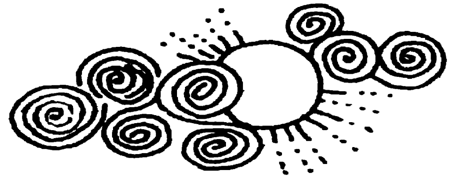
ব্যবধান

মানসী চক্রবর্তী

ব্যবধান

মানসী চক্রবর্তী

বুক ওয়ার্ল্ড
১১ জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা - ৭৯৯০০১



BYABADHAN

by

Manashi Chakraborty

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর 2012

প্রকাশক : অঞ্জনা দাম

বুক ওয়ার্ল্ড

11 জগন্নাথবাড়ি রোড, আগবতলা - 799001

ফোন : (0381) 232 3781 / 231 5121

প্রচ্ছদ : পুষ্পল দেব

অক্ষর বিন্যাস : শিবনারায়ণ মজুমদাব

মুদ্রণ : এস ডি প্রিন্টার্স

32A পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা - 700 009

কলকাতা অফিস ও বিক্রয়কেন্দ্র

জ্ঞান বিচিত্রা

16 ডা.ঃ কার্তিক বোস স্ট্রিট, কলকাতা - 700009

ফোন : (033) 2360 4981

ই-মেল · jnanbichitra@yahoo.com

gnanbichitra.samudra@gmail.com

সার্বিক যোগাযোগ

জ্ঞান বিচিত্রা কার্যালয়

11 জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা- 799001 , ত্রিপুরা

ফোন (0381) 232 3781 / 232 6342

ISBN : 978-81-8266-275-9

একশো পঞ্চাশ টাকা

আমাদের
একমাত্র কন্যা
কল্যাণীয়া সুমিত্রা-কে

ভূমিকা

ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যে শ্রীমতী মানসী চক্রবর্তী নবাগতা। নবাগতা হলেও তাঁর লেখায় জীবনের অভিজ্ঞতার ছাপ আছে। বিশেষভাবে উল্লেখ করার কথা হল, তাঁর কাহিনির পটভূমি কিন্তু ত্রিপুরা নয়, তাঁর লেখা গড়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের কোনো এক অখ্যাত গ্রাম নয়নপুরকে নিয়ে। সেখান থেকে অল্প দূরে রয়েছে নদীয়ার কৃষ্ণনগর এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা। ত্রিপুরা বা আগরতলার নাম গন্ধ কোথাও নেই। তবে ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গ যেহেতু অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে একসূত্রে গাঁথা তাই লেখার পরিস্থিতিকে গ্রহণ করতে পাঠকের কোনো অসুবিধে হয় না।

বাংলা সাহিত্যে মধ্যবিত্তজীবনকে এনে দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। তারপর থেকেই আমরা দেখে আসছি, জীবনের যা কিছু সমস্যা, জটিলতা সব কিছু যেন মধ্যবিত্ত জীবনকে ঘিরেই। উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সেখানে যেন সংখ্যালঘু। লেখকলেখিকারাও বেশিরভাগ উঠে এসেছেন মধ্যবিত্ত স্তর থেকেই। শ্রীমতী মানসী চক্রবর্তীও সেই মধ্যবিত্ত জীবনচিত্র নিয়েই তাঁর উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর উপন্যাস 'ব্যবধান' আমাদের অতি পরিচিত এক মধ্যবিত্ত জীবনকেই রূপায়িত করেছে।

ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস খুব একটা বড়ো জায়গা নিতে পারে নি এখনো। কবিতা এবং ছোটো গল্পই এখানে আসর জুড়ে বিরাজ করছে। সেদিক থেকে শ্রীমতী মানসী চক্রবর্তী যেমন খোলা ময়দান পেয়ে গেছেন, ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যও তেমনি তাঁর কাছ থেকে পেয়ে গেছে তার ক্ষীণ শাখাটিকে পল্লবিত করার উপকরণ।

সর্বত্রই সাহিত্যের আসরে মহিলাদের উপস্থিতি কম। এর কারণ মহিলাদের সৃজন প্রতিভার স্বল্পতা নয়। এর কারণ হল নারীর সামাজিক অবস্থান। সবক্ষেত্রেই তো মেয়েরা পুরুষের পিছনে দাঁড়িয়ে। সাহিত্য যেহেতু প্রকাশ মাধ্যম, সেখানে তো তাদের পরিবার আরো কম। খোলাখুলি কথা বলার জোর মেয়েদের অল্পই। যা চোখে দেখা গেল, বা মন দিয়ে বোঝা গেল তা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করার পথে মেয়েদের বাধা অনেক। রেখে ঢেকে, সাজিয়ে গুছিয়ে, আবৃত করে তাকে বাইরে আনতে হয়। এর জন্যই জীবনের বাস্তবরূপ সাহিত্যে ফুটিয়ে তোলা মেয়েদের পক্ষে কষ্টসাধ্য।

শ্রীমতী মানসী চক্রবর্তী যে জীবনকে তুলে ধরেছেন, তা আমাদের সকলরেই পরিচিত। আমাদেরই চেনা জানা জীবন কাহিনি যেমন আমরা যেন নিজেদেরই দেখতে পাই তাঁর লেখায়।

এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। তিনি যেন কষ্ট খুঁজে খুঁজে ঘটনা সংগ্রহ করেন নি। অবলীলাক্রমে লিখে গেছেন যা আশেপাশের সংসারে। নিজেদের সেই একান্ত পরিচিত আপন পৃথিবীটাকে দেখতে পাওয়ার মধ্যে যে মমত্ববোধ ও আকর্ষণ সেটাই পাঠককে টেনে রাখে তাঁর উপন্যাসের দিকে।

তিনি আরো লিখুন। ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যকে ভরিয়ে তুলুন নতুন নতুন পত্র পল্লবে এই কামনাই রইল।

অপরাজিতা রায়

জয়নগর, আগরতলা

১৯ জানুয়ারি, ২০১২



বর্ষণ থেকে মুক্ত আকাশে উঁকি দিচ্ছে বিকেলের পড়ন্ত রোদ। কাদা মাখা পথ এগিয়ে গেছে একটি সুন্দর গ্রাম নয়নপুরের দিকে। সরল সহজ সাদাসিধে মানুষের বাস এই গ্রাম। সবুজ বনানীতে ঢাকা এই গ্রাম যেন প্রকৃতির এক অভূতপূর্ব অবদান। প্রকৃতি ঢেলে দিয়েছে তার সব ধরনের সৌন্দর্য এই মাটিতে। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত মিলিয়ে এখানকার গণবসতি। শিক্ষিত, অশিক্ষিত সব ধরনের মানুষই আছে এখানে। যেমন ভাল মানুষ আছে, তেমনি খারাপ মানুষও আছে। নয়নপুর 'বর্ধিষ্ণুগ্রাম' বলেই পরিচিত। কিন্তু এখনও অনেক কিছুরই অভাব আছে এই গ্রামে। স্কুল আছে দুই তিনটেই কিন্তু শিক্ষকের সংখ্যা খুবই নগণ্য। কেননা স্থানীয় শিক্ষিত লোকরাই এই স্কুলের পঠন পাঠন কোনমতে চালিয়ে যাচ্ছে। মণিময় রায় এই স্কুলেরই শিক্ষক — স্কুলের মাঠের পুর্বদিকে তাঁর বাড়ি— সাদামাটা ছিম্‌ছাম্ বাড়ি— স্ত্রী-ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার। একটি মেয়ে একটি ছেলে। স্ত্রী — শোভা খুবই ধীর, স্থির বুদ্ধিমতী। সংসারের যাবতীয় কাজ তিনি একা হাতেই সামলান। মণিময়বাবু খুবই গম্ভীর এবং সৎবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। গ্রামের মোটামুটি প্রত্যেকের সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক খুবই ভাল। মেয়ে প্রাইভেটে বি. এ. পড়ছে, ছেলে বেকার। তাই মণিময়বাবুর খুব চিন্তা ছেলের জন্য। এছাড়া উনি যা মাইনে পান তা দিয়ে কোনোমতে চলে যায় এই চার জনের সংসার।

বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে মণিময়বাবু বাড়িতে ঢুকেই দেখলেন স্ত্রী শোভা বসে আছে বারান্দার এক কোণে।

কীগো - কী হল বসে আছ বাইরে ? কী ব্যাপার ? বিশ্রাম-টিশ্রাম হয়নি নাকি ? মণিময়ের প্রশ্নের উত্তরে শোভা মুচকি হেসে বললেন — না - গো - না — ও বাড়ির দিদি এসছিলেন — একটু গল্প করছিলাম। তোমার আসার সময় হয়েছে ভেবে উঠে গেলেন। তা তোমাকে চা দেব তো এখন ? না পরে ? মণিময় ছাতাটা নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন — দাও। সঙ্গে একটু মুড়ি ভাজা দিও। রেখা কোথায় ? দেখছি না তো ? ওহে ভুলে গেছি — ও তো টিউশনিতে গেছে। সত্যি তোমার যে কী হয়েছে সবই ভুলে যাও — শোভা একটু বিদ্রুপ করেই বলল — বলেছিলাম না স্কুল থেকে ফেরার সময় কিছু বাজার করে নিয়ে আসতে ? তাও নিজেই ভুলে গেছ ? আবার যেতে হবে। বলে চা করতে চলে গেল। ফিরে এল এক বাটি মুড়ি ভাজা ও চা নিয়ে। কোথায় গেলে, চা খাও এসে। রাখলাম বারান্দায়। তাড়াতাড়ি এসো — ঠান্ডা হয়ে যাবে।

আসছি তো ! কোথায় আবার যাব ? হাত মুখটা ধুয়ে এলাম — মুখ মুছতে মুছতে মণিময় বারান্দায় উঠল — কীগো তুমি চা খাবে না ? কাপটা নিয়ে এখানে এস — আর বল বাজার থেকে কী আনতে হবে ? আচ্ছা — অসীমকে দিয়ে বাজারটা করাতে পার না? সারাদিন তো ঘোরাফেরা ছাড়া আর কোন কাজই নেই।

কোথায় পাব তাকে ? বিরক্তস্বরেই বলল শোভা — এক কাপ চা নিয়ে চেয়ারে বসল — ইসস কোমরটা যে কী ব্যথা — বয়স যে হচ্ছে তারই ঘণ্টা বাজছে। থাক গে যা খুশি হোক — যা বলছিলাম — তোমার ছেলে খাওয়াদাওয়ার পর সেই যে বেরিয়েছে তার কোনো পাত্তা আছে এখন অবধি ? কী যে হবে ছেলেটার। আমার একটুও ভাল লাগে না। হবে গো গিন্নি— হবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ সময় হলে ঠিক কিছুনা কিছু একটা ব্যবস্থা হবেই। মণিময় শোভার সামনে গিয়ে বলল — তুমি এত চিন্তা করো না তো। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাকে থলেটা দাও ঘুরে আসি বাজার থেকে। বলে পাঞ্জাবিটা পরে নিল — বললে না তো কী আনতে হবে। শোভা বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে।

বলল — দাঁড়াও বলছি — আচ্ছা তোমাকে কি রোজই বলে দিতে হবে বাজার যাবার সময়। বুদ্ধি করে নিয়ে এস অল্পসল্প কিছু। যাও তো যাও - সন্ধ্যা হয়ে এল — ধূপ জ্বালাতে হবে। কোমরে কাপড় গুঁজতে গুঁজতে বলল — মেয়েটাও এখনও আসছে না — এখন আর পেরে উঠিনা সব কাজ করতে।

কী হল মা ? বলতে বলতে রেখা এগিয়ে এল, তোমাকে ধূপ জ্বালাতে হবে না আমি দিচ্ছি — দাঁড়াও হাত পা ধুয়ে নিই। এই বলে রেখা উঠানের এক কোণে বাথরুমের দিকে এগোল। ঘনবসতি এই পাড়া, তবুও সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে যেন মনে হয় নিস্তব্ধ নিঝুম। ঝিঁঝিঁপোকার ডাক, কাছাকাছি বাড়ি থেকে ভেসে আসছে উলুধ্বনি। শাঁখের আওয়াজ।

এদিকে শোভা রাগে গিজগিজ করছে — দেখেছিস রেখা, তোর দাদার কাণ্ড। এখনও বাড়ি ফেরার নাম নেই। আমার কপালটাই মন্দ। না হচ্ছে তোর বিয়ের কিছু, না হচ্ছে অসীমের কোন কাজের ব্যবস্থা ? রাতে ঘুমুতে পারি না এসব ভেবে।

ছাড় তো এসব কথা — রেখা খেঁকিয়ে উঠল — হাতে ধুপ্তি নিয়ে তুলসী গাছের দিকে এগোচ্ছে। আচ্ছা মা। তোমার কি অন্য চিন্তা কিছু নেই ? যখন যেটা হবার সেটা ঠিকই হবে। ভেবে শরীটাকে খারাপ কোরোনা। বলে ঘরে ঢুকল। শোভা কাপড়গুলো ভাঁজ করে আলনায় রাখছে। রেখা এগিয়ে এসে বলল — আচ্ছা মা চা খাবে ? আমি একটু চা করে খাব। বাবা মুড়ি নিয়ে এলে সবাই মিলে মুড়ি ভাজা খাব। কী বল ?

নিশ্চয়ই খাব। বেশি করে খাব। হঠাৎই অসীম পেছন থেকে এসে বলে উঠল। রেখা বোনটি আমার — আমাকে একটু চা দিস। রেখা আড়চোখে তাকিয়ে ইশারা করছে মা আসছে। খাওয়াচ্ছি তোকে চা। এতক্ষণ কোথায় ছিলিরে হতভাগা? ক্ষিপ্ত হয়ে শোভা এগিয়ে এসে

বলল — কোথায় যাস। কী করিস, কিছুই তো জানি না — মা-বাবার যে সন্তানের জন্য কত চিন্তা সেটা একদিন বুঝবি। আমি আর পারি না — বলে বসে পড়লেন বিছানায়। নম্রসুরে মাতৃসুলভ ভঙ্গিতে বললেন — দেখ বাবা - আমাদের বয়স হচ্ছে — এখন তুইই আমাদের একমাত্র ভরসা। এভাবে সারাদিন যদি ঘোরাঘুরিই করিস তা হলে, কাজের চেষ্টা করবি কখন ? এই তো দ্যাখ তুই ঘরে ছিলি না বলে তোর বাবাকেই বাজারে বেরোতে হল। একটু বিশ্রামও নিতে পারল না।

এতক্ষণ অসীম গুম হয়ে বসেছিল। মা'র কথার জবাবে কিই বা বলবে। সত্যিই তো মা-বাবার তো চিন্তারই কথা। অথচ সেই বা কী করবে। চাকুরি কি হাতের মোয়া ? অসীম ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েই রইল — বলল — মা বলতো আমি কী করতে পারি ? সবই বুঝি। কিন্তু মামার জোর থাকলে কবেই হয়তো বা একটা ছোটোখাটো চাকরি হয়ে যেত, তবে হ্যাঁ একটা কিছু তো করতেই হবে। এভাবে ঘুরেফিরে দিন কাটালে তো চলবে না।

উ ... কী করবি তুই ? মুখ বিকৃত করে রেখা বলল — হাতে চায়ের কাপ নে, ধর চা - মুখে বড় বড় কথা— কাজের বেলায় কিছুই না। আচ্ছা দাদা— বাবাকে দেখলে তোর কষ্ট হয় না ? এই বয়সেও কত পরিশ্রম করেন। গম্ভীর হয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে বলল — শোন — দাদা তোকে বলছি - ছেলে পড়াতে শুরু কর। এর চাইতে ভাল ব্যবসা আর নেই। একদম পুঁজি ছাড়া ব্যবসা। শুধু বিদ্যাবুদ্ধি চাই পুঁজি। মুচকি হেসে বলল কেমন বুদ্ধি দিলাম বল ? মা ... প্রদীপটা নিবিয়ে দাও নাগো — একদম ভুলে গেছি। বালিশে উপুর হয়ে শুয়ে অসীম পা নাড়ছে — রেখার কথার উত্তরে সে উঠে বসে বলল — আরে — মুখপুড়ি বেশি পাকামো করিস না। ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া অতই কি সোজা ? আর তাছাড়া আমার মতো বেকার গ্র্যাজুয়েট ভূরি ভূরি আছে এই গ্রামেই। হতাশার সুরেই বলল অসীম এই কথাগুলো। মনের মধ্যে তার অনেক আশা-আকাঙক্ষা ছিল। সাধ ছিল বাইরে গিয়ে এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হবে। কিন্তু বাবার তো সাধ্য নেই। তাই সে কাউকেই দোষ দেয় না। নিজেরই অদৃষ্ট মন্দ — এটাই ভাবে। তাই রেখার বক্তব্যে কথা না বাড়িয়ে সোজা চলে গেল সামনের ঘরে টি. ভি.-র সামনে। খেলা চলছে ভারত পাকিস্তান — ক্রিকেট ম্যাচ। নিজে নিজেই বলছে — দেখতে পাব কিনা কে জানে। রোজইতো আছে এক লোড্‌শেডিং — বিরক্তিকর — আজ কটার থেকে রে লোড্‌শেডিং ? রেখার উদ্দেশ্যে বলল অসীম।

মনেতো হয় সাড়ে আটটা থেকে নয়টা। কাজানি আসলে কখন হবে ? ওদের কি কোন মাথা মুণ্ডু আছে না কি — এখন তো বাজে মাত্র সাড়ে ছয়টা। মা—ওমা—বাবা এখনও আসছে না কেন ? বলে মার কাছে গেল। শোভা চুল আঁচড়িয়ে চুল বাঁধছে। বিনুনি পাকাতে পাকাতে বলল— নিশ্চয়ই পল্টুর দোকানে বসে একটু গল্প সল্প করছে। করুক একটু গল্প— ঘরে এলেই তো একঘেয়েমি— মাছ একটু আনতে বলেছি, পেল কিনা কে জানে। দেরি হলে তো আবার ...

না, না মা — তোমাকে কিছু করতে হবে না। লোড্‌শেডিং হয়ে গেলে তোমার অসুবিধা হবে — আমি যা হোক কিছু করে নেব। বাবাকে আগে আসতে দাও তারপর তো .... বলে রেখা পত্রিকাটা নিয়ে বসল। মার্জিত রুচি সম্পন্না স্বল্পভাষী, স্থির ধীর, মণিময়ের এই মেয়েটি গ্রাম্য সারল্যের এক প্রতিমূর্তি— কে জানে ওর অদৃষ্টের লিখনে কী আছে — এটাই মণিময়ের ও শোভার একমাত্র চিন্তা — সংসার তো যেভাবেই হোক চলে যাচ্ছে। ওদের সংসারে আর্থিক অনটন হয়তো আছে কিন্তু শান্তির অভাব নেই। যা একটু অসীমকে নিয়েই দুশ্চিন্তা। ছেলেকে একটা সুষ্ঠু সৎ ভবিষ্যতের পথ দেখানো মণিময়ের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাসী মণিময় এটা নিয়ে এক্ষুনি এতটা ভাবছে না। যতটা ভাবনা চিন্তা করে শোভা — মা হিসেবে এটা ঠিকই আছে — ছেলে-মেয়ের শান্তি কে না চায়।

শহর ঘেঁষা এই গ্রাম মণিময়ের বাল্য-কৈশোর-যৌবনের কষ্টার্জিত দিনগুলির সাক্ষী। সুখ-দুঃখ শান্তি-অশান্তি সবই কেটেছে এই গ্রামে। তার সাধের এই সংসার নিয়েই সব জল্পনা-কল্পনা। বাজারের থলে নিয়ে মণিময় এসে ঢুকল বাড়িতে। রেখা মা— নে তো থলেটা — আর আমাকে একটু জল দে, খাব। ধর, ধর... বলে এগিয়ে দিল ব্যাগটা রেখার কাছে — রেখা তড়িঘড়ি করে এসে ব্যাগটা ধরে বলল — কেন গো বাবা একটু চা খাবে না ? তুমি বিশ্রাম কর — হাত ধুয়ে জলটা দিচ্ছি — বলতে বলতে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। ফিরে এল এক গ্লাস জল নিয়ে — নাও জলটা, কি হলো ? জামা কাপড় ছেড়ে নাও — আলনায় ধোয়া লুঙ্গিটা আছে — চায়ে জল চাপিয়েছি। মা তুমিও খাও বাবার সঙ্গে বসে। বলে আবার চলে গেল রান্না ঘরে।

মণিময় হাই তুলতে তুলতে গায়ের শার্টটা খুলে নিল। লুঙ্গিটা পরল — জানো গিন্নি — আমাদের মেয়েটা বেশ সাব্যস্তের হয়ে উঠেছে লক্ষ্য করেছ কি ? আর আমার চিন্তা নেই। এখন একটা ভাল পাত্র দেখে বিয়ে দিলেই শান্তি। থাকগে ওসব কথা। রেখা মা শুনলে আবার খিঁচিয়ে উঠবে। ও বলতে ভুলে গেছি মাছ কিন্তু ভাল পাইনি। ছোটো মাছ এনেছি। পাঁচ মিশেলি আর কি — নদীর মাছ তো। মনে হয় খারাপ হবে না। একটু ঝাল ঝাল করে রান্না করো।

তোমার মেয়ে রান্না করবে বলেছে। আমাকে কিছুতেই দিল না রান্নাঘরে যেতে। শোভার মেয়ের প্রতি গর্বের প্রকাশ, ভঙ্গিমায় তার খুশির আমেজ — জানতো রেখা আজকাল আমাকে অনেক সাহায্য করে। এই কচি বয়সে ওর আমাদের প্রতি কর্তব্যজ্ঞান সত্যিই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।

তোমার তো সবটাতেই ভাবনা ? এটা আবার ভাবনার কি কারণ ? এটাই তো স্বাভাবিক, মা-বাবার প্রতি প্রত্যেক সন্তানেরই শ্রদ্ধাভক্তি থাকে, তাই না ? বলে মণিময় উত্তরের অপেক্ষায় শোভার দিকে তাকিয়ে রইল। শোভা অবাক হয়ে চাইল মণিময়ের দিকে — ভাবছে কী বলছে

মণিময়, আজকালকার দিনে সব সন্তানদের মা-বাবার প্রতি এত গভীর মনোযোগ থাকে না — অনেক ক্ষেত্রে মা-বাবার প্রতি কোন ভক্তি শ্রদ্ধাই থাকে না-সব জেনেশুনে মণিময় এ কী বলছে — তারপরই ফেটে পড়ল স্বামীর প্রতি — কি বললে — এটাই স্বাভাবিক ? আজকের যুগের হাওয়া সব — জেনে শুনেও বলছ স্বাভাবিক? আশ্চর্য লোক বটে তুমি ? বিরক্ত হয়ে চায়ের কাপ নিয়ে উঠল — দূর, তোমার সঙ্গে কথা বলতেই ভাল লাগছে না। আমরা ছেলেমেয়েকে যে শিক্ষা দিয়েছি সেটাই ওরা গ্রহণ করেছে — তা বলে কি সব ছেলেমেয়েই মা-বাবার শিক্ষা গ্রহণ করে ? না কি সকলেই মানুষের মতো মানুষ হয় ? বল ? ঠিক বলেছি কিনা ? উত্তেজিত হয়ে শোভা রান্না ঘরের দিকে চলে গেল। দৌড়ে এসে অসীম ঢুকল বাবার ঘরে - এদিক ওদিক তাকিয়ে কৌতুক ভঙ্গীতে বলল — বাবা কী ব্যাপার — হেড অফিসে গণ্ডগোল লাগিয়ে দিলে ? ভেরি ইন্টারেস্টিং। অনেকদিন বাদে এই জমজমাট দৃশ্য। তাই না বাবা ? মণিময় মুখে আঙ্গুল দিয়ে ছেলেকে চুপ করাতে ব্যস্ত।

এই চুপ্ কর চুপ্ কর — তোর মা শুনলে আর রক্ষা নেই। গৃহযুদ্ধ হয়ে যাবে।

কী নিয়ে কথা হচ্ছিল বল তো ? অসীমের চোখে মুখে উৎসাহ। তবে হ্যাঁ বাবা যাই বল না কেন মা সমাজের সব মা'দের চাইতে আলাদা। এতই ভাল যে আমরা গর্বিত মা'কে নিয়ে। তাকে ক্ষেপানো তোমার কোন মতেই উচিত হয়নি। যা ভাগ এখান থেকে — আগুনে ঘৃতাহুতি দিতে এসেছে। যা যা বলছি। ছেলেকে তাড়া করল মণিময়। খেলা দেখছিলি না ? দেখগে যা। — মুচকি হেসে চলে গেল অসীম।

রাত বাজে সাড়ে দশটা — অনেক বাড়িতেই আলো নিভানো। বাজার সেরে, দোকান সেরে কেউ কেউ বাড়ি ফিরছে। রাস্তায় কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। মণিময় ভাবছে বিছানায় শুয়ে এখনও ডাকছেনা কেন খাওয়ার জন্য। ঠিক এমনি সময় ডাক পড়ল — বাবা, ও বাবা খেতে এস, দাদাকেও ডাক। দাদাটাও হয়েছে তেমনি — ক্ষিদে তৃষ্ণাও পায়না নাকি ? পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে— বলে ভাত রেডি করে নিল। সবার খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে সবাই শুতে চলে গেল।

ভয়ে ভয়ে মণিময় বিছানায় উঠল। শোভা নীরব চোখ বুজে শুয়ে আছে। মণিময়ই পরিস্থিতিটা স্বাভাবিক করার জন্য বলল — শোন রেখার মা, তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ — তুমি অন্য অর্থ করেছ। আমারই আসলে ভুল হয়েছে তোমাকে বোঝাতে। আমাদের সন্তান আমাদের আদর্শ নীতিতেই চলছে এটা আমাদের সৌভাগ্য।

ঠিক আছে ঠিক আছে — এখন ঘুমাওতো অনেক রাত হলো। অসীম রেখা শুনতে পাবে আমাদের কথা। বলে পাশ ফিরে শুল শোভা।

অতি অল্প বয়সে সংসারে ঢুকেছে মণিময়। তাই ছেলে মেয়েও হয়ে গেছে বিয়ের যোগ্য। বাবা মারা যান যখন মণিময়ের বয়স বিয়াল্লিশ। পিতৃঋণও শোধ করতে হয়েছে। অবিশ্যি তাও

যৎসামান্য। কিন্তু গাঁয়ের স্কুল শিক্ষক দিয়েই জীবন শুরু। কতই বা তার মাইনে। পৈত্রিক সম্পত্তি বলতে এই বাড়িটা। জমি টমি যা অল্প বিস্তর ছিল তা বিক্রি করে দিতে হয়েছে সংসারের চাহিদা মেটাতে। একটি মাত্র ছোটো বোন কল্যাণীকে পাত্রস্থ করতে হয়েছে এই জমি-বিক্রির টাকা দিয়েই। এছাড়া মণিময়ের কোন উপায় ছিল না। কল্যাণী থাকে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে। ভগ্নীপতি শারীর শিক্ষক। মোটামুটি চলে যাচ্ছে — কল্যাণীর দুটোই ছেলে। বড় ছেলে স্কুল পেরিয়ে মাত্র কলেজে পড়ছে। ছোটো ছেলে ক্লাস নাইনে পড়ছে। মণিময় বোনের খোঁজখবর সবসময়ই রাখে। বছরে একবারই যায়। সেটা হচ্ছে ভাইফোঁটা। এছাড়া আর যাওয়া হয়ে ওঠেনা।

ভোর হয়ে গেছে। প্রকৃতি চমকাচ্ছে সূর্যের দীপ্ত উজ্জ্বল প্রতিভায়। পাখির কিচিরমিচির সঙ্গে সকালের আলো যেন কত মধুর হয়ে উঠেছে। প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছে অনেকেই। গাঁয়ের মেঠো পথে কেউ বা লাঠি নিয়ে। কেউ বা এমনি পায়চারি করতে বেরিয়েছে। ওদের গল্প কথা, হাসি তো মুখে লেগেই আছে। মণিময় কোনোদিনই প্রাতর্ভ্রমণে বেরোয় না। সাতটা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত ঘুমায়। তাই আর বেরোনো হয় না। শোভা কখন উঠেছে তা বলতেও পারে না। হাত মুখ ধুয়ে রান্না ঘরে ঢুকে চায়ের জল চাপিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ান। কীরে রেখা—পটলার মা কি আজ আসবে? কাল তো এল না। তুই এসে বললি শরীরটা ভাল নেই। আজ কী করবে কে জানে! টিউশনিতে বেরোবে বলে রেখা তৈরি হচ্ছিল—যদিও দেরি আছে। এখন বাজে মাত্র সাড়ে ছয়টা। আরও ঘণ্টাখানেক পরে যাবে। কী করে বলব বলতো? মুখ মুছতে মুছতে বারান্দায় এসে দাঁড়াল, ঠিক আছে মা, আমি বরং থালাগুলো ধুয়ে রেখে যাই। আর যদি ও নাই আসে তাহলে দাদাকে বলবে জলটা তুলে দিতে। তুমি একদম জল টানবে না। সাবধানের ভঙ্গিতে বলল রেখা। চলে গেল বিছানাটা ঠিক করতে।

রেখা, রেখা বোন আমার চা'টা এনে দেনা। উঠতে ইচ্ছে করছে না —

অসীম তারস্বরে চিৎকার করে রেখাকে ডাকছে। শোভা শুনতে পেয়ে অসীমের ঘরে ঢুকল — এই ছেলে কী ব্যাপার রে? চা'য়ের জন্য অর্ডার দিচ্ছিস যে বড় ? বিছানা ছেড়ে উঠতে পারিস না? কত বেলা হয়েছে জানিস ? বিরক্তভাবে চলে গেল চা রেডি করতে। রেখা এসে নিজের ও দাদার চা নিয়ে গেল। শোভা বারান্দায় বসল চা'য়ের কাপ নিয়ে। মণিময় বিছানা ছেড়ে উঠে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। এল আরেকটা

সকাল। কে জানে কীভাবে কাটবে সারাটাদিন। ঈশ্বরবিশ্বাসী মণিময় ঈশ্বরের উপরই ছেড়ে দিয়েছে সেটা দেখার জন্য। জীবনের অনেকটা পথই পেরিয়ে এসেছে মণিময় বাকি পথটাও তাকে চলতে হবে দুঃখ কষ্ট নিয়েই। ভাবলেই মনটা উদাস হয়ে যায়।

মুখ ধুয়ে এসে বারান্দায় বসল পত্রিকাটা নিয়ে। কইগো-চা দাও। রেখা কি বেরিয়ে গেছে ? চায়ের কাপ নিয়ে শোভা এল — হ্যাঁগো — নাও চা— বাড়িয়ে দিল চায়ের কাপ মণিময়ের দিকে। কেন রেখাকে কী দরকার ? কৌতূহলী ভঙ্গীতে বলল শোভা। কেন এই কৌতূহল না জেনেই মণিময় বলল — না — এমনি। ঘুম থেকে উঠে মেয়েটাকে দেখতে পাইনি তো তাই .... অবিশ্যি আমারও আজ উঠতে অন্তত আধঘন্টা দেরি হয়ে গেছে। চা খেয়ে মণিময় কাঁধে গামছা নিয়ে চলে গেল বাথরুমের দিকে।

আকাশটা মোটামুটি পরিষ্কারই বলা যায়। তবে আষাঢ় মাস তো কিছুই বলা যায় না। হঠাৎ কখন বর্ষা শুরু হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ বৃষ্টির জেরেই গ্রামের পথগুলো প্রচণ্ড কর্দমাক্ত হয়ে ওঠে। নালাগুলো ভরে যায় জলে। নয়নপুর তখন অশ্রু সজল হয়ে ওঠে। পাশাপাশি গ্রামগুলির অবস্থা আরও জটিল হয়ে ওঠে। দুর্দশাগ্রস্ত অসহায় মানুষের বিপন্নতা হৃদয় বিদারক হয়ে ওঠে। শহর ঘেঁষা হলেও এই দু-চারটি গ্রামের উন্নতি খুউব ধীর গতিতেই হচ্ছে। তবে এ বছর বর্ষাটা সেভাবে এখনও আসেনি। আষাঢ়ের মাঝামাঝি চলছে। দেখা যাক্ কী হয়। শোভা রান্না ঘরে বাসনগুলি গুছিয়ে রাখছে। রেখা চলে গেছে টিউশনিতে। অসীম উঠানে দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে এক আধুট ব্যায়াম করছিল। গেট খুলে পটলার মা ঢুকল। বলল — মাসিমা - ও মাসিমা, আমি এয়েছি।

উদ্ধার করেছ। এখন কাজগুলো করে বাকি উদ্ধারটা কর। যাও, যাও মা রান্নাঘরে আছে। বলে অসীম ব্যায়াম করতে লাগল। শোভা রান্নাঘর থেকে তেড়ে এল। অসীমকে বলল, ছিঃ অসীম এভাবে কথা বলতে হয়, মানুষের সঙ্গে ? এই শিক্ষাই দিয়েছি তোকে ? যাও তো পটলার মা, রান্নাঘরে গিয়ে আগে বাট্‌নাটা কর।

হ্যাঁ — আচ্ছা বলে চলে গেল পটলার মা। অসীম ব্যায়াম বন্ধ করে মা'র দিকে আড়-চোখে তাকিয়ে চলে গেল ঘরে। শোভা আস্তে আস্তে এগোল রান্না ঘরের দিকে, দেখল মণিময় বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শোভার দিকে। বলল — কী ব্যাপার — এত হৈ চৈ কিসের ? মনে হল যেন পটলার মা এসেছে ?

হ্যাঁ-হ্যাঁ এসেছে। শোভা সহজ সরল ভঙ্গীতে বলল — আমি অসীমকে বকেছি — পটলার মাকে কী যা-তা বলছিল — মণিময় কোন গুরুত্ব না দিয়ে বলল — ঠিক আছে, ঠিক আছে — টিভির খবরটা দেখে চলে যাব। আজ আবার মিটিং আছে। তাই একটু আগে বেরোবো। শোভা বলল — তা যেও। কিন্তু বাজে ক'টা এখন? ভাত চাপিয়ে দিয়েছি। একটু মাছ

তোমাকে আগে করে দেব আর কি।

এখন বাজে প্রায় পৌনে নয়টা, বলে টিভির সামনে গিয়ে খবর দেখে তবেই চানে যাবে। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতোই উথালপাথাল মণিময়ের জীবন সংগ্রাম, রুটিন মাফিক জীবনে তার বিচিত্রতা নেই বললেই চলে। অবিচলিতভাবেই কাটিয়েছে অতীতের জমজমাট মিশ্রিত দিনগুলি। এখন অবিশ্যি পূর্ণমর্যাদা নিয়েই সংসারে আছে। শোভার মতো স্ত্রীভাগ্য মণিময়ের শান্তির একটা বিশাল প্রতীক। তাই স্বল্প আয়েও পূর্ণ শান্তি বজায় আছে মণিময়ের সংসারে। অসীম জামা কাপড় পরে রেডি বেরোবার জন্য। বলল, কী গো মা — খাওয়ার কিছু পাব ? খুউব ক্ষিদে পেয়েছে। যাই হোক একটা কিছু দাও না — ইসস — পাচ্ছিনা সহ্য করতে। পেটে হাত দিয়ে রান্না ঘরের মেঝেতেই বসে পড়ল। শোভা ছেলের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল — হ্যাঁ হ্যাঁ দিচ্ছি বাবা। একটু অপেক্ষা কর — দুটো রুটি ক'রে দিচ্ছি। জীবনের সায়াহ্নে এসে শোভার পক্ষে এত পরিশ্রম খুবই কষ্টকর। সংসারটাতো নিজের, করতে তো হবেই। অনেক সময়েই হাঁপিয়ে ওঠে শোভা। বাতের যন্ত্রণায় মাঝেমধ্যে কষ্ট পায়। হা-পিত্যেশ করলে তো সংসার অচল হয়ে যাবে। তাই মণিময়ের দিকে তাকিয়ে সবকিছুই মুখ বুজে সহ্য করতে থাকে। খুব একটা বড়লোক বাড়ির মেয়ে নয় শোভা। শোভার বাবা ছিলেন তখনকার দিনের পোষ্টমাষ্টার। বদলির চাকুরি ছিল। শোভার বাবার নিজস্ব বাড়ি ছিল শান্তিপুরে। শান্তিপুর শহর থেকে অনতিদূরে একটা ঘনবসতিপূর্ণ গ্রামে। পড়াশুনা স্কুল পর্যন্ত। তারপরেই বিয়ে হয়ে যায়। খুব অল্প বয়সেই সংসারে প্রবেশ, তাই স্বাভাবিক ভাবেই হাঁপিয়ে উঠেছে। অসীম প্রাতরাশ করে বেরিয়ে গেল। মণিময়ও খাওয়া দাওয়া সেরে সময় মতো বেরিয়ে পড়ল স্কুলের উদ্দেশ্যে। বেলা বাজে প্রায় সোয়া এগারটা। রান্না-বান্না শেষ করে নিয়ে রেখার খাওয়ারটা ঢেকে রাখল। নিজে খেয়ে নিল সামান্য কিছু। রেখা এলে চা খাবে। গুমোট গরম তাই বারান্দায় হাত পাখাটা নিয়ে বসল শোভা। হঠাৎই রেখার বান্ধবী চম্পা এসে ঢুকল — মাসিমা, রেখা বাড়িতে নেই ? শোভা একগাল হেসে বলল— নারে মা রেখা এখনও আসেনি। এত দেরি হচ্ছে কেন বুঝতে পারছি না। আয়, আয় তুই এসে বোস। মোড়াটা এগিয়ে দিল। চম্পা বলল না মাসিমা বসব না। একটা বই নিতে এসছিলাম। থাকগে বিকেলের দিকে না হয় আসব আবার। এখন যাই মাসিমা। বলে চলে গেল চম্পা। মণিময়ের বাড়ির তিনচারটা বাড়ি পরেই চম্পাদের বাড়ি। চম্পাও প্রাইভেট বি.এ. পরীক্ষা দেবে। ওর বাবা নেই। কোন রকমে সংসার চলে যায়। ওর একটা বড় দিদি আছে। বিয়েও হয়েছে — তবে শ্বশুর বাড়ির লোকজন বিশেষ সুবিধার নয়। স্বামীও তেমনি। টাকার খাঁই বেশি। তাই মায়াকে, ওর দিদির নাম, যথেষ্ট অত্যাচার সহ্য করতে হয়। গ্রামে গঞ্জে শহরে তো এই সব এখন প্রায়শই শোনা যায়।

দুপুরে কড়া রোদের তাপে গরমটা হয়ে উঠেছে অসহনীয়। কাজ ছাড়া ঘর থেকে কেউ বেরোয় না। মাঠের কাজের ব্যস্ততাও অনেকটা কম। সকালবেলা কিছুটা বাতাস ছিল— এখন যেন

প্রকৃতি হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। রেখা বাড়ি ফিরে স্নান টান সেরে নিল। এলোমেলো চুলে একটু টেবিল ফ্যানটার সামনে বসে মার দিকে তাকিয়ে বলল, মা, জানতো আজ কেন দেরি হয়েছে ফিরতে ? শোভা মেয়ের দিকে ক্ষীণ দৃষ্টিতে তাকাল বলল কী করে জানব ? এদিকে আমি চিন্তায় অস্থির, চম্পা এসেছিল বই নিতে। রেখা বলল ঠিক আছে — শোনই না — আমি যে মেয়েটিকে পড়াই ওর মাসি এসেছে কলকাতা থেকে, গ্রাম কোনদিন দেখেনি তাই। আমার চাইতে বয়সে হয়তো কিছুটা বড় হবে। খুউব গল্প করলাম। ভীষণ মিশুকে, তাই দেরিটা হল, শোভা উঠে গেল খাওয়ার প্রস্তুতি নিতে। রেখাকে বলল — আয় আয় খেতে। আমি ভাত বাড়ছি। খাওয়ারদাওয়ার পর্ব আপাতত শেষ করে শোভা একটু বিশ্রাম নিতে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। বয়সের ভারে অনেকটাই দুর্বল হয়ে গিয়েছে শোভা। বিশ্রামই কতটুকু হবে ? ছেলেটা এখনও ফেরেনি। কখন দুটো রুটি খেয়ে বেরিয়েছে। মণিময়ের আসতে আসতে চারটা — সাড়ে চারটার কম নয়। অতিষ্ঠ গরমে অস্থির সবাই।

নিঝুম নিস্তব্ধ গ্রামের দুপুর। খাঁখাঁ করছে রোদ। গ্রামের পথে খুব কমই লোকজন দেখা যাচ্ছে। মাইকে আবার কী যেন বলতে শোনা যাচ্ছে। শোভা এসবে কান না দিয়ে শুয়ে পড়ল। একটু এপাশ ওপাশ করবে বলে। পত্রিকাটা নিয়েই শুল। শোভা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল প্রায় আড়াইটার কাছাকাছি। রেখাও একটু বিছানায় গড়িয়ে নিচ্ছে। বিকেলেও আজ টিউশনি আছে। হঠাৎ গেটের আওয়াজ শুনল রেখা। বলল কিরে দাদা এলি ? চুপচাপ অসীম সোজা ঘরে ঢুকে জামা কাপড় পাল্টে বাথরুমে চলে গেল। শোভা মনে হয় টের পায়নি। সারাদিনের পরিশ্রমে চোখটা একটু ঘুম লেগেছে হয়তো। রেখাই উঠল একটু বিরক্ত হয়েই। উঠতে মোটেই ইচ্ছা করছিল না। তবে আজ রেখা একটা হেস্তনেস্ত করবে দাদার সঙ্গে। এত দেরি করে বাড়িতে ফেরার কী কারণ ? কোন রাজ্য উদ্ধার করে আসে প্রত্যেক দিনই। বসে রইল দাদার অপেক্ষায়।

মণিময়ের যখন বছর তিরিশেক বয়স তখন এই অসীমের জন্ম। তখন বাড়িতে মণিময়ের মা-বাবা, বোন সবাই আছে। আর্থিক অনটন কিছু ছিল ঠিকই কিন্তু শান্তির অভাব ছিল না। হাসিখুশির বাতায়ন সর্বদাই বিরাজ করতো মণিময়ের সংসারে। সেটা অবিশ্যি আজও আছে। প্রথম সন্তান হওয়াতে অসীমের আদরের কোন ঘাটতি ছিল না। দাদু ঠাকুরদার চোখের মণি ছিল। এখনও তার আদর বাবা-মা'র কাছে একই রকম আছে। এই অসীমের চিন্তাই বাবা-মা'র রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। ছেলেও বাবার মতোই সদালাপী, সৎ, নম্র-ভদ্রগোছের। তাই হয়তো এই যুগে অসীমের মতো ছেলের কিছু হওয়া খুবই দুষ্কর। এরমধ্যে পেছনে কোন খুঁটির জোর নেই। তাহলে অসীম কী করবে ? ভাগ্যের পরিহাস বলেই ধরে নেওয়া ছাড়া ওর আর কী করার আছে। অসীম তো চায় বাবাকে একটু রেহাই দিতে সংসারের জটিল সমস্যা থেকে — কিন্তু কীভাবে ? কী করবে ? কবে উঠবে সেই নূতন সূর্য ?

রেখা উঠে গিয়ে ভাত দিল দাদাকে। প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করল অসীমকে। অসীম মুখ বুজে মাথা নিচু ক'রে ভাত খেয়ে উঠে চলে গেল। মুখ ধুয়ে মা'র ঘরে চুপি দিয়ে দেখল মা নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে। ডাকাডাকি না ক'রে টিভি'র ঘরের তক্তপোশটায় একটু কাত হয়ে টিভির চ্যানেলগুলো ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। রেখা বাসনপত্র গুছিয়ে রাখল এই ভেবে হয়তো বা বিকেলে পটলার মা আসবে। পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটায় রেখা যাবে দক্ষিণ পাড়ার টিউশনিতে। বাবার দিকে তাকিয়েই রেখার এই পরিশ্রম। পরিশ্রমটা সার্থক হলে তবেই বাবা-মাকে শান্তি দিতে পারবে। এটাই বদ্ধমূল ধারণা রেখার। এই বয়সের মেয়েদের যে শখ আহ্লাদ সৌখিনতা হয়তো সবই আছে ওর মধ্যে। কিন্তু কিছুই ও প্রকাশ করে না— এটা রেখার স্বভাবজাত দোষ বা গুণ যাই হোক — চেহারার লাবণ্যে, মেয়েসুলভ আচরণে — সব মিলিয়ে ওকে ভালই লাগে। সহজ সরলতার ছাপ ওর মুখে চোখে সব সময়েই পরিস্ফুটিত হয়। এই পাড়াতে ওর সুনাম আছে। সবাইই ওকে স্নেহ করে, ভালবাসে। বাবা মণিময়ের চোখের মণি এই মেয়ে। বিকেলের পড়ন্ত রোদ এসে উঠানে পড়েছে। আকাশটা মনে হয় একটু ভারী ভারী। একরাশ কালোমেঘ যেন পূবদিক থেকে ধেয়ে আসছে। বৃষ্টি এলেও আসতে পারে। শোভা বিছানা ছেড়ে উঠে এসে বারান্দায় দাঁড়াল। ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। মনে হয় কোথাও দূরে বৃষ্টি হচ্ছে। সকালবেলার প্রখর তাপ অনেকটাই তাতে ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। কাপড়-চোপড়গুলো শুকিয়ে গেছে। ওগুলোকে তুলে নিয়ে চলে গেল ঘরে — রেখাকে ডাকল— রেখা - মা একটু চা করে খাওয়াবি? রেখার কাছে এগিয়ে গিয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল — হ্যাঁরে অসীম কখন এল? আমি তো কিছুই টের পাইনি। আমাকে ডাকলি না কেন? রেখা জানালার দিকে তাকিয়ে আকাশ দেখছিল। হেসে বলল — তোমাকে আবার কী ডাকব? শুধু তো ভাত দেওয়া। তুমি মাত্র একটু ঘুমিয়েছ তাই আমি আর ডাকিনি। আচ্ছা আমি তোমার জন্য চা করে নিয়ে আসি। বলে চলে গেল রান্নাঘরে, চা করে মাকে দিল নিজেও খেল। চম্পা বই নিয়ে গেল।

মাঠের রাস্তা পেরিয়েই পূব কোণায় মণিময়ের স্কুল দালান, বাঁশের ঘর মিলিয়ে এই স্কুল। স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। মণিময় আর উপেনবাবু একই সাথে বেরিয়েছে স্কুল থেকে। মণিময়ের বহু পুরানো সঙ্গী এই উপেন মজুমদার। একই পাড়ার বাসিন্দা। মণিময় তাঁকে বড় ভাইয়ের মতোই শ্রদ্ধা করে। উপেনবাবুও পৈতৃক বাড়িতেই থাকেন। দুই ছেলে, স্ত্রী নিয়ে ছোটো সংসার।

বড় ছেলে অলক হাওড়ার বালীতে একটা প্লাস্টিক কোম্পানিতে কাজ করে। সামান্য বেতনই দেয়। ওখানেই থাকে। মাসে দু-তিনবার বাড়িতে আসে। ছোটো ছেলে হীরক নয়নপুরের কলেজেরই ছাত্র। উপেনবাবুর অবশ্য কিছুটা জমি সম্পত্তি আছে। মণিময়ের পরিবারের সঙ্গে এই পরিবারের একটা আঙ্গিক সম্পর্ক হয়ে গেছে।

প্রতি দিনই দুজনে একসাথেই স্কুল থেকে বেরোয়। সাংসারিক রাজনীতিক সব আলোচনাই হয় দুজনের মধ্যে। স্কুল থেকে বেরিয়ে বাড়ির পথ আর কতটুকু তার মধ্যে অনেক কথাই বলাবলি হয়। আকাশটার গুরু-গম্ভীর ভাব। উপেনবাবু বলল — বৃষ্টি নামবে নাকি ? আমি আজ ছাতিটা আনতে ভুলে গেছি। তাড়াতাড়ি পা চালাও ভাই— নয়ত দুজনেই ভিজব। মণিময়ের হাতে ছাতা আছে তাই কিছুটা নিশ্চিন্ত। মণিময় স্মিত হেসে বলল — না দাদা— বৃষ্টি না-ও আসতে পারে। একটু একটু বাতাস আছে তো—দেখুন দেখুন মেঘ কী রকমভাবে সরে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে বাড়ির কাছাকাছি চলে এল। উপেনবাবু বলল, মণিময় তুমি বাজারে যাবে নাকি ? যদি না যাও তো এসো আমার বাড়ি দুজনে বসে একটু গালগল্প করব। বিনয়ী সুরে মণিময় বলল — দেখি গিয়ে বাড়িতে, যদি বাজারে যেতে না হয় তাহলে অবশ্যই আসব। আগে মণিময়ের বাড়ি, তাই মণিময় ঢুকে পড়ল বাড়িতে। চার-পাঁচটা বাড়ি পরেই উপেনের বাড়ি। উপেনবাবু বাড়িতে ঢুকতেই স্ত্রী অঞ্জলি এগিয়ে এসে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলল — তোমার বড় পুত্র এসেছে। ওর নাকি কিছু টাকা লাগবে। আমার কাছে কি টাকার গাছ আছে? আমি কোত্থেকে টাকা দেব? এখন তুমি দেখ কিছু ব্যবস্থা করতে পার কিনা? আমি যাই তোমার জন্য চা করে নিয়ে আসি। বলে অস্থির গতিতে চলে গেল। উপেনবাবু ছেলের দিকে তাকাতে তাকাতে ধীর গতিতে ঘরে গিয়ে ঢুকল। চিন্তায় অস্থির, মাসের শেষ, টাকাটা কোথায় পাবে। এইসব ঝুটঝামেলা সংসারে লেগেই থাকে। জামা-কাপড় ছেড়ে হাঁফ ছাড়ল — বয়সের ঝক্কি তো আছেই। হাতমুখ ধুয়ে ঘরে ঢুকে ইজি চেয়ারে বসল এবং অলককে ডাকল সামনে এসে বসতে। অলক ভীত সন্ত্রস্ত চেহারায় বাবার সামনে বসল — উপেনবাবু বলল — কী ব্যাপার বলতো বাবা? কত টাকা? টাকাটা কিসের জন্য? অলক মাথা নিচু করে বসেছিল — দুটো হাত ঘষতে ঘষতে বলল — বাবা, অমি একটা লেদার কোম্পানিতে চাকুরী পেয়েছি, তোমাদের আগে বলিনি — কী জানি যদি না হয়। হঠাৎ কালই ফোন এসেছে আগামী সাতদিনের মধ্যে জয়েন করতে। এটাতে মাইনেও অনেকটা বেশি। এজন্য কোম্পানিতে দশ হাজার টাকা জমা দিতে হবে সিকিউরিটি মানি হিসেবে। গল গল করে সব বলে গেল অলক। অঞ্জলিও এসে দাঁড়িয়েছে হাতে চায়ের কাপ নিয়ে। উপেনবাবু স্থির হয়ে বসে আছে। কিছুই বলছে না ছেলেকে। একদিকে ভাল একটা সুযোগ অন্যদিকে টাকার ব্যবস্থা করা। দিশেহারা অবস্থায় পড়েছে উপেন। অঞ্জলি খিঁচিয়ে বলল — কী বলছিস তুই ? নূতন চাকুরীতে টাকা লাগবে? উপেনবাবু ধমকের সুরে বলল, আঃ কী যা — তা বলছ। সব ব্যাপারে মুখটা

না নাড়লে হয় না। না বুঝে টুঝে মন্তব্য করো না। দাও চা-টা। হাত বাড়িয়ে চা-টা নিল। চায়ে চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি শুরু করল। স্ত্রী অঞ্জলি কিছু বলতে গিয়েও বলল না, বিমর্ষ মুখে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। অলক বাবার ঘরে বসেই চিন্তায় মগ্ন। মনের মধ্যে আকাশ-পাতাল ভাবনায় সে অস্থির। বাবাকে বলেছে ঠিকই, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি বাবাই বা কী করে ব্যবস্থা করবে— এ নিয়েও অলকের মনের মধ্যে যন্ত্রণা হচ্ছে। অলক সবসময়েই বাস্তববাদী। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগটা সে হাতছাড়া করতে চায় না। তাই বাবার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই। এমনিতেও তার বদ্ধমূল ধারণা আছে বাবার প্রতি। এই লোকটা কোনদিন ন্যায়সংগত কাজে বাধা দেয় নি। হয়তো দেবেও না। কালোমেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। একটু একটু মেঘের গর্জনও শোনা যাচ্ছে। বৃষ্টি এখনও আরম্ভ হয় নি। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কালো আকাশের মতো উপেনবাবুর মানসিক অনুভূতিও ক্রমশ গভীর দুশ্চিন্তায় ছেয়ে যাচ্ছে। তবে একটা কিছু ব্যবস্থাতো করতেই হবে এই মানসিক দৃঢ়তা উনার সবসময়েই আছে। আরও সন্তানের ব্যাপারে তো বটেই।

ছেলেকে সামনে গিয়ে বলল — তা, কখন এলি তুই ? অলক বলল — এই তো তুমি আসার ঘণ্টাখানেক আগে। গাড়ি পেতে একটু দেরি হয়েছে নয়ত আরেকটু আগেই আসতে পারতাম। অঞ্জলি বিমর্ষ মুখে এসে ছেলের কাছে বসল — বলল — যা বাবা একটু ঘুরে আয় বাইরের থেকে। যা হোক একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে। আমাদের যা কিছু তা তো তোদের দুই ভাইয়ের জন্যই।ঐ সময় তো টাকার অঙ্ক শুনে না বুঝেটুঝে রেগে গিয়েছিলাম। অলক বলল — আচ্ছা মা তুমি হঠাৎ করে ক্ষেপে যাও কেন বলতো ? এটা কিন্তু শরীরের জন্য খুবই খারাপ। নরম সুরে মাকে বোঝাল — আমাদের প্রয়োজন যা কিছু দরকার, তোমাদের কাছেই তো চাইব, না কি ?

উপেনবাবু হেসে বলল — হ্যাঁরে, অলক তুই কি কালই চলে যাবি, না দুটো দিন থেকে যাবি ? অলক শার্ট পরতে পরতে গম্ভীর মুখে বলল — না বাবা কালই যাব, তবে খাওয়াদাওয়ার পরে বিকেলের দিকে। মাকে ডেকে বলল — মা, আমি একটু বেরোচ্ছি। বলে বেরিয়ে গেল। অঞ্জলি সন্ধ্যা দিতে ঠাকুর ঘরে ঢুকল। উপেনবাবুর স্ত্রী এই অঞ্জলি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। বাবা পেশকারের কাজ করতেন। কিছু জমিজমা ছিল। নয়নপুরের কাছাকাছি গ্রাম রহিমপুর ওর বাপের বাড়ি। বাবা কষ্ট করেই চার ভাই বোনকে অল্পবিস্তর পড়াশুনা করিয়ে গেছেন। এখন মা আছে। আর তিন ভাই আছে। অঞ্জলিই মা-বাবার প্রথম সন্তান। সুশ্রী, কর্মঠা এই মেয়েকে পছন্দ করে পুত্রবধূ করে এনেছিলেন উপেনবাবুর বাবা। ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়াশুনা অঞ্জলির। সাদাসিধে, সহজ সরল হলেও মেজাজের কোন কমতি নেই অঞ্জলির। উপেনবাবুকে পতিপরম গুরু হিসেবেই মানেন। স্ত্রীকে উপেনবাবু ভাল তো অবশ্যই বাসেন। কিন্তু কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে স্ত্রীর মতকে বেশি প্রাধান্য দেন না। এটাই পুরুষ শাসিত সমাজ

বলে গণ্য। অঞ্জলির স্বভাবটা মোটেই পেঁচানো নয়, তা নাহলে স্বামীর এই মনোভাবটা তাকে অবশ্যই আঘাত করত। সে সংসারের কাজকর্ম নিয়েই থাকে। মাঝে মধ্যে সেলাই ফোঁড়াইও করে। যাবতীয় কাজ সে নিজেই করে। কাজের লোক দিয়ে কাজ করানো ও পছন্দ করে না। বিয়ের পরে পাঁচজনের সংসারে এসেই ঢুকেছিল। সকলের মন জয় করে চলতে হয়েছে। মাঝে মধ্যে অশান্তি যে হত না তা নয়। সে তো সব সংসারেই কম বেশি হয়ই। এখন তো সংসার ভালই চালাচ্ছে অঞ্জলি। শান্তিপূর্ণ সংসার।

উঠানে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখিয়ে ঘরে এসে ঢুকল অঞ্জলি। হীরকও এসে গেছে টিউশন থেকে। স্কুল থেকে বেরিয়ে একেবারে পড়া সেরে আসে। হীরক বিস্ময়ের ভঙ্গীতে জিজ্ঞেস করল মাকে, মা, দাদা এসেছে কখন ? কী মজা, আজকে অনেক গল্প করব দাদার সঙ্গে। প্রায় পনেরদিন পর এল দাদা, তাইনাগো মা ? আনন্দে একদম গদগদ হীরক। দাদাকে খুব ভালবাসে হীরক, ওদের দুভাইয়ের প্রায় ছ'বছরের তফাৎ, সেইজন্য ভালবাসার পাশাপাশি কিছুটা ভয়ও পায়।

দাদাতো দুপুরের দিকে এসেছে। তা তোর এত দেরি হল ? এখনতো ভাত খাবিনা নিশ্চই — একটু দুধমুড়ি খেয়ে নে, এনে দিচ্ছি বলে চলে গেল খাওয়ারটা আনতে। হীরক হাত-পা ধুয়ে টিভি-র সামনে বসল। উপেনবাবুও সেখানেই ছিল। ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল — হীরু, ইংরেজি গ্রামারগুলো ঠিকমতো বুঝে এসেছিস তো ? সংক্ষেপে উত্তর দিল হীরক, হ্যাঁ বাবা, মোটামুটি বুঝে এসেছি। এই বলে টিভি দেখতে লাগল। এরা দুই ভাই খুবই অমায়িক ভদ্র। সবাই জানে মণিময় এবং উপেনবাবুর পরিবার খুব ভাল। আর্থিক স্বচ্ছলতা অতটা না থাকলেও পারিবারিক শান্তি বা বংশমর্যাদা ওরা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এই নয়নপুরে উচ্চবিত্ত পরিবারও আছে একটু দূরে বাস-স্ট্যান্ড-এর কাছাকাছি। কয়েকটা পরিবারই আছে। কেউ ব্যবসায়ী, কেউ ঠিকাদার আবার কেউ কেউ আছে সরকারে চাকুরে। গ্রামের সাধারণ লোকের চোখে এরাই উচ্চবিত্ত। এদের ব্যাপারে গ্রামবাসীর কোন আগ্রহ নেই কোনকালেই। প্রত্যেকেই নিজেদের কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

উপেনবাবু অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল যদি মণিময় আসে, তবে অলকের ব্যাপারে তার সঙ্গে একটু আলাপ-আলোচনা করবে। আকাশ এখনও মেঘমুক্ত হয়নি। রাতের দিকে বৃষ্টি আসতে পারে। আর কখন আসবে মণিময়। উপেনবাবুকে যে করে হোক টাকার ব্যবস্থাতো করতেই হবে। ছেলের ভবিষ্যৎ বলে কথা। অঞ্জলি এসে গম্ভীরভাবে বলল, ছেলেটা এসেছে এতদিন পর, একটু মাছ-মাংস নিয়ে এলে তো পারতে। এটাও তোমাকে বলে দিতে হবে ? খুবই আক্ষেপের সুরে বলল অঞ্জলি—উপেনবাবু স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল—আমি তো একটু বেরোবই, তখন নিয়ে আসব। দেখি ভাল ইলিশ মাছ পাই কিনা! অঞ্জলি বলল, ঠিক আছে, একটু তাড়াতাড়ি এসো। আমাকে আবার রান্না করতে হবে। তোমার তো আবার

বেরোলে বাড়ি ফেরার কথা মনে থাকে না। বলে রান্নাঘর থেকে থলেটা এনে রাখল চেয়ারের উপর। উপেনবাবু প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে গেল ছাতা হাতে নিয়ে।

মণিময় স্কুল থেকে বাড়িফিরে দেখল গিন্নী বাড়ি নেই। রেখাও বেরোবার জন্য প্রস্তুত। অসীম টিভির ঘরে শুয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে। মণিময় নিজের ঘরে ঢুকে কৌতূহলী ভঙ্গীতে বলল — কীরে রেখা-তোর মা কোথায় গেছে ? রেখা এগিয়ে এসে বলল, মা-তো এইমাত্র জীতু মামার বাড়িগেছে। অনেকদিন তো যায় না তাই জোর করে আমিই পাঠিয়েছি। তুমি হাত মুখ ধোও। আমি মুড়ি ভাজা রেডি করেই রেখেছি। শুধু চা'টা করব। তারপর আমি যাব টিউশনিতে। বলে প্রচণ্ড গতিতে চলে গেল রেখা। মণিময় মনে মনে খুশিই হল এই ভেবে — শোভা বেড়াতে গেছে। নিজে তো আর এখন কোথাও নিয়ে যায়না বললেই চলে। শুধুমাত্র নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ ছাড়া দুজনে একসাথে বেরোনই হয় না। অতীতের কথা মনে পড়লে তাই খব ভাল লাগে। বিয়ের পরে মণিময় স্ত্রীকে নিয়ে কাছাকাছি অনেক জায়গায়ই বেড়িয়েছে। স্ত্রীকে নিয়ে দূরে বেড়াতে যাওয়ার মত আর্থিক সক্ষমতা ছিল না। এর জন্য অবশ্য শোভার মনে কোনো জেদ ছিল না বা এখনও নেই। মণিময়ের মতো স্বামী পেয়েই সে ধন্য। শোভার কাছে সচ্চরিত্র, সজ্জন, উদার মনোভাবাপন্ন স্বামী পাওয়াই সৌভাগ্য। এখন তো ছেলেমেয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে গিয়ে স্ত্রীর দিকে অতটা মনোযোগ দেয়া হয়ে ওঠে না মণিময়ের। তবে মণিময়ের স্থির ধারণা, এই সংসার সুন্দরভাবে চলছে শোভার জন্যই।

চা খেতে খেতে রেখাকে বলল মণিময়, রেখা মা অসীমকে ডাক দিয়ে বলে আস। ঠাকুরের কাছে প্রদীপ ধূপকাঠিটা যেন জ্বালিয়ে দেয়। আমি তো আবার এসব পারি না। মৃদু হেসে বলল — হ্যাঁ বাবা। দাদা উঠেছে। চা ও দিয়েছি। বলে দিয়েছি সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে। তোমাকে কিছু করতে হবে না। তুমি বিশ্রাম কর। আমি আসছি বাবা, বলে তাড়াতাড়ি ছাতাটা নিয়ে বেরোল। যে কোনো সময় বৃষ্টি আসার সম্ভাবনা আছে। শোভা বা কী করে আসবে ? যদি বৃষ্টি নামে। মণিময় চায়ের কাপ নিয়ে সামনের ঘরে ঢুকল, দেখল, অসীম চুপ করে বসে কী যেন ভাবছে। মণিময় ছেলের পিঠে হাত দিয়ে বলল — বাবা, কী ভাবছিস রে ? তোকে তো কোনো সময় দেখিনি এভাবে বসে থাকতে ? যা একটু ঘুরে আয় জীতু মামার বাড়িথেকে। তোর মাকেও নিয়ে আয়। বৃষ্টি নামলে আবার — অসীম ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে বলল, না বাবা — আমি এখন বেরোব না। ভাল লাগছে না। মা নিজেই আসতে পারবে। নয়ত তুমি যাও। মণিময় পিতৃ স্নেহে আপ্লুত হয়ে বলল — কেন, কী হয়েছে তোর বলতো ? ভাল লাগছে না কেন ? শরীর খারাপ ? অসীম মাথা নিচু করে বলল, না বাবা, শরীর ভালই আছে। খাচ্ছি দাচ্ছি ঘুমচ্ছি — শরীরের কী হবে ? শোনো বাবা — আমি আর পারছি না এভাবে ঘোরাঘুরি করে সময় কাটাতে। আমার জন্য তুমি একটা কিছু কোরো। নয়ত বলে দাও আমি কী করব। বেকারত্বের জ্বালা আর পারছি না সহ্য করতে — মা ঘরে নেই, তাই তোমাকেই বলছি

আমার মনের কথা। মা শুনলে তো কান্নাকাটি জুড়ে দেবে। এখন তুমিই বল আমি কী করব? বলে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অসীম। আমি যাচ্ছি মাকে আনতে। হ্যারিক্যানটা জ্বালিয়ে রেখে যাচ্ছি যদি লোডশেডিং হয়ে যায়। থাকগে তোমাকে অনেক কথাই বললাম বাবা। মন খারাপ কোরো না তুমি। মণিময় আশ্চর্যান্বিত হয়ে তাকিয়ে রইল অসীমের দিকে। হল কী ছেলেটার! এই বলল যাবে না, আবার যাচ্ছে। অসীমকে বলল, ঠিক আছে, আমার ছাতাটা নিয়ে যা, বলে মণিময় টিভি-টা চালিয়ে বসল। অসীম বেরিয়ে গেল। হাজার চেষ্টা করেও মনটা টিভি-র দিকে রাখতে পারছে না। অসীমের কথাগুলোই মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। কী ব্যবস্থা করবে ছেলেটার জন্য। আর্থিক সঙ্গতিও তেমন নেই। অনেকরকম চিন্তা মণিময়ের মনকে ঘিরে রেখেছে।

এমনি সময় হঠাৎ বাইরের থেকে আওয়াজ, মণিময় আছ নাকি? উপেনবাবুর আওয়াজ শুনে মণিময় বাইরে এসে দাঁড়াল, বলল, আরে উপেনদা যে, আসুন আসুন, ভেতরে আসুন— আপ্যায়ন করে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসাল। বারান্দার সোজাসুজি পশ্চিমদিকে একখানা ঘর। সেই ঘরেই দুজনে ঢুকল। হাতের কাজ করা একখানা সুন্দর টেবিল ক্লথ পাতা আছে টেবিলে, সামনেই একখানা কাঠের চেয়ার। সেটাতেই উপেনবাবু বসল, মণিময় বারান্দা থেকে একখানা মোড়া এনে বসল। বিনয়ের ভঙ্গীতে মণিময় জিজ্ঞেস করল — কী ব্যাপার দাদা, আপনি কী মনে করে? আমি যাইনি বলে নাকি? আপনি তো সচরাচর সন্ধ্যার পরে কোথাও বেরোন না? উপেন অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, না ভাই, তোমার সঙ্গে একটা জরুরি আলোচনা ছিল। তা বৌমাকে দেখছি না? বেরিয়েছে বুঝি? মণিময় উত্তর দিল, হ্যাঁ ওর এক ভাইয়ের বাড়ি গেছে সংসার নিয়েই তো ব্যস্ত থাকে। কোথাও তো যায়ই না। আজ একদম আমি আসার অগেই বেরিয়ে গেছে। কেন ভাই? রসিকতা করে বলল, উপেন, তোমাকে কি আজকাল বৌমা বেশি পাত্তা টাত্তা দিচ্ছে না? তুমি আসার আগে বেরিয়ে গেল? বলে হা হা করে হেসে উঠল উপেন। মণিময় খুব সংযতভাবে বলল, না দাদা, বয়সতো হল ভালই, কত আর পাত্তা দেবে, বলুন? ছেলেমেয়ে বড় হয়ে গেলে, আমার মনে হয় কোনো স্ত্রীই স্বামীকে বেশি তোয়াক্কা করে না। মহিলা আইনের জেরে তো পুরুষরা এমনিতেই কুপোকাৎ হয়ে পড়েছে। তাই না? থাকগে — আমি একটু চা করে নিয়ে আসছি। আপনি বরং বসে বসে টি.ভি দেখুন। উপেন তীব্র আপত্তি করে বলল, না, না মণিময়, একদম না, আমি এক্ষুনি চা খেয়ে এসেছি। তুমি চুপ করে বস তো। আমাকে একটু বাজারেও যেতে হবে। অলক এসেছে দুপুরের দিকে। তাই একটু ....। মণিময় বলল, তাই নাকি? দু-চারদিন থাকবে তো? ছেলেটাকে অনেকদিন দেখিনা। উপেন গম্ভীরভাবে বলল, এসে তো থাকেই না, দেখবে কী করে? এই তো আজ এসেছে। কাল খাওয়া দাওয়ার পরে চলে যাবে। এসেছেও তো একটা বিশেষ কাজে। মানে আমার মাথায় বাজ ফেলতে। আমি যে এখন কীভাবে কী করি — তাই তোমার

সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে এলাম ভাই। মণিময় খুব চিন্তিত কণ্ঠে বলল — হয়েছে কী দাদা? বলুন — আমাকে খুলে বলুন। উপেন সহজভাবেই, অলক কবে কী একটা লেদারের ভাল কোম্পানিতে নিজের বায়োডাটা জমা দিয়েছিল সুপারভাইজার পদের জন্য। আমাদের সে আগে জানায়ওনি কিছু। ফোনের মাধ্যমেই নাকি ইন্টারভিউ নিয়েছিল। এখন সেখানে সে চাকরিটা পেয়েছে। তা ... মণিময় উৎফুল্ল হয়ে একগাল হেসে বলল — তাই নাকি ? দাদা — এ যে বড় আনন্দের খবর। ছেলেমেয়ের কিছু ভাল হলে মা-বাবার তো আনন্দের সীমা থাকে না। কিন্তু আপনি ... আপনাকে তো খুবই উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। কেন ? অলক কী বলছে? উপেন আস্তে আস্তে বলল, না অলক এমনিতে কিছু বলছে না। ওর তো খুবই ইচ্ছা এটাতেই জয়েন করার, মাইনে-টাইনেও বেশি। কিন্তু সমস্যা যেটা হল সেটা হচ্ছে — অলককে এক্ষুনি দশ হাজার টাকা সিকিউরিটি মানি হিসেবে জমা দিতে হবে। এখন কালকের মধ্যে আমি এতগুলো টাকা কী করে ব্যবস্থা করি ? একদিনের নোটিশে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাও তুলতে পারব না। কী যে করি .... আশ্চর্য হয়ে মণিময় বলল, কিন্তু দাদা — একটা কথা ব্যাঙ্কে তো আপনার কিছু সেভিংস আছে, নাকি ? তাতে দশ হাজার টাকা হবে না ? উপেন বলল, না ভাই এত টাকা হবে না, সেদিন মাত্র টাকা তুলে দুটো সার্টিফিকেট কিনেছি। তাতেই চলে গেছে ত্রিশ হাজার টাকা। এখন হাজার পাঁচেক টাকা হয় হবে। বাকি টাকা কোথায় পাব ? তাছাড়া এখানে তো একসঙ্গে ব্যাঙ্ক থেকে পাঁচ হাজার টাকা দেবেও না। সেটা হয়তো চেষ্টা চরিত্র করে তুলতে পারব। কিন্তু বাকি টাকা ? মণিময় তাকাল বাইরের দিকে। দেখল শোভা ঢুকছে। হাতে বাজারের ব্যাগ। শোভা ঢুকেই উপেনকে দেখে ঘোমটা টেনে বলল, আরে দাদা যে। কতক্ষণ? ভাল আছেন তো ? আপনারা বসুন। বলে ভিতরে চলে গেল। মণিময় উপেনকে বলল, দাদা, শুনুন অলককে বলুন, কিছু সময় চেয়ে নিতে, দশ হাজার টাকা আজকাল অনেকের কাছেই কিছু না। কিন্তু আমাদের কাছে তো অনেক, সংসার চালিয়ে আর কত টাকাই বা থাকে। সাতদিন সময় পেলে টাকাটা অনায়াসেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। উপেন মণিময়ের কাছে আশ্বাস পেয়ে বলল, এই জন্যইতো তোমার কাছে আসা। এই রকম সৎবুদ্ধি কেউই আমাকে দেবে না ভাই। বলে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। ব্যাগটা হাতে নিয়ে বলল, বাজার করে বাড়িযাব। শোভাকে ডেকে বলল যাচ্ছি বৌমা, আরেকদিন এসে তোমার হাতে চা খেয়ে যাব। উপেন বেরিয়ে যেতেই মণিময় নিজেকে নিয়ে ভাবতে লাগল। আজ যদি ওর আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকত তাহলে উপেনদাকে টাকাটা দিয়ে সাহায্য করতে পারত। মনের মধ্যে নানারকম চিন্তাভাবনা জড়ো হতে লাগল। মণিময়ের উদারতাই মণিময়কে ভাবিয়ে তুলেছে। তবুও তো অলকের একটা না একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু অসীমের কী ব্যবস্থা করবে মণিময় ? এই সব প্রশ্নের উত্তর মণিময়ের কাছে নেই। মণিময় গালে হাত দিয়ে বসে ভাবতে লাগল। শোভা কাপড়-চোপড় পাল্টে স্বামীর কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, কী ব্যাপার বলতো, উপেনদা হঠাৎ কী মনে

করে এলেন? তিনি তো আসেনই না? মণিময় হঠাৎ চমকে গিয়ে বলল — ও, তুমি, উপেনদা এসছিল একটা ব্যাপারে পরামর্শ নিতে। শোভাকে মণিময় সংক্ষেপে বলল উপেনদার কথা। মণিময় বলল বাজার করে আনলে? রসের ভঙ্গীতে বলল —তবে তো আজ রাতে ভালমন্দ কিছু খাওয়া হবে। অসীমটা গেল কোথায় ? রেখাও আসছে না এখনও। কী ব্যাপার বলতো? কী আবার ব্যাপার ? শোভা কাপড় ভাঁজ করতে করতে আড় চোখে তাকিয়ে বলল, তোমার সবটাতেই বাড়াবাড়ি — পড়াতে গেছে, না পড়িয়েই চলে আসবে? বাজে তো মাত্র পৌনে সাতটা। আর অসীম ? অসীম আর কোথায় যাবে। আড্ডা মারা ছাড়া আর কোন কাজ আছে ওর? বিরক্ত সুরে বলে রান্না ঘরের দিকে পা বাড়াল। পেছন পেছন মণিময়ও রান্না ঘরে ঢুকল। শোভা মাছগুলো আগেই বাটিতে রেখে দিয়েছিল। মণিময় দেখে উচ্ছ্বাসের সুরে বলল, গিন্নি— করেছ কী ? দুরকম মাছ ? ধনে পাতা এনেছ তো ? ছোটোমাছের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, এই মাছটা এখন রান্না কর। ধনে পাতা দিয়ে চচ্চড়ি, তেলাপিয়াটা কাল রেঁধো, ব্যস — এতেই হয়ে যাবে। রান্নাটা একটু তাড়াতাড়ি করে নাও না গো। আমার ক্ষিদে পেয়ে যাচ্ছে। যদি পারো তো আমাকে একটু চা করে দিও, কেমন? যাই একটু টিভি নিউজটা শুনি। বলে ধীর পদক্ষেপে চলে গেল সামনের ঘরে। এই ঘর থেকেই ডেকে শোভাকে জিজ্ঞেস করল— কীগো — জিতু ওরা কেমন আছে। অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই। তুমিও তো অনেকদিন বাদেই গেলে। ওরা তো আসেই না। শোভা কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে এই ঘরে এসে বলল —। জান গো—জীতুর ব্যবসা খুব একটা ভাল চলছে না। জীতুর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। চারদিন হোলো কলকাতা গেছে ব্যবসার কাজে। মিনতির সঙ্গে বসেই গল্প করে এলাম। জীতুর কপালটাই মন্দ। দুটো মেয়ের মধ্যে বড় মেয়েটা পড়া ছেড়ে বসে আছে ঘরে। ছোটো মেয়েটা পড়াশুনায় মোটামুটি। মিনতি দুঃখ করছিল। সুপাত্র পেলে বিয়ে দিয়ে দিত বড় মেয়েটাকে। সত্যি জীতুটা অথৈ জলে পড়েছে। অথৈ জল মানে ? একটু উত্তেজিত হয়েই বলল মণিময়। প্রত্যেকের জীবনেই খারাপ সময় ভাল সময় আসে। তাতে এত ভেঙে পড়ার কী আছে! যখন যেমন তখন তেমনভাবেই চলতে হয়। মণিময় জানে জীবনসংগ্রাম কী, তাই শোভাকে এই কথাগুলো বুঝিয়ে বলতে পেরেছে। তাই কোনো কষ্টই তার কাছে কষ্ট মনে হয় না। অনেক সংগ্রাম করার পর আজ মণিময় একটু সুখের মুখ দেখতে পেয়েছে। তা-ও অর্থ দিয়ে নয়, পরিবার দিয়ে।

বাইরে ঝিরঝির বৃষ্টি হচ্ছে মাটি ভেজার মতো, এতেই অনেকটা স্বস্তি পাওয়া যাবে। রেখা-অসীম একসাথেই বাড়ি ফিরল। অসীম শোভাকে বলল— মা - একটু চা খাব। রেখা বেগুনি, আলুর চপ টপ এনেছে। খাব তো। তাই আরকী চা-টা হলে ....। রেখা তেড়ে গিয়ে বলল দাদাকে — মাকে অর্ডার দিচ্ছিস? কেন, নিজে করে খেতে পারিস না ? বিয়ে করলে বৌকে তো ঠিকই করে খাওয়াবিরে দাদা ? হঠাৎ নরম সুরে বলল — দাঁড়া, একটু অপেক্ষা কর —

আমি করে দিচ্ছি। বলে মুখ বেঁকিয়ে চলে গেল রেখা। ভাই বোনের এই ধরনের তুচ্ছ কলহ মণিময়ের পরিবারে প্রায়ই লক্ষ করা যায়। এর পেছনে ভাইবোন পরস্পরের প্রতি কতটা আন্তরিক সেটাই লক্ষণীয়। মণিময়ের ছেলেমেয়ে বাবার মতোই নীতিবাদী আদর্শবাদী হয়েছে। মা-বাবার অগাধ বিশ্বাস এই দুই ছেলেমেয়ের ওপর।

রেখা এসে দাদাকে চা দিয়ে চলে গেল পড়ার টেবিলে। সামনেই বি.এ. ফাইনাল পরীক্ষা। খুব একটা পড়ার সময় পায় না। যা রাত্রেই একটু সময় পায় রেখা পড়াশুনা করার। বৃষ্টি হওয়াতে ঠান্ডা ঠান্ডা ভাবও রয়েছে আজ। রাতে গরম আর মশার উৎপাতে পড়াশুনা লাটে উঠে যায়। আজ মনে হয় রেখা বেশি রাত্রি পর্যন্ত পড়তে পারবে। মণিময় দরজায় উঁকি দিয়ে দেখে গেল মেয়ে কী করছে। রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে শোভাকে জিজ্ঞেস করল, কীগো রান্না কতদূর ? রান্নাটা সেরে বারান্দায় এসো, কথা আছে। শোভা উৎসাহিত হয়ে বলল হ্যাঁ, হ্যাঁ আসছি, গ্যাসটা মুছে নিই একটু — রান্না শেষ করে ফেলেছি। বলে তাড়াতাড়ি হাতের কাজ শেষ করে বারান্দায় এসে মোড়ায় বসল—আগ্রহী সুরে বলল — কীগো, বল তোমার কী কথা আছে। বলে তাকিয়ে রইল স্বামীর দিকে কখন বলবে। মণিময় ভাবগম্ভীর সুরে বলল হ্যাঁ, যা বলছিলাম— আজ স্কুলে অপর্ণা দিদিমণি রেখার জন্য এক পাত্রের সন্ধান দিয়েছে। তাঁরই ভাসুরের ছেলে। অপর্ণা দিদিমণিকে তুমি চেন তো? শোভা বলল, হ্যাঁ গো হ্যাঁ চিনি চিনি। আমার সঙ্গে পরিচয়ও আছে। তা তুমি জিজ্ঞেস করনি ছেলে কী করে ? বয়স কেমন ? আস্তে আস্তে মণিময় বলল — হ্যাঁ হ্যাঁ জিজ্ঞেস করেছি, ছেলে উত্তরপাড়ার একটা ব্যাঙ্কে চাকুরি করে, বয়স তো বলল আঠাশ-উনত্রিশ হবে। বি. কম. পাশ করে চাকরিতে ঢুকেছে। ক্লেরিক্যাল পোস্টে আছে। তা মাইনে-টাইনে.....? কৌতূহলের সুরে শোভা বলল। শোভার কথার উত্তরে মণিময় হেসে ফেলল। বলল, তুমি যদি বল তবে আগে আমি ছেলেটি কেমন, সচ্চরিত্র কিনা, সেটা আগে খবর নেব। মাইনে-টাইনে তো পরে। শোভা নম্র ভঙ্গীতে বলল —হ্যাঁ গো হ্যাঁ তাই করো, কতই তো সম্বন্ধ এসেছে। কোনটাই গায় লাগাওনি, এবার অনুগ্রহ করে মেয়ের কথা মাথায় রেখে সব খবরাখবর নাও, বুঝলে? বিধাতার লিখন কীরকম কে জানে? কী হল চুপ করে গেলে যে? মণিময় মুখে আঙ্গুল দিয়ে স্ত্রীকে বলল আস্তে বল, রেখা শুনতে পাবে। আগে সব খবরাখবর নিই। তারপর ওর সঙ্গে তুমি কথা বলে নিও। শোভা আস্তে বলল—হ্যাঁগো ঠিক বলেছ, রেখার মতামতেরও তো দরকার আছে, বল ? মণিময় শোভার কথায় সায় দিয়ে চলে গেল টি.ভি.-তে নয়টার খবরটা শুনতে। মণিময় মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে এত চিন্তা করে না। ঈশ্বরে বিশ্বাসী বলেই হয়তো। মণিময় জানে প্রত্যেক মেয়েই নিজস্ব একটা ভাগ্য নিয়েই জন্মায়। এছাড়া প্রত্যেক মা-বাবাই চায় মেয়ে শ্বশুরবাড়িগিয়ে স্বামী সুখে বঞ্চিত না হোক, পাঁচ জনের স্নেহ ভালবাসা নিয়েই দিন কাটাক। মণিময়-শোভাও স্বাভাবিকভাবেই তা চায়। অর্থ সেখানে নিতান্তই অর্থহীন। তারপরে অদৃষ্টের পরিহাস, রেখা

ওদের একমাত্র মেয়ে। তাই মণিময় যথেষ্ট দেখাশুনা, খোঁজখবর নিয়েই এগোবে। হুট করে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়াটাও ঠিক হবে না।

মণিময় জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল বৃষ্টি এখন আর নেই। হয়তো শুক্লপক্ষ চলছে তাই মেঘ কাটিয়ে চাঁদ উঁকি দিচ্ছে। মাঝেমধ্যে আবার উপেনদার জন্যও চিন্তা হচ্ছে। সন্তানের ব্যাপারে মা-বাবাকে সচেতন থাকতেই হয়। কী জানি কিভাবে উপেনদা এই সমস্যার নিষ্পত্তি করবে! নিম্নমধ্যবিত্তদের অর্থ সমস্যা একটা বিশাল সমস্যা। কিন্তু কিছু তো করারও নেই। ছেলের ভবিষ্যৎ বলে কথা। নিজের জন্য এত চিন্তাভাবনা মণিময় কখনই করে না। পরের দুঃখে সে সর্বদাই ব্যথা অনুভব করে। এটাই তার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। মণিময় অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবছে ভোরের আলো ফুটলেই উপেনদার কাছে যাবে। অবিশ্যি স্কুলও আছে। গেলেও তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। হঠাৎ চিৎকার করে রেখাকে ডেকে বলল, রেখা, এই রেখা, খাওয়া দাওয়াটা সেরে নে-না মা, রাত তো হল, খাওয়ার পরে আবার ঘণ্টাখানেক পড়ে নিস। রেখা দৌড়ে এসে বাবার কাছে দাঁড়াল। বলল — আচ্ছা বাবা, এত চিৎকার করতে হয় নাকি? খুউব খিদে পেয়েছে? বাবার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল রান্না ঘরে। মাকে বলল মা, তুমি সবার ভাত বেড়ে নাও। আমি দাদাকে ডাকছি। বলে অসীমকে ডেকে নিয়ে এল। খাওয়ার পাট চুকিয়ে যার যার ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়ল। দিনের পরে রাত, রাতের পরে আবার দিন, এই ভাবেই চলছে জীবনযাত্রা। এর আর কোন হেরফের হয় না। রাত বাড়ার সাথে সাথে পুরো গ্রামই ঝিমিয়ে পড়েছে। দূরের থেকে মাঝেমধ্যে কুকুরের ডাক, মাইকে কোথায় গান বাজছে — শোনা যায়। হঠাৎই ঘুমে জড়িয়ে এল মণিময়ের চোখ।

সকালের রোদের চমক ছড়িয়ে পড়েছে উপেনের বাড়ির উঠোনে। হয়তো ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছে উপেনের, ভোরে উঠে অলক বসে আছে বারান্দায় গালে হাত দিয়ে। ভাই হীরকও একটু আগে উঠে পড়তে বসেছে। ওদের বাড়ির সোজাসুজি দেখা যায় ধূ-ধূ করা মাঠ। চারদিকে বাড়িঘরে রাস্তা মিলিয়ে একটা সুদৃশ্য পটভূমি লক্ষ করা যায়। সকালবেলার এই গ্রাম্য শোভা, গরুর গাড়ি, গ্রামের ছোটো ছোটো খড়ের ঘর সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের অনেক উপন্যাসের কাহিনি মনে করিয়ে দেয়। গ্রামের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পাখির কলকাকলি, সহজ সরল মানুষের সাদামাটা চেহারাটা সাধারণত আজও বাংলার গ্রামেই পরিলক্ষিত হয়। শহরের

কৃত্রিমতার ভিড়ে কখন যে এগুলো হারিয়ে গেছে বা মানুষ হারিয়ে ফেলেছে তা কেউই বলতে পারে না। শহুরে বাতাস বলতে একটা কথা আছে। এই বাতাসে পাখির কলতানের পরিবর্তে গাড়ির হর্ন, কলকারখানার আওয়াজই শোনা যায়, সবুজ বনানী যেভাবে এই প্রকৃতিকে ছবির মতো তুলির টানে সাজিয়ে রেখেছে তা কেবলমাত্র এই ধরনের গ্রামেই এখনও দেখতে পাওয়া যায়। যেকোনো গ্রামের শান্ত সংযত আবহাওয়া আজও মানুষকে নিবিড় আনন্দ সুখলাভে সাহায্য করে, নয়নপুরও তেমনি একটি গ্রাম। যেখানে উপেনবাবু, মণিময়, জীতুর মতো খোলামেলা স্বভাবের মানুষের বাস। এদের মতো নয়নপুরের অন্যান্য অধিবাসীরাও মোটামুটি শান্তিতেই জীবনযাপন করছে। সব শ্রেণীর মানুষই একাত্মা হয়ে বসবাস করছে। সারাবছরের পুজোপার্বণের অনুষ্ঠান যে যার সাধ্যমত ঠিকই চালিয়ে যাচ্ছে। বাঙালির ধর্মীর সংস্কৃতির আচার অনুষ্ঠানগুলো গ্রামবাংলার মানুষরাই বেশির ভাগ ধরে রেখেছে। ধর্মীয় গোঁড়ামিগুলো গ্রামের শিক্ষিত-অশিক্ষিত এই দুই স্তরের মানুষের মধ্যেই বেশি লক্ষ করা যায়। নয়নপুরেও এর ব্যতিক্রম কিছু নেই। সকাল সন্ধ্যায় প্রায় প্রতিটি ঘরেই আজও নিয়ম করে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজান হয়। প্রকৃতির এই গতানুগতিক রীতিকে ওরা সুন্দরভাবে ধরে রেখেছে। তেমনি ধরে রেখেছে মানুষের প্রতি মানুষের সার্বিক মেলবন্ধন।

উপেনের স্ত্রী অঞ্জলি চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী সকালবেলায় কাপড় ছেড়ে ঠাকুর ঘরে ঢুকল এবং ঠাকুরের নিদ্রা ভঙ্গ করে, ঠাকুর ঘর পরিষ্কার করে বেরিয়ে এল, ছেলে অলককে বলল, কীরে এভাবে বসে আছিস কেন? টাকার জন্য চিন্তা করছিস বাবা? আবেগের ভঙ্গীতে অলক বলল, হ্যাঁ মা, বাবার জন্য খুব কষ্ট হয় আমার, কিন্তু কার কাছেই বা চাইব বলো? সব ঠিক হয়ে যাবে ঠাকুরের কৃপায়। এখন যা তো মুখ-টুখ ধুয়ে এসে চা খা। আমি যাচ্ছি চা বানাতে। বলে কোমরে কাপড় গুঁজতে গুঁজতে চলে গেল অঞ্জলি। ততক্ষণে উপেনও বিছানা ছেড়ে উঠে এসে বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নিল। তারপর একসাথে বসে চা বিস্কুট খেল। স্ত্রী অঞ্জলির দিকে তাকিয়ে বলল, শোন, আজ আমি নয়টার সময় একটু ভাত খেয়ে বেরিয়ে যাব। ব্যাঙ্কে যেতে হবে। ওখান থেকে স্কুলে চলে যাব। বলে উঠে চলে গেল ভিতরে। আর অঞ্জলি আর কী করবে, রান্না ঘরে গিয়ে রান্নার জোগাড় করতে শুরু করল। অলক আস্তে আস্তে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। মার প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টিতে বলল, আচ্ছা, মা একটা ঠিকে ঝি তো রাখতে পার, তাহলে তো তোমার এত কষ্ট হয় না। সব কাজ এক হাতে করা কি এখন আর তোমার পক্ষে সম্ভব ? অঞ্জলি বলল, ঠিক বলেছিস বাবা, তোর ভাল চাকরি হলে তোকে বিয়ে করাব, তারপর তো আর .... এর মধ্যে হীরক এসে কথার মাঝে যোগ দিল। বলল রসিকতার সুরে, দাদা বিয়ে করে তো বৌ নিয়ে চলে যাবে চাকরির জায়গায়, তা তোমার কী সুবিধে হবে? সে গুড়ে বালি গো মা, বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চলে গেল আবার পড়তে। অলক ক্ষিপ্ত স্বরে বলল, দেখেছ মা দেখেছ হীরক কী পেকেছে? দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা

ওকে বলে অলক দৌড়ে চলে গেল হীরকের ঘরে। অঞ্জলি একটুও অবাক হল না কেননা দুই ভাইয়ের এই ধরনের মধুর কলহ অঞ্জলি প্রায়ই উপভোগ করে থাকে। উপেন খাওয়া দাওয়া করে বেরিয়ে গেল। কাল রাতের গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিতে পথঘাট স্যাঁতসেঁতে হয়ে রয়েছে। সকাল থেকেই রোদে ঝলমল করছে। আকাশ একেবারেই মেঘমুক্ত হয়ে গিয়েছে। উপেনের মনটা কিন্তু মেঘমুক্ত হয় নি। যতক্ষণ না ছেলের জন্য টাকার ব্যবস্থা না করতে পারছে ততক্ষণ কী করে হবে মেঘমুক্ত মন। উপেন নিজেও বুঝে উঠতে পারছে না শেষ পর্যন্ত কী হবে। তবুও হাল ছাড়বে না উপেন। ব্যবস্থা একটা হবেই। এই আশা নিয়েই বেরিয়েছে উপেন। পাল পাড়ার কাছাকাছি আসতেই দীনুর সঙ্গে দেখা। দীননাথ সাহা নয়নপুরেরই একজন মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। কাপড়ের খুচরা ও পাইকারি বিক্রেতা। হাওড়াহাট থেকে সস্তায় কিনে এনে বেশি দামে বিক্রি করাই ওর একমাত্র লক্ষ্য। বাসস্ট্যান্ডের কাছেই ওর দোকান। উপেনকে দেখেই বিনয়ে ভেঙে পড়ল। হাত জোড় করে নমস্কারের ভঙ্গীতে বলল, স্যার— এত তাড়াতাড়ি স্কুলে যাচ্ছেন ? পরীক্ষা-টরীক্ষা নাকি ? উপেন বলল — না, আমার অন্য কাজ আছে। তাই একটু আগে বেরিয়েছি। তা দীনু তোমার কী খবর ? ব্যবসাবাণিজ্য ভালই চলছে? তা তুমি এদিকে কোথায় চললে ? দীনু বলল,স্যার, আমি ছেলের প্রাইভেট টিউটরের বাড়িতে যাচ্ছি। ছেলের পড়াশুনার ব্যাপারে একটু খোঁজখবর নিতে। স্যার একদিন আসুন না আমার বাড়িতে। উপেন একগাল হেসে উত্তর দিল হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চই যাব, তুমি এগোও, আমিও যাই, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। হাঁটতে লাগলেন উপেন, দীনুও চলে গেল। দীননাথ শিক্ষিত ছেলে। বি.কম. পাশ। বহুদিন বেকার থাকার পর পৈতৃক সম্পত্তি অর্ধেক বিক্রি করে এই ব্যবসা আরম্ভ করেছে। ওর স্ত্রী শহরের বি. এ. পাশ করা মেয়ে। ওদের একটাই ছেলে। বারো তেরো বয়স। দীনুর বাড়িঘরও খুবই সুন্দর, জেলে পাড়ার দিকে যেতে রাস্তার ডানহাতে বাড়িটা। বাড়িটা দেখলে দীনুর রুচির প্রশংসা করতেই হবে। ওদের পরিবারটা মোটামুটি শিক্ষিতই বলা চলে। ওর বাবা ব্রজনাথ সাহা ছিলেন এই গ্রামের জুনিয়ার বেসিক স্কুলের শিক্ষক। খুব কষ্টেই এই দুই ছেলেকে পড়াশুনা শিখিয়েছিলেন। কিছু জায়গা সম্পত্তি ছিল তাই কোনোমতে সংসার চালিয়ে গেছেন। দীনুর বড়ভাই সালকিয়ায় একটা ব্যাঙ্কে চাকরি করে। বউ-বাচ্চা নিয়ে ওখানেই বাড়িভাড়া করে থাকে। মাঝেমধ্যে আসে ভাই-এর বাড়িতে বেড়াতে। দীনু ছেলেটি অত্যন্ত বিনয়ী নম্র এবং বুদ্ধিমানও বটে। তাই পাড়াপ্রতিবেশী, গ্রামের কিছু সংখ্যক মানুষের সঙ্গে সাধ্যমতো সদ্ভাব বজায় রেখে চলেছে। মণিময়ের সঙ্গেও দীনুর ভালই সম্পর্ক। অনেক সময় দীনুর দোকান থেকেও কাপড়চোপড় কিনে নিয়ে আসে। দীনুর সঙ্গে হঠাৎই দেখা হয়ে গেল রেখার। রেখা বলল, আরে দীনুদা তুমি ? আমাদের বাড়িযাচ্ছ বুঝি ? দীনু আমতা আমতা করে বলল, নারে রেখা—খোকনের প্রাইভেট টিউটরের বাড়ি যাচ্ছি। সময় তো পাই না খোঁজ খবর নেওয়ার। তাই আজ যাচ্ছি। রেখা বলল,কেন আজ কি তোমার দোকান বন্ধ ? দীনু একটু হেসে

বলল—হ্যাঁ রে। একজন ব্যবসায়ী মারা গেছে কাল, তাই আজ সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। তা তুই কোথায় যাচ্ছিস এত তাড়াতাড়ি? পড়তে নিশ্চয়ই? রেখা সহাস্যে বলল, না-গো-না, পড়াতে যাচ্ছি। ঠিক আছে যাও। ফেরার সময় একটু ঘুরে এসো আমাদের বাড়ি। বলে গট গট করে হাটতে লাগল। দীননাথ চলে গেল গন্তব্যস্থলের দিকে। ভাবতে লাগল আজ আর রেখাদের বাড়ি ঢুকবে না। বাড়িতে একটু কাজকর্ম আছে। আরেকদিন সময় করে বৌ-ছেলেকে নিয়ে যাবে। তাহলে মণিময় স্যারও খুশি হবে।

মণিময় তৈরি হচ্ছে স্কুলে যাওয়ার জন্য। বাজে প্রায় সাড়ে নয়টা। চানটান সারা হয়ে গেছে। আয়নার সামনে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল ছেলেকে, কীরে অসীম আজ আর কোথাও যাবিনা? ছেলের উত্তরের আগেই মা শোভা বলল উত্তেজিত হয়ে, কেন ? ও বাড়িতে থাকলে কি তোমার খুউব অসুবিধা হয় ? যত আদিখ্যেতা — এই রোদে রোদে কোথায় ঘুরবে ছেলেটা? — তাছাড়া লাভ কী হচ্ছে এই ঘোরাঘুরিতে ? মণিময় বিস্ময়ের ভঙ্গীতে স্ত্রীকে বলল, আরে কী আশ্চর্য — এতে তোমার এত চটে যাওয়ার কী হল ? ওতো অলকদের বাড়ি থেকে ঘুরে আসতে পারে। আবার ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, তাই নারে অসীম? যা-না অলকের সঙ্গে একটু গল্প করে আয়। অসীম পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিল। বাবাকে বলল — ঠিক আছে যাব এখন। তোমরা আবার আমাকে নিয়ে পড়লে কেন বুঝলাম না। আমার যদি ভাল লাগে ত যাব। অলকের সঙ্গে কাল বাজারে একটু দেখা হয়েছিল। খুউব চিন্তিত দেখাচ্ছিল, বলে উঠে গেল মার কাছে। শোভা বলল, আয় বোস—রুটিটা খেয়ে নে। আজ আর তরকারি করিনি। আলু ভাজা দিয়ে খেয়ে নে। মণিময়ও চলে এল ভাত খেতে। শোভা গম্ভীর ভাবে বলল মণিময়কে, আজ কিন্তু এই খবরটা নিও, বুঝেছ তো কোন্ খবরটা? মণিময় অন্যমনস্ক হ'য়ে উত্তর দিল, হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি। উপেনদার কথা বললে তো? শোভা ক্ষিপ্ত হয়ে বসার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুচকি হেসে অসীম শোওয়ার ঘরে গিয়ে ঢুকল। শোভা মণিময়কে বলল, সত্যি তোমাকে নিয়ে আর পারিনা। উপেনদার ভূত ঢুকেছে মাথায়। উপেনদার ব্যবস্থা উপেনদা ঠিকই করবে। তোমার চিন্তা করতে হবে না। নিজের চিন্তা কর। বলছি রেখার সম্বন্ধটার ব্যাপারে। মণিময় আচমকা নিজের ভুল বুঝতে পারল। ততক্ষণে খাওয়াও শেষ হয়ে গেছে। উঠে দাঁড়িয়ে বলল হেসে হেসে, ও .... হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। ঠিক আছে এই ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েই আসব। একটু রস করে বলল, নয়ত তুমি তো বোধ হয় বাড়ি ঢুকতে দেবে না। চলে গেল মণিময় মুখ ধুতে। শোভা বিড় বিড় করে বলতে লাগল, নিজের চিন্তার শেষ নেই। মানুষের চিন্তা নিয়ে বসে বসে ভাবে। কই উপেনদাকে তো দেখলাম না আজ অবধি একটা বিয়ের সম্বন্ধ আনতে? বলে এঁটো বাসনগুলো ঘরের এক কোণায় রেখে দিল। এখন শোভা চা করে খাবে। রেখা এলে রুটি খাবে একসাথে। মণিময় বেরিয়ে গেল স্কুলের উদ্দেশ্যে। স্কুলের গেট দিয়ে ঢোকার সময় লক্ষ করল উল্টোদিকের রাস্তা দিয়ে উপেনদা

আসছে। মণিময় একটু দাঁড়াল। উপেন কাছে আসতেই বলল, ব্যাঙ্কে গেছিলে তাই না? কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা দাদা কত টাকা তুলতে পারলেন? উপেন ঈশ্বরের প্রতি হাতজোড় করে বলল, ঠাকুরের আশীর্বাদে সাত হাজার টাকা তুলতে পেরেছি। অনেক বলে কয়ে রাজি করিয়েছি ম্যানেজারকে। আর পাঁচশো টাকা আছে পাশ বুকে। গেটের ভিতর ঢুকে গেল দুজনেই কথা বলতে বলতে। মণিময় বলল, আর বাকি তিন হাজার টাকা? উপেন হেসে বলল, সেটা আমি স্কুল থেকে ব্যবস্থা করে নেব। মণিময় মনে মনে নিশ্চিন্ত হল। যাক টাকার জন্য উপেনদাকে আর হা পিত্যেশ করতে হবে না। দুজনেই সোজা স্টাফ রুমের দিকে চলে গেল। স্টাফরুমে ঢুকে মণিময় এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল অপর্ণা দিদিমণি এসেছে কিনা। দেখল অপর্ণা দিদিমণি বসে আছে, হাতে একটা বই নিয়ে। মণিময় এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে বলল, দিদিমণি, টিফিন পিরিয়ডে আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলব রেখার সম্বন্ধটার ব্যাপারে। আপনার কোনো আপত্তি নেই তো? অপর্ণা একগাল হেসে উত্তর দিল না-না কিসের আপত্তি? বলে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল প্রেয়ার লাইনে যাওয়ার জন্য। মণিময়ও যাওয়ার জন্য উদ্যত হল। আজ মণিময়ের ক্লাসের চাপটা একটু বেশিই। দু-তিনজন টিচার ছুটি নিয়েছে তাই এই চাপটা। রোদের প্রখরতা বেশি হওয়াতে গরমটাও পড়েছে অসহ্য। টিনের চালের স্কুল বলেই হয়তো সবাইকেই গরমে হাঁসফাঁস করতে হয়। অধিকাংশ ফ্যানই বিকল হয়ে রয়েছে। তাই এইগুলো থাকা না থাকা সমান কথা। হেডমাস্টার মশাইকে অনেকবারই বলা হয়েছে, কিন্তু তিনি এব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্যই করেন না। অদ্ভুত ধরনের লোক এই প্রধান শিক্ষক মহাশয়। তাঁর মাথার উপরে পাখা ঠিকই ঘুরছে। কিন্তু অন্যদের কষ্টের কথা উনি মোটেই ভাবতে রাজি নন। স্কুলের বয়স্ক শিক্ষকদের মধ্যে মণিময় একজন। কষ্ট সহ্য করা ওর ধাঁচে সয়ে গেছে। ফ্যান থাকুক চাই না থাকুক—এসব নিয়ে মণিময় মাথা ঘামায় না। তবে হ্যাঁ ছাত্রছাত্রীগুলোর জন্য কষ্ট অনুভব করেন ঠিকই। কিছু কিছু নেতা গোছের শিক্ষক-শিক্ষিকাও আছে এই স্কুলে। ক্লাস ফাঁকি দিয়ে মিছিল মিটিং নিয়েই ব্যস্ত থাকে এরা। মণিময়ের একদম পছন্দ নয়। কী দেশোদ্ধার করবে ওরা? শিক্ষকের কাজ শিক্ষাদান করা, এর বাইরে কিছু করা উচিত নয়, এটাই মণিময়ের নীতি এবং আদর্শ। এই আদর্শ থেকে কেউ এক চুলও নড়াতে পারেনি মণিময়কে। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে অভাবকে সঙ্গী করে নি....... ভাবে বাঁচতে চায় মণিময়। এতদিন কাটিয়েও এসেছে এই নীতিতেই। তবুও কোনো ঝুট ঝামেলা সে আজও পছন্দ করে না। রাজনীতি তো একটা নীতি। কে কতটা বোঝে সেটা মণিময় জানে না, তবে এটা প্রত্যক্ষ করে যে, রাজনীতি সম্বন্ধে যার বিন্দুমাত্র বোধগম্য নেই, সেও বড় বড় বুলি আওড়াতে চেষ্টা করে। মণিময়ের কাছে সংসারের রাজনীতির টাল সামলানোই কষ্টকর। সুতরাং বাইরের রাজনীতির দিকে মনোনিবেশ করার কোনো প্রয়োজন সে বোধ করে না। এজন্য সে অনেকের কাছেই নিন্দনীয়।

ছুটির ঘণ্টা বাজল। একটু অপেক্ষা করছে মণিময় উপেনের জন্য। ক্লাস থেকে বেরিয়ে এল উপেন। এখন বাড়ি ফেরার পালা। চল ভাই মণিময়, যাওয়া যাক। যাওয়ার পথে টুকটাক কিছু বাজার নিতে হবে। নয়ত বাড়ি গিয়ে আর বেরোতে ইচ্ছে করে না। চলো যাই বলে উপেন ও মণিময় স্কুল থেকে বেরিয়ে পড়ল। যেতে যেতে উপেন মণিময়কে জিজ্ঞেস করল, কী ভাই মণিময় টিফিন পিরিয়ডে অপর্ণা দিদিমণির সঙ্গে কী আলাপ করলে ? অবশ্য তোমার বলতে যদি আপত্তি না থাকে তবেই ....। মণিময় উপেনকে থামিয়ে দিয়ে বিনম্র সুরে বলল — না, না দাদা আপনাকে বলব না তো কাকে বলব, বলুন ? ওই রেখার একটা বিয়ের সম্বন্ধ তিনি দিয়েছেন। সেটাই খোঁজখবর একটু নিলাম। গিন্নি তো বোধ হয় উদগ্রীব হয়ে বসে আছে। উপেন মণিময়ের দিকে তাকিয়ে বলল, কী বল ভাই। উদ্‌গ্রীব হবে না ? মেয়ের বিয়ে বলে কথা, তা পাত্রটি ভাল তো ? কী করে-টরে সেটা পরে। আগে বংশমর্যাদা, স্বভাব চরিত্র কেমন সেটা খবর নিও ভাই। মণিময়ের বাড়ি এসে গেছে। মণিময় তাই বিনয়ী হয়ে বলল, দাদা, আপনাকে সব বলব পরে, এখন আমি যাই। ছুটির দিনে আপনার সঙ্গে গিয়ে আলোচনা করব দাদা ! যাই তাহলে, উপেন বাড়ির পথে হাটতে হাটতেই বলল। হ্যাঁ হ্যাঁ এসো, বলে উপেন চলে গেল বাড়ির দিকে।

অঞ্জলি বিছানায় বসে পত্রিকা পড়ছিল। উপেনের আসার সঙ্কেত পেয়ে ঘুরে বসল। বলল — কী গো আজ যেন একটু দেরি হল ? ব্যাগে করে কী বাজার করে আনলে ? উপেন একটু বিরক্ত চোখে তাকিয়ে বলল, উফ — কী আশ্চর্য, এত প্রশ্ন করার কী আছে? খুলেই দেখো না। যাও তো যাও আমার জন্য চা চিড়াভাজা করে আন। বড্ড খিদে পেয়েছে। অঞ্জলি একটু থতমত খেয়ে গেল ধমক খেয়ে। বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ যাচ্ছি—কোন্ সকালে খেয়ে বেরিয়েছে। খিদে পাবে না। বলে বারান্দায় রাখা বাজারের থলেটা রান্না ঘরে নিয়ে রাখল। উপেনের হঠাৎই মনে পড়ল—টাকাটা যে স্কুলের পিওন বিভুকে দিয়ে পাঠিয়েছিল বাড়িতে — তাই জিজ্ঞেস করল অঞ্জলিকে অঞ্জু। অলক গেল কখন ? টাকাটা পেয়ে খুশিতো ? অঞ্জলি চিড়া ভাজতে ভাজতে উত্তর দিল, অলক তো আজ যায়নি ! বিভু এসে টাকাটা দিয়ে যাওয়ার পর কী জানি কী ভাবল। বলল আজ যাবে না। তোমার সঙ্গে দেখা না করে, তোমার আশীর্বাদ না নিয়ে যাবে না। বলে চিড়ে ভাজার প্লেটটা উপেনের দিকে এগিয়ে দিল। উপেন প্লেটটা টেবিলের উপর রেখে চলে গেল কলের পারে হাত মুখ ধুতে। অঞ্জলি এই ফাঁকে চাও করে নিয়ে এল, বিড়বিড় করে বলতে লাগল আমি তাড়াহুড়ো করে নিয়ে এলাম। ঠান্ডা করার জন্য ? লোকটা স্কুল থেকে এসে এমন তাড়া দেয় যেন আমাকেই গিলে খেয়ে ফেলবে। বলতে বলতে চা-টাকে ঢাকা দিল। চলে গেল নিজের জন্য চা আনতে। সংসারের খাটা-খাটুনিতে অঞ্জলিও তিতিবিরক্ত হয়ে গিয়েছে। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত একই রকম কাজ একঘেয়েমি এসে গেছে অঞ্জলির। এখন মাঝে মধ্যে ভাবে দুটো ছেলে না হয়ে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে

হলে ভাল হত। তবে এটাও বোঝে যে এইসব চিন্তাভাবনা নিরর্থক।

উপেন বাথরুম থেকে বেরিয়ে বারান্দায় উঠতে গিয়ে লক্ষ করে অসীম গেট খুলে ঢুকছে। উপেন উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, আরে, অসীম যে, আয়, আয় ভেতরে। অনেকদিন বাদে এলি বাবা। স্ত্রীর উদ্দেশে বলল, দেখ কে এসেছে। বলে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। তড়িঘড়ি করে অঞ্জলি এসে ঢুকল বসার ঘরে বলল, আরে বাবা, কতদিন পরে তোকে দেখলাম অসীম বল? — অসীম সুযোগ পেয়ে বলল, কাকিমা — আপনারা ভাল আছেন তো? অলক নাকি যায়নি আজকে। তাই আর কী — তা সে কোথায়? বলে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল অসীম। উপেন চা খেতে খেতে চিড়াভাজার প্লেটটা অসীমের দিকে এগিয়ে দিল। অসীম উপেনের দিকে তাকিয়ে বলল, না কাকু আপনি খান—আমি এক্ষুনি চা-মুড়িভাজা খেয়েই বেরিয়েছি। আপনি খান। এই বলে অসীম অসম্মতি জানাল। পত্রিকাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। হীরককেও দেখতে পাচ্ছিনা! টিচার-এর বাড়িগেছে বুঝি? বলে অসীম এঘর ওঘরে হাটতে লাগল। অঞ্জলি বলল, তোর বাবা-মা ভাল আছে তো? কতদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই— অথচ একই পাড়ায় থাকি। রেখার তো পরীক্ষা এগিয়ে আসছে? অসীমের কেমন অস্বস্তি লাগছিল। অলকের সঙ্গে আড্ডা দেবে ভেবে এসেছিল। তাই অগত্যা উত্তর দিল, মা-বাবা আছে মোটামুটি ভালই। রেখার এখন পরিশ্রম একটু বেশি হচ্ছে—এই আর কী। বলে হীরকের একটা বই নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগল। উপেন হীরকের ঘরে ঢুকতেই অসীম বিমর্ষ মুখে বলতে লাগল, কাকু - অলককে বলোনা—আমার জন্য যেকোনো একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে, আমার আর ভাল লাগছে না। বাবার আশা ভরসা কিছুই সার্থক করে তুলতে পারছি না। উপেন অসীমের পিঠে হাত দিয়ে তাকে আশ্বাস দিল নিরাশ হোস না বাবা। সবকিছুর একটা সময় আছে। নিশ্চয়ই হবে সময় হলে। তুই একবার না হয় অলকের সঙ্গে শহরে যা—চাকরির বাজার কীরকম সেটাও বুঝে আসতে পারবি। একদম মন খারাপ করিস না। সব হবে সময় হলে। সঙ্গে সঙ্গে অঞ্জলিও আশাপোষণ করতে লাগল।

অসীম কতক্ষণই বা অপেক্ষা করবে অলকের জন্য। তাই যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে বারান্দায় এলো। প্রায় সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা ছয়টা বাজে। কাকিমা আমি যাচ্ছি আজকে। অলককে বলবেন আবার এলে দেখা হবে। কাকুকে নিয়ে আসুন না একদিন আমাদের বাড়িতে? যাচ্ছি তাহলে। উপেন ঘরেই বসে রইল। অঞ্জলি ওর পেছনে পেছনে গেট পর্যন্ত এল। অসীমের চলার পথে তাকিয়ে রইল অঞ্জলি।

কতকালের অতীতের কথা মনে পড়তে লাগল। বহু বছর ধরে ওরা একই গ্রামে প্রতিবেশী হয়ে বসবাস করছে। উপেনের বিয়ের আগেই মণিময় বিয়ে করে সংসার পেতেছিল। এক বছরের মধ্যেই উপেনও বিয়ে করে ফেলে। দুই পরিবারের মধ্যে হৃদ্যতা, আন্তরিকতা যথেষ্ট পরিমাণে আগেও ছিল, এখনও আছে। পরিবেশ পরিস্থিতিতে এখন দুই পরিবারের আনাগোনা,

সামাজিকতায় অনেকটাই ভাঁটা পড়েছে। কিন্তু সুসম্পর্কের সুতোর একটুও টান পড়েনি। ছেলেমেয়েও বড় হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেকেরই লাইফ স্টাইল আলাদা আলাদা। মণিময়-উপেনের বয়স বেড়ে প্রায় জীবনের সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। সংসারের প্রতিবন্ধকতা ওদের দুজনকেই আগলে রেখেছে। জীবন সংগ্রাম দুজনেই চালিয়ে যাচ্ছে আজও দুর্বার গতিতে। উপেন তো তবু একটা চিন্তা থেকে মুক্ত হয়েছে — সে হচ্ছে ছেলের চিন্তা। একটা ব্যবস্থা ওর হয়েছে। কিন্তু মণিময় ? মণিময়ের তো দুইদিকেই চিন্তা, মেয়ের এবং ছেলের। ছেলের বেকারত্বের জ্বালা মণিময় কীভাবে দূর করবে? এই চিন্তাই মণিময়কে কুরে কুরে খাচ্ছে। মেয়ের জন্য চিন্তা সে করে না। যখন যেটা হবার হবে। তবে হ্যাঁ এটাও বোঝে যে মেয়েকে সুপাত্রে দান করতে হলে—নিজেকে চেষ্টা করতে হবে। তাছাড়া সারাজীবনের যা কিছু সঞ্চয়, সবই মেয়ের বিয়েতে শেষ হয়ে যাবে। এসব নানা রকম ভাবনা চিন্তা করলেও মণিময় এখনও প্রাণবন্ত। নিজের স্বভাবজাত গুণেই সে এই সমাজে শান্তিতে আছে। এই ব্যাপারে মণিময়ের তুলনা নেই। তার আত্মতুষ্টি এখনও যথেষ্টই আছে। যেটা উপেনের মধ্যে অনেকটাই কম। উপেন সবসময়ই একটু মিটমিটে স্বভাবের। কিন্তু সে মণিময়ের মতোই সৎবুদ্ধি সম্পন্ন লোক। তার শাসন ব্যবস্থায়ই সংসার চলে। সেখানে তার স্ত্রী অঞ্জলির মতামত বেশি প্রাধান্য পায় না। তাই প্রথম থেকেই অঞ্জলি এই সংসারে মানিয়ে চলে এসেছে। তাই সংসারে কোন অশান্তি হয় না। বাংলার পল্লীগ্রামের মেয়েরাও হয়তো এমনিই হয়। সাদামাটা মনে ছেয়ে থাকে শুধুই আপনজনের প্রতি স্নেহ, ভালবাসা। সংসারকে ভালবাসতে জানে ওরা। তাই কখন যে মেঘে মেঘে বেলা গড়িয়ে যায় বুঝতেও পারে না। মণিময়ের স্ত্রী শোভা সামান্য পড়াশুনা জানে। এছাড়া মমতামাখা চেহারায় ভেসে উঠে গ্রাম বাংলার সহজ সরল চিত্র। শুধু শোভা অঞ্জলি কেন—গ্রামের সরলতা প্রায় মহিলাদের মধ্যেই লক্ষ করা যায়। হয়তো লেখাপড়ার বালাই নেই ওদের মধ্যে —কিন্তু যে শিক্ষা-দীক্ষা গ্রামের সহজ সরল মানুষের মধ্যে আছে, তা যে-কোন শিক্ষিতকেও হার মানাতে পারে।

কাল রোববার। স্কুল মাঠে পঞ্চায়েতের মিটিং আছে বিকেলবেলা। মাইকিং করছে। একটু একটু চাঁদের আলো উঁকি দিচ্ছে। ঠান্ডা বাতাস বইছে। মনে হয় দূরে কোথায় বৃষ্টি হচ্ছে। এই প্রচণ্ড গরমে মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে। মণিময়ের প্রতিবেশী নীরদবাবুর বাড়ি থেকে অনেক কোলাহল শোনা যাচ্ছে। গা ঘেঁষা বাড়ি। জোরে কথা বললেও শোনা যায়। নিঃসন্তান নীরদবাবুর সংসারে বৃদ্ধা মা এবং স্ত্রী ছাড়া আছে একটি ছোটো ভাই। পাশাপাশি বাড়ি বলে সাংঘাতিক কিছু ঘনিষ্ঠতা নেই। বছর পাঁচেক হবে ওরা এসেছে। এর আগে ছিলেন একজন স্কুল টিচার। রিটায়ারমেন্টের পর এই বাড়ি বিক্রি করে চলে গেছেন শহরের দিকে। এরপরই নীরদবাবুরা এসেছে। পেশায় তিনি কাঠের ব্যবসায়ী। বাজারে তাঁর একটা ছোটো দোকান

আছে। ছোটো ভাই বিনোদ সম্প্রতি ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে একটা অটো রিক্সা কিনেছে। ও নিজেই এটা চালায়, নয়নপুরে অটো সার্ভিস কম বলে বিনোদের রোজগার মোটামুটি ভালই হয়। নির্ঝঞ্ঝাট পরিবার। তবে পড়াশুনার ব্যাপারটা ওদের নেই বললেই চলে। মণিময় কিছুই জানে না এত হৈচৈ কেন? হঠাৎই দেখল শোভা ভাল একখানা শাড়ি পরে ঘরের থেকে বেরিয়ে উঠানে এসে দাঁড়াল এবং মণিময়কে বলল, তোমাকে বলতে ভুলে গেছি—বিনোদের বিয়ে ঠিক হয়েছে। আজ তাই কয়েকজন সধবাকে ডেকেছে উলু দেওয়ার জন্য। নীরদবাবুর বৌ দুপুর বেলা এসে আমাকে বলে গেছে। মণিময় অবাক হয়ে বলল, তাই নাকি? বিনোদের বিয়ে? এজন্যই এত কথা বার্তা ? ভাল ভাল খুব ভাল। যাও—চলে এসো তাড়াতাড়ি। মণিময় ঘরে গিয়ে ঢুকল। বাইরে আর থাকা যাচ্ছে না। প্রচণ্ড মশার উৎপাত। স্বাস্থ্য দপ্তরের এই ব্যাপারে কোনো হুঁশ নেই। আজকের আবহাওয়া খুউব ভাল। বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। রাস্তায় দেখা যাচ্ছে অনেকেই হাঁটতে বেরিয়েছে। মাঝে মাঝেই মাইকিং শোনা যাচ্ছে। পাড়ায় পাড়ায় জটলা করে কথাবার্তা চলছে — কালকের মিটিংয়ে কে, কী বলবে। রেশনে চাল নেই, চিনিও অনিয়মিত দিচ্ছে। বি.পি.এল. কার্ডধারীদের চাল নিয়েও তালবাহানা চলছে। এই গ্রামে পঞ্চাশ শতাংশ লোকই বি.পি.এল. কার্ডধারী। অনেকেই আবার এই কার্ডের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত। গ্রামের রাস্তাঘাটের ব্যাপারেও আলোচনা হবে হয়তো। শিক্ষার মান উঁচু করতে গেলে তার পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে। গ্রামের এই সামান্য সমস্যার কথা পঞ্চায়েতের মারফতেই সরকারের নজরে আসে। তাই বছরে দু-চার বার এই মিটিং হয়ে থাকে নয়নপুরে। যদিও দুর্নীতিবাজরা এই সব মিটিংয়ে অনুপস্থিতই থাকে। এই গ্রামেও আছে সেই রকম লোভী মানুষ। যারা যে কোনো উন্নয়নের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নিজেদের আখের গোছাতে সবসময় ব্যস্ত থাকছে ওরা। গ্রামের গরিব মেহনতি মানুষও এদের লোভের উগ্র লেলিহান থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। কিছু অশিক্ষিত সাদাসিধে শ্রেণীর লোক নিজেদের বিশেষ করে ওদের চাহিদার যোগান দিচ্ছে। কী করবে, কিছু করার নেই ওদের। জলের মতো স্বচ্ছ মানুষ গুলোর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শহরের মতো গ্রামেগঞ্জেও চলে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ও কিছু অসাধু কর্মচারীর লুটের রাজত্ব। এই গ্রামের বাসিন্দাদের অনেকেই আবার এই ব্যাপারে সতর্ক। মাঝে মধ্যে প্রতিবাদী কণ্ঠও শোনা যায়। জাগতে দেখা যায় ওদের সচেতনতা বোধ, ফুটে ওঠে ওদের আত্মাভিমান। এরকমই কানাঘুষো চলছে হাটে, মাঠে, রাস্তায়।

শোভা বিনোদদের বাড়ি গিয়ে দেখল আশেপাশের পাড়া থেকেও অনেক মহিলারা এসেছে। অনেককেই চেনে না শোভা। নীরদের দিদি এসেছে। ছোটো বোন এসেছে। ওরা সবাই রান্নাঘরে ব্যস্ত চা মিষ্টি নিয়ে। এদিকে উঠানের এক কোণে বিনোদের জন্য একটা ঘর তৈরি হয়েছে

বিয়ের পরে বৌ নিয়ে থাকবে বলে। বিনোদের ঘরেই সব মহিলাদের বসার ব্যবস্থা হয়েছে। একটা শুভ অনুষ্ঠানে এসেও মহিলাদের পরনিন্দা-পরচর্চা করার অভ্যাসটা বজায় রেখেছে ঠিকই, শোভা দেখল উপেনের স্ত্রী অঞ্জলিও চুপ করে এক কোণায় একটা চেয়ারে বসে আছে। শোভা অনেকদিন পর একটা ভাল পরিবেশ পেয়েছে। এতগুলো মহিলা একসাথে। কেউ বলছে কালকের মিটিং এর কথা, কেউ বলছে জেলে পাড়ার কোন্ বউ স্বামীর বাড়িতে নির্যাতিতা হচ্ছে। আবার পুব পাড়ার একজন বয়স্কা মহিলা বললে, জান বিনোদ বিয়েতে নগদ তিরিশ হাজার পণ চেয়েছে। বলে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। এমন সময় নীরদের বউ রমা এসে সবাইকে উলু দেওয়ার জন্য উঠোনে যেতে অনুরোধ করল। সবেমাত্র আসরটা জমে উঠেছিল। মন্দ লাগছিল না শোভার। মনে মনে আবার রাগ হচ্ছিল বিনোদের পণ নেওয়ার ব্যাপারটায়। চলে গেল সব উঠানের দিকে। অঞ্জলি এগিয়ে এসে শোভার হাতটা ধরে বলল, দিদি, কেমন আছ গো? কতদিন যাও না আমাদের বাড়ি! শোভা একগাল হেসে বলল হ্যাঁগো, সেটা ঠিকই। হয়ে ওঠে না ভাই। যাব, যাব। তুমিও তো ..... বলতে বলতে চা-মিষ্টি খেয়ে নিল। অনুষ্ঠান শেষে শোভা রমার কাছে বিদায় নিয়ে অঞ্জলিকে সঙ্গী করে বেরিয়ে পড়ল বিনোদদের বাড়িথেকে, শোভা বলল অঞ্জলিকে মৃদু হেসে, চলো না অঞ্জলি আমাদের বাড়ি, বেশি বাজেনি ঘড়িতে। অঞ্জলি বিনয়ের সুরে বলল, না দিদি আজ আর ঢুক বনা বসতেও পারব না বেশিক্ষণ। তা হলে গিয়ে লাভ কী ? বলতে বলতেই দেখা গেল মণিময়ের বাড়ির দরজায় এসে গেছে। অঞ্জলি সোজা চলে গেল। শোভা ঢুকে পড়ল বাড়িতে।

বাঙালির রীতিনীতি, আচারবিচার, ধর্ম সংস্কৃতি এখনও গ্রাম বাংলায় সম্পূর্ণ রূপে বিদ্যমান। বিয়ে হোক। পূজো হোক, এখনও গ্রামের ঘরে ঘরে ধর্মীয় আচার বিধি মেনেই অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এখনও সেখানে বিরাজ করছে সমাজের সবচেয়ে ঘৃণ্য প্রথা 'পণপ্রথা'। গ্রাম্য পরিবেশে এক স্তরের মানুষের মধ্যে এই প্রথা নিঃসন্দেহে এক জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিচু স্তরের মানুষরা তো জানেই না এটা যে কতটা অমার্জনীয় অপরাধ। এটা ওদের বোধগম্যতার বাইরে। তার সঙ্গে বাড়ছে প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে বধূ নির্যাতন। শিক্ষার আলো এখন অনেক পরিবারেই পৌঁছে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই অনুপাতে মানুষের মানসিক অগ্রগতির কোনো লক্ষণ আজও সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় না। সেইজন্যেই আজকের সমাজ ব্যবস্থায় গ্রামে এমন কি শহরেও নারী নিগ্রহ বেড়েই চলেছে। আইনি শাসন এখানে কিছু করতে পারছে না। কেননা শিক্ষিত-অশিক্ষিত দুই সমাজেই মানুষ নিজের আদর্শ, নৈতিক বোধ হারিয়ে ফেলেছে। তার জন্যই এই করুণ পরিণতিও লক্ষ করা যায়। 'নয়নপুর' গ্রামও সেই দিকে পিছিয়ে নেই। অনেক অবাঞ্ছনীয় অপরাধ এখানেও ঘটে থাকে। নয়নপুরেরই বাসিন্দা নীরদ দাসের ভাই বিনোদের বিয়ে হতে চলেছে পাশের গ্রামের এক গৃহস্থ পরিবারের মেয়ের সঙ্গে। আবার সেই

পণ? কে জানে এর পরিণতি কী হবে? শোনা গেছে জেলে পাড়ার এক গরিব নির্যাতিতা বধূকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়েছে। বিনোদ তো স্কুলের গণ্ডিও পার করতে পারেনি। বড়ভাই -এর সংসারেই ছোটো থেকে বড় হয়েছে। হয়তোবা এখন ওর উপার্জন ভালই। তবুও গরিব কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার কাছ থেকে টাকা চাওয়ার প্রথা ঠিকই রেখেছে। এইসব নিয়েই নীরদের বাড়িতে মহিলা মহলে আলোচনা হচ্ছিল। যদিও নতুন কিছু সমস্যা নয় এটা। তবুও এটা একটা সমালোচনার বিষয় তো বটেই। বস্তুত পক্ষে বাঙ্গালী সমাজ ব্যবস্থা এখন অনেকটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে এই পণ প্রথার কারণে। সমাজ যে কতটা কলঙ্কিত হয়ে পড়ছে এটা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কেউ কি এসব নিয়ে কখনও রুখে দাঁড়িয়েছে? কিন্তু সমালোচনার কোনো অভাব হচ্ছে না। নয়নপুরের কিছু সংখ্যক বাসিন্দাদের এই অভিমত যে বিনোদ কেন পণ নিচ্ছে ! আবার কিছু সংখ্যক লোকের কথা হচ্ছে নেবেই বা না কেন ? সবাইই তো নেয়। তবুও বিনোদ তো না নিলে পারত। সে মেয়ের দরিদ্র পিতার কথা ভাবল না একটুও। বাসদি পাড়ায় বিন্দু নামে একটি মেয়ের বিয়ে হয়েছিল পণ দিয়ে। শেষ পর্যন্ত লোভী স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন মেয়েটিকে টিকতে দিল না। তাকে চিরতরে বিদায় নিতে হল। বিন্দুর স্বামী এখন হাজত বাস করছে। এই রকম দৃষ্টান্ত গ্রামে-গঞ্জে কেন অনেক শহরেও পরিলক্ষিত হয়।

শোভা বাড়িতে ঢুকেই দেখল মণিময় সামনের ঘরে বসে টি.ভি.-র খবর শুনছে। শোভা সোজা চলে গেল নিজের ঘরে। পোশাক পাল্টে এল মণিময়ের কাছে। লক্ষ করল খুব মনোযোগ দিয়ে খবর শুনছে মণিময়। শোভা পাশের চেয়ারটায় বসল। কতক্ষণে বলবে বিয়ে বাড়িতে শোনা কথাগুলি। হঠাৎ মণিময়ই জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার গিন্নি কিছু বলবে নাকি? মিষ্টি খেয়ে এসেছ তো? শোভা চেয়ারটাকে টেনে মণিময়ের সামনে নিয়ে এসে বসল। রেখা তো পাশের ঘরেই পড়াশুনা করছে তাই আস্তে আস্তে বলল, হ্যাঁ গো হ্যাঁ—মিষ্টি-টিষ্টি খেয়েই এসেছি। শোনো এবার — জান তো বিনোদ বিয়েতে তিরিশ হাজার টাকা পণ নিচ্ছে। মণিময় শুনে একটুও অবাক হল না। বলল, এটা কি আবার নূতন কিছু নাকি ? প্রায় প্রতি ঘরে ঘরেই মেয়েকে পণ দিয়ে বিয়ে দিতে হচ্ছে। তা তোমাকে কে বলল? শোভা পান চিবুতে চিবুতে উত্তর দিল, আমাকে? আমাকে আবার কে বলবে ? সবাই বলাবলি করছিল। নিন্দাও করছিল। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলল, কেন ছেলেরা এই অমানবিক কাজগুলো করে বলতে পার ? আমার কিন্তু চিন্তা হচ্ছে রেখাকে নিয়ে। আমরা তো পণ-টনও দিতে পারব না। তবে কি আমাদের মেয়ের বিয়ে হবে না? মণিময় জানে তার সঙ্গতিই নেই। তাছাড়া এইসব লোভী ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়াও ঠিক নয়। তাই মণিময় মৃদু হেসে উত্তর দিল, আমার মেয়ের যদি বিয়ে না হয় না হবে কিন্তু পণ দিয়ে বিয়ে আমি দেব না। এটাই আমার শেষ সিদ্ধান্ত। এখন

যাও তো, একটু চা করে নিয়ে এসো, বলে চলে গেল বারান্দায়, মোড়াটায় বসল। শোভা একটু আড়চোখে তাকিয়ে চলে গেল। রান্নাবান্না সবই করতে হবে। রেখাকে ডেকে লাভ নেই ওর পরীক্ষা দোরগোড়ায়। চায়ের পর্ব শেষ করে শোভা রান্না চাপিয়ে দিল, এক ফাঁকে নীরদের বউ এসে রেখার জন্য মিষ্টি দিয়ে গেল। রাত বাড়তে লাগল। আকাশে কোনো মেঘের চিহ্ন নেই, তবুও ফুরফুরে একটা বাতাস আছে। নয়নপুর শান্ত স্নিগ্ধ হয়ে পড়েছে। পাখির কলকাকলির পরিবর্তে শোনা যাচ্ছে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। দেখা যাচ্ছে জোনাকির আলো। গ্রাম নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়েছে।

রবিবারের সকাল। প্রত্যেকেরই একটা ছুটির মেজাজ থাকে। নেই কোনো ব্যস্ততা। নেই কোনো টেনশন। তবে মাঠের কাজ অনেকক্ষণ শুরু হয়ে গেছে। ক্ষেতে চাষিভাইরা কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু বিকেলের মিটিংয়ে সবাই জমায়েত হবে। রোদের ঝিলমিলিতে নয়নপুর আলোকোজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর সকাল। বিকেলের কথা কে বলতে পারে কী হবে ? বৃষ্টি হলে তো সবই পণ্ড হয়ে যাবে। মিটিং মানেই এই গ্রামে উৎসবের মেজাজ। যাকগে সেসব কথা।

নীরদের বউ রমা সেজে গুজে হনহন করে বেরিয়ে গেল। হাতে একটা টিফিন বকস। রাস্তায় হঠাৎই রেখার সঙ্গে দেখা স্কুলের মাঠের ধারে। হেসে রেখাকে জিজ্ঞেস করল, কীগো রেখা কোথায় চললে ? রেখা সহাস্যে উত্তর দিল, কাকিমা, যাচ্ছি পড়াতে। তুমি? তুমি কোথায় যাচ্ছ এত সকালে? রমা পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল, আমি যাচ্ছি দীনুদের বাড়ি। টিফিন বকসটা দেখিয়ে বলল এই দেখনা, একটু মিষ্টি দিতে যাচ্ছি। কাল প্রণতি আসতে পারেনি তো তাই দিয়ে আসতে যাচ্ছি। রেখা তার ছাত্রের বাড়ি ঢুকে পড়ল। বলল, কাকিমা এসো আমাদের বাড়ি, বিয়ের গল্প শুনব। রমা সম্মতি জানিয়ে হাটতে লাগল। রমার বয়স বেশি নয়। পঁয়ত্রিশ, ছত্রিশ হবে। শ্যামলা রং — কিন্তু লাবণ্যে ভরা চেহারা, নম্র স্বভাবের মেয়ে। শাশুড়ি, স্বামী এবং দেওরকে নিয়ে সংসার, নিজের কোনো সন্তান নেই। এটা ওর জীবনের একটা অধ্যায় অন্ধকারে ঢেকে রেখেছে। নয়নপুর থেকে মাইল দূর কৃষ্ণপুর গ্রামে ওর ভাইয়ের বাড়ি। বাবা-মা কেউই বেঁচে নেই। অদৃষ্টের পরিহাসে নীরদের সঙ্গে ওর গাঁটবন্ধন হয়। রমা কিন্তু মাধ্যমিক

পাশ করা যেখানে নীরদের বিদ্যা ছিল ক্লাস ফাইভ কি সিকস পর্যন্ত। রমার বাবারও কাঠের ব্যবসাই ছিল, তবে বড় আয়তনের। বালীতে ওর বাবার ছিল মোটামুটি বড়ই ফার্ণিচারের দোকান। এছাড়া গভর্নমেন্ট অর্ডার সাপ্লায়ার-এর কাজও করত। রমার দাদা এখন ঐ ব্যবসা সামলাচ্ছে। ভালই আছে। এই সূত্রেই নীরদের সঙ্গে আলাপ। তারপরেই প্রেম বিনিময়ে বিবাহসুত্রে আবদ্ধ হয় ওরা দুজন। রমাকে এ পরিবারে এসে অনেক মানিয়ে নিতে হয়েছে। এখন ভালই আছে। দীনুদের বাহির গেট খুলে ঢুকল রমা, কলিং বেলের আওয়াজ শুনে ছুটে এসে দরজা খুলল প্রণতি। ছিমছাম চেহারা, পরনে একটা সুন্দর ম্যাকসি। গ্রামের আর পাঁচটা মহিলার মতো সে নয়। তার আবার আচরণ-আদব-কায়দায় শহুরে ছাপ যথেষ্টই রয়েছে। তবে খুবই উজ্জ্বল প্রাণবন্ত। শিক্ষিতা তো বটেই। রমাকে দেখে একটু অবাক হয়েই বলল— আরে আপনি? আসুন ভেতরে আসুন। কী ব্যাপার। হঠাৎ কী মনে করে। রমা একটু ইতস্তত বোধ করছিল। তা সত্ত্বেও বলল, কাল তো তুমি যাওনি ভাই। তাই শুভ কাজের একটু মিষ্টি তোমাদের জন্য নিয়ে এসছি। নাও।—বলে মিষ্টির বকসটা বাড়িয়ে দিল। প্রণতি হাসিমুখে মিষ্টিটা নিয়ে টেবিলের উপর রাখল। বলল, গতকাল যেতে পারিনি বলে আমি লজ্জিত। আপনি আবার মিষ্টি নিয়ে এলেন কেন? মনে মনে খুবই খুশি হয়েছে প্রণতি। রমা আর বসল না। যাবার জন্য উদ্যত হয়ে বলল, তোমার ছেলেকে তো দেখছি না, কোথায় পড়তে গেছে বুঝি? না, আমি যাচ্ছি এখন। বসার কোনো উপায় নেই, রান্না বান্না সব ফেলে এসেছি। তুমি একদিন যেও এরমধ্যে কেমন? প্রণতি বিনয়ী সুরে উত্তর দিল হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই যাব। রাজু তো আপনাদের পাড়ায় স্যারের বাড়িতে যায়। একদিন যাব ভাবছি। কাল আমার এক মামি শাশুড়ি এসেছিলেন। তাই যেতে পারিনি। রমা দরজার কাছে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেল। দীনু এসে ঢুকল। হাতে চায়ের কাপ। স্ত্রী প্রণতিকে জিজ্ঞেস করল, নীরদবাবুর বৌ এসেছিল নাকি? মিষ্টির প্যাকেটটার দিকে তাকিয়ে বলল, আরে মিষ্টি নিয়ে এসেছে কেন ? কোনো অনুষ্ঠান ছিল বুঝি? প্রণতির খুব রাগ হল। সব জেনেশুনেও না জানার ভান করছে দীনু। বিরক্ত হয়েই উত্তর দিল, কেন, তুমি জান না কাল যে বিনোদের বিয়ের আশীর্বাদ গেছে ? এরই মধ্যে ভুলে গেলে ? আশ্চর্য— বলে ভিতরে গিয়ে ফিরে এল এক কাপ চা হাতে নিয়ে। দীনু বসে পত্রিকা পড়ছে। চা খাওয়া হয়ে গেলে রাজুকে নিয়ে আসবে। কোন সকাল ছয়টায় পড়তে গেছে। এখন বাজে প্রায় পৌনে নয়টা। প্রণতিও পাশাপাশি বসে চা খাচ্ছে। শিক্ষিকা হলেও প্রণতি খুবই সহজ সরল স্বভাবের। ওদের সন্তান রাজু ক্লাস এইটে পড়ে। পড়াশুনায় ছেলেটি মোটামুটি। খুব ভালও নয়। খুব খারাপও নয়। রাজুই প্রণতির ধ্যানজ্ঞান। নিজে পড়াশুনা জানে তাই ছেলেকে বাড়িতে কিছুটা সাহায্য করতে পারে। দীনুর ব্যস্ততার দরুন ছেলের পড়াশুনার খোঁজখবর খুব একটা নিতে পারে না। প্রায়ই ব্যবসার খাতিরে কলকাতা যেতে হয়। তাই সংসারের বাইরেও অনেক কাজই প্রণতিকে করতে হয়।

সংসারে এতটাই আটকে গেছে যে বাপের বাড়িও যেতে পারে না। মা-বাবা আসে মাঝে মধ্যে। ষোল বছর হয়েছে এই সংসারে ঢুকেছে। স্বামীর সংসার করাই মেয়েদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য হিসাবে গ্রহণীয়। প্রণতিও আরও পাঁচটা কর্তব্যপরায়ণা মেয়ের মতোই এই সংসারকে ভালবেসে আঁকড়ে ধরে আছে। এত বছরের বিবাহিত জীবনে অনেক ঘাত প্রতিঘাতও কাটাতে হয়েছে। কেননা দীনুর প্রথমাবস্থায় মোটামুটি অভাব অনটনের মধ্যেই কেটেছে। তখন মা বাবাও ছিলেন। সচ্ছল উপায়ে সংসার চালানোর ক্ষমতা দীনুর ছিল না। বিয়ের দেড় বছরের মধ্যেই রাজুর জন্ম। অতীতের সেই দিনগুলি মনে হলে প্রণতির চোখে জল আসে। ঈশ্বর দয়াময় — তাই কাঁটাবহুল অতীত পার হয়ে এসেছে প্রণতি। দীনু এমনিতে খুবই সুন্দর এবং সৎ স্বভাবের ছেলে। হাওড়ার একটা কো-এডুকেশন কলেজে দুজনেই পড়ত। তবে একসঙ্গে নয়। দীনু এক বছরের সিনিয়ার ছিল। তখন থেকেই আলাপ পরিচয় হয়ে ওদের বিয়ে হয়। প্রথমে প্রণতির বাবার আপত্তি ছিল। কিন্তু পরে মেয়ের সুখের কথা চিন্তা করে রাজি হয়ে যান। গ্রাম এবং শহরের মধ্যে সম্পর্কটা প্রথম প্রথম ততটা সুখকর ছিল না। দুই পরিবারের মধ্যে সেরকম সুসম্পর্ক ছিল না বললেই চলে। প্রণতির সন্তান জন্মাবার পর ধীরে ধীরে সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে আরম্ভ করে। দীনু সর্বদাই প্রণতিকে চোখের মণি করেই রেখেছে। এখনও তাই। তবে হ্যাঁ দীনু এখন পর্যন্ত কোনো সুস্পষ্ট পরাজয় ভোগ করেনি। তাই তার মনের দৃঢ়তা আর স্ত্রীর ভালবাসাই তাকে আজ এই জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে। এটাই দীনুর বদ্ধমূল ধারণা। এখানে থাকতে থাকতে প্রণতি এই গ্রামকে যেমন ভালবেসেছে তেমনি ভালবেসেছে এই গ্রাম বাংলার সহজ সুন্দর মানুষগুলোকে।

প্রণতি বসে রইল, আজ তো কোনো তাড়া নেই। বুড়ামাসি রান্না করছে। মাছ তরকারি ছিল ফ্রিজে। ওগুলো বার করে দিয়ে রান্নাটা বুঝিয়ে দিয়ে এসে সামনের ঘরে বসে পত্রিকাটা নাড়াচড়া করছে। এক্ষুনি রাজু চলে আসবে। রাজুকে নিয়ে এনে একসাথেই তিনজনে ব্রেকফাস্ট খাবে। রান্নাঘর থেকে হঠাৎই কী ভাঙ্গার একটা শব্দ কানে এল। প্রণতি এঘরে বসে জিজ্ঞেস করল, ও মাসি কী ভাঙলগো?' মাসি তটস্থ হয়ে উত্তর, না কিছু না। হাত থেকে কাপ পড়ে গেছিল কিন্তু ভাঙ্গেনি গো। প্রণতি কথার বেশি পাত্তা না দিয়ে বলল, ঠিক আছে মাসি তুমি রুটিগুলো ভেজে নাও। রাজু চলে আসছে। বলে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল ছেলের আসার অপেক্ষায়। দুপুর ঘনিয়ে আসছে। দীনুর বাড়িটা খুবই সুন্দর। নয়নপুর হাইস্কুল পেরিয়ে একশ গজ দূরে ওদের বাড়িটা। বাড়িটা দীনুর পরিশ্রমের ফল। বাড়ির বারান্দায় বসে রাস্তায় মানুষের লোকজনের আসা যাওয়া চোখে পড়ে। বাড়ির পেছনে আছে সারি সারি নারকেল গাছ আর সুপারি গাছ। সবই দীনুর হাতে লাগানো। রাস্তার পাশে ধানের ক্ষেত, যেন সবুজ চাদরে ঢাকা। মনোমুগ্ধকর নয়নাভিরাম দৃশ্য শুধু গ্রাম বাংলায়ই লক্ষ করা যায়। ঝকমকে রোদে ধানের শিষে সোনার রং ধরেছে। বেলা গড়িয়ে দুপুর হয়ে এল। আজ সবাই যে যার ঘরে বসে ছুটির

আমেজ ভোগ করছে। স্কুল মাঠে সামিয়ানা টাঙ্গানো হয়েছে মিটিং-এর জন্য। বিকেল পাঁচটায় মিটিং-এর সময় ধার্য করা হয়েছে। নয়নপুরের গাঁওপ্রধান হরিমোহন মজুমদার। অল্প শিক্ষিত এই লোকটি নয়নপুরেরই বাসিন্দা। খুবই মিষ্টভাষী, কিন্তু হরিমোহন লোকটি মোটেও সুবিধার নয়। গাঁওপ্রধান হওয়ার আগে পর্যন্ত তার ভাল মন্দ কিছুই বোঝা যায়নি। মাতব্বর গোছের লোক এই হরিমোহন। বুদ্ধিমান তো বটেই। তাই গাঁয়ের লোকেরা তাকে প্রধানের আসনে বসিয়েছে। তার মস্তিষ্কের সুচতুর বুদ্ধি দিয়ে এই গ্রামের জন্য ভালমন্দ কাজ দুই-ই করেছে। গায়ের রংটা মিশমিশে কালো হলেও চেহারার জৌলুস বজায় রেখেছে। ষাটের কাছাকাছি বয়স হবে। তা হলে কী—দেখলে কিন্তু আরো কম মনে হয়। শরীরটাকে খুউব যত্নে রাখে। বোঝা যায়। চাষবাসই ছিল ওর পূর্বকার পেশা। এখন জমিজমা ঠিকই আছে। কিন্তু এখন আর নিজে কিছুই করে না। লোক দিয়ে করায়। প্রধান বলে গ্রামের কিছু সংখ্যক লোক ওকে সমীহ করেই চলে। নয়ত কার মাথার উপর কখন খাঁড়ার ঘা পড়বে কে বলতে পারে। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ লোকই ওকে মোটেও গ্রাহ্য করে না। কেননা 'সততা' জিনিসটা হরিমোহনের মানসিকতায় খুব একটা স্থান করে নিতে পারেনি। সাধারণ পরিবারভুক্ত হলেও আদবকায়দা, চালচলনে এখন আর সাধারণত্বের ছাপ নেই। গ্রামের আর পাঁচজন বিত্তশালী লোকদের মতোই তার জীবনযাত্রা। হরিমোহনের কল্যাণে বি. পি. এল. কার্ডের যোগ্য অনেক পরিবারই বি. পি. এল. কার্ড পায়নি। গ্রামের অগণিত ক্ষুব্ধ মানুষরা আজ এই সমাবেশে গিয়ে নয়ত বা হরিমোহনের দুর্নীতির জবাব চাইবে! অন্যান্য গ্রামের মতো নয়নপুরেও গ্রামবাসীদের অনেক রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আজকের অগ্রগতির যুগে মফঃস্বলের এই সমস্ত সমস্যাগুলি দূর করাও একান্ত দরকার। কেননা শিক্ষিত হোক আর অশিক্ষিত হোক মানুষ এখন আর পিছিয়ে নেই, শহরগুলিতে অনেক ক্ষেত্রেই দ্রুত উন্নতি লক্ষ করা যায় তবে গ্রামেই বা হবে না কেন ? এই সমস্ত সুবিধা অসুবিধা দেখার জন্যইতো পঞ্চায়েত গঠন। আজ গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তি থেকে শুরু করে সাধারণ পরিশ্রমী লোকরাও অংশ নেবে নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশের জন্য। হরিমোহন ছাড়াও পঞ্চায়েত সদস্যরাও এই মিটিংয়ে থাকবে। থাকতেতো হবেই কারণ ওরাই গ্রামবাসীদের ডেকেছে। বেলা পড়ে এসেছে। আকাশটি পরিষ্কারই আছে। গাছপালার পাতার ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু রোদের ঝিকমিক দেখা যাচ্ছে। আবহাওয়াটা ভালই বলা যায়। পাঁচটা বাজতে চলেছে। লোকজন কিছু এগুচ্ছে ধীরে ধীরে মাঠের দিকে। অনেক বাড়ির মহিলারাও সেজেগুজে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে দলবল নিয়ে। মাইকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে দূর থেকে। সবাইকে ডাকছে তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য।

মণিময় সবে বিছানা ছেড়ে উঠেছে। ছুটির দিনেই দুপুরে খাওয়ার পরে একটু বিশ্রাম নেওয়া হয়। হাই তুলতে তুলতে শোভাকে বললে, কীগো গিন্নি একটু চা খাওয়াবে নাগো। চা খেয়ে একটু মিটিং থেকে ঘুরে আসি। তুমি যাবে নাকি? শোভা চলে যাচ্ছিল রান্না ঘরে। হঠাৎ

থমকে গিয়ে বলল, দেখি — যদিও বা যাই তবে শেষের দিকে যাব। গিয়ে বা কী করবে? বলে চা করতে চলে গেল। মণিময় প্রস্তুত হতে লাগল। রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখল, লোকজন সব যাচ্ছে। মণিময় ভাবছে রাস্তায় বেরিয়ে উপেনদাকে পেলে ভালই হবে। একা যেতে হবে না। অসীমও বেরোচ্ছে। মনে হয় মাঠের দিকেই যাবে। মণিময় জানে এইসব মিটিংয়ে গেলে এই বয়সের ছেলে মেয়েদের চেতনাবোধ জাগে। শোভা দু কাপ চা নিয়ে ঢুকল। মণিময় চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, বাঃ চমৎকার চা করেছ আজ। তারপরেই মিটিংয়ের প্রসঙ্গে বললে, জানো তো হরিমোহন মজুমদারের বক্তব্য শোনার জন্যেই আমার যাওয়ার উদ্দেশ্য। তাছাড়া আমরা অর্থাৎ আমাদের গ্রামবাসীদের অনেকগুলো জমানো ক্ষোভ আছে। সেগুলি ওরা পঞ্চায়েতের সভাতে কতটুকু তুলে ধরতে পারে এটাও দেখার ব্যাপার। শোভা বলল, গাঁওপ্রধানের কথা বলে তো লাভই নেই, আমি অতশত বুঝিও না বাপু। তবে লোকটা সুবিধের নয় এটা বুঝি। মণিময় শোভার কথায় সায় দিয়ে মাথা নাড়ল। কিছুই বলল না। প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে গেল। এই নয়নপুরের মতো বর্ধিষ্ণু গ্রাম পশ্চিমবাংলার আনাচেকানাচে আরও রয়েছে। এই সমস্ত গ্রামের মানুষের হাতের তৈরি জিনিষই শহরবাসীদের পরিতৃপ্ত করে। মাঠে ফসল, গোলাভর্তি ধান, পুকুরভরা মাছ, ক্ষেতের নানা রকম সব্জি শুধুমাত্র গ্রামের মাটিতেই উৎপন্ন হয়। নয়নপুরের মাটিতেও এই সব জিনিষ উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যারা ফসল ফলায়, চাষবাস করে, অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে যারা চাষি, তাদের মুখে হাসি ফোটাবে কে ? তাদের পরিশ্রমের প্রকৃত মূল্যায়ন করা হয় কি ? একদম করা হয় না। যারা প্রতিটি মানুষের অন্ন যোগানের ব্যবস্থা করে, তাদেরই ঘরে দেখা যায় অন্নের অভাব। এখানকার চাষিদের একই দৈন্যদশা। তবে নয়নপুরে চাষিদের সংখ্যা খুঁবই নগণ্য। এদের গোয়ালে গরু, পুকুরে মাছ — মাঠ ভর্তি ধান সবই আছে। সনাতন দাস, একজন চাষি, ওর বাড়িজেলে পাড়ার উত্তর সীমান্তে। ওর বাড়িতে ঢুকতেই চোখে পড়ে গোয়াল ঘর। দুটো শীর্ণকায় গরু বাঁধা থাকে। হরিমোহনের এই জনসভায় সনাতনও উপস্থিত আছে। হরিমোহনের বক্তৃতার পরে আর কারুর মুখেই রা বেরোয় না। বিশেষ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বি.ডি.ও. সাহেব আছেন। থানার বড়বাবু আছেন, আর আছেন স্থানীয় স্কুলের হেড্মাস্টার মশাইরা। এছাড়া স্কুল শিক্ষকরা তো আছেনই। গাঁওপ্রধান হরিমোহনকে এদের মধ্যে অনেকেই পছন্দ করেন না। হরিমোহনের বক্তৃতায় গ্রাম্যবাসীর উদ্দেশ্যে মিষ্টি কথার ফুলঝুরি ঝরছে। তার এই ভাবপ্রবণ ভাষণে অধিকাংশ মানুষই অতিষ্ট। কথায় আর কাজে তার আকাশ পাতাল তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। সহজ সরল এই মানুষগুলির অসুবিধা বা যে কোনো রকম কষ্ট অনুভব করার ক্ষমতা হরিমোহনের নেই বললেই চলে। তার এই তাঁবেদারি স্বভাব কারুরই জানতে বাকি নেই। সমাজের এই ধরনের দুষ্টস্বভাবের কিছু সংখ্যক লোকদের জন্যই অনেক ধরনের উন্নতিও ব্যাহত হয়ে পড়ে। অনেকেই অনেক কিছু কুমন্তব্য করে এই হরিমোহনকে নিয়ে। তবুও গ্রামবাসীদের তার তদারকিতেই থাকতে

হয় কেননা এই ধরনের মানুষ কারুর জন্য ভাল করতে না পারলেও খারাপ অবশ্যই করতে পারে। মিটিংয়ে মেম্বাররাও আছেন। মেম্বারদের মধ্যে হরিপদ গোপ, নন্দন ঘোষ, আর ভোলা দে একটু অন্য রকম। হয়তো বা বিদ্যাবুদ্ধি আছে বলেই এদের ক্রিয়াকলাপ অন্যদের চাইতে আলাদা। এরা সবসময়েই গ্রামের নিরীহ গরিব মানুষদের পাশে থাকে। তাদের অভাব অভিযোগ শুনে নিষ্পত্তির চেষ্টা করে। ভাষণ চলছে। একে একে সবাই যে যার মতো ভাষণ শেষ করে নিল। কিন্তু গ্রামের জনতার কিছু অংশ হরিমোহনের কাছে অনেক রকম আর্জি পেশ করল। যেমন এর মধ্যে আছে রাস্তাঘাট পাকা করা, পানীয় জলের সুব্যবস্থা, যান বাহনের ব্যবস্থা — স্কুলের চালাঘর ভেঙ্গে বিল্ডিং তৈরি করা ইত্যাদি। যারা এই সমস্যাগুলি উত্থাপন করেছে তারাও জানে যে হরিমোহন কতটুকু সাফল্যের কাজ করবে, কতটুকুই বা ভাববে এইগুলির সমাধানের জন্য। কিন্তু কিছু করারও তো নেই। খারাপ হোক ভাল হোক হরিমোহন তো গ্রামপ্রধান। তাই সমস্যাগুলি তার কাছেই পেশ করতে হয়। এটাই নিয়ম। মণিময়ের স্কুলের হেড স্যারও তার স্কুলের অর্ধনির্মিত বিল্ডিংয়ের ব্যাপারে, ছাত্রদের সুবিধার্থে খেলার মাঠের সংস্কারের ব্যাপারে কিছু কিছু সমস্যা তুলে ধরেন। দু একজন পঞ্চায়েত সেক্রেটারি গ্রামবাসীদের জন্য বি.পি.এল. কার্ডের ন্যায্য বণ্টন দাবি করেন। বি. ডি. ও. সাহেব সবই চুপচাপ নিরীক্ষণ করেন। তিনিই গ্রামবাসীরা যাতে ন্যায়সঙ্গতভাবে সবরকম সুযোগ সুবিধা পায় সেই মতই পোষণ করলেন। দক্ষ প্রশাসক হিসেবে ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার শ্রীপীযুষ দত্তের খুবই সুনাম আছে। এ তল্লাটে দত্তসাহেবের সততা, কাজেকর্মে একনিষ্ঠতার কথা মানুষের মুখে মুখে ফেরে। হরিমোহনকেও এই দত্ত সাহেব ভালো করেই জানেন এবং চেনেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর কিছু করার নেই। কারণ আইনের বাইরে তো কারুরই কিছু করার ক্ষমতা থাকে না। হরিমোহনও কাগজে পত্রে এতই স্বচ্ছ যে তাকে ধরা অত সহজ নয়। তাই তার প্রতি একটা চাপা ক্ষোভ সকলেরই রয়েছে।

মণিময়, উপেন, নীরদ, দীনু ওরা প্রায় পাশাপাশি ছিল মিটিংয়ে। সবাই চুপচাপ থেকেই সকলের মন্তব্য কর্ণগোচর করল। মতামত বিনিময় কিছুই হল না। রাত ৭টা বাজে প্রায়। মিটিংও শেষ হয়ে গেল। হরিমোহন খোশমেজাজেই তার মেম্বারদের নিয়ে মিটিং শেষে স্কুল মাঠ থেকে বেরিয়ে গেল। সবাই যে যার মতো চলে গেল। মণিময় উপেন একসাথে হাঁটতে লাগল বাড়ির উদ্দেশ্যে। রাস্তা-ঘাট অন্ধকার। স্ট্রিট লাইট গুলো সবগুলো জ্বলে না। এই অন্ধকারের মধ্যেই মানুষ জায়গায় জায়গায় জটলা করে মিটিং-এর কথাবার্তাই বলছে। নানারকম অভিযোগ অভিমত পোষণ করছে। হাঁটতে হাঁটতে মণিময় বাড়ির গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, উপেনদা আসুন না এক কাপ চা খেয়ে যান। উপেন মাথা নেড়ে অসম্মতি জানিয়ে বলল, না ভাই—এখন আর যাই না। আমার বাড়িতে গিয়ে আবার বেরোতে হবে। উপেনের অসম্মতি স্বীকার করে মণিময় বলল, ঠিক আছে দাদা, জোর করব না। তা কোথায় যাবেন

আপনি? উপেন স্মিত হেসে উত্তর দিল, আরে ভাই আজ সকালে বাজার করতে সময় পাইনি, বাড়িতে একটু কাজ ছিল। এখন বাজারে না গেলেই না হয়। তাই আর কী ...., চলি আজ আরেকদিন আসব। বলে উপেন চলে গেল। মণিময় উঠোন পেরিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল। দেখল রেখা পড়ার টেবিলে বসে। রেখার সামনে গিয়ে মণিময় বলল—কীরে, তোর মা কোথায়? মিটিং-এ তো গেল না। রেখা বইয়ের মধ্যে মাথা গুঁজে উত্তর দিল, কেন? মা তো ঘরেই! দেখো-রান্না ঘরে হয়তো। — বলতে বলতে রেখা দেখল মা এসে উপস্থিত। মণিময় নিজের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, গিন্নি একটু চা খাওয়াও। মুড়িটুড়ি কিছু খাব না। শোভা বলল, কেন, কেন—চায়ের সঙ্গে কিছু খাবে না? চপটপ তো কিছু নিয়ে আসতে পারতে। মণিময় বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় শোভার দিকে তাকিয়ে বলল, দুপুরের খাওয়াটা আজ আমার বেশি হয়ে গেছে। অনেকদিন বাদে মাংস খেলাম তো তাই। তবে হ্যাঁ তোমাদের জন্য আনতে পারতাম। উপেনদার সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলে এসেছি। তাই একদম মনে নেই। এখন এনে দেব? রেখা তীব্র আপত্তি করে বলল, না, না বাবা—কিছু আনতে হবে না। আমরা চিড়াভাজা খেয়ে নেব। তুমি একটু বিশ্রাম নাও। রেখার কথায় সন্তুষ্ট হয়ে মণিময় চোখ বুজে আরাম করতে লাগল। ভাবতে লাগল এই দুনিয়ায় মেয়েরাই পিতামাতার কথা বিশেষভাবে ভাবে। ওদের মমতাবোধ মা-বাবা স্বামী সন্তানের উপর বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। আজও সমাজের এক অংশ কন্যা সন্তানকে অবজ্ঞার চোখে দেখে। মণিময় ভেবে পায় না রেখার মতো মেয়ে যদি প্রতি ঘরে থাকে তবে তো সেখানে শান্তি বিরাজ করারই কথা? তবে কেন এই ঘৃণ্য মনোভাব মানুষের মধ্যে প্রায়শই পরিলক্ষিত হয়? আজকাল মেয়েরা কী না করছে? আবার সংসারে ঢুকে অনেক মেয়ে মুখ বুজে অত্যাচারও সহ্য করতে হচ্ছে। এরজন্য প্রাণও দিতে হচ্ছে — একথা ভেবে মণিময় চমকে উঠে বসে পড়ল। এতক্ষণ কোন্ গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিল মণিময়। কখন শোভা এসে চা ঢেকে রেখে গেছে, খেয়াল করেনি। চা খেতে আরম্ভ করে শোভাকে ডাকল, কইগো একটু শুনে যাও। আসছি, এত চিৎকার করছ কেন? ভাতটা নামিয়ে আসছি। তুমি ততক্ষণে চা-টা খেয়ে নাও। মণিময় অপেক্ষা করতে লাগল। অসীমটা যে কোথায় গেল। এখন তো বাড়ি ফেরা উচিত। এখুনি হয়তো শোভা খিচমিচ করতে আরম্ভ করবে। ছেলেটার জন্য ভেবে ভেবে শোভা সবসময়ই অস্থির হয়ে থাকে। মায়ের মন তো? ভাবনা ছাড়া আর করবেই বা কী? শোভা এল এবং বসল খাটের এক কোনায়। রেখা পড়ছে আস্তে আস্তে। মাঝে মধ্যে মশা মারার আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। মণিময় বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে রেখার ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এসে আবার বসল শোভার মুখোমুখি। শোভা বুঝতে পারল কী বলবে। বলল, বুঝেছি এতক্ষণে তোমার কথাটি কি? তোমাকে বলে আমিই জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। এবার বলো কী খবর আনলে!

মণিময় আওয়াজ নিচু করে বলতে লাগল, সেদিন তো স্কুলে অপর্ণা দিদিমণির সঙ্গে এ ব্যাপারে কিছুক্ষণ কথা হল। — শোভা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল— তা কি বললেন অপর্ণাদি? মণিময় বলল, বললেন তো অনেক কিছুই। ছেলের বাবা নাকি রেলওয়েতে চাকুরি করতেন। ওরা এক ভাই, এক বোন। ছেলের দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। বাটানগরে থাকে। বাটা কোম্পানিতে চাকুরি করে জামাই। ছেলের দিদিও গ্র্যাজুয়েট। আসল কথা পরিবারটা খুবই শিক্ষিত। উত্তরপাড়াতেই ছেলে ভাড়া থাকে মা-বাবাকে নিয়ে। সব শুনে শোভা আগ্রহী হয়ে বলল, তাহলে অপর্ণাদিকে বলেছ রেখার সম্বন্ধে কথা বলতে? মণিময় উত্তর দিল হ্যাঁগো-হ্যাঁ — অপর্ণাদিদিমণি আগেই কথা বলে নিয়েছে। গরমের ছুটিতে তো উনি উত্তর পাড়া বেড়াতে গিয়েছিলেন। তখনই রেখার কথা বলে এসেছে। শোভা হতচকিত হয়ে বলল, গ্রামের মেয়ে বলে ওদের আপত্তি নেই তো? না, না, জোরে বলে উঠল মণিময়, কী যে বল না তুমি, আপত্তি থাকলে কি অপর্ণা দিদিমণি রেখার কথা বলতেন? কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, রেখার একটা রঙিন ছবি ওরা দেখতে চেয়েছে। ছবি দেখে পছন্দ হলে তবেই আসবে রেখাকে দেখতে। বুঝলে ? মণিময় চলে গেল টি.ভি.র খবর শুনতে। অসীমও ততক্ষণে এসে গেছে। শোভা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল বাকি কাজগুলো সারতে।

শোভার মনে মনে একটা চিন্তা প্রায়ই ওর মনটাকে অস্থির করে তোলে। মেয়েকে তো বিয়ে দিতে হবেই। কিন্তু কে জানে শ্বশুর-শাশুড়ি কেমন হবে। জামাই কেমন হবে! রেখা পারবে কিনা মানিয়ে নিতে। যতসব উদ্ভট চিন্তা শোভার মনকে ঘিরে রাখে। বড় আদরের মেয়ে রেখা। মেয়েকে সবকিছুই শিখিয়েছে শোভা। কখন কীভাবে চলা উচিত সবই জানে এই মেয়েটি। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস বলতে তো একটা কথা আছে। আর তাছাড়া আজকাল ঘরে ঘরে নারী নির্যাতনের নামে যা হচ্ছে তা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে। রাতে ঘুমাতে গেলেই শোভার মাথায় এসব নানারকম আজে বাজে চিন্তা ঘুরপাক খায়। যার কোনো মাথামুন্ডু নেই। এখন শোভার বড় কাজ রেখাকে নিয়ে গিয়ে একটা সুন্দর, রঙিন ছবি তোলা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপর্ণাদিকে ছবিটা দিতে হবে।

এদিকে মণিময় ভাবছে বোনটার বাড়িতে গিয়ে ঘুরে আসবে। সেটা অবিশ্যি সামনের সপ্তাহ ছাড়া সম্ভব নয়। আজ মাত্র রোববার যাচ্ছে। ছুটির দিন ছাড়া তো যাওয়া হবে না। সেই কবে ভাইফোঁটায় ওকে দেখে এসেছিল। কল্যাণী তার বড় আদরের বোন। ভাগ্নে দুটোর জন্যও মনটা খুউব টানে মণিময়ের। ভগ্নিপতি অরুণ ওখানকারই একটা স্কুলে শারীর শিক্ষক হিসেবে কাজ করে। সরকারি চাকুরি তাই নিশ্চিন্ত। মাইনে যদিও তেমন আহামরি কিছু নয়। কল্যাণী এই অল্প টাকাতেই হিসাব করে চালিয়ে যাচ্ছে সংসার। এছাড়া পড়াশুনার খরচতো আছেই। তবে অরুণ ছেলেটি যথেষ্ট ভালো। নম্র, ভদ্র, বিনয়ী। কল্যাণীর ভাগ্য এদিকে খুবই ভাল।

কল্যাণী তো নিজে বেশি একটা পড়াশুনা করেনি। ক্লাস এইট থেকে নাইনে উঠতে পারেনি বলে মণিময়ের বাবা আর পড়তে দেননি। বাড়িতেই কাজকর্ম করে দিন কাটাত। তারপর বাবা মারা যাওয়ার পর মণিময় পৈতৃক সম্পত্তি কিছু বিক্রি করে বোনকে বিয়ে দেয়। কল্যাণী দেখতে সুন্দরী না হলেও সুশ্রী। তাই হয়তো অরুণ দেখেই পছন্দ করে ফেলেছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা বিচার করতে যায়নি। মণিময়ের খুব টান এই বোনের জন্য। আর আছেই বা কে? বড় ভাই ছিল মণিময়ের। বড় ভাই স্নেহময় ছিল মণিময়ের চার বছরের বড়। মণিময়ের বয়স যখন বারো বৎসর তখন তিনদিনের জ্বরে স্নেহময় মারা যায়। ওদের পরিবারে ছিল একটা এটা মর্মান্তিক অধ্যায় এবং অভাবনীয় ঘটনা। আজও মণিময়ের মনে পড়ে দাদার কথা। কী ছিল সেই দিনগুলি। বাবা মা দুভাই এক বোনের সংসার ছিল তখন আনন্দে পরিপূর্ণ। অভাবটা ছিল শুধুই অর্থের। আর কিছুরই অভাব ছিল না। হঠাৎই এই ছন্দপতন। তাই মণিময় বাবা-মা যতদিন বেঁচে ছিলেন কোনো দিনই অবজ্ঞা অবহেলা করেনি। বরং পিতামাতার সেবায় এতটাই নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করে রেখেছে।

হয়তো বা আজ সেই জন্যই মণিময়ের ছেলে-মেয়েও আনন্দের পথ ধরে চলতে শিখেছে। এখন মণিময়ের আত্মীয় বলতে আছে এক বৃদ্ধ মামি, মামাতো ভাই আছে তিনজন। আর শ্বশুর বাড়ির লোক তো আছেই। মামাতো ভাইয়েরা খুব সচ্ছল অবস্থায়ই আছে। তিনজনেই মোটা টাকা মাইনের চাকুরি করে। কলকাতায়ই ওদের আলাদা আলাদা ফ্ল্যাট বাড়ি আছে, যোগাযোগ বলতে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান। এছাড়া দেখা সঙ্গত বড় একটা হয় না, ওদের জীবনযাত্রার মান সম্পূর্ণই আলাদা। এজন্য হয়তো মণিময়ের সঙ্গে খাপ খায় না। তবে রেখার বিয়ে স্থির হলে তো মণিময়কেই ওদের সঙ্গে গিয়ে যোগাযোগ করতে হবে। তবে আত্মীয় পরিজন সবার সঙ্গেই প্রায় মণিময় শোভার সুন্দর সম্পর্ক রয়েছে। সামাজিকতা, আত্মীয়পরায়ণতা মণিময় সবসময়ই নিজের সীমিত গণ্ডির মধ্যে মেনে চলে।

সকালবেলার নয়নপুরের নয়নাভিরাম দৃশ্য কারুরই অজানা নয়। সপ্তাহের প্রথম দিন শুরু হল, চিরাচরিত নীতি অনুযায়ী প্রত্যেকের ঘরে ঘরে যে যার কাজে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত নিচ্ছে। শ্রাবণের শেষ হতে চলেছে। ভাদ্রের কাঠফাটা রোদের ঝলসানো রূপ এখন থেকেই প্রকৃতিকে আগাম জানান দিচ্ছে। গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে নাগদেবীর পূজার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বারোমাসের তের পার্বণের অন্যতম হচ্ছে এই মনসাপুজো।

ঈশ্বরে বিশ্বাসী মণিময় পুজো পার্বণের অতশত বোঝে না। ও বোঝে মানুষকে সেবা করা — যার যার যোগ্যতা অনুযায়ী। মানুষের সেবায়ই ভগবান সন্তুষ্ট হন এটাই মানে মণিময়। ঘটা করে পূজা করার মধ্যে সে কোনো রকম আত্মতুষ্টি খুঁজে পায় না। সেই একমাত্র কারণে শোভার কোনো পূজা পার্বণের অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় না। শুধুমাত্র লক্ষ্মীপূজা আর সরস্বতী পূজাটাই মণিময়ের বাড়িতে হয়। সকালবেলা তাড়াহুড়োয় রেখা মাকে বলতেই ভুলে গেছে পাশের বাড়ির রমা কাকিমার সাথে ওর কাল রাস্তায় দেখা হয়েছিল। বলেছে আজ একবার আসবে মা-র কাছে। এখুনি ওকে বেরোতে হবে। প্রায় আটটা বাজে। পটলার মা-টাও এখনও আসেনি। এখন আর রেখার পক্ষে কোনো কাজ করাই সম্ভব নয়। কাপড় পরে রেডি হয়ে রান্নাঘরে গিয়ে দেখল শোভা ভাত চাপিয়েছে। তরকারি নিয়ে বসেছে কাটার জন্য। রেখাকে দেখে শোভা বলে উঠল, কীরে বেরোচ্ছিস যখন একটু কিছু মুখে দিয়ে যা। রুটি করেছি। দেব? রেখা নিজে হাতে একটা রুটি একটু তরকারি নিয়ে খেয়ে নিল। বলল, মা আজ রমা কাকিমা হয়তো আসবে। কাল দেখা হয়েছিল তখন বলল। আমি যাচ্ছি। রুমালে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেল রেখা।

মাসিমা — চিঠি আছে চিঠি। রতন পিওন গেটে এসে হাঁক দিল। তড়িঘড়ি করে অসীম ঘর থেকে বেরিয়ে এল রতনদা অনেক দিন পরে এলে তাই না? চিঠি খুঁজতে খুঁজতে উত্তর দিল রতন হ্যাঁগো দাদা। চিঠি না এলে আমি এসে কী করব? অসীম হা হা করে হেসে উঠল। বলল, দেখি দেখি কার চিঠি? ততক্ষণে শোভাও সামনে দাঁড়িয়েছে। আগ্রহী সুরে বলল, কার চিঠিরে অসীম ? রতন ইতিমধ্যে চলে গেছে। অসীম বলল, দাঁড়াও দেখছি। মনে হচ্ছে পিসির। তাই নাকি? পড় তো একটু, খুশীতে গদগদ হয়ে বলল শোভা। অসীম মনে মনে একটু বিরক্ত হল। মা তো পড়াশুনা জানেই তবে আবার পড়ে শোনাতে হবে কেন ? চিঠিটা নাড়া চাড়া করে মার হাতে দিয়ে বলল, এই নাও, নিজে পড় বলে চলে গেল ঘরের ভেতর। শোভা চিঠিটা হাতে নিয়ে রেখে দিল রান্নাঘরের তাকের উপর। এখন মোটেও সময় নেই। এত বড় চিঠি পড়ার। আরেকটু কাজ বাকি আছে, তারপর মণিময়কে বিদায় করে ধীরে সুস্থে বসে ননদের চিঠিখানা পড়বে। মণিময়ের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। অনেকক্ষণ নিশ্চয়ই চানে ঢুকেছে। বেশ কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এল চান টান করে। উঠানে দাঁড়িয়ে শোভাকে জিজ্ঞেস করল, কী গো রতন এসছিল মনে হয়। তা কার চিঠি এসেছে? শোভা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল এবং বলল, বা বা তোমার কানের পাওয়ার খুউব আছে তো? সবইতো শুনেছ। এটা শুনতে পাওনি কার চিঠি এসেছে। মণিময় শোভার উত্তরে থতমত খেয়ে বলল, না গো না শুনিনি, বলোই না তুমি। কল্যাণীর চিঠি এসেছে। পড়িনি এখনও, তাই বলতে পারব না কি লিখেছে। হয়েছে তো ? এবার ঘরে গিয়ে সেজে গুঁজে নাও। মণিময় হেসে উত্তর দিল, অ্যাঁ সাজব? কাকে দেখাব সেজে, তুমি ছাড়া আর আমার কে আছে বল? শোভা সলজ্জ ভঙ্গীতে

দাঁড়িয়ে রইল। কী হয়েছে — মণিময়ের। রস যে একবারে উপচে পড়ছে। শোভা জানে তার স্বামী কী রকম মজার লোক। বয়স বাড়তে থাকলেও রসের কোনো ঘাটতি নেই। বাড়িতে থাকলে স্বামী-স্ত্রীর এই মধুর খুনসুটি লেগেই থাকে। অসীমটা বাড়িতে আছে, তাই শোভার একটু সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল। তাই আর কথা বাড়ায় নি। উত্তর দিলে মণিময় যে আরও কত কিছু বলত তার ঠিক নেই। তাই নিজেকে সংযত রাখাই ভালো।

বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে। যে যার কাজে চলে গেছে। পটলার মা-ও এসে কাজ সেরে চলে গেছে। রেখা এখনও আসেনি। হয়তো দুটো টিউশনিই সেরে আসবে। তাহলে বিকেলটা ফ্রি থাকবে। পড়াশুনা করতে পারবে। রেখা এলে চান করতে যাবে। কল্যাণীর চিঠিতে তেমন কিছু খবর নেই। ভালই আছে ওরা। শোভাও কতদিন দেখে না ননদকে। ননদকে শোভা নিজের বোনের মতোই ভালবাসে আবার শাসনও করে। বিয়ের পর এসে কল্যাণীকে পেয়েছে ফ্রকপরা ছোট্ট মেয়ে। তাই এত স্নেহ ভালোবাসা। ওর জন্য সন্তানের চাইতেও কোনো অংশে কম নয়। অতীতকাল থেকে ননদ বৌদি সম্পর্কের তিক্ততার কথা আজও সমাজের বহু পরিবারেই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু শোভার সঙ্গে কল্যাণীর যে আঙ্গিক সম্পর্ক তা একেবারেই নজীরবিহীন বলা যায়। এটা পারিবারিক সংস্কারই বলা চলে।

দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে শোভা, রেখা বিছানায় বসে একটু আলাপ সালাপ করছিল। বেলা বাজে প্রায় আড়াইটা। অসীম এখনও ফেরেনি। এখুনি হয়তো চলে আসবে। হঠাৎ গেট খোলার শব্দে দুজনেই তাকাল বাইরের দিকে। ভাবল অসীম এসেছে। শোভা এগিয়ে গেল বারান্দার দিকে। দেখল রমা ঢুকছে। শোভা একগাল হেসে বলল, কীগো রমা—কী ব্যাপার— এসো এসো ভেতরে এসো। নিয়ে গিয়ে বসাল ভিতরের ঘরে। নীরদের বৌ রমা শোভাকে খুব সম্মানের চোখেই দেখে। কী গো দিদি যন্ত্রণা দিলাম না তো এ সময়ে ? রমা একটু ইতস্তত করেই বলল, কী করব — আর সময়ও পাই না সারাদিন। তাই নিরিবিলিতেই এলাম। শোভা নরম সুরে বলল, আরে না না কি বলছ — তুমি আসাতে বরং ভালই হয়েছে — একটু গল্প সল্প করতে পারব। এমনিতেই আমি দুপুরে বিশ্রাম নেওয়ার সময় খুব একটা পাইনা। বলো কী খবর ? রেখা একটু বিরক্তই বোধ করছিল। কেননা মার আর বিশ্রাম নেওয়া হল না। রেখা কোনো কথা বলল না। চলে গেল পাশের ঘরে টেবিলে বসে পড়ার বইগুলো দেখতে লাগল। রমা শোভার সঙ্গে বসে সংসারের কথাবার্তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এর মধ্যে প্রধান হল শাশুড়ির নিন্দা। শোভার মনঃপূত হচ্ছিল না কথাগুলি। যাই হোক শুনতে তো হবেই। হঠাৎই যাওয়ার জন্য উদ্যত হয়ে বলল, দিদি — যার জন্য এসছিলাম পরশু বুধবার আমাদের বাড়িতে মনসা পূজা। সাধারণ মতোই হবে। রেখাকে নিয়ে আপনি যাবেন। ঠিক আছে যাব, বলল শোভা, সন্ধ্যাবেলা একবার যাব, কেমন ? রমা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল তাহলে যাই এবার দিদি। অঞ্জলিদির বাড়ি যাব এখন। যাই দিদি, বলে চলে গেল। এগিয়ে দিতে গেট

পর্যন্ত এল শোভা। তারপর বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিয়ে এল । অসীম এসে ইতিমধ্যে খেয়ে দেয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। ঘণ্টাখানেক বাদে মণিময়ও এসে পড়বে স্কুল থেকে। তাই শোভার আর বিশ্রামের উপায় নেই।

সন্ধ্যার প্রাক্‌লগ্নে নয়নপুরবাসীরা যার যার কর্মক্ষেত্র থেকে ঘরে ফিরছে। দিনের আলো ঝিমিয়ে এলেও গরমের দাপট ঠিকই আছে। আকাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বৃষ্টির সম্ভাবনা তো নেইই। মণিময়ের বাল্যবন্ধু গিরিজাপ্রসাদ চৌধুরী এই গ্রামে এসেছেন কাল। দু-তিনদিন থাকবেন। এখানে তার আত্মীয়ের বাড়ি আছে। কাল হঠাৎই মণিময়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। সে কী আনন্দ দুজনের। মণিময়ের সঙ্গে দেখা না হলেও গিরিজা ঠিকই আসত মণিময়ের বাড়িতে, পেশায় সে উকিল। লিলুয়াতে থাকে পরিবার নিয়ে। ওখানকার কোর্টেই ওকালতি করে। দুদিনের জন্য গ্রামে বেড়াতে এসেছে। রাশভারী চেহারা। সুন্দর সুঠাম স্বাস্থ্য। এই বয়সেও বয়সটাকে ধরে রাখতে পেরেছে। মণিময়ের বাড়ির উঠানে পা দিয়েই হাঁক দিল, মণিময়, আছিস নাকি ভাই? মণিময় তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল, আরে গিরিজা আয় আয়। মুখে উচ্ছ্বাসের হাসি। কয়েকবছর বাদে দেখা তো। আনন্দ আর ধরছে না। বন্ধুকে পেয়ে মণিময় একদম আহ্লাদে গদগদ। হাত ধরে ঘরে নিয়ে গিয়ে ঢোকাল। চেঁচিয়ে ডাকল শোভাকে, ও গিন্নি এদিকে এসো। দেখে যাও কে এসেছে। শোভা একটু ফিটফাট হয়ে এসে সামনে দাঁড়াল, আড়ষ্ট হয়ে বলল, কেমন আছেন গিরিদা, কতদিন পর দেখা, তাই না? গিরিজা সহাস্যে বলল, হ্যাঁগো বৌঠান আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে মনটা একদম ভরে গেল। আমি তো আছি ভালই, আপনারা কেমন আছেন? শোভাকে উত্তর দিতে না দিয়ে মণিময় নিজেই বলল আরে ব্যাটা — তুই যে ভালো আছিস তা তোর চেহারায়ই প্রকাশ পাচ্ছে। তুই তো সেই আগের গিরিই আছিস রে। আমরাও ভালই আছি। বৌদিকে নিয়ে এলে আরও ভাল লাগত। তোর তো দুটোই মেয়ে নারে? গিরিজা বলল, হ্যাঁরে ভাই বড়মেয়ে কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ছে সায়েন্স নিয়ে। ছোটো মেয়ে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দেবে। আর আমার গিন্নি তো প্রায়ই অসুস্থ থাকে। মানে অসুস্থ বলতে সুগার ধরা পড়েছে। তাই আর এমনিতে কাজকর্ম মোটামুটি করে। মণিময় জানে গিরিজার শ্বশুরবাড়ি খুবই বড়লোক। বড়লোক বাবার একমাত্র কন্যা হচ্ছে এই গিরিজার স্ত্রী। তাই অহংকারীও বটে। মেপে কথা বলা গিরিজার স্ত্রীর স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট। একমাত্র স্ত্রীর কারণেই গিরিজা অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে আলাদা হয়ে পড়েছে। ছাত্রাবস্থায় মণিময় গিরিজার বাড়ি গেছে কয়েকবারই। কেননা গিরিজা এই গ্রামেরই ছেলে ছিল। শোভা ট্রেতে করে চা-মিষ্টি এনে গিরিজার সামনে টেবিলে রাখল। গিরিজা খুশিতে গদগদ হয়ে বলল, আরে করেছ কী বৌঠান—এত মিষ্টি? মণিময় টিপ্পনী কেটে বলল, আরে বড়লোক বাড়ির জামাই তুই — এই দুটো মিষ্টি খেতে পারবি না ? তুইই ঠিক করেছিস ভাই, বড়লোক বাড়ির মেয়েকে বিয়ে করে। শোভা দাঁড়িয়ে শুনছিল মণিময়ের

কথাগুলো। মনে মনে রাগ হচ্ছিল। গিরিজা মিষ্টি খেতে খেতে বলল, এই মনা—একদম বাজে কথা বলবি না। বৌঠান ছেলেমেয়ে নিয়ে তুইও তো ভালই আছিস। বৌঠানের হাতের রান্নার যে কী মধুর স্বাদ তা আজও মনে পড়ে। আমার তো কপালে স্ত্রীর হাতের রান্না খাওয়ার সৌভাগ্য নেই। বলে চায়ের কাপে চুমুক দিল। এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর শোভা হঠাৎই বলে উঠল, কেন গিরিদা, রান্নার লোক আছে বুঝি? মণিময় শোভার দিকে তাকিয়ে বলল হ্যাঁগো—রান্নার লোক ছাড়া ওর চলবে নাকি? বড়লোক বাড়ির একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করার ঝক্কি পোয়াচ্ছে গিরিজা। আমাকে দেখ শোভার হাতের রান্না ছাড়া খেতেই পারি না। গিরিজা এবার হেসে ফেলল। মণিময়ও মিটি মিটি চোখে শোভার দিকে তাকাল। এইসব কথার পাত্তা না দিয়ে শোভা গিরিজাকে অনুনয় করে বলল, গিরিদা আপনি এখন ভাত খেয়ে যান না! ঘরে যা আছে তাই দিয়েই আপনাকে খাওয়াব। আমি এক্ষুনি রান্না বসিয়ে দিচ্ছি। গিরিজা উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বলল, না না বৌঠান এবার হবে না। আরেকবার এলে অবশ্যই আপনার হাতের রান্না খেয়ে যাব। আমার সঙ্গে আপনাদের তো ভদ্রতার কোনো সম্পর্ক নেই। বলুন বৌঠান? শোভা চুপ করে রইল। মণিময় বলল, না খেলে আর কী করা যাবে। তা তুই কাল আছিস তো? গিরিজা বলল এদিক ওদিক তাকিয়ে, হ্যাঁ কাল আছি, তা তোর ছেলেমেয়ের সাথে তো দেখা হল না। কী যেন তোর মেয়ের নাম? ও মনে পড়েছে রেখা। মেয়ের তো বিয়ের বয়স হল, বিয়ে দিবিনা? শোভা মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল হ্যাঁ হ্যাঁ দেব তো দাদা—ভাল পাত্র একটা দিন না। আপনার তো কত পরিচিতি। সঙ্গে মণিময়ও গলা মিলিয়ে বলল হ্যাঁ রে গিরিজা—ভাল পাত্রের সন্ধান পেলে অবশ্যই জানাস। আমাদের মতো সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে হলেই ভাল হয়। গিরিজা বারান্দার দিকে এগোল, মণিময়ও পেছন পেছন চলল। গিরিজা উঠানে দাঁড়িয়ে শোভার উদ্দেশে বলল, চলি বৌঠান যদি পারি কাল সন্ধ্যায় আবার আসব। এই পরিবারটা বড়ই লোভনীয় আমার কাছে — কী বলিস মণিময় ? ছোটোবেলার সব কথা মনে করিয়ে দেয়। তাই না? দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরল। তারপরেই গিরিজাপ্রসাদ বেরিয়ে গেল। মণিময় শোভা অতীতের স্মৃতি মন্থন করতে লাগল। গিরিজাদের বাড়ি ছিল দক্ষিণ পাড়ায়। ওরা একসময় বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিল এই দেশে। গিরিজার বাবার অবশ্য তখন কিছু করার মতো বয়সই ছিল না। বড়দাদা রণদাপ্রসাদ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ছিল। তাই সে চেষ্টা চরিত্র করে কলকাতার একটা পত্রিকা অফিসে কাজ জোগাড় করে নিয়েছিল। সেটা দিয়ে কোনোরকমে সংসারটা চলে যেত। কিন্তু গিরিজার পড়াশুনা? তাই নিয়ে ওদের যথেষ্ট আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যাইহোক —গিরিজার মামার বাড়ি সচ্ছল হওয়াতে গিরিজার পড়াশুনাটা চালিয়ে নিতে পেরেছিল। বড়ভাই রণদাপ্রসাদ পত্রিকা অফিসের কাজ ছাড়াও প্রাইভেট টিউশনিও আরম্ভ করে সংসারটাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। তাছাড়া রণদাপ্রসাদ খুউব উদ্যোগী মানুষ ছিলেন। দু-চার বছরের মধ্যে সে প্রাইভেটে বি. এ.

পাশ করে নিয়েছিল। তারপর নিজের চেষ্টায় সে একটা বেসরকারি সংস্থায় কাজ জুটিয়ে নিয়েছিল। খুব সুন্দর সুপুরুষ চেহারা এই রণদাপ্রসাদের। স্মার্ট, বুদ্ধিমান তো বটেই। তাই তখনকার দিনে ভাল একটা চাকুরি জোগাড় করতে কষ্ট হয়নি। পিতামাতার প্রতি কর্তব্য। ছোটো ভাইয়ের দায়িত্বই ছিল তার আদর্শ। শুধুমাত্র এই কারণেই আজ গিরিজাপ্রসাদ নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। মা-বাবা মারা যাওয়ার পর ওরা নয়নপুর ছেড়ে গিয়েছে যার যার কর্মক্ষেত্রে। মণিময় জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছে বড়-দাদার কথা। কোথায় আছে, বা কেমন আছে। মণিময়ের চোখে ভেসে ওঠে সেই দিনগুলির স্মৃতি। তখনকার মানুষের আন্তরিকতাই ছিল অন্যরকম। গল্পগুজব, খাওয়াদাওয়া আসা-যাওয়া লেগেই থাকত। এসবই হত পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে। মণিময় গিরিজার দাদাকে নিজের দাদার মতোই শ্রদ্ধা করত। এই রকম দাদাকে কে না শ্রদ্ধার চোখে দেখবে। পরে শোনা গেছে এই দাদাই বিয়ে করে নাকি আলাদা করে দিয়েছিল গিরিজাকে। ততদিনে গিরিজার ওকালতি পাশ করা হয়ে গেছে। নিজের পছন্দমতো মেয়েকেই বিয়ে করেছিল গিরিজা। এই পর্যন্তই গোচরে আছে মণিময়ের। নিরিবিলি পরিবেশে এই সব স্মৃতি মন্থন করতে মণিময়ের খুবই ভাল লাগে। এখন শোওয়ার পালা। খাওয়ার পাট চুকিয়ে বাসনপত্র গুছিয়ে শোভাও চলে এসেছে বিছানায়। চারিদিকে গা ছমছম করা অন্ধকার। জানালা দিয়ে এখনও দূরে কারুর কারুর ঘরে মিটমিটে আলো দেখা যাচ্ছে। নিঝুম নিস্তব্ধ পরিবেশে কুকুরগুলো ডেকে ডেকে যেন রাতের নিস্তব্ধতাকে প্রকট করে তুলছে। নয়নপুরের সব রাত্রির প্রতিনিয়ত ঘটনাই এটা। এটার কোনো আর তারতম্য নেই।

পঞ্চায়েত প্রধান হরিমোহন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে হন হন করে। কোথায় যাচ্ছে কে জানে। এত সকালে এ পাড়ার কোথায় যাওয়ার পরিকল্পনা তার মাথায় এসেছে তা কারুর জানা অসাধ্য। নীরোদ, মণিময়ের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে জেলে পাড়ার দিকে যাচ্ছে হরিমোহন। কার অপকারের কথা মাথায় এসেছে তা একমাত্র হরিমোহনই বলতে পারে। রেখা টিউশনিতে যাওয়ার সময় দেখল ফিনফিনে পায়জামা পাঞ্জাবি পরে হরিমোহন ওদের বাড়ি পার হয়ে এগোচ্ছে। রেখাকে দেখে একটু মুচকি হাসি দিল। রেখা পাত্তা না দিয়ে হাঁটতে লাগল। বেলা বাজে প্রায় আটটা। আকাশে আজ অল্পবিস্তর কালো মেঘ রয়েছে। হয়তো বা বৃষ্টি হলেও হতে পারে।

হরিমোহন গিয়ে ঢুকল জলধরের বাড়িতে। বাড়িতে ঢুকতেই গোলাভর্তি ধান, পাশেই গোয়ালে

দুটো গরু লক্ষ করা যায়। টালির চালা ঘরে জলধর থাকে। খুবই জরাজীর্ণ চেহারা বাড়ি ঘরের। স্ত্রী সন্তানাদি নিয়ে খুব কষ্টেই আছে বোঝা যায়। হরিমোহনকে দেখে জলধর খুব ভয় পেয়ে গেল। সামনে হাতজোড়করে দাঁড়িয়ে বলল, নমস্কার বাবু — আপনি? আমাকে খবর দিলে তো আমিই যেতাম। আপনি কষ্ট করে ...., কাঁচুমাচু হয়ে রইল জলধর। হরিমোহন গেট পেরিয়ে উঠানে এসে দাঁড়াল। এদিক ওদিক নিরীক্ষণ করে বলল, শোন জলধর—আমি এসেছি আমার দরকারে। তোকে খবর দেব কেন? জলধর ভাবল তাঁর আবার কীসের দরকার? ভেবে মাথা নিচু করে বলল, বাবু আপনার দরকার আমার কাছে? অবাক হয়ে বিস্ময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জলধর। হরিমোহন চতুর হাসি হেসে বলল, হ্যাঁ রে হ্যাঁ — আমারই দরকার। শোন আমার কিছু ধানের দরকার। সেটা তুই দিবি আমাকে। সাবধান কেউ যেন জানতে না পারে। জলধরের স্ত্রী লতা ঘরের ভিতর উঁকি মেরে সবই শুনছিল। লতা একটু দাপুটে মেয়ে। লেখাপড়াও তেমন কিছু জানে না। তবে একেবারে মূর্খ মেয়ে নয়। সুন্দরী বলা চলে না। শীর্ণকায় চেহারা। পরনে ময়লা আটপৌরে শাড়ি। চার সন্তানের জননী হয়ে অতি অল্প বয়সে বৃদ্ধের ভাব ধরেছে। পল্লী গ্রামের চাষাদের বৌ-মেয়েরাই হয়তো প্রায় সবাইই এরকম ভগ্ন চেহারা ধারণ করে। অভাবের তাড়নায় দারিদ্র্য তাদের সঙ্গী হয়ে দাঁড়ায়। জলধরের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তবে লতা তো চুপ করে থাকার মেয়ে নয়। স্বামীর দারিদ্র্য সুযোগ নিয়ে ভণ্ড হরিমোহন তার স্বামী জলধরকে ঠকাতে এসেছে। এ কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না। এই ভেবে লতা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, কেন-কেন বাবু — আপনারতো অনেক পয়সা — বাজার থেকে কিনে নিন না। এখানে বিনি পয়সায় কেন দেব আমরা? জলধর ধমকে দিল লতাকে। নিরীহ, গম্ভীর টাইপের লোক এই জলধর বৌ-এর দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইল। হরিমোহন লতার কথার বেশি পাত্তা দিল না। আবারও অনুনয়ের ভঙ্গীতে জলধরকে বলল, কিরে ব্যাটা দিবি তো? নয়ত বি. পি. এল. কার্ড নাকচ করে দেব, জলধর একটা চেয়ার এনে দিল ঘর থেকে। বলল, বাবু বসুন না আপনি—একটু চা খান, হরিমোহন চোখ লাল করে বলে উঠল, তোর এখানে আমি চা খেতে আসিনি বুঝলি? আমার মতো একজন গাঁওপ্রধানকে তোর বউ যা নয় তাই বলে দিল! তুই তো কিছুই বললি না? বলে রাগে গজ গজ করতে লাগল। হরিমোহনের কাছে এইগুলি সবই নাটক। মানুষের তিক্ত কথায় ওর কিছুই আসে যায় না। নিজের স্বার্থ উদ্ধার হলেই হল। সেটা যেভাবেই হোক, ছলে, বলে, কৌশলে যেভাবেই হোক। লতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাগে ফুঁসছিল। এমনিতেই কায়ক্লেশে সংসারটাকে টানতে হয়। জলধর খুবই অমায়িক প্রকৃতির লোক। হরিমোহন জলধরকে ফুসলিয়ে আরও দু-দুবার ধান নিয়েছে। একটা পয়সাও দেয়নি। স্বামীর পরিশ্রমকে লতা এভাবে জলে ভাসিয়ে দেবে না। হরিমোহন কী ক্ষতি করবে আর! অনেক ক্ষতি করেছে। সরকারি ঘর চেয়েছিল জলধর। সেটাও আজ পর্যন্ত ব্যবস্থা করে দেয়নি। এটাতো ওদের ন্যায্য

পাওনাই ছিল। হরিমোহনকে জলধর অনেক অনুরোধ করেছে। কিন্তু কিছুই ফল হয়নি। আজ এসেছে সেই জলধরের কাছেই ধান চাইতে। জলধরের করুণ অবস্থা দেখে লতা সহ্য করতে পারছিল না। বলে উঠল, একটা ঘর চেয়েছিলাম, তা-ও আপনি ব্যবস্থা করে দেননি। ভাঙ্গা ঘরে বাচ্চাদের নিয়ে কোনোমতে থাকি। বৃষ্টি হলে জল পড়ে ভেসে যায় ঘর। তাও আপনার দয়া হয় না আমাদের জন্য। আমরা কেন দেব আপনাকে ধান? জলধর আর কী বলবে। বলার ইচ্ছা থাকলেও বলতে পারেনা সে। লতার মুখের কথাগুলি একেবারেই বাস্তব। হরিমোহন এতই ধূর্ত যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল। মান অপমান বোধ ওর একেবারেই নেই। লতার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলতে লাগল, আরে শোন্ এরই মধ্যে ঘর পেয়ে যাবি। তোদের কয়েক জনের নাম আমি পাঠিয়েছি। এদিক ওদিক তাকিয়ে মধুর সুরে বলল, কীরে জলধর তোর ছেলে মেয়েদের তো দেখছি না। ওরা কোথায় ? জলধর মাথাটাকে নুইয়ে বলল, দুজন ইসকুলে গেছে, দুজন এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। হরিমোহন কী ভেবে একদম হা-হা করে হেসে উঠে বলল বাব্বা এখনও ঘুমুচ্ছে। চাষার ঘরে নবাব পুত্তুর। জলধর এতক্ষণ সংযত হয়েই ছিল। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তীব্র আপত্তির সুরে বলে উঠল, এসব কথা বলবেন না বাবু। আমি গরিব চাষি ঠিকই। কিন্তু মান অপমান বোধ মনে হয় আপনার চাইতে অনেক বেশি আছে আমাদের। এভাবে বিদ্রুপ করবেন না। বাবু হাত জোড় করে বলছি চলে যান আপনি। বলে হাত জোড় করে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল জলধর। হরিমোহন চিৎকার করে কিছু গালাগাল দিয়ে জলধরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। জলধর ভাবনায় পড়ল কে জানে এই প্রধান মহাশয় আবার কী ক্ষতি করবে। জলধর লতাকে বলল, তোমার কী দরকার ছিল এতগুলো কথা বলার? লতা খেঁকিয়ে উঠল, বলব নাই বা কেন ? ঘুম থেকে উঠেই চলে এসেছে বিনি পয়সার জিনিস মাগতে। আমাদের জন্য তিনি কী করছেন? বলে বিড়বিড় করতে করতে চলে গেল ঘরের ভেতর। লতা গরিব চাষির বৌ হলেও তার আদর্শগত নীতিগত বোধ অনেক শিক্ষিত লোকের চাইতেও বেশি। হরিমোহনকে ও কোনো কালেই পছন্দ করে না। বাপের বয়সী লোক বটে—কিন্তু দুর্নীতি, ভণ্ডামি, ধূর্তামি পিতৃতুল্য সম্মান পাওয়ার একেবারেই অযোগ্য। গতবছরও হরিমোহন দুই বস্তা ধান এসে নিয়ে গিয়েছিল। জলধরকে লোভ দেখিয়েছিল, এটা করে দেব সেটা করে দেব বলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিছুই করে দেয়নি। এখানেই লতার রাগ। ক্ষোভও বলা যায়। স্বামীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল এভাবে কেন বিলিয়ে দেবে ? গাঁওপ্রধান বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে। লতা এই ধরনের গাঁওপ্রধানকে তোষামোদ করবে না। জলধরকেও করতে দেবে না। স্বামীর সঙ্গে লতা নিজেও অনেক পরিশ্রম করে। ছেলেমেয়েদের যন্ত্রণা, সংসারের ঝামেলাতো আছেই। এটা অবিশ্যি জলধরও বোঝে যে লতা তার যোগ্যা স্ত্রী। জলধর পরিষ্কার একটা শার্ট গায়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে লতাকে বলল, আমি একটু উপেন স্যার-এর কাছ থেকে ঘুরে আসি। ওঁকে সব বলব ভাবছি।

লতা স্বামীর কথায় সম্মতি জানাল। বেরিয়ে গেল জলধর।

জলধরের মতো আরও দু-চারজন চাষি নয়নপুরে আছে তারাও জলধরের মতোই সব সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে দুঃখ কষ্টের মধ্যেই দিন অতিবাহিত করছে। শুধুমাত্র একজনই আছে হরিমোহনের তাঁবেদারি করে। জলধর উপেনের বাড়ির দরজায় দেখল সুন্দর একটা গাড়ি দাঁড়ানো। তাই আর ঢুকল না। ভাবল নিশ্চয়ই কোনো আত্মীয়স্বজন এসেছে উপেন স্যার-এর বাড়িতে। বিমর্ষ মন নিয়ে ফিরে গেল বাড়িতে।

উপেন মজুমদারের বাড়িতে হৈ হুল্লোড়, অনেক লোকের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। গেটে একখানা সাদা ধবধবে মারুতি গাড়ি দাঁড়ানো। এসেছে উপেনবাবুর খুড়তুতো ভাই সপরিবারে। বেলুড়ে ওদের পৈতৃক বাড়ি আছে। মানে উপেনের কাকার বাড়ি। এই খুড়তুতো ছোটো ভাই রতীশ বালীগঞ্জে ফ্ল্যাট কিনেছে বছর দুয়েক আগে। ও কলকাতাতেই একটা মাল্টি ন্যাশন্যাল কোম্পানিতে ম্যানেজিং ডাইরেকটর হিসেবে কাজ করে। ভাল টাকা মাইনে পায়। পরিশ্রমও সেইরকমই করতে হয়। এক মেয়ে এক ছেলে নিয়ে ওদের ছোটো সংসার। আধুনিক পোশাক পরিচ্ছদের এবং আধুনিকতার সুস্পষ্ট নিদর্শন ওদের মধ্যে পুরোপুরি বিদ্যমান। মেয়ে তো বি. কম. পাশ করে এম.বি.এ. করেছে। ছেলে এবারই ভর্তি হয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ। ব্যাঙ্গালোরে থাকে। ছুটিতে বাড়িতে এসেছে। তাই সবাই মিলে বেরিয়ে পড়েছে বেড়াতে। আজ প্রথমেই রতীশের উপেনদার কথাই মনে পড়ল। তাই সোজা চলে এল নয়নপুরে। একান্নবর্তী পরিবারে যখন থাকত তখন উপেনই সব ভাই বোনদের মধ্যে বড় ছিল। তাই উপেনকে সবাই বড়দা বলেই ডাকত। আজও রতীশের কাছে বড়দা আগের মতোই সম্মানের, শ্রদ্ধার পাত্র। বড় হওয়ার উৎসাহ উদ্দীপনা সব এই বড়দার কাছেই পেয়েছে রতীশ। তাই সমাজের উঁচুতলার মানুষ হয়েও রতীশের সবচেয়ে আগে আজ বড়দার কথাই মনে পড়ল। তাই সব ভাবনাচিন্তা পেছনে ফেলে চলে এসেছে এই নয়নপুরে বড়দার সঙ্গে দেখা করতে। রতীশেরও বড়ভাই মনীষ থাকে বেলুড়ে পৈতৃক বাড়িতে। সে একটা বেসরকারি অফিসে করণিকের কাজ করে। পড়াশুনায় বেশি দূর এগোতে পারেনি বলেই আজ তার এই অবস্থা। ভাগ্যের পরিহাসও বলা চলে। নিষ্ঠুর নিয়তি তাকে উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠার জন্য সাহায্য করেনি। তাই মনীষও উপেনের মতোই কষ্ট করে দিনাতিপাত করছে। উপেনের কাকার আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল। তাই ছেলেমেয়ের পড়াশুনার পেছনে পয়সা খরচের কোনো ঘাটতি ছিল না। মনীষের চাইতে রতীশের পড়াশুনার ব্যাপারে আগ্রহটা ছিল বেশি। ওদের একটাই বোন রুবি, ভালভাবেই বি এ পাশ করেছিল। রুবি রতীশের দিদি। বিয়ে হয়েছে সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্রের সঙ্গেই। এখন থাকে হায়দ্রাবাদে। ভালই আছে। রতীশ বড়দা উপেনের বাড়ি এসেছে একটু সকালেই। বাড়িতে ঢুকেই সবাইকে চমকে দিল রতীশ। উপেনের স্ত্রী অঞ্জলি রান্না ঘরে বসে সব্জী কাটছিল। উপেন বারান্দায় বসে পত্রিকা পড়ছিল। হঠাৎ গাড়ির শব্দে চমকে উঠল।

অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কারা যেন ঢুকছে ওদের বাড়ির গেট দিয়ে। কাছে আসতেই উপেন উচ্ছ্বসিত হয়ে চিৎকার করে উঠল। রতীশ উপেনকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। উপেন আনন্দে হেসে বলল, আরে রতীশ! বলে ভাইকে জড়িয়ে ধরল। কতদিন পরে এলি বল্ তো ভাই! অঞ্জলির উদ্দেশ্যে বলল, কই গো — বেরিয়ে এসো — দেখো কে এসেছে। আজ আমাদের আনন্দের দিন। রতীশের স্ত্রী মমতা পেছনে দাঁড়িয়ে হাসছিল ওদের দুভাইয়ের কাণ্ডকারখানা দেখে। এগিয়ে গিয়ে ভাসুরকে প্রণাম করল। অঞ্জলি ততক্ষণে মাথায় ঘোমটা টেনে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ভাবছে এতদিন পর কী মনে করে রতীশ ঠাকুরপো। তা-ও আবার সপরিবারে। আগের থেকে কিছু জানায় নি। হঠাৎ করে এসে উপস্থিত। রুবি অঞ্জলিকেও প্রণাম করল। অঞ্জলি অপ্রস্তুত হয়ে বলল, আরে থাক ভাই থাক—কতদিন পরে এলে বলো তো মমতা? অঞ্জলি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েই রইল। কী মমতা কী হয়েছে। সাজে পোশাকে একদম আধুনিকতার ছাপ। পরনে দামি সিল্ক শাড়ি, গায়ে অল্প সোনার গয়না, পায়ে হাই হিল জুতো। মেয়েও তেমনিই হয়েছে। উগ্র আধুনিক পোশাক পরা। জিনসের প্যান্ট গেঞ্জি পরনে। ছেলেটা অতি সাধারণ পোশাক পরেছে। দুজনেই এগিয়ে এসে জ্যাঠাজেঠিকে প্রণামের কাজটা সেরে নিল। অঞ্জলি রতীশের মেয়েকে আদর করে জিজ্ঞেস করল তোমার নামটা যেন কী মা? আজকাল সব ভুলে যাই। মেয়ে হেসে উত্তর দিল 'আমার নাম? আমার নাম অনুরূপা মজুমদার। ছোটোভাইয়ের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, আর ওর নাম রোহিত মজুমদার। অঞ্জলি বলল, মমতা তোমার ছেলেমেয়ে তো খুব স্মার্ট। আর তাছাড়া স্মার্ট হবে নাইবা কেন! কলকাতায় পড়াশুনা করছে, ওখানকার শিক্ষা পদ্ধতিই তো আলাদা, আর আমরা গ্রামের মানুষ গ্রাম্যই রয়ে গেলাম। বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রতীশের দিকে তাকিয়ে। রতীশ এগিয়ে এসে বলল, আরে বৌদি এখানে দাঁড়িয়েই কথা বলবে? ভিতরে যেতে বলবে না? উপেন তাড়াতাড়ি রতীশের হাত ধরে ওদের সবাইকে ঘরের ভিতর নিয়ে গেল। টি ভি.-র ঘরেই বসাল। অঞ্জলিও এসে ঢুকল। বলল, বলো ঠাকুরপো তোমার কী খবর? হঠাৎ এতদিন পর আমাদের কথা মনে পড়ল? রতীশ জুতো খুলে বিছানায় আরাম করে বসল। মমতা আর ছেলেমেয়ে এদিক ওদিক ঘুরে ঘরগুলি দেখল। রতীশ বলল অঞ্জলিকে, হ্যাঁগো বৌদি একদম ছুটিই পাই না। আগে একটু চা খাওয়াও। অনেকদিন তোমার হাতের চা খাই না। শুনে খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেল অঞ্জলি। মমতা এসে বসল রতীশের সামনে একটা সোফায়। পাশে থেকে রতীশের কথাগুলো শুনছিল। রতীশের বেশি আদিখ্যেতা। এত কথার কী আছে! মনে মনে রাগ হচ্ছিল মমতার। তাই চুপ করে বসে রইল। উপেন মমতাকে বলল বিনয়ী ভঙ্গীতে, বৌমা, তোমাদের একটু কষ্ট হবে আমার এখানে। গ্রামের পরিবেশ তো তাই বলছিলাম আর কী? মমতা গম্ভীর মুখে বলল, না তেমন কিছু নয়। তাছাড়া আমরা একটু বাদেই তো চলে যাব। মমতার এই উদ্ধত আচরণ উপেনকে ব্যথা দিল। মমতাও অতি

সাধারণ ঘরের মেয়ে। বিয়ের পরে রতীশের স্বল্প আয়ে হিসেব করে সংসার চালানোর অভিজ্ঞতা মমতারও ছিল। এখন হয়তো অতীতের সেই দিনগুলির কথা ভুলে গেছে। এক কথায় অল্প জলের মাছ গভীর জলে পড়লে যা হয়। উপেন বা অঞ্জলি কেউ কিন্তু অতীতকে ভোলেনি। তাই মমতার এই পরিবর্তিত রূপ তাদের চোখে সর্বাগ্রে ধরা পড়েছে। মমতার কথায় রতীশও একটু অবাক হল। বড়দার সঙ্গে ওরা কেউ এভাবে কথা বলে না। রতীশ ধমকের সুরে বলল, কী হচ্ছে মমতা এভাবে কথা বলছ কেন? রতীশের ছেলেমেয়ে চলে এল এ ঘরে। অনুরূপা বাবাকে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে গো বাবা, মা আবার কী বলল? উপেন তাড়াতাড়ি স্নেহের সুরে বলল, কিছুই হয়নি মা, তুই বোস আমার পাশে, অনুরূপা জেঠুর পাশে বসে অনেক গল্প করল। রোহিত বাবার পাশে বসে রইল চুপ করে। অঞ্জলি ট্রেতে করে নিয়ে এল চা — সঙ্গে বিস্কুট-চানাচুর। রতীশ উৎফুল্ল হয়ে হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে আরাম করে বসল। মমতাও গম্ভীর মুখে চা নিয়ে নিল। অঞ্জলি কোণের সোফাটার মধ্যে বসল। অঞ্জলি রতীশকে বলল, ঠাকুরপো, এবেলা যাওয়া চলবে না। এতদিন পরে এলে, না খেয়ে কিছুতেই যেতে পারবে না। একটু মাছের ঝোল ভাত খেয়ে যাবে। উপেন অঞ্জলির কথায় সায় দিয়ে বলল, হ্যাঁরে ভাই, তোরা কিন্তু খেয়েই যাবি। খাওয়াদাওয়ার পর চলে যাস। রতীশ একটু আমতা আমতা করছিল মমতার দিকে তাকিয়ে। মমতা চুপ করেই রইল। রতীশ বলল, দেখো বড়দা খাওয়া দাওয়ার ঝামেলা করলেই আমাদের বেরোতে দেরি হয়ে যাবে, কতটা পথ তুমি তো জানই। উপেন মমতার দিকে তাকিয়ে বলল, কী বৌমা, তুমি কিছু বলো! একবেলা একটু ভাত না খেয়ে গেলে খুউব দুঃখ পাব। মমতা স্মিত হেসে সম্মতি জানাল। এতে রতীশও খুশি হল। হাসি মুখে অঞ্জলিকে বল্লল, বৌদি তুমি কষ্ট করে রান্নাটা তাড়াতাড়ি সেরে নাও। আমরা খেয়ে দেয়ে তিনটার মধ্যে বেরিয়ে পড়ব। মমতা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলো দিদি — আমি তোমাকে সাহায্য করব। অঞ্জলি একটু অবাকই হলো। বলল মমতাকে, আগে তুমি শাড়িটা পাল্টে নাও। তারপর রান্নাঘরে কাজ করতে করতে তোমার গল্প শুনব। অঞ্জলি চলে গেল শাড়ি আনতে। এনেছিল একটা শাড়ি মমতাকে পরার জন্য। যদিও মমতা শাড়ি পাল্টাল না। দামি শাড়ি পরেই রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকল। রোহিত অনুরূপা ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগল। গ্রামের এই সুন্দর ছিমছাম পরিবেশ ওদের মনে আনন্দের অনুভূতি বাড়িয়ে দিয়েছে। উপেন আজ স্কুলে যেতে পারে নি। হীরক গেছে স্কুলে। রতীশ খাওয়াদাওয়া সেরে অনেকক্ষণ চলে গেছে। উপেন একটু শুয়েছে। আজ একটা বেলা খুবই ভাল কাটল উপেনের। আগের কত স্মৃতি আজ চোখের সামনে ভেসে উঠছে। তবে রতীশ না বদলালেও ওর স্ত্রী অনেকটাই বদলে গেছে। টাকা পয়সা মানুষকে এতটাই পাল্টে দেয় জানা ছিল না উপেনের। রতীশের ছেলে মেয়ে দুটি রতীশের মতোই হয়েছে। মমতার কথা বলার ভাবভঙ্গী অঞ্জলিরও ভাল লাগেনি। তবে অঞ্জলি কোনো ব্যাপার নিয়েই বেশি মাথা ঘামায় না। তাছাড়া এত চিন্তা করার

ফুরসৎও নেই। হীরকও চলে আসবে এখুনি স্কুল থেকে। সংসারে কাজের কী শেষ আছে। সন্ধ্যাও ঘনিয়ে এল। উপেন উঠে তৈরি হল একটু বেরোনোর জন্য। সান্ধ্য ভ্রমণ বললেও চলে।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে উপেন স্কুলের মাঠ পেরিয়ে চলে গেল প্রায় দীনুদের বাড়ির কাছাছাছি। রাস্তা থেকেই দীনুর ছেলের পড়া শোনা যাচ্ছে। ঐ রাস্তাটা অন্ধকার তাই ওইদিক থেকে ফিরে এল। হাঁটতেও আর ভাল লাগছে না। মাথায় কত চিন্তা উলটপালট খাচ্ছে। অলকটা সামনের সপ্তাহেও আসবে কিনা কে জানে। অজয়ের কাছে একটা হাত চিঠি দিয়েছিল। ভালই আছে। টাকা নতুন কোম্পানিতে জমা দিয়ে দিয়েছে। এখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার-এর অপেক্ষায় আছে। এই সপ্তাহে আসতে পারে। হীরকের ভবিষ্যৎ চিন্তা উপেন করে না। অলকই যা করার করবে। হীরকের ইচ্ছা ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার। হীরকের এই মনোবাঞ্ছা পূরণ করার ক্ষমতা আপাতত উপেনের নেই। রতীশের ছেলে রোহিত ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ছে টাকার জোরে। ভর্তি করার সময় দুলক্ষ টাকা ডোনেশন দিতে হয়েছে। কারণ রোহিতের রেজাল্ট খুব ভাল হয়নি। কিন্তু হীরককে তো রেজাল্ট ভাল করতে হবে যদি ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে হয়। ভাল ফল করতে পারবে কিনা কে জানে। কেননা হীরকের জন্য দুজনের বেশি টিউটর রাখা উপেনের পক্ষে অসম্ভব। হীরকের এই জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। ভাবতে ভাবতে প্রায় বাড়ির কাছাকাছি চলে এল। হঠাৎই অলকের বন্ধু অজয়ের সঙ্গে দেখা। অজয় এই গ্রামেরই ছেলে। অলকের স্কুলের বন্ধু। খুবই ভদ্র বিনয়ী। অজয় প্রায়ই কলকাতা যায়। স্টেশনের কাছাকাছি ওর ছোটো একটা স্টেশনারি দোকান আছে। ভালই চলে বলা যায়। ও হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে আর পড়েনি। সংসারে হাল ধরতে হয়েছে। বাবা কিছুদিন হয় মারা গেছে। মা সেলাই টেলাই করে। দুটো বোন পড়াশুনা করছে। এই জন্যই অজয়কে ব্যবসায় নামতে হয়েছে। পড়াশুনায় ভালই ছিল ছেলেটি। কলকাতা গেলে মাঝেমধ্যে অলকের সঙ্গে দেখা করে আসে। অজয়কে দেখে উপেন বলে উঠল, কীরে অজয় এর মধ্যে কি আর কলকাতায় গেছিলি ? অজয় মাথা নিচু করে বলল, না স্যার—এর মধ্যে যাইনি। তবে সামনের সপ্তাহে হয়তো বা যাব। কোনো খবর থাকলে বলবেন— আমি অলকের সঙ্গে অবশ্যই দেখা করে আসব। উপেন হেসে বলল, ঠিক আছে বাবা। যাওয়ার আগে একবার আমার সাথে দেখা করে যাস কেমন ? অজয় ঠিক আছে স্যার বলে এগিয়ে গেল। উপেন চলে এল বাড়িতে।

নীরদদের বাড়িতে মনসাপূজা প্রতিবছরই ঘটা করে হয়। গ্রামের চাষাভুষো, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই নিমন্ত্রিত থাকে। রমাদের প্রশস্ত উঠানেই এই পূজার আয়োজন করা হয়। উপেনের বউ অঞ্জলি প্রস্তুত হচ্ছে রমাদের বাড়ি যাবে। সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালানো হয়ে গেছে। উপেনকে দেখে চা করতে চলে গেল অঞ্জলি। শরীরটা বেশি ভাল লাগছে না উপেনের। ক্লান্ত লাগছে। হয়তো চা খেলে শরীরটা একটু ঝরঝরে হবে। উপেন ঘরে ঢুকে জামা কাপড় পাল্টে বিছানায়

বসল আরাম করে। হাঁক দিয়ে বলল, কিগো—চা হল ? সঙ্গে একটু চানাচুর এনো তো! অঞ্জলি তাই নিয়ে এল উপেনের ঘরে। বলল, চা খাও। আমি একটু রমাদের বাড়িথেকে ঘুরে আসি। হীরক এলে বোলো রান্নাঘরে খাবারটা ঢাকা আছে, খেয়ে নেয় যেন। আমার হয়েছে যত জ্বালা। সব কাজ গুছিয়ে তারপর বেরোনো, বলে বিড় বিড় করতে করতে বেরিয়ে গেল। মাঝে মধ্যে উপেনের এই একাকিত্ব একঘেয়েমি হয়ে দাঁড়ায়, তখন মনে হয় একটা মেয়ে থাকলে কত ভাল হত। অলক সুপ্রতিষ্ঠিত হলে একটা ভাল বংশের মেয়ের সাথে ওর একটা সম্বন্ধ করা যেত। তা হলে ঘরটা পরিপূর্ণ থাকত। কে জানে কবে এই আশা পূর্ণ হবে।
অঞ্জলি যাওয়ার সময় মণিময়ের বাড়িতে ঢুকে শোভাকে ডেকে নিল। বিশাল আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান চলছে মনসাপূজার। প্রচুর লোকজনেরও সমাগম হয়েছে। বসার ব্যবস্থাও উঠানের একধারে করা হয়েছে। একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক এসে একখানা মাদুর পেতে দিয়ে গেল। মাদুরের উপরই সবাই বসার ব্যবস্থা হয়েছে। রমাকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। হয়তো ঘরের মধ্যে কোনো কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আত্মীয়স্বজনও এসেছে কিছু কিছু। এছাড়া এ অঞ্চলের মানুষরা তো আছেই। তবে মহিলার সংখ্যাই বেশি। মনসাপূজা গ্রাম বাংলার প্রায় ঘরে ঘরেই অনুষ্ঠিত হয়। যার যেমন সাধ্য সেইভাবেই পূজা হয়। মহিলাদের কলকাকলিতে রমার বাড়ির উঠোন একদম মুখরিত। পূজামণ্ডপ বলে নিন্দাচর্চার কোনো ঘাটতি নেই। অঞ্জলি ও শোভা গিয়ে মাদুরের এককোণে বসে পড়ল। রমা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলল। অচেনা অজানা দু-একজন মহিলার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিল। এক মহিলা এসে চা দিয়ে গেল। শোভা রমাকে বলল, ভাই আমাকে প্রসাদ দিয়ে দাও। ঘরে নিয়ে যাব। অঞ্জলিও তাই বলল রমাকে। রমা একগাল হেসে চলে গেল প্রসাদ আনতে। অঞ্জলি শোভাকে বলল, জানেনতো দিদি — আজ কলকাতা থেকে আমাদের রতীশ স্ত্রী ছেলে-মেয়ে নিয়ে এসছিল। আপনি কি চেনেন রতীশ ঠাকুরপোকে ? শোভা উত্তর দিল, ঠিক মনে পড়ছে না। তোমার দাদা হয়তো চিনবে। তা এসছিল কি সকাল বেলায় ? অঞ্জলি চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বলল, হ্যাঁগো হঠাৎ করে এসে উপস্থিত। কীই বা করব ? ঘরে যা ছিল তাই রান্না করে খাইয়ে দিয়েছি। শোভা স্মিত হেসে বলল, তোমার তো তাহলে খুউব ধকল গেছে সারাটা দিন। তোমার জা কেমন ? অঞ্জলি মুখ বেঁকিয়ে বলল, দূর দূর একটুও ভালনা, আগে ভালই ছিল। এখন একদম যাচ্ছেতাই। কথাবার্তার ধরন দেখলে গা জ্বলে যায়। শোভা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল অঞ্জলির দিকে। ভাবল অঞ্জলি তো কোনোদিন কারুর নিন্দা করে না। সবাই ওর কাছে ভাল। তারপর বলল, তাই নাকি ? খুউব বড়লোক বুঝি ? তাছাড়া হঠাৎ করে পয়সা হলে এমনিই হয়। চা-টা খেয়ে দুজনেই উঠে পড়ল। পূজা মণ্ডপের সামনে গিয়ে হাতজোড় করে প্রণাম করল। রমা এসে দুজনকে দুটো প্রসাদের প্যাকেট দিল। বলল, দিদি এগুলো তো শুক নো ফল প্রসাদ। আমি খিচুড়ি আপনাদের দু'জনের বাড়িতেই পাঠিয়ে দেব

একটু পরে। শোভা এবং অঞ্জলি দুজনেই তীব্র আপত্তি করে বলল,না, না রমা একদম পাঠাবে না, ওরা যদি এসে খেয়ে যায়, খাবে, নয়ত কোনো দরকার নেই। তুমি একদম এসব ভেজাল করবে না। ঠিক আছে ? রমা, আমরা ভাই এখন চলি। খুউব ভাল লাগল। সময়টা ভাল কাটল। বলতে বলতে এগিয়ে গেল গেটের দিকে। রমার পেছনে নীরদও এল ওদের এগিয়ে দিতে। শোভা-অঞ্জলি বেরিয়ে গেল বাড়ির উদ্দেশে।

রমাদের বাড়ির অনুষ্ঠান মনে হয় রাত বারোটার আগে শেষ হবে না। লোকজনের আনাগোনা এখনও চলছে। গ্রামবাংলার পূজার চিত্র এই রকমই হয়। পূজামণ্ডপ যেন হয়ে ওঠে তীর্থক্ষেত্র। অন্তরের পরশ দিয়েই সবাইকে আহ্বান করা হয়। নীরদ খুব সাধারণ পর্যায়ের লোক হয়েও আজ আতিথেয়তায়, ভদ্রতায় অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছে।

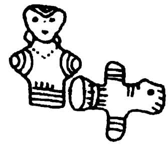
শোভা এসে ঘরে ঢুকে দেখল রেখা পড়তে বসেছে। মণিময় টি.ভি.তে খেলা দেখছে। ছেলে এখনও ফেরেনি। ওকে নিয়ে এখন আর চিন্তা করে না। যা হবার হবে। উপেনের মনোযোগ টি.ভি.র দিকে। তাই শোভাকে লক্ষ করেনি। শোভা মণিময়ের ঘরে ঢুকে বলল, কীগো চা খেয়েছ ? মুড়িটুড়ি কিছু খেয়েছ? মণিময় শোভাকে দেখে অবাক হয়ে বলল, তুমি? তুমি কখন এলে? টি.ভি. বন্ধ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হ্যাঁগো গিন্নি চা-মুড়ি খেয়েছি। রেখাই দিয়েছে। দাঁড়াও আসছি বলে শোভা চলে গেল। প্লেটে করে উপেনের জন্য প্রসাদ নিয়ে এল, প্রসাদ দেখে মণিময় বলল, বাবা এত প্রসাদ কে খাবে? বলে এক টুকরো ফল তুলে নিয়ে প্লেটটা শোভাকে ফিরিয়ে দিল। শোভা নিয়ে চলে গেল রেখাকে দিতে। রেখা মাকে বলল, মা তুমি এখন বিশ্রাম কর। পত্রিকাটত্রিকা পড়—আমি একটু পরে উঠে ভাতটা করে নেব। আর কিছু করতে হবে নাকি? শোভা হেসে সস্নেহে বলল না রে মা তুই পড়, আমি আরও পরে ঢুকব রান্নাঘরে। শুধু ভাতই করব। এখন তোর বাবার সঙ্গে একটু কথা বলি গিয়ে, বলে চলে গেল শোভা মণিময়ের ঘরে। অসীম হয়তো চলে আসবে নয়টার মধ্যে। এসেই খেলা নিয়ে বসবে। মাত্র বাজে রাত আটটা। অসহ্য গরম। পাখার বাতাসও গরম হয়ে যায়। ভাদ্রমাসের গরমে অতিষ্ঠ জীবনযাপন করতে হবে। আজ কদিন যাবৎ ছিটেফোঁটা বৃষ্টিও হচ্ছে না। আজ আকাশটা একটু থমথমে ভাব ধরে আছে। রাতে বৃষ্টি হলেও হতে পারে। মণিময়-শোভা বসে কথা বলতে লাগল। তখন বাইরের থেকে আওয়াজ, স্যার, ও স্যার, আছেন নাকি? মণিময় তড়িঘড়ি করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এখন আবার কে এল? গলাটা যদিও খুবই চেনা তবুও বুঝতে পারছে না কে হতে পারে। মণিময় বারান্দায় এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, কে ওখানে, অন্ধকার তো, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। স্যার আমি জলধর, স্যার বলে এগিয়ে এসে নমস্কার করল। মণিময় অবাক হয়ে বলল, জলধর? কী ব্যাপার তোমার। কিছু দরকার আছে? এসো, বসো মোড়াটার মধ্যে। জলধর গরিব চাষি। স্যারের সামনে বসতে ইতস্তত করছিল। তারপর মণিময়ের কথায় বসল। জলধরের চেহারা খুবই

বিমর্ষ, বুঝতে পারল মণিময় কিছু একটা হয়েছে। নয়ত এমনিতে জলধর কোনো সময়েই আসে না। মণিময়কে খুবই সম্মান করে এই নিম্নবিত্ত মানুষরা। জলধর খুবই নিরীহ গোছের লোক। চাষবাস আর নিজের সংসার নিয়েই সে থাকে। কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে মণিময় বা উপেন এদের সাহায্য প্রার্থনা করে বা পরামর্শ চায়। জলধরের বাবাও এই গ্রামেরই বাসিন্দা ছিলো। ছোটো বেলায় বাবা মারা যাওয়ায় পুরো সংসারের দায়িত্ব তার কাঁধে এসে পড়ে। জলধর ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়াশুনা কোনোমতে করেছে। পড়াশুনার মাথা একেবারেই ছিল না। ছেলেবেলা থেকেই বাবার সঙ্গে মাঠে গিয়ে কাজ করার অভ্যাস করেছিল। তাই আজ ভাল চাষি হতে পেরেছে। নয়নপুরের মাটিতে তার জন্ম। কর্ম হয়তো এখানেই শেষ হবে। মণিময় ইজিচেয়ারে বসল। জিজ্ঞেস করল জলধরকে, বলো জলধর, কী হয়েছে? তোমার মনটা খুব খারাপ মনে হচ্ছে। জলধর মাথা নিচু করে বলল, হ্যাঁ স্যার, পরিশ্রমের ফসল কাউকে কি বিনি পয়সায় দেওয়া যায় ? আপনিই বলুন না স্যার। মণিময় উত্তেজিত হয়ে বলল, নিশ্চয়ই না। কেন দেবে? কে চেয়েছে বলো তো? অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল জলধরের দিকে। জলধর বিষণ্ন মুখে উত্তর দিল, স্যার—আপনি তো জানেনই, প্রধান হরিমোহন মজুমদার কী ধরনের। উনি আজ সকালে আমার বাড়ি এসে উপস্থিত, ধান দিতে হবে দুবস্তা। আমার বউ তো রেগেমেগে অস্থির। চার কথা শুনিয়েও দিয়েছে প্রধানকে। মণিময় হেসে বলল, তোমার বউ কথার প্রতিবাদ করেছে তো হয়েছেটা কী? করবে না—তোমার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল কি কাউকে দান করার জন্য? ঠিকই করেছে, সুযোগ্যা পত্নীর কাজ করেছে তোমার বউ, বুঝলে জলধর? কিছু অন্যায় করেনি। হরিমোহন প্রধান হতে পারে। তার মানে এই নয় যে, যা খুশি করে বেড়াবে। এখন তোমার চিন্তা হচ্ছে হরিমোহনকে নিয়ে, তাই তো? জলধর বলল, হ্যাঁ স্যার—তিনি তো দুষ্ট প্রকৃতির লোক— সেই জন্যই চিন্তাটা। আমি যদিও বা দিতে চাই, আমার বৌ তো কিছুতেই দিতে দেবে না। কী যে করি ভেবে পাচ্ছি না স্যার। তাই আপনার কাছে আসা। কিছু বুদ্ধি পরামর্শ যদি দিয়ে দেন স্যার। অতি বিনয়ের ভঙ্গীতে বসে রইল জলধর। শোভা এসে দেখে গেল কে এসেছে। মণিময় বলল, শোনো জলধর, কিছুই করতে পারবে না হরিমোহন, তুমি চুপচাপ থাক। এ নিয়ে আর কারুর সাথে আলোচনাও কোরো না। তোমার কাজ তুমি করে যাও। উপরে ঈশ্বর আছেন। আর তাছাড়া আমরা তো সবাই তোমার জন্য আছিই। হরিমোহনের জন্য কেউ নেই। ওর এই সব অন্যায় আব্দার কেউই সমর্থন করবে না। কিছু চিন্তা করো না। নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যাও। মণিময়ের কথায় জলধর কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে বাড়ি চলে গেল।

মণিময় ঘরে ঢুকে দেখল শোভা তখনও বসে পত্রিকা পড়ছে। শোভা সবই শুনেছে জলধরের আসার কারণ। সুতরাং মণিময়কে নতুন করে কিছু বলতে হল না। মণিময় শোভাকে চুপচাপ দেখে নিজেই বলল, আচ্ছা গিন্নি কল্যাণীর যে চিঠি এসেছে তুমি তো বললে না? ভুলে গেলে

নাকি? শোভা একটু লজ্জিত হয়ে বলল হ্যাঁগো একদম ভুলে গেছি। চিঠিটাতো তোমার টেবিলের উপরেই রেখেছিলাম। তুমি দেখনি? মণিময় বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেছি। তুমি কিছু বললেনা, তাই বললাম, যাকগে, কল্যাণীকে দেখতে একবার যাব নাকি? শোভা উৎসাহিত হয়ে বলল, নিশ্চয়ই যাবে। ওকে একবার দেখে আসা দরকার, এখন কবে যাবে সেটা ঠিক কর তুমি। শোভা চলে যাচ্ছিল হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলল, আর শোনো কাল ইস্কুলে গিয়ে রেখার সম্বন্ধটার ব্যাপারে খোঁজ নিও। রেখার ফটোটাও নিয়ে যেও। এ সম্বন্ধই তো আছে। আর দু-চারটা সম্বন্ধ থাকলে ভাল হত। তাই না? মণিময় কথার সায় দিয়ে বলল তুমি মনে করে যাওয়ার সময় ফটোটা আমার ব্যাগে ঢুকিয়ে দিও। নয়ত আমি কিছুই আলাপ করতে পারব না। শোভা আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অসীম এসেই রান্না ঘরে উঁকি মেরে দেখল মাকে। সামনে গিয়ে বলল, মা, একটু কিছু খাবার দাওনাগো, ভীষণ খিদে পেয়েছে। শোভা রুক্ষ সুরে বলল হ্যাঁ, বাড়িতে এলেই তোর খিদে পায়। রাত বাজে কটা? মার এইসব উক্তি শুনে অসীম দৌড়ে চলে গেল নিজের ঘরে। জানে যতই রাগ হোক, মা কিছু না কিছু খাবার এনে দেবেই। একটু পরে শোভা প্লেটে করে প্রসাদ নিয়ে ঢুকল অসীমের ঘরে। ঘর থেকে বেরোবার সময় মণিময়কে দেখল খাটে বসে আছে একটা বই নিয়ে। সামনে এগিয়ে গিয়ে মণিময়কে বলল, জানতো আজ নাকি উপেনদার বাড়ি তে ওঁরই খুড়তুতো ভাই রতীশ বলে কে এসছিল, বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে সারাদিন কাটিয়ে গেছে। অঞ্জলি বলছিল তুমি নাকি চেন ওদের। শুনে মণিময় উঠে বসে বলল, তাই নাকি? হ্যাঁ রতীশকে তো এককালে খুবই চিনতাম, উপেনদার মুখেই শুনেছি, এখন ও নাকি বিশাল মোটা টাকা মাইনের চাকরি করছে কলকাতায়। গাড়ি বাড়ি সবই করেছে। এই জন্যই উপেনদা আজ স্কুলে যায় নি। গড় গড় করে সব বলে গেল। শোভা বলল, হ্যাঁগো হ্যাঁ গাড়ি নিয়েই এসছিল। রতীশের বৌ নাকি একটুও ভাল না, বলছিল অঞ্জলি। মণিময় আড়চোখে শোভার দিকে তাকিয়ে রইল। এই কথার কী উত্তর দেবে ভেবে পাচ্ছিল না, তবুও বলল, এই হচ্ছে মেয়েলি স্বভাব। এক বেলায়ই বুঝে নিয়েছে রতীশের বউ ভাল না। আমি যতটুকু জানি রতীশের বউ তো ভালই ছিল। টাকা হওয়াতে খারাপ হয়ে গেল নাকি? শোভা চুপ করে শুনছিল মণিময়ের কথাগুলি। কোনো কথার উত্তর না পেয়ে মণিময় ব্যঙ্গ করে বলল, তার মানে কি জান গিন্নি ? আমার যদি হঠাৎ করে অনেক টাকা পয়সা হয়ে যায় তবে তুমিও খারাপ হয়ে যাবে। তাই না? বলে হা-হা করে হাসতে লাগল। শোভা রাগ করে বলল, তোমার সবটাতেই ইয়ার্কি। এজন্য তোমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। বলে হন হন করে চলে গেল ভাত নামাতে। মণিময় বই নিয়ে পড়তে লাগল। নয়নপুরের গভীর রাত। নিদ্রায় আচ্ছন্ন গ্রামবাসী। আকাশে অল্পবিস্তর মেঘের আভাষ দেখা যাচ্ছে। নিস্তব্ধ রাত্রির অবিরাম বৃষ্টি এই গরমের অতিষ্ঠতায় শান্তির দূত হয়ে এই মাটিকে প্রকৃত শান্তির রূপ দেয়। প্রকৃতপক্ষে তাইই হল। মধ্য রাত্রির জলের ধারা যেন

নয়নপুরবাসীদের আরও গভীর নিদ্রায় মগ্ন করে ফেলেছে।



প্রভাতী সূর্যের চমক ঠিকই এই পল্লীগ্রামকে আলোকময় করে তুলেছে। মাঠ, ঘাটরাস্তা প্রায় জলমগ্ন। সারা রাত্রির এই অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর সূর্যদেবতা যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছেন নয়নপুরের আকাশে। স্কুলের পাশে কালী মন্দিরের মণ্ডপে বসেছে হরিমোহন ও তার দু-চারজন সাগরেদদের জমজমাট আড্ডা। ধূর্ত হরিমোহন প্রধান হওয়ার পর কারুর ভাল কোনোদিনই চিন্তা করেনি। যতই খারাপ হোক, তার কাছে কিছু অংশের মানুষকে তো যেতেই হয়। সকাল আটটা বাজতে না বাজতেই হরিমোহন বেরিয়ে পড়ে — সঙ্গে তারই মতন সঙ্গীসাথি নিয়ে। প্রায়ই এই নাটমন্দিরে বসে ওদের আড্ডা। আজও বসেছে। হরিমোহনের বড় বড় বুলি শুনতে ওই গ্রামবাসীরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এখানকার অনেকেরই তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে হরিমোহন সম্পর্কে। বিশেষ করে এই লোকটা গরিব চাষিদের প্রতি যা নয় তাই করে বেড়াচ্ছে। ওর ভয়ে অনেকেই মুখ খুলতে চায় না। সামনে যতই ওকে স্যার বলে সম্বোধন করুক পেছনে ওকে কেউই সম্মানের চোখে দেখে না। সাধারণত এমন স্বার্থান্বেষী লোক সচরাচর দেখা যায় না। নাটমন্দিরে বসে হরিমোহন সিগারেট টানছে। এক সাগরেদ শিবু বলে উঠল, দাদা মাঠেঘাটে যা জল হয়েছে না, দেখবেন এবার চাষিদের অবস্থা। আপনি ছাড়া ওদের তো কোনো গতিই নেই দাদা! হরিমোহন আসন করে বসে আছে ভগবানের মতো। তবে সত্যিই সে গরিব নিরীহ মানুষের ভগবান হতে পারত যদি তার মনটা উঁচুদরের হত। হরিমোহন গম্ভীর ভাবভঙ্গি করে বলল, হ্যাঁ দেখবি কী অবস্থা করি ওদের। অসভ্য জলধরকেও আমি ছাড়ব না। জানিসতো জলধরের বউ এর কথার কী ধার? আমি গেছিলাম ধান চাইতে আর ওর বউ কিনা আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল। শিবু চোখ বড় করে বলল, কী বলছেন দাদা, আপনি হলেন এ গ্রামের প্রধান, আর আপনাকে অপমান? এ কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না দাদা! এই সব কথা বলে এই শিবু হরিমোহনকে ইন্ধন জোগাচ্ছে। হরিমোহন তো এদিকে আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠল এবং বলল, শোন্ শিবু আমি জলধরের কী হাল করি তুই শুধু দেখ্ না। আমাকে দু-বস্তা ধান দিলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত বল ! এই সব চাষার দলকে কীভাবে শায়েস্তা করতে হয় তা আমার জানা আছে ভাল করেই। এমনি সময় দেখা গেল দৌড়ে আসছে পূর্ব পাড়ার কৃষক বস্তির জনার্দন চাষী। এসে একদম

হরিমোহনের পায়ের তলায় বসে বলল, বাবু — বাঁচান বাবু আমাকে। বৃষ্টিতে আমার ক্ষেত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কথা বলুন, আমি এখন কী করব বলুন। আপনি কোনো উপায় বের করে দিন নয়ত বউ বাচ্চা নিয়ে রাস্তায় নামতে হবে বাবু। হরিমোহন চতুর হাসি হেসে বলল, এই বৃষ্টিতেই তোদের খেতটেত ডুবে গেল? বলিস কী জনার্দন! আমি কী করব? আর তোদের জন্য করে লাভই বা কী আমার? জনার্দন অনুনয় বিনয় করে বলতে লাগল। হরিমোহনের মন গলানো এত যে সহজ নয় এটা জনার্দন ভালই জানে। হরিমোহন বসে পা নাচাতে লাগল। জনার্দনের কথার কোনো পাত্তাই দিল না। জলধরের ব্যাপারটা জনার্দন জানে। তাই কথা না বাড়িয়ে বলেই ফেলল, বাবু আমাকে বাঁচান। আমি আপনাকে দু-বস্তা ধান দিয়ে আসব। জনার্দনের কথায় পাষণ্ড হরিমোহন নিশ্চিন্ত হল। যাক পাওয়া যাবে কিছু ধান। তারপর জনার্দনকে বলে দিল কী উপায়ে খেতের জল কীভাবে বের করবে। সকালবেলাটায় এই লোভী হরিমোহনের ভালই লাভ হল। জনার্দন চলে গেল ব্যবস্থা করতে। হরিমোহন ও সাগরেদদের নিয়ে রওনা হল বাড়ির উদ্দেশে। জগতে এক ধরনের লোক আছে যারা নিজের কথা ছাড়া পরের কথা ভাবে না। হরিমোহন ঠিক সেই ধরনের লোক। অন্যের ক্ষতির চিন্তা ছাড়া কোনোকিছুই সে আর ভাবে না। হরিমোহনের ছেলে রঞ্জনও বাপের মতই লোভী, স্বার্থপর তৈরি হয়েছে। ওকে নিয়ে গ্রামে প্রায়ই নানারকমের বিপাকের সৃষ্টি হয়। এই তো মাসখানেক আগে একটি মেয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে রঞ্জনকে জড়িয়ে কত কিছুই ছড়িয়েছে এখানে। হরিমোহনের এতে কিছুই আসে যায় না। উল্টো আরও মেয়েটির বাড়ি গিয়ে হম্বিতম্বি করে এসেছে। একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে বাবার মতো হলেও রঞ্জন কিন্তু বাবাকে একটুও পছন্দ করে না। হরিমোহনের স্ত্রী লাবণ্য খুবই ভদ্র অমায়িক চরিত্রের মহিলা। স্বামীর এইসব আচরণের জন্য সে স্বামীর উপর খুব ক্ষুব্ধ। লাবণ্যকে গ্রামের প্রায় সব মহিলারাই ভালবাসে। কেউ কেউ আবার সম্মানও করে। হরিমোহন সবসময়েই কর্কশ প্রকৃতির লোক। নিজের স্ত্রীর সঙ্গেই সে কেনা বাঁদির মতো ব্যবহার করে। লাবণ্য এখন আর চুপ করে থাকে না, মাঝে মধ্যে প্রতিবাদ করে, রক্ষে এই যে মেয়ে নেই — তাহলে এরকম বাপের মেয়েকে কোনদিনই বিয়ে দিতে পারত না। এটা অবশ্য লাবণ্যের ধারণা। হরিমোহন হয়তো সেক্ষেত্রে পয়সা দিয়ে জামাই কিনে নিত। ছেলেটার জন্য লাবণ্যের দিবারাত্রি চিন্তা। স্বামীকে নিয়ে চিন্তা করা কবেই ছেড়ে দিয়েছে। ভেবেছিল যদি রঞ্জন মানুষের মতো মানুষ হত তাহলে লাবণ্য সার্থক মায়ের রূপ পেত। পড়াশুনা সকলের হয় না, কিন্তু পড়াশুনা ছাড়াও অনেকে সত্যিকারের মানুষ তৈরি হয়। হরিমোহনের মতো না হয়ে লাবণ্যের মতো ও তো হতে পারত। লাবণ্যের মতে এটা গরীবের অভিশাপ। হরিমোহনের দুর্নীতি — কুকীর্তি স্বার্থপরতা গ্রামের গরিব মানুষদের শোষণ—সব অভিশাপ হয়ে নেমে এসেছে এ সংসারে। টাকা পয়সা বাড়িঘর সবই আছে হরিমোহনের, কিন্তু যেটা নেই সেটা হচ্ছে শান্তি। যা নাকি লক্ষ লক্ষ টাকা ফেললেও

খুঁজে পাওয়া যায় না। কেউ বেড়াতেও আসে না হরিমোহনের বাড়ি। গ্রামের পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে প্রায় সকলেই এই লোকটাকে হেয় চোখে দেখে। স্বামীর গরবে গরবিনি হয়ে বাংলার বউরা বেঁচে থাকে এই সংসারে, কিন্তু লাবণ্যের এরকম কপাল কোথায় ? নয়নপুরের মাটিতে লাবণ্যের লজ্জা ঢাকবার জায়গা নেই। একদিকে স্বামী অন্যদিকে ছেলে।

বেলা বাজে প্রায় সাড়ে নয়টা। জনার্দনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে হরিমোহন এসে বাড়িতে ঢুকল। বাইরে হাত-পা ধুয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকে এদিক-ওদিক তাকিয়ে তল্লাশি করতে লাগল রঞ্জনটা কোথায় গেছে—নাকি নবাব পুত্তুর এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি! হঠাৎ ঝাঁঝিয়ে উঠল, রঞ্জন, এই রঞ্জন কোথায় রে তুই হতভাগা? নীরব সব। কোনো উত্তরই এল না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও লাবণ্যকে আসতে হল এ ঘরে। বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, কী হল? চীৎকার করছ কেন ? তোমার ছেলে এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। হরিমোহন হেসে বলল, তাই নাকি? তা বেশ বেশ। তাছাড়া এত তাড়াতাড়ি উঠেই বা কী করবে। আমার ছেলে তো আর যা খুশি কাজ করতে পারে না। দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল হরিমোহন, তুমি যাও, নিজের কাজ কর গে। এক কাপ চা পাঠিয়ে দাও। রাগে লাবণ্যের মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠল। মেজাজের সুরে বলল, এখন চা-টা পাওয়া যাবে না। রুটি করছি তারপরে একেবারে চা পাবে। সামনে এগিয়ে গিয়ে বলল হরিমোহনকে, আর শোনো ছেলেটাকে এত প্রশ্রয় দিও না। তোমার মতোই তো তৈরি হচ্ছে। বাপকা বেটা, এখনও সময় আছে সঠিক রাস্তা দেখাবার। নয়ত পরে কপাল চাপড়ালেও কিছুই করতে পারবে না। বুঝলে ? কোনোদিনই তো আমাকে গ্রাহ্য করলে না। বলে চলে গেল। হরিমোহন ফ্যান চালিয়ে বসে পত্রিকাটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। হঠাৎ কী মনে হল চিৎকার করে ডাকতে লাগল, গোপাল—এই গোপাল—এদিকে দেখে যা তো। গোপাল হরিমোহনের বাড়িতে কাজ করে। ফাই-ফরমাশ খাটে। গোপাল এই গ্রামেরই এক গরিব চাষির ছেলে। দশ বছর বয়সে মা-বাবাকে হারায়। গ্রামে একবার ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। তখন ওর মা-বাবা দুজনেই প্রাণ হারায়। এরপর গোপাল পাশের গাঁয়ে মামার বাড়িতে চলে গিয়েছিল। ক্লাস ফোর পর্যন্ত গোপাল পড়েছে। তারপর ওকে কেই বা পড়াবে? মামার বাড়িতেও কষ্টেই ছিল। চারমাস আগে গোপাল এসেছে হরিমোহনের বাড়িতে। হরিমোহন পাশের গাঁ রসুলপুরে গেছিল নিজের কাজেই ওখানে গিয়ে গোপালের বৃত্তান্ত সব শুনে ওকে এখানে নিয়ে আসে। বাড়িতে এমনিতেও কাজের লোকের দরকার ছিল। তবে হরিমোহন গোপালকে ভালইবাসে। গোপালও খুব বাধ্যের ছেলে। সারাদিনই সকলের ফাইফরমাশ খাটে। লাবণ্যও খুব স্নেহ করে। গোপাল দৌড়ে এসে ঢুকল। বলল, কেন ডেকেছেন গো বাবু? হরিমোহন উচ্চস্বরে বলে উঠল, কোথায় ছিলিরে হতচ্ছাড়া? আমি ডেকে ডেকে .... যা আমার চা জলখাবারটা নিয়ে আয়। তাড়াতাড়ি দিতে বলবি—আমি বেরোব। ঘাড় নেড়ে গোপাল চলে গেল রান্না ঘরে। নিয়ে

এল চা-রুটি-তরকারি। টেবিলের উপর রেখে চলে গেল গোপাল নিজের কাজে, সেই মুহূর্তেই লাবণ্য ঢুকে বলল, কী এমন তোমার জরুরি কাজ ? এখুনি তো এলে আবার বেরোবে ? তোমার অপদার্থ ছেলেকে ডাক দিয়ে যেও। তারপর যেখানে খুশি সেখানে যাও। ওর খাওয়ার নিয়ে আমি বসে থাকতে পারব না। বলে রাগ করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। হরিমোহন গ্রাহ্যও করল না স্ত্রীর কথা। বেরিয়ে গেল। লাবণ্য হাঁ করে রইল, হরিমোহন ওর কথাকে পাত্তা দিল না বলে। নিশ্চয়ই কোনো অপকর্ম করতে যাচ্ছে হরিমোহন। লাবণ্য জানে ওর স্বামী আগের থেকেই এই প্রকৃতির ছিল, কিন্তু প্রধান হওয়ার পর থেকে এই অসভ্যতা বেড়েই চলেছে। স্বামীর সুখ তো লাবণ্য কোনোকালেই পায় নি। এখনও পায়না। ভেবেছিল ছেলে বড় হয়ে অন্তত মায়ের দুঃখটা বুঝবে। কিন্তু কিছুই হল না। ছেলেটাও হয়েছে উচ্ছৃঙ্খল, অবাধ্য। হরিমোহনের এ নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। লাবণ্য এ সংসারে এসে অনেক কষ্টই করেছে। কেননা হরিমোহনের আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। সে তখন একটা তেলকলে চাকুরি করত। সামান্য বেতনের চাকরিতে সংসার খুব কষ্ট করেই চলত। তার মধ্যে মা-বাবা ভাই-বোন নিয়ে সংসার। হরিমোহন যতই খারাপ হোক মা-বাবার প্রতি কর্তব্য পালনে কোনোদিনই ত্রুটি করেনি। ছোটো ভাই জগমোহন বেশি পড়াশুনা করেনি। তাই বুদ্ধির জোরে ব্যবসায় টিকে রয়েছে। আন্দুল-এ তার ছোটোখাটো একটা কাপড়ের ব্যবসা রয়েছে। ওখানেই সে থাকে স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে। ছোটো বোন পারুলের বিয়ে হয়ে গেছে অনেকদিন। সে পাশের গাঁয়েই থাকে স্বামী সন্তান নিয়ে। দাদার এইসব হঠকারিতার কথা সবই পারুলের কানে যায়। কিন্তু কিছুই বলতে পারে না। দাদার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধই তাকে চুপ করিয়ে রেখেছে। কারণ দাদা হরিমোহন বাবার মতোই পারুলকে স্নেহ মমতা করে এবং সবসময় খোঁজখবরও রাখে। এর পিছনে অবশ্য লাবণ্যরও যথেষ্ট সহযোগিতা রয়েছে। দেওর ননদ নিয়ে লাবণ্য বেশ কয়েক বছর একসাথে কাটিয়েছে। মাতৃস্নেহেই ওদের আদর যত্ন করেছে। পারুল প্রায়ই আসে বেড়াতে। ব্যবসার কারণে জগমোহন বেশি আসতে পারে না। তবে প্রায়ই ফোনটোন করে রঞ্জনের মোবাইলে। বেলা বাজে প্রায় সাড়ে দশটা। লাবণ্য গিয়ে চুপি দিল ছেলের ঘরে। দেখল বিছানাটা ওলোট পালট হয়ে আছে। রঞ্জন বাথরুমে ঢুকেছে। দেখে বিরক্ত হয়ে চলে গেল নিজের ঘরে। প্রচণ্ড গরম, তাই ফ্যানটা চালিয়ে বিছানায় বসল। গোপালকে চিৎকার করে ডাকল। গোপাল এসে জিজ্ঞেস করল, কী—মা ডাকছেন ? লাবণ্য পান চিবুতে চিবুতে বলল, শোন্ রান্না ঘরে দাদার খাওয়ার ঢাকা দেওয়া আছে টেবিলের উপর। বাথরুম থেকে বেরোলে দিয়ে দিস। আর একটু চা করে খাওয়া তো বাবা। ঠিক আছে বলে গোপাল মাথা নিচু করে চলে গেল লাবণ্যর কথা মতো কাজ করতে। ফিটফাট পোশাকে রঞ্জন এসে ঢুকল মার ঘরে। বলল, মা—আমি খেয়ে নিয়েছি। একটু বেরোচ্ছি। বলে মার মুখের দিকে তাকাল, বলল, কী হল তোমার, রাগ রাগ মনে হচ্ছে। কাজকর্ম নেই নাকি ? বসে আছ যে ? এবার

লাবণ্য ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, না, আমার কাজ থাকবে কেন? তোর অনেক কাজ, তাই নারে হতভাগা? কী রাজকার্য করতে বেরোচ্ছিস শুনি ? রঞ্জন বলে উঠল, আরে, আরে এত মেজাজ দেখাচ্ছ কেন ? কথা বলতে ভাল না লাগলে আমার সাথে কথা বোলো না। আমার ভাবে আমাকে থাকতে দাও। বলে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, শোন মা — আমাকে বিকেলে কিছু টাকা দেবে। আমার হাত একদম খালি। বুঝলে? লাবণ্য ছেলের প্রতি ঘেন্নায় কোন উত্তর দিল না। বিষণ্ণ মনে বসে রইল। রঞ্জন চলে গেল। ছেলের এই অধঃপতনের মূলে ওর বাবাই। এটাই ভাবছে বসে লাবণ্য। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের ছেলে কিছুই করেনা, এমনকি কিছু করার প্রচেষ্টাও নেই। ওরই সমবয়সী ছেলেরা অনেকে গ্রামের বাইরে গিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। আবার কেউ চাকরিবাকরিও করছে। হরিমোহনের লোভের বশে ছেলের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। এই সব ভেবে ভেবেই অস্থির লাবণ্য। উঠে রান্নঘরে গিয়ে ঢুকল। কিছুটা রান্না বাকি ছিল। সেটা শেষ করে নিল। গোপালকে বলল রান্নাঘর পরিষ্কার করে অন্যান্য কাজ সেরে নিতে। স্নান পুজো সেরে লাবণ্য বসল টি.ভি.র সামনে। ছেলের আচরণে মনটা খুবই খারাপ। প্রায় দুটো বাজে। বাপ-ছেলের আসার কোনো রকম সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছে না লাবণ্য। যখন যার ইচ্ছে ঘরে আসবে। এরকম একাই থাকতে হয় লাবণ্যকে। গোপালটা আছে বলে রক্ষা। তাও সন্ধ্যা হতে না হতেই তার চোখে নিদ্রাদেবী ভর করে। বেশির ভাগই লাবণ্যকে একাই খেতে হয়। ওদের জন্য কোনো সময়েই লাবণ্য বসে থাকে না। আজকেও ওদের দুজনের ভাত টেবিলে রেখে লাবণ্য গোপালকে নিয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে ফেলল। এলে গোপালই ওদের ভাতটা দেয়। এরকম জীবন অনেক আগেই লাবণ্য মেনে নিয়েছে। নয়ত এ সংসারে থেকে ওকে আরও অনেক দুর্ভোগ পোয়াতে হত। বিকেলে প্রায় রোজই লাবণ্য পাড়ায় এবাড়ি-ওবাড়ি ঘুরতে যায়। মন খুলে একটু গল্প-গুজব করে আসে। এইভাবে গতানুগতিক জীবন থেকে বেরিয়ে মুক্ত বায়ু সেবন করে লাবণ্য। নারীর যতটা সুষ্ঠু চেতনা বোধ থাকার দরকার তার পুরোটাই লাবণ্যের মধ্যে আছে। পড়াশুনা কম জানলেও যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষমতা রাখে সে। প্রতিবাদী মন নিয়েই সে চলে। যেখানেই অন্যায় দেখে সেখানেই লাবণ্য প্রতিবাদ করার ক্ষমতা রাখে। শুধু নিজের ঘরেই নিজেকে যথেষ্ট মানিয়ে চলতে হয়। সেটা ভালবাসার থেকেই হোক — আর ঘৃণার থেকেই হোক। নয়নপুরের মানুষরাও লাবণ্যকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চেনে। তাই তারা হরিমোহনের স্ত্রী বলে নয়, একজন আদর্শ নারী হিসেবে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। এই ভালবাসাকে পুঁজি করেই তো লাবণ্য নয়নপুরে টিকে আছে। বিকেল হয়ে আসছে। আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। একটু একটু ঠান্ডা বাতাস বইছে। পাখিরা সব ঘরে ফিরছে। মাঝে মধ্যে বিদ্যুতের চমক, তার সাথে মেঘের গর্জন বৃষ্টির আগমনী গাইছে। তবে একটা কথা আছে, যত গর্জে তত বর্ষে না। দেখা যাক কী হয় শেষ পর্যন্ত। বিকেলের আকাশের এই

অস্বাভাবিক পরিস্থিতি অনেকের মনকেই বিষণ্ণ করে তোলে। তবে ভাদ্রের কাঠফাটা রোদের তাপপ্রবাহে এ রকম বৃষ্টি যেন বরফগলা জলের মতো অনুভূত হয়। কাল রাতের বৃষ্টিতেই নয়নপুরের রাস্তাঘাট, মাঠ পুকুর সব জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল। সারাদিনটা তো ভালই ছিল। এখন যদি আবার এই গ্রাম বর্ষণসিক্ত হয় তবে কী ভয়াবহ চেহারা ধরবে কে জানে? লাবণ্য আজ আর বেরোলো না। জানালার দিকে তাকিয়ে প্রকৃতির সুন্দর রূপ উপভোগ করতে লাগল। রাখাল ভাইরা সব ঘরে ফিরছে গরু ঠেঙ্গাতে ঠেঙ্গাতে। হয়তো মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করছে যে বৃষ্টিটা না হয়। নয়ত ওদেরকে এই ক্ষতি মেনে নিতে হবেই। এই সময় অবিরাম বৃষ্টি চাষি ভাইদের ক্ষতির আশঙ্কাই বেশি থাকে। ওরা এতই গরিব নিরীহ শ্রেণীর মানুষ যে কারুর কাছে নিজেদের ক্ষতির কথা প্রাণ খুলে বলতেও পারে না। আজকাল কি আর কেউ স্বার্থ ছাড়া কারুর সাহায্য করতে এগোয়। আজকালকার সমাজে দুর্বলদের প্রতি শোষণ দমন পীড়ন তো লেগেই আছে। লাবণ্যের স্বামী হরিমোহন এ অঞ্চলের গাঁওপ্রধান ঠিকই, কিন্তু সে কোনোদিনই লাবণ্যের সুবুদ্ধিকে গ্রাহ্য করেনি বা এখনও করে না। অর্থলোভী হরিমোহন এই সব নিরীহ মানুষদের নির্দ্বিধায় শোষণ করে যাচ্ছে। লাবণ্য স্ত্রী হিসেবে স্বামীকে এই অনাচার থেকে বিরত থাকার জন্য অনেক বুঝিয়েছে, অনেক সুপরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু তাতে কোনোই ফল হয়নি। হয়নি কোনো রকম সুরাহা। লোভের মাত্রা আরও বেড়েই চলেছে। লাবণ্য নিরুপায় হয়ে এখন আর কিছুই বলে না। দুবেলা পুজো দিতে গিয়ে ভগবানকে ও একটা কথাই বলে হরিমোহনকে যেন সুমতি দেয়। লাবণ্যের এই সংসারের প্রতি কোনো উৎসাহ নেই আজ আর। এক সময় এই সংসারকে খুবই ভালবাসত। ধীরে ধীরে মনটা তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছে। আকাশে কালো মেঘের মতো তার সুন্দর মনটা অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। কী লাভ এত ভেবে। ইলশেগুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। আবহাওয়া অনেক ঠান্ডা হয়েছে। রাস্তায় লোকজন দেখা যাচ্ছে তবে তুলনামূলক কম। যার বিশেষ দরকার বেরোবার তাকে তো বেরোতেই হবে। উপেনও বেরিয়েছে বাজার করতে। ছাতা আছে সঙ্গে। বাজার করতে গিয়ে দেখা হল জলধরের সঙ্গে। জলধর এগিয়ে এসে বলল, নমস্কার স্যার, আপনার বাড়ি কাল সকালে গিয়েছিলাম। গেটে দেখলাম সাদা একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কে এসেছে ভেবে ফিরে চলে এসছি। উপেন মৃদু হেসে বলল, হ্যাঁরে আমার ভাই এসছিল। তা তুই কেন গিয়েছিলি? জলধর নিচুস্বরে বলল, স্যার আমাদের প্রধানের কথা বলতে আপনার কাছে গিয়েছিলাম। তারপরে জলধর সংক্ষেপে হরিমোহনের কথা বলল। উপেনের খুউব রাগ হল এই সব কথা শুনে। হরিমোহনের হুজ্জুতি সহ্য করা যায় না। যদিও নতুন কিছুই নয়। উপেন জলধরকে বলল, তুই বরং সময় করে একবার আমার বাড়ি তে আয়, তখন কথা হবে, বৃষ্টি বাড়লে আবার বাজার করতে পারব না। জলধর খুশি হল উপেন স্যার-এর কথায়। গদগদ হয়ে হাত জোড় করে বলল জলধর, ঠিক আছে স্যার, ছুটির দিনে আসব আর কী! আপনি যদি

কোনো সুরাহার পথ বাতলে দেন — তাহলে খুব ভালো হয়। আসি স্যার। উপেন বাজারের ভিতরে ঢুকল। তিন চারদিনের মতো বাজার করে ফিরে এল বাড়ি তে। রাত সোয়া সাতটা বাজে। চারদিকে অন্ধকার ঘুটঘুট করছে। আশপাশের জঙ্গল থেকে ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়েই চলেছে। টিনের চালে বৃষ্টি পড়ার ঝমঝম শব্দ হচ্ছে। হীরক ঘরে বসে পড়াশুনা করছে। অঞ্জলি টি.ভি. দেখছিল। উপেনের সাড়া পেয়ে অঞ্জলি উঠে গিয়ে বাজারের ব্যাগটা রেখে এল রান্না ঘরে। অঞ্জলির শরীরটা আজ একটু খারাপ করেছে। ঠান্ডা লেগেছে মনে হয়। সর্দিকাশিতে ভরপুর হয়ে আছে। রুমাল দিয়ে নাক মুছতে মুছতে উপেনকে বলল, কীগো চা খাবে না? আমি খাব একটু। তাই তোমাকে জিজ্ঞেস করছি। উপেন অঞ্জলির দিকে তাকিয়ে লক্ষ করল অঞ্জলির শরীরটা ভাল না। বলল, তোমার শরীরটা মনে হয় ভাল না। এত ঠান্ডা লাগল কী করে? দাও একটু চা দাও। চা খেয়ে আবার যাই তোমার জন্য ওষুধ আনতে। চেয়ারে বসল উপেন। অঞ্জলি ধীরে ধীরে বলল, না গো না ওষুধ টষুধ লাগবে না আমার। সামান্য একটু সর্দিকাশি হয়েছে। কালই ঠিক হয়ে যাবে। আমি চা করে আনছি। বলে অঞ্জলি চলে গেল চা করতে। উপেন ভাবতে লাগল অঞ্জলির এই স্বভাব বহু পুরানো। ডাক্তারের ওষুধ খেতে চায় না। তাছাড়া ও সহজে কাবুও হয় না। তবুও স্বামী হিসেবে তো উপেনের কর্তব্য ওষুধ এনে দেওয়া। অঞ্জলি চিড়েভাজা-চা নিয়ে এল। হীরককেও দিয়ে এসেছে খাবার। হঠাৎ বাইরে গেট খোলার শব্দ। এত রাতে আবার কে আসতে পারে! উপেন টর্চ নিয়ে বেরোল। দরজার বাইরে আসতেই শুনতে পেল। উপেনদা আছেন ? আমি মণিময়। মণিময় দাঁড়িয়ে আছে উঠোনে ছাতা মাথায়। উপেন অবাক হয়ে বলল, আরে তুমি? এসো এসো ভাই। কতদিন পরে এলে বলো তো? মণিময় হাসিমুখে ঘরে ঢুকে দেখল অঞ্জলি বসে চা খাচ্ছে। মণিময়কে দেখে অঞ্জলি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বসুন দাদা। অনেকদিন বাদে আপনাকে দেখলাম। বসুন আপনি— আমি চা করে আনছি। মণিময় উপেন দুজনেই বসল। উপেন বলল, কী ভাই মণিময় তোমাকে একটু উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে ! কী ব্যাপার? মণিময় বিনয়ের সুরে বলল না, না দাদা—তেমন কিছু নয়। হঠাৎ মনে হল — তাই চলে এলাম। গরমটাও কম। হীরক বুঝি পড়াশুনা করছে? উপেন বলল, এই আর কি ! স্কুল, টিচার এসব করে কতক্ষণ আর পড়তে পারে বল? মণিময় কথায় সম্মতি জানিয়ে বলল, তা তো ঠিকই, এ নিয়ে ভাববেন না। ও ঠিকই ভাল রেজাল্ট করবে। অঞ্জলি চা নিয়ে এসে ঢুকে বলল, দাদা, শোভাদিকে নিয়ে এলেই পারতেন। জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যেত। নিন চা খান। বলে অঞ্জলি সোফায় বসল। মণিময় বলল, বৌঠান শোভার যে এখন রান্নার সময়, তাছাড়া বাইরে বৃষ্টিও হচ্ছে। তাই আর কী....। তিনজনে মিলে কিছুক্ষণ নানারকম কথাবার্তা হল। অঞ্জলি একসময় উঠে চলে গেল রান্না করতে। মণিময় উপেনকে বলল, উপেনদা, বৌঠানকে অমূল্য ডাক্তারের ওষুধ খাওয়ালে ভাল হত। আজকাল তো ঘরে ঘরে জ্বর, সর্দিকাশি লেগেই থাকছে—তাই

আগে থেকে সাবধান থাকাই ভাল। নইলে তো আপনার সংসার অচল হয়ে যাবে। বলে হাসতে লাগল। উপেনও মুচকি হেসে বলল, না ভাই। এত অকর্মণ্য আমি নই। এক দুদিন ঠিকই আমরা চালিয়ে দিতে পারব। তবে তুমি ঠিকই বলেছ, ওষুধটা খাওয়া দরকার। তারপর বলো তোমার অন্যান্য খবর কী। রেখার বিয়ের সম্বন্ধটার কী হল? উপেন এ ব্যাপারে কী বলবে বুঝে উঠতে পারছিল না। অনেক ভেবেচিন্তে উত্তর দিল মণিময়, ফটোটাই শুধু পাঠানো হয়েছে। ফটো দেখে পছন্দ হলে তবেই যোগাযোগ করবে। আর তো কোনো পাত্রের সন্ধানও পাচ্ছি না, আমার গিন্নি তো একদম অস্থির হয়ে পড়েছে মেয়েকে পাত্রস্থ করার জন্য। পাত্র না পাওয়া গেলে আমি কী করব বলুন? উপেন সব শুনে বলল, তা তো ঠিকই আছে ভায়া, মা তো অস্থির হবেই। মেয়ে বলে কথা। আর কটা দিন দেখে নয়ত পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে দাও। কথাটা মণিময়ের বেশি পছন্দ হল না। মেয়ে তো পশরা নয় যে তার জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হবে। এই জন্য উপেনকে বলল, না উপেনদা বিজ্ঞাপন দেওয়ার মতো আমার নেই। আমার মেয়ে তো কানা খোড়া নয় যে তার বিয়ের জন্য আমার মানুষের কাছে ভিক্ষা চাইতে হবে। উপেন অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে মণিময়কে বলল, আমাকে অবাক করলে ভাই। এ যুগের মতোই তো আমাদের চলতে হবে। আজকাল ছেলে মেয়েরা ইন্টারনেটে নিজেদের পছন্দ যাচাই করে নিচ্ছে এবং সুন্দর মতো বিয়েও হয়ে যাচ্ছে। আর তুমি বল কিনা বিজ্ঞাপন দেওয়াটাও আপত্তিকর? যাকগে এত চিন্তা করে লাভ নেই। নিয়তির বিধান মানলে সময়ের অপেক্ষা করতেই হবে। তবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। মণিময় এবার মনে মনে খুশি হল। বলল, এখন যে সম্বন্ধটা চলছে সেখানে আমাকে যদি যেতে হয় তবে আমার সঙ্গে আপনাকেও যেতে হবে দাদা। উপেন মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। মণিময় কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অলকের খবরাখবর নিল। অঞ্জলি হাত মুছতে মুছতে এসে বসল। মণিময়ের দিকে তাকিয়ে বলল, দাদা সবই শুনেছি আমি। এবার বিয়েটা লাগিয়েই দিন। আমরাও একটু আনন্দফুর্তি করি। তারপরে আবার উদাস হয়ে বলল, সত্যি সেদিনের ছোট্ট মেয়ে রেখারও বিয়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে। ভাবতেও অবাক লাগে কী করে এতগুলো বছর পার করে এলাম। বলুন দাদা? মণিময় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হ্যাঁ, সত্যি বৌঠান—নদীর স্রোতের মতো সময়ও দ্রুত গতিতে বয়ে যায়। এবার আমি চলি উপেনদা। রাত অনেক হল। উপেনও উঠে দাঁড়িয়ে মণিময়কে বলল, আরে ভাই — আর কিছুক্ষণ বসতে পারতে তো? নাকি বৌমা রাগ করবে? মণিময়ের উত্তরের অপেক্ষা না করেই উপেন, চলো চলো ভাই বলে হাতে টর্চ নিয়ে মণিময়কে এগিয়ে দিতে চলল। কিছুটা এগিয়ে দিয়ে উপেন বাড়ি চলে এল। ঘরে ঢুকে মনে পড়ল মণিময়কে হরিমোহনের কথা বলা হয় নি। মণিময় তো জানেই, এটা তো আর উপেন জানে না। কেননা জলধর উপেনকে বলেনি যে সে রাত্রিবেলা মণিময়ের বাড়ি গেছিল। মণিময়েরও হয়তো মনে নেই উপেনকে বলতে। অঞ্জলির রান্না হয়ে গেছে। তাই বিছানায়

একটু গড়িয়ে নিচ্ছে, খাওয়াদাওয়া করতে আরও ঘণ্টাখানেক বাকি। হীরক এসে মার পাশে বসে বলল, মা তোমার শরীরটা খারাপ তাই না? তোমার উঠে কাজ নেই। আমি আর বাবা ভাতটাত বেড়ে খেয়ে নেব। অঞ্জলি ছেলের কথা শুনে মিটি মিটি হাসছিল। হীরককে বলল, সেকী রে। আমি ভাত খাব না? না উঠলে ভাত খাব কী করে? বলে হাসতে লাগল অঞ্জলি। হীরক মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, কেন গো মা — তোমাকে এখানে টেবিলে ভাত এনে দেব। অসুবিধার কী আছে? অঞ্জলি স্নেহের সুরে বলল, নারে বাবা এত অসুস্থ আমি নই। তোকে কিছু করতে হবে না। তুই শুধু পড়াশুনা করে আমাদের মনের আশা পূর্ণ কর্। যা এখন পড়তে যা। আমি একটু বাদে উঠে ভাতটাত দেব। বুঝলি ? যা বাবা যা। হীরক গিয়ে আবার পড়ার টেবিলে বসল। উপেন পত্রিকা পড়ছিল। মা-ছেলের কথোপকথন শুনছিল। অঞ্জলি উপেনের দিকে তাকিয়ে বলল, মণিময়দা যে বলে গেল রেখার বিয়ের কথা, একটাই সম্বন্ধ আছে। তুমিও তো পাত্রের সন্ধান করতে পার। তিনি তো আমাদের কাছে নিকট আত্মীয়ের চাইতেও বেশি, তাই না? তোমার কাছ থেকে এটুকু আশা ওরা করতে পারে। যাদের মেয়ে আছে তারাই বোঝে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মানসিক অবস্থা কীরকম থাকে। আজকে দাদার কথা শুনে খুউব কষ্ট লাগছিল আমার। তাই তোমাকে বলছি তুমিও একটু চেষ্টা করো। রেখাতো আমাদেরও মেয়ে। উপেন অঞ্জলির সুপরামর্শে খুবই খুশি হল। অঞ্জলির কথায় সায় দিয়ে বলল, ঠিকই বলেছ। মণিময়ের জন্য কিছু করা দরকার। দেখি কী করা যায়। বলে বসে ভাবতে লাগল। অঞ্জলি হঠাৎ বলে উঠল, আচ্ছা সেদিন যে এসছিলেন এক ভদ্রলোক নির্মল না কী যেন একটা নাম। বলো না। নামটা আমার কিছুতেই মনে পড়ছে না। তোমাদের স্কুলেরই ক্যাশিয়ার ছিলেন। এখন অবসর নিয়েছেন। উপেন তাড়াতাড়ি করে বলে উঠল, হ্যাঁ হ্যাঁ সে তো সুনির্মল ভৌমিক। আমাদের স্কুলের ক্যাশিয়ার ছিলেন। বছর দেড়েক হল রিটায়ার্ড করেছেন। কেন ওঁকে দিয়ে কী হবে? অঞ্জলি বিছানায় উঠে বসল। উৎসুক ভঙ্গীতে উপেনকে লক্ষ করে বলল, তুমি তো সবই ভুলে যাও। তিনি বলছিলেন না তাঁর বড় ছেলে ওকালতি পাশ করে উকিল হয়েছে। কোথায় যেন ওকালতি করছে। জায়গাটার নামও বলেছিলেন, আমার নামটা মনে নেই। উপেন হেসে বলল, কোথায় আবার, বলছিল কলকাতা হাইকোর্টের একজন সিনিয়র এডভোকেট-এর জুনিয়র হিসেবে সবে কাজ শুরু করেছে। এই ছেলেকে তো আমি ভাল করে চিনিও না। ঠিক আছে খোঁজখবর নেব। সুনির্মলবাবু তাঁর বাড়ির ঠিকানা তো দিয়েই গেছেন। অঞ্জলি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ঠিক আছে এবার চলো খাওয়াদাওয়াটা সেরে নিই। শরীরটা বিশেষ ভাল লাগছে না। বলে আস্তে আস্তে চলে গেল। রাতের নিস্তব্ধতা অন্ধকারে জোনাকির আলো ঝিকমিক করছে। বৃষ্টি আর নেই। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। উপেন সবসময়েই খাওয়ার পরে একটু সময় টি.ভি. দেখে। টি.ভি. দেখতে গিয়ে ভাবছে কাল স্কুলে মণিময়কে রেখার সম্বন্ধের ব্যাপারে একটু বলবে।

সুনির্মল বাবু এমনিতে খুবই ভদ্রগোছের লোক। মুখে হাসি লেগেই থাকে। তবে খুবই চালাক প্রকৃতির লোক। ছেলেও যদি এমন হয় তবে আজকাল আধুনিক যুগের জন্য খুব প্রযোজ্য। সুনির্মলবাবু এখানে নয়নপুরে বাড়ি ভাড়া করে একাই থাকত। স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে থাকত সোনাপুরে। এখানে সুনির্মলের শ্বশুরবাড়ি। সুনির্মলের স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়িতেই থাকত। এখন ওরা একসাথেই থাকে। জমিটা আগেই কিনে রেখেছিল। রিটায়ারমেন্টের পর ছোটোখাটো একটা বাড়ি করে ওখানেই এখন থাকছে। মেয়ে কলেজে পড়ছে। পরিবারটা ছোটোই। এসবই উপেন সুনির্মলের কাছ থেকেই শুনেছে। হয়তোবা পাত্র হিসেবে সুনির্মলের ছেলে খারাপ হবে না। ছেলের নামটা উপেনের জানা হয়নি। আলাপ দেওয়ার আগে মণিময়কে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে।

গতরাতের বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট স্যাঁতসেঁতে হয়েছে বটে। কিন্তু প্রভাতি সূর্য জ্বলজ্বল করছে স্বমহিমায়। ভাদ্র মাসের রোদের প্রখরতা প্রকৃতিকে অতিষ্ঠ করে তোলে। তাইতো স্বচ্ছ বারিধারা মানুষের দেহ মনকে এই তাপপ্রবাহ থেকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও মুক্তি দেয়। রোদের তাপে বেলা বাড়ার সাথে সাথে হয়তো বা গরমও বাড়বে তবে সকালবেলার এই আবহাওয়াটা খুবই ঠান্ডা এবং মধুর পরিবেশ বজায় রেখেছে। মণিময়ের বাড়িতেও আজ মধুর পরিবেশ। মণিময়ের-শোভার মনে অসীমের চাকুরির ব্যাপারে ক্ষীণ আশার আলো দেখা দিয়েছে। শোভা আজ খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেছে। ঠাকুরের কাছে শোভার একটাই প্রার্থনা আজ। অসীমের যেন কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়। অসীমের আজ একটা ইন্টারভিউ আছে। তাই সে কলকাতা যাচ্ছে। কখনও হয়তো এই চাকরিটার জন্য আবেদন করেছিল। কাল চিঠি এসেছে ইন্টারভিউর জন্য। বিরাটিতে একটা নতুন গ্লাস ফ্যাক্টরি হয়েছে। সেখানকার অফিসের ম্যানেজমেন্ট-এর জন্য লোক চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। ইন্টারভিউ হবে আগামীকাল শুক্রবার সকাল এগারটায়। মণিময় কোনো ঝুঁকি নিতে চায় না তাই একদিন আগেই পাঠিয়ে দিচ্ছে অসীমকে। দমদমে অসীমের এক বন্ধু আছে। ওখানেই বন্ধুর বাড়ি। অসীম বুথ থেকে ফান করে তার যাওয়ার সংবাদ জানিয়ে দিয়েছে। অসীম ঘুম থেকে উঠে চান সেরে নিয়েছে। একটু টেনশন তো আছেই। শোভা ওর জন্য রান্না করছে। দশটার সময় রওনা হবে। মণিময় বাথরুম সেরে এসে অসীমকে ডেকে কাছে বসাল কয়েকটা কথা বলার জন্য। অসীম ভাবছে বাবা আবার কী বলবে কে জানে। মণিময় সস্নেহে বলল, বাবা অসীম।

টেনশন একদম করবি না, ইন্টারভিউটা ঠিকঠাক মতো দিবি। বেশি ঘোরাঘুরি করবি না শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখবি। সময় সুযোগ থাকলে দক্ষিণেশ্বর গিয়ে মা ভবতারিণীকে একবার দর্শন করে আসিস। কলকাতার রাস্তাঘাট সম্পর্কে তোর ধারণা একদম নেই। একা কোথাও যাবি না। আর কিছু বলার নেই আমার। তোর বন্ধুর মোবাইল নম্বরটা দিয়ে যা বাবা। দরকার হলে যাতে তোর খবরাখবর নিতে পারি বুঝলি? অসীম একগাল হেসে বলল, আচ্ছা বাবা আমি কি এতই ছেলেমানুষ যে তুমি সব শিখিয়ে দিচ্ছ! যাচ্ছি তো মোটে দুদিনের জন্য। তুমি কোনো চিন্তা করনা বাবা। আমি কথামতোই সব করব। তোমরা শুধু আশীর্বাদ কর যেন এবার আমার একটা কিছু ব্যবস্থা হয়। শোভা এসে বলল, সব গুছিয়ে নিয়েছিস তো? সাবান তোয়ালে ইত্যাদি? ইন্টারভিউ দিয়েই চলে আসবি। নয়ত চিন্তায় থাকব বাবা। নয়টাতো বাজে প্রায়, চল একটু খেয়ে নিবি। বলে শোভা চলে গেল ভাত দিতে। পেছন পেছন অসীমও গেল। খাওয়াদাওয়া সেরে ড্রেস পরে নিল। মণিময়কে বলল, অলকের ঠিকানা নিয়েছি, যদি সম্ভব হয় দেখা করে আসব। রেখা সামনেই বসেছিল। মিটিমিটি হেসে বলল, তুই কি বেড়াতে যাচ্ছিস নাকি রে দাদা। ভাল করে ইন্টারভিউ দিবি। স্মার্ট হয়ে যাবি বুঝলি — হাঁদারাম কোথাকার! বলে দৌড়ে পালিয়ে গেল। অসীম বলল, দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা তোর। বলে রেখার পেছনে ছুটল। ভাই-বোনের এ মধুর কলহ মা-বাবা দুজনেই উপভোগ করল। আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল ভাই-বোনের এই সুন্দর ভালবাসা যেন সারাজীবন বজায় থাকে। আজ যেন অসীমের এই যাত্রা সফল হয়, এই চাইল ভগবানের কাছে। মণিময়ও প্রস্তুত হল অসীমকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত ছাড়তে যাবে বলে। শোভা ঠাকুর ঘরে ঢুকে ঠাকুর প্রণাম করে ঠাকুরের ফুল অসীমের পকেটে ঢুকিয়ে দিল। অসীমও ঠাকুর প্রণাম করে মা-বাবাকে প্রণাম করে রওনা দিল। শোভার চিন্তা আরম্ভ হল। অসীম ফিরে না আসা পর্যন্ত এই চিন্তা বজায় থাকবে। মণিময় এসে স্কুলে যাবে। রান্নাও বাকি আছে। রেখা মা-র কাছে এসে বসল, কী গো মা খেতেটেতে দেবে না? আমি তো পড়তে যাব। শোভা রেখার দিকে তাকিয়ে বলল, আজও পড়া আছে! যা না মা— তোর খাবারটা রেডি করেই রেখেছি খেয়ে নে গিয়ে। আমি একটু পরে যাচ্ছি। তুমি খাবে না? দাঁড়াও আমি নিয়ে আসছি।— বলে রেখা চলে গেল খাবার আনতে। তারপরে দুজনে বসে খেয়ে নিল। রেখা জানে—আজ মার মনটা একটু খারাপ থাকবে। তাই মাকেও খাইয়ে নিল। তারপর চলে গেল পড়তে।

অবিনাশবাবুর কাছেই রেখা পড়ে পলিটিক্যাল সায়েন্স আর ইকনমিকস। অবিনাশ পাল রিটায়ার্ড প্রফেসর। উনি সপরিবারে শ্বশুরের ভিটেতে থাকেন। কলকাতার কোনো এক নামি কলেজেই প্রফেসরি করেছেন। অবিনাশবাবুর নাকি বারাসতে একটা ফ্ল্যাটও আছে। ওখানে ছেলে থাকে বৌ ছেলে মেয়ে নিয়ে। সন্তান বলতে ওঁর ঐ একমাত্র ছেলেই। ছেলেবৌ-এর সঙ্গে বনিবনা

হচ্ছিল না বলেই তিনি গ্রামে চলে এসেছেন। এই গ্রামে যে কজন ছেলে মেয়ে প্রাইভেটে বি.এ. পরীক্ষা দিচ্ছে বা দেবে তাদের তিনি পড়ান। খুউব ভাল এবং অমায়িক প্রকৃতির লোক এই অবিনাশবাবু। তাঁর স্ত্রী অনুপমাদেবীও খুবই কর্মঠা এবং বুদ্ধিমতী মহিলা। শিক্ষিতা তো বটেই। তবে গ্রামের সবাই বলে এই মহিলা একটু দাম্ভিক প্রকৃতির। হয়তো বা কম কথা বলে তাই গ্রামের সাধারণ সাদামাটা মহিলামহলে স্থান করতে পারেনি। তবে এটাও ঠিক সবাই মিশুকে হয় না, বা সহজ সরলও হয় না। অনুপমা দেবী ঐ শ্রেণীর উপরে। তবে যে সব মেয়েরা পড়তে আসে তাদের সঙ্গে কিন্তু উনি সুযোগ পেলে যথেষ্ট গল্পই করেন। ভদ্রমহিলাকে দেখলেই বোঝা যায় খুবই শৌখিন প্রকৃতির মানুষ। সুন্দর রুচিসম্পন্ন শাড়ি পরাই তাঁর শৌখিনতার বিশেষ প্রতীক। ব্যক্তিত্বের ছাপ তাঁর চোখে মুখে প্রকাশ পায়। সেক্ষেত্রে অবিনাশবাবু অনেক বেশি খোলামেলা। ষাটোর্ধ বয়স্ক এই ভদ্রলোকটি সর্বদাই হাসি খুশি উচ্ছল থাকতে ভালবাসেন। অবিনাশবাবুকে দেখলে বয়সটা ধরা পড়ে না। সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী এই ভদ্রলোক নিয়মিতভাবেই চুলে কলপ করেন। চেহারায় সৌন্দর্যে আভিজাত্যের ছাপ রয়েছে। শান্তিপ্রিয় এই মানুষটি শান্তির খোঁজেই নয়নপুরে চলে এসেছেন। গ্রামের অভিভাবকদের অনুরোধেই তিনি কলেজ স্তরের ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে শুরু করেছেন। পড়াশুনায় তার যথেষ্ট পরিমাণে আগ্রহ আছে বলেই পড়াতে রাজি হয়েছেন। এতে ছেলেমেয়েগুলোর খুবই উপকার হয়েছে। টিউশন বাবদ তাঁকে সামান্য টাকা দিলেই চলে। ছাত্রছাত্রীরা পড়ে আনন্দ পেলেই অবিনাশবাবুর সবচেয়ে বড় পাওনা। এটাই তার অভিমত। দুঃখকে ছাপিয়ে সুখের নয়, শান্তির বাতায়নে বাস করাই তার একমাত্র লক্ষ্য। সন্তানের দেওয়া দুঃখকে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ভুলে থাকতে চান নানারকম কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে। এজন্যই এই শান্ত স্নিগ্ধ নয়নপুরে আসা। রেখা, চম্পা, শিউলি, উমা এই অবিনাশবাবুকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। অবিনাশবাবুও ছাত্রছাত্রীদেরকে নিজের সন্তানের মতোই দেখেন। তিনি ভাবেন নিজের সন্তানদের কাছে আঘাত পেলে কী হল, এরকম একাধিক সন্তান ওঁর কাছে শিক্ষা লাভ করে নানা জায়গায় নানান পজিশনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এখনও স্যারকে পিতৃ-সমতুল্য স্থানে বসিয়ে রেখেছে। সুতরাং এক সন্তানের দেওয়া ব্যথা তাঁর হৃদয়ে বেশি অনুভূত হয় না। রেখাকে ওঁরা দুজনেই খুব ভালবাসেন। সপ্তাহে দুদিন এখানে ওরা পড়তে আসে। রেখা ও চম্পা এসে খাতা বই বের করে চেয়ারে বসেছে। অবিনাশ আগে থেকেই নিজের চেয়ারে বসা ছিল। ওদের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে হেসে বললেন, তোরা আজ দেরী করে এলি? কোনো অসুবিধা ছিল বুঝি! রেখা তাড়াতাড়ি করে বলল, হ্যাঁ স্যার একটু অসুবিধা— মানে আমার দাদা আজ কলকাতা গেল তো! তাই আর কী অবিনাশ বললেন, ও-দাদাকে রওনা করিয়ে দিলি। তাই তো? আর চম্পা তো তোকে ছাড়া আসবে না। বুঝতে পেরেছি। বলে বইয়ের পাতা ওলটাতে লাগলেন। চম্পা একটু ইতস্তত করে বলল, স্যার — আপনার ইকনমিকস বইটা যদি একটু দেন তবে আমি

একটু নোট করে রাখতে পারি স্যার। অবিনাশ স্যার চম্পার দিকে তাকিয়ে বললেন পরীক্ষার আর ক-দিন বাকি রে চম্পা। এখনও নোট্ করা বাকি, এরকম করলে হবে? বইটা তুই নিয়ে যাস— কোনো অসুবিধা নেই। তবে দু-চারদিনের মধ্যে ফেরত দিবি কেমন? চম্পা গদগদ হয়ে বলল, হ্যাঁ, স্যার অবশ্যই নিয়ে আসব। এর পর যেদিন পড়তে আসব সেদিন। ওরা পড়তে লাগল। কিছুক্ষণ পর রেখার মনে হল অনুপমা দেবী হয়তো বাড়িতে নেই। থাকলে একবার হলেও এঘরে এসে ঢুকত। রেখা ভয়ে ভয়ে স্যারকে জিজ্ঞেস করল, স্যার মাসিমণি তো একবারও এলেন না এঘরে? বাড়িতে নেই বুঝি? অবিনাশ স্যার গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন না — মন্দিরে গেছে। এখুনি চলে আসবে হয়তো। গেছে তো অনেক্ষণ হল। বলে চুপ করে রইলেন। পড়ার সময় অন্য কথা তাঁর একেবারেই অপছন্দ। তবুও রেখার কৌতূহলী মন না জিজ্ঞেস করে থাকতে পারল না। চম্পা রেখার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, চুপ করতো, তোর কী দরকার এত খোঁজখবর নেওয়ার! স্যার কিন্তু রেগে গেছেন। দেখনা মুখের দিকে তাকিয়ে। রেখা বুঝতে পেরে আবার পড়ায় মনোযোগ দিল। ঘণ্টাখানেকের বেশি পড়ায় না। তাঁর যা বিদ্যাদানের ক্ষমতা সেটা ঠিকমতো গ্রহণ করতে পারলে এই এক ঘণ্টাই যথেষ্ট। পড়া শেষে চম্পা বইটা নিয়ে রেখা বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হল।

স্যারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উঠতেই হঠাৎই দেখা হয়ে গেল অনুপমা দেবীর সঙ্গে। পড়নে লালপাড় দামি একটা গরদের শাড়ি। গায়ে ছিমছাম গয়নাও আছে। পায়ে আল্তা পরা, বিধাতা যেন দেবীরূপে তাঁকে পাঠিয়েছেন এই মর্ত্যে। রূপের জৌলস যেন ঠিকরে বেরোচ্ছে। রেখা হাঁ করে তাকিয়েই রইল। কী সুন্দরই না লাগছে মাসিমণিকে। চম্পা এগিয়ে গিয়ে বলল, স্যার তো আপনার জন্য ভাবছেন! অনুপমা দেবী বললেন কেন? এত চিন্তা করার কী আছে। তাছাড়া আমি তো বলেই গেছি একটু দেরী হতে পারে। থাকগে বুড়ো হলে মানুষ কত কিছুই বলে। তোমাদের পড়া শেষ? রেখা বলল, হ্যাঁ মাসিমণি। রেখা আপাদমস্তক লক্ষ করে বলল, মাসিমণি আপনাকে যা লাগছে না। একেবারে অপরূপ। বলে হাসতে লাগল রেখা। অনুপমা খুশির আবেগে, তাই নাকি? বুড়ো মানুষদের আবার অপরূপ! দূর দূর—এখন আমাদের কোনোমতে দিন কাটানো। তোমরা আমাকে ভালবাস তাই আমার সবকিছুই তোমাদের ভাল লাগে। চম্পা বলল, না মাসিমণি রেখা ঠিকই বলেছে। আমাদের মতো বয়সে আপনি না জানি কত সুন্দর ছিলেন। না রে চম্পা এসব বলিস না। আমি সবসময়ই এক রকম। বলে অনুপমা গেট খুলে বাড়িতে ঢুকলেন। রেখা ওরাও হাঁটতে লাগল বাড়ির রাস্তা ধরে। চম্পা রেখাকে বলল, দেখেছিসতো, যেকোনো মানুষকে সুন্দর বললে মানুষ কতটা খুশি হয়। রেখা হঠাৎ করে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে চম্পাকে প্রশ্ন করল, কী বললি, যেকোনো মানুষ মানে? স্যারের বউ যেকোনো মানুষ হয়ে গেল তোর কাছে! নয়নপুর

গ্রামে বের কর্ তো এত সুন্দর একজন মহিলা, আবার এতটা বয়সে? বলে হাঁটতে লাগল রেখা। চম্পাও সুযোগ পেয়ে রেখার সঙ্গে রসিকতা করে বলল কেন? আর নেই? কেন তুইও তো যথেষ্ট সুন্দরী রে রেখা। এবার রেখা উত্তেজিত হয়ে বলল, দেখ্ চম্পা ইয়ার্কি করবি না। আমার চেহারা নিয়ে টিটকারি দিচ্ছিস? নারে না তুই ভুল বুঝছিস — তুইতো সত্যিই মোটামুটি সুন্দরী। বলে চম্পা ওর বাড়ির দরজায় এসে বলল, রেখা যাচ্ছি, বইটার থেকে নোট কিছু তৈরি করে তোকে দিয়ে আসব তোর যদি দরকার হয়তো দেখে নিতে পারিস। ঠিক আছে, দিয়ে যাস। তাহলে আমিও একটু চোখ বুলিয়ে নেব। চলি রে চম্পা। বলে বাড়ি চলে গেল রেখা। চম্পা বাড়িতে ঢুকে দেখল মা বারান্দায় বসে আছে। মা শান্তিবালা খুবই নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। স্বামী মারা যাবার পর দুই ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে তার সংসার মোটামুটি চলছে। বড় ছেলে বিকাশ পড়াশুনা শেষে করে চাকরির সুবাদে আসানসোলে বসবাস করছে। চাকরি করে একটা প্রাইভেট ফার্মে। স্ত্রী-সন্তান নিয়েই সেখানে থাকে। খুব বড় পদের চাকরি নয়, তবে উপরি পাওয়ার লাভে বেশ সচ্ছল অবস্থায়ই আছে বলা যায়। মা শান্তিবালা মেয়ে চম্পা এবং ছোটো ছেলে বিভাসকে নিয়ে গরিবানা ভাবেই থাকে। চম্পার বাবা মহিম ঘোষ রেলওয়েতে চাকুরি করতেন। তাই শান্তিবালা মোটামুটি ভালই একটা ফ্যামিলি পেনশন পায়। বিকাশ বড় একটা খোঁজখবর রাখে না বললেই চলে। মাঝেমধ্যে অল্পস্বল্প টাকা পাঠিয়ে মাকে খুশি রাখার চেষ্টা করে। এতে সংসার চলুক না চলুক এতে তার কিছু আসে যায় না। ছোটো ভাই বিভাস নয়নপুর হাইস্কুলে দশম শ্রেণীর ছাত্র। পড়াশুনায় বেশ ভাল। বুদ্ধিমান বটে। মায়ের এই অসহায় অবস্থার জন্য সে দাদাকেই দায়ী করে। দাদা যদি আর একটু দায়িত্বশীল হত, তাহলে মাকে সংসার চালাতে এত কষ্ট করতে হত না। দাদার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিও কমে গেছে শুধু এইসব কারণে। চম্পাও যথেষ্ট মিতব্যয়ী। প্রাইভেটে বি-এ পরীক্ষা দেবে ঠিকই, মাকে একটু সাহায্য করার জন্য দুটো টিউশনিও করে। মা শান্তিবালা সারাক্ষণ যে কী চিন্তা করে সেটা চম্পা ভালই বোঝে। চম্পাকে নিয়েই শান্তিবালার যত চিন্তা এবং এটাই স্বাভাবিক। বড় ছেলে বিকাশ সেরকম নয় বলেই আজ শান্তিবালাকে এত চিন্তা করতে হয়। বিকাশের চাকরির দুবছরের মধ্যেই বিকাশকে বিয়ে করান তার বাবা মহিম ঘোষ। তার একবছরের মধ্যেই মহিম ঘোষের মৃত্যু হয়। এই নয়নপুরে মহিম ঘোষের পৈতৃক বাড়ি। খুব খাঁটি লোক বলেই সকলের কাছে পরিচিত ছিল এই মহিম ঘোষ। চাকুরি জীবন বাইরেই কাটাতে হয়েছে। নয়নপুরেই থাকত স্ত্রী ছেলে-মেয়ে। বাড়িটা ছাড়া কিছু জমি সম্পত্তি এখনও আছে ওঁদের। ব্যাঙ্কেও কিছু টাকা রেখে গেছেন। এই টাকায় হাত দেয়না শান্তিবালা। কেননা চম্পাকে তো পাত্রস্থ করতে হবে। স্বামীর মৃত্যুর পর ভাবত বিকাশ তো আছেই, যে করেই হোক চলে যাবে। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে বিকাশের ভাবগতি শান্তিবালার মনে সন্দেহের বাসা বেঁধেছে,

বুঝতে পেরেছে বিকাশ তার সন্তান তো বটেই কিন্তু সুসন্তান নয়। তাই শান্তিবালা এখন আর বিকাশের উপর নির্ভর করতে পারছে না। বিশেষ করে আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে তো নয়ই। বিভাসেরও একটা ভবিষ্যৎ চিন্তা রয়েছে। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হওয়ার পর কোথায় পড়বে, কী পড়বে এইসব চিন্তার পাহাড়ে বসে আছে শান্তিবালা। চম্পা খুবই হাসিখুশি উচ্ছল মেয়ে। মায়ের সঙ্গে ওর বন্ধুত্বের সম্পর্ক। মার যাতে কষ্ট না হয় সেজন্য একটা কাজের লোক রেখে দিয়েছে। কাজের লোকের মাইনেটা ওই দেয়। শান্তিবালা নিরামিষই রান্না করে সবসময়ে, মাঝেমধ্যে ওদের মাছ রান্না করে দেয়। নিজে নিরামিষই খায়। নয়নপুরের গ্রামের মানুষ শান্তিবালাকে যথেষ্ট সম্মানের চোখেই দেখে। বিশেষ করে তিনি স্কুলের মেয়েদের সেলাই ফোঁড়াই শেখানোর ব্যাপারে সাহায্য প্রদানের ব্যাপারে আগ্রহী, তাই সকলেই তাঁকে সুনজরে দেখে। এই গ্রামের অনেকেই স্বর্গীয় মহিম ঘোষের এই পরিবারের সাহায্য সহায়তায় এগিয়ে আসে। বিভাস পড়াশুনায় যথেষ্ট আগ্রহী বলে স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে মণিময়, উপেন ছাড়াও আরও দু-একজন শিক্ষক ওকে পড়ার ব্যাপারে আলাদাভাবে সাহায্য করে থাকে। তাই এই নয়নপুর গ্রাম শান্তিবালার পরিবারের কাছে জীবন সংগ্রামের স্বর্গ।

মাকে বসে থাকতে দেখে চম্পা বলল, কীগো মা চুপচাপ বসে আছ। গল্পের বইটাতো পড়তে পার। বলে চম্পা সোজা ঘরে ঢুকে পড়লে। বই-খাতা রেখে হাত মুখ ধুতে বাথরুমে ঢুকল। এসে শান্তিবালাকে বলল, আচ্ছা মা তুমি এত কী ভাব বলোতো? আমি তোমার কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছি এখন, তাই না? তারপর মাকে গলা জড়িয়ে ধরে আদর করে বলল, আমি পাশ করে চাকরি না পেয়ে কোনো বিয়েটিয়ে করব না। এটাই আমার শেষ কথা। তুমি কি চাওনা আমি নিজের পায়ে দাঁড়াই? শান্তিবালা স্নেহের সুরে বলল, না রে মা আমিতো তাই চাই। কিন্তু বিয়ে তো দিতেই হবে বল্! আমার শরীরটাও ক্রমশ খারাপের দিকেই যাচ্ছে, কখন কী হয় কে জানে, তোর জন্যই আমার যত চিন্তা রে চম্পা! চম্পা মৃদু হেসে উত্তর দিল খুউব চিন্তা করো। তবে চলো আগে খাওয়াটা সেরে নিই। বলে টানতে টানতে মাকে নিয়ে গেল খাওয়ার জন্য। বিভাসের জন্য ভাত ঢাকা দিয়ে রেখে দুজনেই খেয়ে নিল। চম্পাও প্রাইভেট টিউশনি করে দুটো। বিকেলে এক ছাত্রের বাড়ি যেতে হবে পড়াতে। তাই খেয়ে দেয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। বিভাস এসে খাওয়াদাওয়া করে বেরিয়ে গেল খেলতে। স্কুল মাঠেই ওরা খেলে। খেলাধুলায়ও যথেষ্ট আগ্রহী বিভাস। বলা তো যায়না এই খেলাকে মাধ্যম করে হয়তো বা বিভাস জীবনে দাঁড়াতে পারে। স্কুলের হয়ে ফুটবল খেলে এই ছেলে কয়েকবারই স্কুলকে পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। যতই খেলাধুলা করুক, সন্ধ্যার আগেই বাড়ি ফিরে পড়তে বসে যাবে বিভাস। পড়ার কথা ওকে বলতে হয় না। মা শান্তিবালা ছেলের ব্যাপারে খুবই নিশ্চিন্ত। শুধুমাত্র ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা। আসল চিন্তা

মেয়েকে নিয়ে। কে দেবে পাত্রের সন্ধান, বিধাতা কী লিখে রেখেছেন কে জানে? শান্তিবালা দেবীর এক দাদা থাকে ডায়মন্ড হারবারে। সেখানেই এই ব্যাপারে চিঠি লেখার কথা ভাবছে শান্তিবালা। যদি দাদা কোনো সন্ধান দিতে পারে। এদিকে চম্পাও বেরিয়ে গেল টিউশনির উদ্দেশ্যে। আসতে প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে যায়। রেখা এবং চম্পা প্রায় একই স্বভাবের মেয়ে। ভদ্র নম্র গোছের সাদাসিধা সহজসরল মেয়ে দুটো নয়নপুরের অন্যান্য মেয়েদের চাইতে আলাদা। অদৃষ্টের পরিহাস ওদের কোথায় নিয়ে যায় পরে দেখা যাবে।

সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলে উঠেছে নয়নপুরের ঘরে ঘরে। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে মানুষজন বাইরে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। যদিও প্রকৃতি বাদ সেধেছে। হাওয়া বাতাস নেই বললেই চলে। তবুও কিছু কিছু লোক গরমের তাণ্ডব থেকে বাঁচার জন্য ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়েছে একটু ঠান্ডা হাওয়ার জন্য। এছাড়া গ্রামের হাওয়ায় একটা ঝিরঝিরে ভাব লেগেই থাকে। সেটা শহরের ইট কাঠের ফাঁকে একটুও অনুভব হয় না। সারাদিনের ক্লান্তিকে যেন গ্রামের এই শান্ত সুনিবিড় হাওয়া শান্ত করে শরীর মনকে তাজা করতে সাহায্য করে। সন্ধ্যে হতে না হতেই সারি সারি রাস্তার লাইটগুলো ফুলের মালার আকারে সেজে ওঠে। দূরে শোনা যায় মসজিদের নামাজের ধ্বনি। বিদ্যুতের চমকানিতে আজ বাংলার প্রায় প্রতিটি গ্রামই হয়ে উঠেছে আলোকোজ্জ্বল। এখন আর আগের মতো অন্ধকারে পথ চলতে হয় না। আজ তাই মানুষের মনও হয়ে উঠেছে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে সুদূরপ্রসারী। সব মিলিয়ে এই নয়নপুরকেই শান্তি পরিবেষ্টিত গ্রাম বলা যেতে পারে।

এমনটাই ভাবে এখানকার মানুষরা। এখানকার বেশির ভাগ লোকেরাই একের সঙ্গে অপরের একটা সুন্দর আত্মিক সম্পর্ক রাখতে সর্বদাই সচেষ্ট। এর মধ্যে কি ব্যতিক্রম নেই? হ্যাঁ তাও আছে। তবে তারা বাকি সকলের কুনজরেই থাকে। বেকারত্বের জ্বালায় এই গ্রামের কয়েকটা ছেলেই ভুগছে। এর মধ্যে মণিময়ের ছেলেও আছে। মণিময়ের ছেলে অসীম খুব সাহসী এবং বুদ্ধিমান ছেলে। বেকারত্বের জ্বালায় ভুগলেও সে সর্বদাই হাসিখুশি প্রাণোজ্জ্বল থাকে। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বেকারত্ব ঘোচাবার। অসীমের বন্ধুদের মধ্যে দু-একজন ছেলে আছে যারা পুরোপুরি হতাশ হয়ে পড়েছে চাকরির ব্যাপারে। একরকম হালই ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু অসীম সেরকম নয়। সে আশাবাদী ছেলে। এ অঞ্চলের লোকেরা অসীম বলতেই বোঝে খুবই ভাল ছেলে। অসীম আজই সকালে ফিরেছে ইন্টারভিউ দিয়ে। তখন মণিময় বাড়ি ছিল না। অন্য কাজ ছিল। তাই স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হয়েছে মণিময়ের। উঠানেই চেয়ার নিয়ে বসেছে মণিময়। মোড়ায় বসেছে শোভা। চা খেতে খেতে কথাবার্তা হচ্ছে। অসীম বারান্দায় বসেছে। বাবা ছেলের কথোপকথন হচ্ছে। মণিময় উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করল অসীমকে, কীরে অসীম বল্ তোর খবর। ইন্টারভিউ কেমন হল? বলে তাকিয়ে রইল উত্তরের অপেক্ষায়।

অসীম মৃদু হেসে বলল, হ্যাঁ বাবা, ইন্টারভিউতো মোটামুটি ভালই হয়েছে। কিন্তু আমার হয়ে সুপারিশ করার তো কেউ নেই। তাই না? মণিময় আক্ষেপের সুরে বলল, তাতো ঠিকই, আজকাল তো আবার যোগ্যতার বিচার হয় না, পেছনের খুঁটির জোর থাকতে হয়। যাক — ভাল ইন্টারভিউ দিয়েছিস এটাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, এরপর তোর ভাগ্য নির্ধারণ করবে ঈশ্বর । এসব নিয়ে একদম চিন্তা করিস না। যা হবার হবে, বলে দাঁড়িয়ে পড়ল মণিময়। অসীম বাবার দিকে তাকিয়ে নম্রসুরে বলল, বাবা, এবার আমার একটা মোবাইল নেওয়া দরকার। নয়ত চাকরিবাকরিতে কনটাকট করা খুউব কষ্ট। তাছাড়া ওরা মোবাইল নম্বর চেয়েছে। আমি কোত্থেকে দেব। অজয়ের নম্বরটা দিয়েছি। শোভা আগেভাগে উঠে অসীমকে বলল, মোবাইল? পয়সা আসবে কোত্থেকে রে? যত জমিদারি আলাপ সালাপ! মণিময় খুব বিরক্ত হল শোভার উক্তিতে। কোনো সময়েই সে কটুক্তি পছন্দ করে না। আরও ছেলের ব্যাপারে তো মোটেও গ্রহণযোগ্য নয় এই ধরনের উক্তি। তাই মণিময় ঘরে চলে গেল। বিছানায় উঠে বসে রইল চুপচাপ। মনটা খুব খারাপ লাগছে ছেলেটার জন্য। কোনোদিনই অসীম বাবার কাছে কিছুই চায়নি। আজ যাও একটা জিনিস চেয়েছে ছেলে, তাও শোভার উক্তিতে অসীমের মনটা হয়তো খুবই খারাপ হয়ে গেছে। বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারল না। মণিময় উঠে চলে এল অসীমের ঘরে। অসীম টি.ভি. দেখছে। বাবাকে দেখে অবাক হয়ে বলল, কী ব্যাপার বাবা তুমি কিছু বলবে? মণিময় চেয়ারে বসে বলল, হ্যাঁরে বাবা, তুই তোর মার কথায় কিছু মনে করিসনি তো? অসীম বাবার হাত ধরে বলল, 'না বাবা না, একটুও না, মা তো হামেশাই এসব বলে। বিশ্বাস করো তুমি, আমি কিছু মনে করিনি। তোমাদের মতো বাবা-মা পেয়ে আমি ধন্য। তুমি যখন পারবে তখনই তুমি একটা মোবাইল আমাকে কিনে দিও। মণিময় অসীমের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, হ্যাঁরে অসীম অবশ্যই দেব। আমি এত অক্ষম নই যে ছেলের এই সামান্য চাহিদাটুকু পূরণ করতে পারব না! তুই কিছু ভাবিস না—সামনের মাসেই তোকে মোবাইল কিনে দেব। শুনে অসীম খুব খুশি হল। মণিময় আবার নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। শোভা আর এমুখো হল না। মণিময়ের গাম্ভীর্যভাব তার ব্যক্তিত্বকে আঘাত করেছে। তাই শোভা মণিময়ের মুখোমুখি হতে সাহস করেনি। রাতের খাওয়ার পাট চুকিয়ে শোভা ঘরে গিয়ে দেখল মণিময় ঘুমিয়ে পড়েছে। শোভাও পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল। ছেলেকে কি এটুকু কথাও বলতে পারে না? সংসারের চিন্তা করেই তো চলেছে শোভা। তবে হ্যাঁ, মোবাইলের গুরুত্ব যে একেক জনের কাছে একেকরকম সেটা সত্যি শোভা বোঝে না। তাই অসীমকে একটা কথা না হয় বলেই ফেলেছে। তাতেই মণিময়ের এত রাগ!

বিছানায় আসলেই শোভাকে নানান চিন্তা ঘিরে রাখে। এখন আসল চিন্তা রেখাকে নিয়ে। পাশে শুয়ে মণিময় নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে। আশ্চর্য, এই লোকটার কি কোনো চিন্তাই মাথায় আসে

না? কী সুখ নিদ্রাই না উপভোগ করছে! সামনের রোববার রেখাকে দেখতে আসার কথা। কী হবে কে জানে। নিয়তির বন্ধন থাকলে তো এই পাত্রের সঙ্গেই বিয়ে হবে রেখার। বিয়ের যোগাড়যন্ত্র কি চাট্টিখানি কথা! মণিময় এইসব ব্যাপারে সবসময়েই উদাসীন। তাই শোভা অর্থ বিপত্তির মধ্যেও রেখার জন্য কিছু গয়না গড়িয়ে রেখেছে। তার জন্য অবশ্য শোভাকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু গয়না ছাড়াও তো অনেক খরচ আছে। হঠাৎ করে বিয়ে ঠিক হলে মণিময় টাকার যোগাড় করবে কোত্থেকে? মণিময়ের এসব নিয়ে কোনো চিন্তা-ভাবনা আছে বলে মনে হয় না শোভার। তিনি তো সবসময়েই ঈশ্বরে বিশ্বাসী। যখন যা হবার তাই হবে। মেয়ের জন্য শোভার রাতের ঘুম উঠে গেছে। রেখা মণিময়-শোভার খুবই আদরের সন্তান। কথায় আছে মেয়ে লক্ষ্মী হয়ে সংসারে জন্মায়। সেই লক্ষ্মী যখন সংসার থেকে চলে যাবে নিজের সংসারে তখন এ সংসারের হাল কেমন হবে কে জানে! এই নয়নপুরের অধিকাংশ মানুষই অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠ যারা আছে তারা সবাই রেখাকে খুবই স্নেহের চোখে দেখে। তাছাড়া নিজস্ব স্বভাবের জন্যও রেখা সকলের কাছেই প্রিয়। কে জানে বিধির বিধান কী? শোভার চোখে ঘুম নেই। কাল আবার স্কুলে যাওয়ার সময় মনে করিয়ে দিতে হবে মণিময়কে, জেনে আসতে পাত্রপক্ষ রোববার আসছে কি না! সকাল হতে না হতেই উপেন এসেছে মণিময়ের বাড়ি। সবেমাত্র মণিময় শয্যা ত্যাগ করেছে। আলুথালু বেশে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই তার নজরে পড়ল উপেন ঢুকছে। হঠাৎ এত সকালে উপেনকে দেখে একটু অবাকই হল মণিময়। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার দাদা, আসুন আসুন—কোনো সমস্যা নয় তো? আরে না, না ভাই। হাসতে হাসতে উত্তর দিল উপেন। আমি একটু কলকাতা যাচ্ছি, ছেলেটা নূতন কোম্পানিতে ঢুকেছে তো, তাই কোথায় কীভাবে আছে একটু দেখে আসি। চেষ্টা করব আজই ফিরে আসতে, নয়ত কাল সকালে তো অবশ্যই। তাই তোমাকে একটু জানিয়ে গেলাম আর কী। মাথায় ঘোমটা টেনে শোভা এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। মণিময় শোভাকে বলল, দাদাকে একটু চা দাও। উপেন তীব্র আপত্তি করে বলল না, না আমি এখন চা খাব না, এখুনি চা খেয়েই বেরিয়েছি। তাড়াতাড়ি যেতে হবে। বলে উপেন যাওয়ার জন্য উদ্যত হল। মণিময় বলল, দাদা, আমি যাব আপনার সঙ্গে বাসস্ট্যান্ড অবধি? উপেন মণিময়ের এই উক্তিতে খুবই খুশি হল। ভাবল—সত্যিই মণিময় উপেনকে নিজের দাদার মতোই শ্রদ্ধা করে। উপেন স্নেহের সুরে বলল, না মণিময়—একদম না। আমি যেতে পারব, তোমার কথাতেই আমি যথেষ্ট খুশি হয়েছি। সত্য তোমরাই আমার আসল আপনজন। বলে বেরিয়ে গেল মণিময়ের বাড়িথেকে। রেখা দৌড়ে এসে বাবাকে জিজ্ঞেস করল বাবা — অলকদার কী হয়েছে গো? জেঠু এত সকাল সকাল কলকাতা গেল কেন? মণিময় রেখার এতটা কৌতূহল ঠিক পছন্দ করতে পারল না। তাই মণিময় গম্ভীর হয়ে রেখাকে বলল,

এমনিতেই গেছে অলকের খবরাখবর নিতে। তা তোর এত খবরে কী দরকার ? শোভা রান্নাঘর থেকে সবই শুনছিল। বাবার উত্তর শুনে রেখা মাথা নিচু করে নিজের পড়ার টেবিলে গিয়ে বসল। শোভা এসে মণিময়কে মনে করিয়ে দিল পাত্রপক্ষের আসার ব্যাপারে খোঁজ নিতে। শোভা বেশি কথা বলল না। কে জানে মণিময়ের মেজাজের পারদ নেমেছে কি না !

বেলা বাড়ার সাথে সাথে গরমের দাপট বেড়েই চলেছে। ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি হতে চলেছে এক ফোঁটাও বৃষ্টি হয়নি অনেক দিন। প্রকৃতির শুষ্কতা মানবজীবনে ডেকে এনেছে ভয়াবহ রুক্ষতা। দাবদাহের অসহ্যতায় বাতাস বয়ে আনছে শুধুই গরমের তিক্ততা। আকাশে অল্পবিস্তর মেঘ জমলেও হাওয়া তাকে মুহূর্তে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতির এই রুক্ষতা থেকে নয়নপুরের সবুজ বনানীও বাদ যায়নি। সামনেই শরতের আগমন। বিশ্বজননী মহামায়া প্রকৃতিকে ঢেলে সাজিয়ে তবেই মর্ত্যে আসেন। বারিধারার সিক্ত পরিবেশকেও এই ধরার তখন মানিয়ে নিতে হয়। তখন গ্রাম-বাংলার উৎসবমুখর দিনগুলো হয়ে ওঠে দুঃখময়। তাই এখন কিছু কিছু বৃষ্টি হলেই ভাল হত। দুর্গাপুজোয় বৃষ্টি ভাবা যায় না। বিশ্বকর্মা পুজোর পরেই দুর্গাপুজোর উৎসব প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে যায়। উৎসবের মেজাজে সব জাতির মানুষ একাকার হয়ে যায়। সে গ্রামেই হোক আর শহরেই হোক।

শোভা ভাবছে আশ্বিন কার্তিক কোনোটাই বিয়ের জন্য ভাল মাস নয়। অঘ্রান মাসে হতে পারে। মণিময় স্কুল থেকে না ফেরা পর্যন্ত এই টেনশন শোভার থাকবেই। সকালের খাওয়া খেয়ে অসীম একটু বেরিয়েছে। রেখা আজ বাড়িতেই আছে সারাদিন। বিকেলে যাবে টিউশনিতে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। শোভা বিছানা থেকে উঠে বারান্দায় এসে বসল হাতপাখা নিয়ে। রেখা বেরিয়ে গেল। মণিময় এলে একসঙ্গেই চা খাবে শোভা। আজ আসতে একটু দেরি হচ্ছে মণিময়ের। কে জানে কী কারণ। স্কুলে মিটিং থাকতে পারে। আকাশটা একটু মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আছে। ঠান্ডা বাতাস বইছে। কোথাও হয়তো বৃষ্টি হচ্ছে। অসীম এখনও শুয়েই আছে। ঘর থেকেই ডেকে মাকে জিজ্ঞেস করল, কী গো মা—বাবা এখনও এল না? প্রায় পাঁচটা বাজতে চলল। দেরি হবে বা কিছু বলে গেছে নাকি তোমাকে? না তো ! তোর বাবা কি কিছু বলে নাকি আমাকে? যা জিজ্ঞেস করি শুধু সেটুকুই উত্তর দেয়। অসীম বুঝতে পারল মার মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে আছে। তাই আর কথা না বাড়িয়ে টি. ভি. দেখতে লাগল। শোভা রান্নাঘরে গিয়ে চায়ের জল চাপিয়ে দিল। চা রেডি করে অসীমকে বলল এসে চা নিয়ে যেতে। নিজেও চায়ের কাপ নিয়ে আবার বারান্দায় এসে বসল। রাস্তা দিয়ে কত লোকই তো

যাচ্ছে কিন্তু মণিময়ের টিকিটি দেখা যাচ্ছে না।

এদিকে ঘরে বাজারও নেই। মাছ তরকারি সবই ফুরিয়ে গেছে। বাজার না করলে রাতে খাবে কি ? সবই চিন্তা করতে হয় শোভাকে। কিছু যে নেই ঘরে মণিময় অবশ্য সেটা জানে। দেখা যাক মণিময় বাজার করে আনে কি না। কিন্তু কী করে আনবে? বাজারের থলে তো নিয়ে যায়নি— যাক সে যা হবার হবে। শোভা সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়ে উঠানে নামতেই দেখল মণিময় ঢুকছে। হাতে একটা ব্যাগ। শোভা তুলসীতলায় প্রণামটা সেরে চুপচাপ ঠাকুর ঘরে গিয়ে ঢুকল। মণিময় রান্নাঘরে ব্যাগটা রেখে কলতলায় গিয়ে হাত পা ধোয়ার পাটটা চুকিয়ে নিল। তারপর ঘরে গিয়ে পাখাটা চালিয়ে বসল। হাঁক দিয়ে শোভার উদ্দেশে বলল, অল্প কিছু মাছ আর তরকারি নিয়ে এলাম। শোভা বিকৃত সুরে বলল, তাই বুঝি দেরি হল? মণিময় আড় চোখে তাকাল শোভার দিকে। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, আরে না না এজন্য দেরি হয়নি। দেরি হয়েছে অন্য কারণে। পরে বলছি সেটা। আগে আমার জন্য চা-মুড়ি নিয়ে এসো। তারপর বলব। শোভা হয়তো বুঝল কারণটা, কিন্তু অসীম কিছুই না বুঝে বাবার কাছে এসে দাঁড়াল। বলল বাবার কানে কানে, হেড অফিস খুউব উত্তপ্ত। যে কোনো সময় ফাটতে পারে। দেরি হওয়ার কারণটা যাই বল না কেন বুঝেসুঝে বল। সাবধান—বাবা—সাবধান। মণিময়ও ছেলেকে সায় দিয়ে মুখে আঙুল দিয়ে বলল, চুপ কর ব্যাটা। আবহাওয়াটা যে ভারি সেটা আমি বাড়িতে ঢুকেই বুঝতে পেরেছি। বুঝলি? যা ভাগ এখান থেকে। ঐ আসছে রণচণ্ডী। মাকে দেখে অসীম ছুটে পালাল। শোভা চা-মুড়ির বাটি টেবিলে রাখল। এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছু একটা আন্দাজ করতে পারল শোভা। বাপ ছেলের কথোপকথন কী প্রসঙ্গে হচ্ছিল ! বলল, অসীম দৌড়ে বেরিয়ে গেল কেন আমাকে দেখে? আমি কি ভূত না কি? মণিময় মিটিমিটি হাসছিল শোভার কথা শুনে। শোভার দিকে তাকাতেই মণিময়ের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। শোভাকে খুব নম্রভাবে বলল, অসীম? না, না, ওতো অন্য কথা বলে বেরিয়ে গেল। জরুরি দরকার আছে বলেই দৌড়ে বেরিয়ে গেল। তা তোমার চা কোথায়? শোভা অন্যদিকে তাকিয়ে উত্তর দিল আমি চা খেয়ে নিয়েছি। এবার বলো তো তোমার কিসের জন্য এত দেরি হল? মণিময় খুবই ক্লান্ত তবুও এখুনি না বললে শোভা আরও ক্ষেপে যাবে। তাই বলল আমি অপর্ণা দিদিমণির বাড়ি গেছিলাম। স্কুলে গিয়ে শুনলাম উনি আজ স্কুলে আসবেন না। তাই স্কুল ছুটির পর সোজা চলে গেলাম ওঁর বাড়িতে। আমাকে দেখে দিদিমণি তো একদম অবাক। শোভা উৎসুক হয়ে বলল, তারপর আপ্যায়ন করল কীরকম? উপেন আবার আরম্ভ করল আপ্যায়ন মানে? দারুণ একদম। আরও শুনলে অবাক হবে, আমি গিয়ে দেখলাম ওঁর ভাসুর এসেছেন কাল রাতে। শোভা একগাল হেসে বলল, তারপর, তারপর ? কী বললেন উনি? আলাপসালাপ হল রেখার ব্যাপারে? মণিময় বলল, হ্যাঁগো হ্যাঁ, অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল। খুবই সম্পন্ন লোক। দেখতে শুনতেও চমৎকার। শোভা উত্তেজিত হয়ে বলল, দূর ছাই— এই

ভদ্রলোক সুন্দর দিয়ে আমাদের কী হবে বলো তো? কী যে বলনা। এখন আসল কথা বলো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি তো, বলল উপেন, রেখাকে দেখার কথা আমিই বললাম। কিন্তু ভদ্রলোক ভাদ্রমাসে মেয়ে দেখবেন না। আশ্বিনমাসে এসে অবশ্যই দেখে যাবেন। ফটো দেখে ওদের সকলেরই পছন্দ হয়েছে। বাবা মা দেখার পরই ছেলে দেখতে আসবে। তবে আমিও অপর্ণা দিদিমণিকে বলে এসছি ছেলের একটা ছবি আনতে। শোভা খুশিতে বলে উঠল, যাই হোক এতদিনে একটা কাজের কাজ করেছ তুমি। মেয়ের প্রতি দায়িত্বজ্ঞান বেড়েছে তা হলে ? উপেন উঠে ফ্যানটা বন্ধ করে টি. ভি. র ঘরে যেতে উদ্যত হল। শোভার কথার উত্তরে বলল, কী বললে — আমার মেয়ের প্রতি দায়িত্বজ্ঞান আমার থাকবে না তো কার থাকবে? হঠাৎ হঠাৎ কী যে বল না তুমি ? বলে টি. ভি. দেখতে বসল। রেখার আসার সময় হয়ে গেছে। এতক্ষণ ছিল না বলেই এত কথা শোভা মণিময় বলতে পেরেছে। হঠাৎ মণিময়ের মনে হল উপেনের কথা। ফিরেছে কিনা কে জানে। ভাবল একবার উপেনের বাড়ি গিয়ে খবরটা নিয়ে এলে ভাল হত। মনে মনে ভাবতে লাগল খবরটা শেষ হলে একবার উপেনের বাড়িযাবে। এমনি সময় রেখা এসে ঢুকল। মণিময় জিজ্ঞেস করল, কীরে মা দেরি হল? এমনিতেই বাবা, চম্পার সঙ্গে গল্প করছিলাম রাস্তায় দাঁড়িয়ে। মণিময় উঠে গিয়ে প্রস্তুত হচ্ছিল উপেনের বাড়ি যাবে বলে। রেখা দেখে বাবাকে জিজ্ঞেস করল, বাবা এখন আবার কোথায় যাচ্ছ ? মণিময় বলল, যাই একটু অলকদের বাড়ি। উপেনদা এসেছে কিনা দেখে আসি। যাবি নাকি? চল না। রেখা শুনে বাবাকে বলল, আমি তো একটু আগেই দেখলাম জেঠুকে, বাড়ির দিকে যাচ্ছে। মণিময় শুনে আশ্বস্ত হল। যাইহোক—উপেনদা ফিরেছে। অসীমও আজকাল তাড়াতাড়িই বাড়িতে চলে আসে। এসেই রেখার পেছনে লাগা ছাড়া অসীমের আর কাজ কী ! রেখাকে দেখেই বলে উঠল, কীরে — খুব আড্ডাবাজ হয়েছিস তাই না? রাস্তায় দাঁড়িয়ে চম্পার সঙ্গে এত কী কথা তোর? রেখা তেড়ে এল দাদার দিকে, কী বললি তুই ? আর তুই কী করিস? আড্ডা মারিস না? না কি গান করতে বেরোস? অসীম গম্ভীর হয়ে বলল, হ্যাঁ আমিও আড্ডা দিই। তাতে কী হয়েছে? আমি তো ছেলে, আমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারি বুঝলি ? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি মেয়েদের সবটাতেই দোষ তাই না? মুখ বেঁকিয়ে বলল রেখা। অসীম কাছে এসে রেখার কান ধরে বলল, দাঁড়া, শিগগিরই তোকে এ বাড়িথেকে তাড়াব, শ্বশুর বাড়ি গিয়ে বুঝবি, তখন মুখ দিয়ে আর শব্দ বেরোবে না। বলে অসীম চলে গেল হাত-মুখ ধুতে। রেখা চিৎকার করে বলতে লাগল হ্যাঁ হ্যাঁ — তা হলে তোর রাস্তাটা পরিষ্কার হবে। একটা পেত্নি ধরে নিয়ে আসবি। বলে রেখা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল মাকে সাহায্য করতে। মণিময় ঘরে বসে ভাই-বোনের এই মিষ্টি মধুর কলহ উপভোগ করছিল। ভালই লাগছিল। জীবন সংগ্রামের মাঝে এইরকম আনন্দঘন পরিবেশ তো ভাল লাগারই কথা।

রেডিওতে প্রভাতি অনুষ্ঠান চলছে। উপেনের স্ত্রী অঞ্জলি ভক্তিমূলক গানগুলি শুনতে শুনতেই

অনেক কাজ সেরে ফেলে। বেশির ভাগ সময়েই হীরক এসে রেডিও বন্ধ করে পড়তে বসে যায়। আজও তাই হল। হীরক রেডিও বন্ধ করে পড়তে বসল। অঞ্জলি হীরককে বাটিতে করে মুড়ি দিয়ে এল, সঙ্গে এক কাপ দুধও দিল। অঞ্জলি উপেন বসার ঘরে বসে চা খাচ্ছিল। হঠাৎই উঠান থেকে আওয়াজ এল, কই গো বউ, কী করছ? অঞ্জলি বুঝতে পারল এতো দাসপাড়ার বুড়ি পিসির গলা। প্রায়ই আসত আগে, এখন বয়সের ভারে হেঁটে এতটা পথ আসতে পারে না। অঞ্জলিকে খুবই স্নেহের চোখে দেখে। অঞ্জলিও বুড়ি পিসিকে এটা ওটা দিয়ে দেয়। অঞ্জলির এমনিতেই দয়ার শরীর। বুড়ি পিসির গলা শুনে অঞ্জলি বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বসার জন্য একটা পিঁড়ি এনে দিল পিসিকে। বলল, কী গো পিসি—এতদিন কোথায় ছিলে? বোসো, শরীরটা খারাপ ছিল মনে হয়। বুড়ি পিসির পরনে আধময়লা কাপড়। রুক্ষ চুলে অনেকদিন চিরুনি পড়েনি মনে হয়। যেখানেই যায় লাঠিতে ভর করে হেঁটে যায়। সত্তর পঁচাত্তর বৎসর বয়স হয়েছে, তবুও দেখলে বোঝা যায় এক কালে শরীর স্বাস্থ্য ভালই ছিল। এখন তো কথা বলতেও হাঁপাতে থাকে। অঞ্জলিকে বলল, হ্যাঁগো, শরীরটা একটুও ভাল যাচ্ছে না। বেরোতেও সাহস পাই না এজন্য। তবুও সকাল সকাল এসেছি তোমার কাছে একটা দরকারে। অঞ্জলি হাতে চায়ের কাপ নিয়ে চা খেতে খেতে বলল, সে বুঝতেই পেরেছি, এখন বলে ফেল দরকারটা কী ? আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। বুড়ি পিসি ভাবছিল কী করে কথাটা বলবে অঞ্জলিকে। তাই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল অসহায় ভঙ্গিতে, বৌগো, আজ তিনদিন হলো আমার পেটে একটা দানাও পড়েনি। বৌ বাপের বাড়িবেড়াতে গেছে লো বৌ। সঙ্গে পুলাটাও গেছে। আমি কি আর এখন কিছু করতে পারি যে রান্না করে খাব। তবুও যদি চাল আলু দিয়ে যেত। একটু সেদ্ধভাত করে খেয়ে নিতাম। অঞ্জলির খুউব মায়া হল। কষ্টও লাগল। বুড়ি শাশুড়িকে এভাবে রেখে কী করে বেড়াতে গেল? আশ্চর্য সমাজ ব্যবস্থা— শাশুড়িবউ-এর এই খিটিমিটি আজও চিরাচরিত প্রথায় চলছে। অঞ্জলি বলল, তুমি একটু বসো। আমি তোমাকে একটু চাল-আলু দিয়ে দিচ্ছি। বলে অঞ্জলি ঘরে গিয়ে একটা প্যাকেটে চাল আর আলু এনে বুড়ি পিসিকে দিল। বলল, নাও, এটা রান্না করে খেয়ে নিও। আমি তো এখনও ভাত চাপাইনি নয়ত তোমাকে খাইয়ে দিতাম। তুমি এখন যাও। আমার কাজকর্ম সব পড়ে আছে। বলে অঞ্জলি দাঁড়িয়ে দেখল অনেক কষ্ট করে লাঠিতে ভর দিয়ে বুড়ি পিসি উঠে দাঁড়াল। অঞ্জলিকে আশীর্বাদ করে বলল, বৌগো, তুমি শান্তিতে থাক, আমি এখন যাই, কেমন? তারপরে আস্তে আস্তে চলে গেল। বুড়ি পিসির ছেলে পল্টু বাজারে চায়ের দোকান চালায়। খুব কষ্ট করেই সংসার চালায়। কাজের ফাঁকে অঞ্জলি ভাবতে লাগল বুড়ি পিসির কথা। অনেকের কাছেই শোনা গেছে—এই মহিলা খুব দাপুটে ছিল। কাজেকর্মে সবদিকেই পটু ছিল। এখন এই একমাত্র ছেলেই ভরসা। তাও ছেলেবৌ-এর অবহেলা বুড়ি পিসির মনে দুঃখের পাহাড় জমে গিয়েছে। দুঃখটাকে হাল্কা

করার জন্যই হয়তো অঞ্জলির কাছে দুদণ্ড কথা বলে শান্তি পায়। এরা সকলের কাছে সমাজের নিচুস্তরের মানুষ। এদের শিক্ষাদীক্ষা - অর্থকড়ি না থাকতে পারে — কিন্তু অপমানবোধ, দুঃখবোধ তো আরও পাঁচটা শিক্ষিত লোকের মতো ঠিকই থাকে। তবুও সমাজের উঁচুতলার মানুষরা এদের হেয় চোখেই দেখে। কিন্তু কেন এই বৈষম্য? অঞ্জলি ভেবে পায় না, নিজের সংসারেও এদের মূল্য এত কমে যায় কী করে। মা যেই সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখায়, অনেক কষ্ট করে লালন-পালন করে বড় করে তোলে। নাইবা হোক সে শিক্ষিত, নাইবা থাকুক তার অর্থের জোর, তা বলে কি সেই সন্তান সম্মানের সাথে মা-বাবাকে দুবেলা দুমুঠো ভাত দিতে পারে না ? মা বাবা কি বুড়ো হলে ঘরের আবর্জনার মতো হয়ে যায় ? এইসব আকাশপাতাল ভাবতে ভাবতে অঞ্জলি রান্না প্রায় শেষ করে এনেছে। বেলা বাজে প্রায় সাড়ে নয়টা। হীরক স্নান করতে গেছে। উপেন দাড়ি কামাচ্ছে। স্নানের প্রস্তুতি নিচ্ছে। অঞ্জলিকে উপেন বিদ্রুপ করে বলল, তোমার পিসি এসে তোমার কাছ থেকে কী আদায় করে নিল আজ? অঞ্জলি না শোনার ভান করে রইল। মনে মনে রাগ হল খুবই। সবকিছুতেই উপেনের নাক গলানো ভাব অঞ্জলি মোটেই পছন্দ করে না। তাই কোনো উত্তর দিল না। উপেন কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ স্নান করতে চলে গেল। স্কুলে রওনা হওয়ার আগে অঞ্জলি উপেনকে বলল, তোমরা তো পল্টুর দোকানে চা খাও। শ্বশুর বাড়িথেকে ফিরলে পল্টকে একটু বুঝিয়ে বলবে তো মাকে একটু দেখাশুনা করতে। সন্তান হয়ে মাকে কষ্ট দেওয়াটা কি ঠিক? তুমিই বলো। নিজের পাপ নিজেই কুড়ুচ্ছে! উপেনের পছন্দ হল না কথাগুলো। তাই উপেন বলল, ছাড়ো তো ওদের কথা, অশিক্ষিত মূর্খ কতগুলি। আমি এসব বলতে টলতে পারব না। তোমার সঙ্গে দেখা হলে তুমিই বলো। হাতে ছাতা নিয়ে উপেন বেরিয়ে পড়ল। হীরক আগেই চলে গেছে। অঞ্জলি উপেনের এই সমস্ত উপেক্ষার কথা শুনে খুব বিরক্ত হল। মানুষটা যে কী ধরনের—অঞ্জলি আজও বুঝে উঠতে পারল না। কাল রাতে ফিরেছে ছেলের সাথে দেখা করে। যতটুকু অঞ্জলি জিজ্ঞেস করেছে ততটুকুই উপেন উত্তর দিয়েছে। মায়ের মন ছেলের ব্যাপারে কতকিছুই তো জানতে ইচ্ছে করে। বলেছে তো অলক এ সপ্তাহের শেষে আসবে — দেখা যাক কবে আসে।

ভাদ্র মাসের খাঁখাঁ করা রোদ যেন নয়নপুরকে ঝলসে দিচ্ছে। কাঠফাটা রোদে রাস্তায় মানুষের চলাচল খুবই কম। দুপুরের প্রবল উত্তাপে গাছের শুকনো পাতার মর্মর শব্দ শোনা যাচ্ছে। হীরকের আসার সময় হয়ে আসছে। নাকি টিউশন সেরে আসবে কে জানে। কিছুই তো বলে না ছেলেটা। অঞ্জলিরও এত মনে থাকে না কোন্ কোন্ দিনে টিউশন থাকে। সংসারের একঘেয়েমিতে অঞ্জলি অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে ঠিকই, কিন্তু আবার এ সংসার ছেড়ে কোথাও দুদিন থাকতেও মন চায় না। নিজের সংসারের এমনিই বন্ধন। প্রায়ই ভাবে ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে দুটো দিন কাটিয়ে আসবে। কিন্তু সংসারের নানা ঝামেলায় হয়ে ওঠে না। কে রান্না

করবে, কে বাড়ি পাহারা দেবে—এইসব সমস্যাই আসল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। খালি বাড়িতে থাকলে অঞ্জলি বসে বসে এইসবই ভাবে। চিন্তাভাবনার কুলকিনারা খুঁজে পায় না। বৃদ্ধা মার কথা প্রায়ই মনে পড়ে, তিন ভাইয়ের মধ্যে ছোটো ভাইটাই মাঝেমধ্যে আসে দিদির বাড়িনয়নপুরে। ওর কাছেই যা মার খবরাখবর পায়। গত জামাইষষ্ঠীতে অবশ্য সবাই গিয়ে এসেছে রহিমপুরে। এখান থেকে বেশি দূরও নয়। তবুও যাওয়া হয় না। অঞ্জলি ভাবছে এবার পজোতে মাকে এনে কয়েকদিন অন্তত নিজের কাছে রাখবে। স্বামী হিসেবে উপেন যথেষ্ট ভাল হলেও এ ব্যাপারে একটু উদাসীন। সে বড় একটা শ্বশুরবাড়ির ধারে কাছে ঘেঁষে না। এ নিয়ে অঞ্জলির কোনো মাথাব্যথা নেই। সবার তো আর সব গুণ থাকে না। মাঝখানে মার খুব শরীর খারাপ হয়েছিল। বার্ধক্যজনিত অসুখ। তখন উপেন গিয়ে শাশুড়ি মায়ের খোঁজ খবর নিয়ে এসেছিল। তিন ভাইয়ের বৌয়েরা মোটামুটি ভালই দেখাশুনো করে শাশুড়িকে। এজন্য অঞ্জলি নিশ্চিন্ত। এইসব ভাবতে ভাবতে অঞ্জলি দেখল হীরক এসে গেছে। তার মানে আর পড়তে যায়নি। হীরককে খাবার দিয়ে বিকেলের টুকিটাকি কাজগুলো অঞ্জলি সেরে নিল। উপেন এলে চা করবে। চুলটুল বেঁধে মোটামুটি বিকেলের প্রসাধন সেরে নিল। উপেনের অপেক্ষায় বসে রইল। যদি তাড়াতাড়ি আসে তা হলে চা-টা করে দিয়ে একটু ঘুরে আসবে কাছাকাছি কারুর বাড়ি থেকে। দমফাটা গরমে কোথাও গিয়েও শান্তি পাওয়া যায় না। তার উপর আবার লোডশেডিং তো আছেই। অঞ্জলি সবসময়েই ভাবুক প্রকৃতির। কাজের ফাঁকে ফাঁকে কতরকম চিন্তাই না ওকে ঘিরে রাখে। গ্রামের অসহায় দরিদ্র মহিলাদের কথাও ওর মাথায় ঘুরপাক খায়। কিন্তু কী করার আছে। উপেনের সঙ্গে এইসব আলোচনা করলেও বড় বেশি একটা গুরুত্ব পায় না। উপেনের ভাষায়, 'নিজের খেয়ে বুনো মোষ তাড়ানোর' কী দরকার। উপেন একটুও বোঝে না যে অঞ্জলির সচেতনতা বোধ যথেষ্টই রয়েছে। সে সাধারণ মাপের মেয়ে নয়। একটু হলেও আলাদা স্বভাবের। হোক না শিক্ষাগত যোগ্যতা কম, তাতে কী আসে যায়। সুষ্ঠু মানসিকতা গড়তে পুঁথিগত বিদ্যার দরকার হয় না। দরকার হয় মুক্ত আকাশের মতো মন। অঞ্জলির ধারণা উপেনের মতো স্বামী বলেই তাকে এতদিনেও বুঝে উঠতে পারল না। কারণ উপেন স্বামী হিসেবে ভাল হলেও যথেষ্ট আত্মকেন্দ্রিক প্রকৃতির লোক। তাই অঞ্জলির সবসময়েই একটা ক্ষোভ থেকেই যাবে। রান্না, ঘর-গেরস্থালির কাজ ছাড়া অঞ্জলি এ পৃথিবীতে এসে আর কিছুই করতে পারল না। ছোটোবেলায় পিতৃহীন হওয়ায় পড়াশুনোও করতে পারেনি অঞ্জলি। তবে অঞ্জলি জানে এটাই তার ভাগ্য যে উপেনের মতো শিক্ষিত লোককে সে স্বামী হিসেবে পেয়েছে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দেখল নীরদের বৌ রমা এসেছে। মনে মনে খুশিই হল অঞ্জলি। কিছুক্ষণ সময় তো কাটানো যাবে। অঞ্জলি তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে বলল, এসো ভাই এসো— বোসো। বলে নিজেও বসল রমার পাশের

সোফায়। রমার পরনে দামি শাড়ি না হলেও বেশ ছিমছাম চেহারায় ভালই লাগছে দেখতে। রমা অঞ্জলিকে বেশ মান্য করে। তাই গল্প করতে অঞ্জলির কাছে প্রায়ই আসে। অঞ্জলি রমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, বেশ সুন্দর লাগছে তোমাকে রমা। বেশ হাসিখুশিও দেখাচ্ছে। কী ব্যাপার? রমা লজ্জানম্র ভঙ্গীতে বলল, না দিদি-কিছুই তো না। আপনি আমাকে ছোটো বোনের মতো ভালবাসেন তো তাই সবসময়েই আপনি আমার ভালটাই দেখেন। ঘরে বসে থেকে সময় কাটছিল না, তাই আপনার সঙ্গে গল্প করতে এলাম। অঞ্জলি এক গাল হাসি দিয়ে রমার হাত ধরে বলল, খুউব ভাল করেছ। আমি তো গল্প করতে ভালই বাসিগো রমা। তা তোমার শাশুড়ির কী খবর। ঘুম থেকে উঠেই নিশ্চয়ই আরম্ভ হয়ে যায় তোমার দোষক্রটি ধরা? সত্যি, মহিলার ভাগ্য ভাল তোমার মতো ছেলের বৌ পেয়েছে। রমা অঞ্জলির কথায় সায় দিয়ে বলল, আর বলবেন না দিদি। এত করার পরও ওঁর মন আজও পাইনি। বেশি বেশি করি বলেই হয়তো .....। অঞ্জলি বারেবারেই বাইরের দিকে তাকাচ্ছে উপেন এল কিনা দেখতে। তিনি আবার এসব নিন্দাচর্চা একদমই পছন্দ করেন না। তাই ভয় আর কী যদি এসে শুনে ফেলে। হীরক উঠানেই হাঁটছিল। মার তাকানো দেখে বুঝে নিল যা বোঝার। মাকে বলল, মা চালিয়ে যাও, কোনো ভয় নেই। আমি আছি এখানে। বাবা এলে আমি তোমাকে ইশারা করব। কেমন? হীরকের উক্তিতে রমা হেসে ফেলল। অঞ্জলি ঘরের দরজায় এসে বলল, দাঁড়া হতচ্ছাড়া, পড়াশুনো ছেড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শোনা হচ্ছে? দাঁড়া আমি আসছি, বলে ছেলেকে তাড়া করল ঘরের দিকে। হীরক ওরে বাপরে বলে দৌড়ে ঢুকে গেল নিজের ঘরে। অঞ্জলি হাসতে হাসতে এসে রমাকে বলল, দেখলে — কী ফাজিল হয়েছে ছেলেটা? তুমি কিছু মনে কোরোনা ভাই, কেমন ? তুমি একটু বোসো একটু চা করে নিয়ে আসছি। চা খেতে খেতে গল্প করা যাবে। পড়ার ঘর থেকে হীরক আওয়াজ দিল, মা, আমি করে দেব চা? তোমরা বসে গল্প করো—দেখবে কেমন ফার্স্ট ক্লাস চা করে খাওয়াই। বলে মার উত্তরের অপেক্ষায় রইল। অঞ্জলি শুনে খুশীই হল। কিন্তু নিজে সে গল্প করবে আর ছেলে চা করে খাওয়াবে এটা মন থেকে মেনে নিতে পারল না। তাই হীরককে বলল, না তোমাকে কিছু করতে হবে না। হাতমুখ ধুয়ে পড়তে বসে আমাকে উদ্ধার করো। তাতেই হবে। বলে চলে গেল রান্নাঘরে চা করতে। রমা বসে বঙ্কিম রচনাবলীর পাতা উল্টাতে লাগল। যদিও এটা ওর বোধগম্যের মধ্যে পড়ে না। সাহিত্যের ভাষা বুঝলে তো ! কারণ রমার দোষ নেই। পড়াশুনো একরকম হয়নি বললেই চলে। শিক্ষার মান ওদের খুবই নিচু। অঞ্জলি উপেনের চা করে ঢাকা দিয়ে দু কাপ চা বিস্কুট নিয়ে এসে বসল। দেওরের বিয়ের কথা বলল রমা। আশ্বিনের চৌদ্দ তারিখ বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে। আরও প্রায় মাসখানেক বাকি। অঞ্জলি স্পষ্ট ভঙ্গীতে রমাকে বলল, যাই বল না কেন রমা, পণ নেওয়ার ব্যাপারটা আমি কোনো মতেই সমর্থন করতে পারছি না। আমি কেন এ গ্রামের অনেকেই এটার বিরোধিতা করছে। রমা

বলল, এ ব্যাপারে আমার কী বলার আছে বলুন? এরা তো আমার বিয়েতেও পণ নিয়েছে। আমার বাবাও তো যথেষ্ট গরিব, তারপরেও তাকে রেহাই দেয়া হয়নি। অঞ্জলি আর কথা বাড়াল না। রমা চায়ের কাপগুলো বারান্দায় রেখে দিল। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। তাই রমা আর বসতে চাইল না। বলল, দিদি— একদিন আসুন না আমাদের বাড়ি। অঞ্জলি বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ যাব। বিয়ের বাজার টাজার হলে খবর দিও, তখন দেখে আসব। তুমি এসো আবার, কেমন? বলে অঞ্জলি রমাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিল। তারপর এসে ঠাকুর ঘরে তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালল। হীরক পড়তে বসেছে। আরেকটু পরে ওর টিফিনও তৈরি করতে হবে। গরমে হাঁসফাঁস করছে শরীর। আকাশে অল্পবিস্তর মেঘ থাকলেও বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। ধানের খেতে ফাটল ধরেছে। নালাপুকুর বৃষ্টির অভাবে শুকিয়ে গেছে। নয়নপুর কেন, আজ বাংলার সব পল্লীগ্রামের চেহারাই নিদারুণ হয়ে উঠেছে।

সারাদিনের ক্লান্তির ছাপ মাখিয়ে উপেন এসে বাড়িতে ঢুকল। অঞ্জলি দেখেই বুঝল দেরি হওয়ার কারণটা। উপেন একেবারে বাজার করেই এসেছে। এখন থেকে প্রস্তুতি চলবে রান্না খাওয়ার। অঞ্জলি একা হাতে সব সামলায় বলে চাপটা পড়ে বেশি। উপেন ব্যাগটা অঞ্জলির হাতে দিয়ে বলল, মাছ কাটিয়েই এনেছি। শুধু মাছের ঝোলভাত করো। আর কিছু করতে হবে না, বুঝলে? অঞ্জলি ভাবল কী দরদই না দেখাচ্ছে তার স্বামী। আর এই লোকটাই এক গ্লাস জল ভরেও খায় না। তার এই উল্টোপাল্টা ব্যক্তিত্ববোধ অঞ্জলির মোটেও পছন্দ নয়। সংসার হল স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার পবিত্র তীর্থস্থান। সেখানে যদি সাংসারিক কাজকর্ম দুজনে মিলেমিশে করা যায়, তাহলে দোষটা কোথায়? পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষদের একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই উপেন মজুমদার। যদিও অঞ্জলির সংসারে এসব নিয়ে কোনো মতানৈক্য নেই, কোনো অশান্তিও নেই। সহজ সরল স্বভাবের এই অঞ্জলি সবই মানিয়ে নিয়েছে। এই সংসারকে ভালবাসার পীঠস্থানই বানিয়ে রেখেছে।

সাংসারিক কাজের ব্যস্ততায় জীবন যে কখন অপরাহ্নের আলোর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে তা অঞ্জলি বা উপেন কেউই টের পায়নি। অনেক কায়ক্লেশ, দুঃখযন্ত্রণা, তার সাথে আনন্দ সুখ, সব পেরিয়েই আজ ওরা বার্ধক্যের কোঠায় এসে পা দিয়েছে।

রাত বেড়েছে, খাওয়াদাওয়ার পাট চুকে গেছে। চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। ঝিঁঝি পোকার ডাক এই অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতকে ছাপিয়ে বেড়াচ্ছে। হীরক শুয়ে পড়েছে। উপেন মাত্র বিছানায় উঠেছে। অঞ্জলি ঘরের দরজা বন্ধ করে টি.ভি. দেখতে বসেছে। দূরের থেকে কীর্তনের সুর ভেসে আসছে। গরমে এক দুটো জানালা খুলেই রাখে। রাস্তা দিয়ে এখনও অল্পস্বল্প লোকের আনাগোনা চলছে। নয়নপুরে কোনোদিনই চোর ডাকাতের উপদ্রব ছিল না। এখনও নেই। তাই নয়নপুরের মানুষ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে পারে। তবে মাতালের দৌরাত্ম্য কমবেশি ঠিকই আছে। রাস্তার ধারে যাদের বাড়িঘর তারাই বেশি টের পায় এই অহেতুক ঝামেলা।

ভোরের আকাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তবে গরমটা বেশ গুমোট। স্নান করা ছাড়া শরীর ঠান্ডা করার আর কোনো উপায় নেই। মণিময় নয়টার মধ্যেই স্নানের পর্ব সেরে নিল। এখন একটু আরাম বোধ হচ্ছে। এমনিতেও আজ তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে। স্কুলে পরীক্ষার মিটিং আছে। স্কুল শুরুর আগেই এই মিটিংয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। তাই দশটার মধ্যে চলে যেতে হবে স্কুলে। খাওয়া-দাওয়া সেরে মণিময় প্রস্তুত হয়ে ছাতাটা মনে করে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল স্কুলের উদ্দেশে। বাড়ির গেট পেরিয়ে রাস্তায় পড়তেই উপেনের সঙ্গে দেখা মণিময়ের। বেশ ভালোই হল। এইটুকু রাস্তা তো! বেশ গল্প করতে করতে চলে যাওয়া যাবে। উপেনও মণিময়কে পেয়ে খুশি হল। ভাবল রেখার সম্বন্ধের ব্যাপারে এখুনি বলবে কিনা। যাক এখন বলে কাজ নেই। পরে সময় করে বললেই চলবে। ভাবতে ভাবতে উপেন মণিময়ের সাথে হাঁটতে হাঁটতে স্কুলে গিয়ে পৌঁছে গেল। যা গরম পড়েছে। স্টাফরুমে গিয়ে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিল। আর মিনিট দশেক বাদেই শুরু হবে মিটিং হলঘরে। রক্ষা দু-তিনটে ফ্যান চলে হলঘরে। হেডমাস্টার মশাই-এর পৌরোহিত্যে মিটিং সম্পন্ন হল। পুজোর ছুটির আগেই পরীক্ষা শেষ করে খাতাপত্র দেখে জমা দিয়ে দিতে হবে। স্কুলের কিছু কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকা যার যার ক্লাশে চলে গেছে নিজের নিজের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পাদন করতে। মণিময়ও চলে গেছে ক্লাশে। উপেন বসে আছে। ভাবছে একটু চা খেলে ভালই হতো। মাসিকে তো দেখা যাচ্ছে না। আসেনি নাকি! ভাবতে ভাবতেই মাসি এসে ঢুকল। উপেন মাসিকে বলল, মাসি একটু চা খাওয়াবে না কি? মাসি একটু হেসে বলল, হ্যাঁ স্যার খাওয়াব। তবে একটু দেরি হবে। মাত্র জলটা চাপিয়েছি। বলে রেজিস্ট্রি খাতাটা নিয়ে আবার চলে গেল। শৈল মাসির বয়স অনেক। তাই সকলের সঙ্গেই খবরদারি করে। তবে সব স্যার দিদিমণিদের সম্মানও করে। ওর স্বামী এই স্কুলেই চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ছিল। হঠাৎ মারা যাওয়াতে শৈলমাসি এই চাকুরিটা পায়। এই স্কুলের জন্য খুব টান। অনেক কাজের মধ্যে চা করাটাও ও নিষ্ঠার সঙ্গেই করে। সবাইকে খুশি করেই চলে এসেছে এতদিন। এই চাকরিই ওকে একসময় চরম দারিদ্র্যের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। এখন তো মোটামুটি ভালই আছে। দুটো ছেলে আর একটা মেয়ে নিয়ে ওর সংসার ছিল। মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে অনেক দিন। ছেলেরা মেয়ের ছোটো। বাবা মারা যাওয়াতে ছেলেরা বেশি পড়াশুনা করতে পারেনি। দুই ছেলেই বিয়ে করেছে। তাদেরও সন্তানাদি আছে। শৈলমাসি ওদের সঙ্গেই থাকে। ছেলে দুটোই মায়ের কষ্টের মূল্য দিয়েছে। একটা নাতি এই স্কুলেই পড়ে ক্লাস সিক্সে। হঠাৎ আবার এসে ঢুকল মাসি, বলল উপেনকে স্যার, রাগ করলেন না তো ? কী করব বলেন,এতগুলো চা তো, তাই আর কী। উপেন মাসির দিকে তাকিয়ে বলল, আরে নাগো মাসি — রাগ করব কেন ? এর পরেই আমার ক্লাস আছে। তাই বলছি তুমি তোমার সময়মতোই চা দিও। শৈলমাসি একগাল হেসে পান চিবুতে চিবুতে চলে গেল। সবসময়েই গালভর্তি পান থাকে। মাথার চুল প্রায় সবই সাদা। বয়স অনুপাতে স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালই।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই থাকে সবসময়ে। বয়স্ক মানুষ হিসেবে টিচাররা মোটামুটি সবাই একটু সমীহ করেই চলে। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী বলে অবজ্ঞা করে না। আবার দু-চারজন টিচার আছে যারা নাকি শৈলমাসিকে দপ্তরি হিসেবেই ফাইফরমাস খাটায়। এই রকম কদর্য আচরণে অনেকেই আবার ক্ষুব্ধ। স্কুল ছুটির পর মণিময় উপেন একসাথেই বেরোল। উপেন রেখার বিয়ের সম্বন্ধের ব্যাপারটা বলতে গিয়েও বলল না। মণিময়ের বাড়িতে গিয়েই বলবে। তা হলে শোভাও সামনে থাকবে। এটাই ভাল হবে। পড়ন্ত রোদে বিকেলটা ভালই লাগছে। অসহনীয় গরমটা এখন আর বোধ হচ্ছে না। গাছের পাতাগুলোও একটু একটু নড়ছে। মণিময় উপেন দুজনেই দুজনের বাড়ি চলে গেল।

রেখা টিউশনির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে ভাবল চম্পাকে একটু ডেকে নেয়া যাক। গেলে তো খুউব ভালই হয় তাহলে দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে টিউশনি সেরে একটু বাজারে যাবে। টুকিটাকি জিনিসপত্র কেনার আছে। অনেকদিন দোকানপাটের দিকে যাওয়া হয় না। তাই রেখা একটু বিকেল বিকেল বেরিয়ে পড়েছে। চম্পার বাড়িতে গিয়ে ঢুকে দেখল বারান্দায় হরিমোহনের স্ত্রী বসে আছে। খুব জমিয়ে গল্প করছে। চম্পার মা শান্তিবালা দেবী মাদুর পেতে নিচে বসে হরিমোহনের স্ত্রী লাবণ্যর সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। রেখা ঢুকে একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। শান্তিবালা রেখাকে ডাকল ঘরে যাওয়ার জন্য। চম্পা সেখানেই আছে। রেখা মাথা নুইয়ে ঘরে গিয়ে দেখল চম্পা প্রস্তুত হচ্ছে বেরোবার জন্য। রেখাকে হঠাৎ দেখে অবাক হয়ে বলল, আরে রেখা তুই ? বোস বোস। বলে চুল আঁচড়াতে লাগল। রেখা ফিসফিস করে বলল এই শোন্ — এই মহিলা এখানে ? কী ব্যাপার ? চম্পা হেসে বলল এই মহিলাকে তুই চিনিস না ? এ তো হরিমোহন মজুমদারের স্ত্রী। রেখা বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ চিনি আমি। তোকে আর চেনাতে হবে না। তোদের বাড়িতে যাতায়াত আছে বুঝি ? চম্পা এসে রেখার পাশে বসে বলল, না সে রকম কিছু না। তিনিই আসেন — মা তো যায়ইনি কোনোদিন। তবে কি জানিস রেখা, লাবণ্য মাসি কিন্তু খুব ভাল। একদম অন্যরকম। রেখার বেশি পছন্দ হল না কথাগুলো। বলল, বুঝেছি - চল্ চল্ - তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি। একটু দোকানের দিকে যাব। বলে রেখা উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। চম্পা বাজারের কথা শুনে কিছু টাকা ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল রেখার সঙ্গে। শান্তিবালা দেবী ওদের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, চম্পা, তাড়াতাড়ি চলে আসিস ? কিছু সবজি কিনে আনিস। বলে লাবণ্যের সঙ্গে আবার কথা বলতে লাগল।

চম্পা ও রেখা টিউশন শেষ করে বাজারের দিকে রওনা হল। বাজারের কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেল। বাজে প্রায় সাড়ে ছয়টা, সন্ধ্যা উতরে গিয়ে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। দুজনেই ভাবতে লাগল কী করা যায়। সন্ধ্যার পর দোকানপাটের পরিবেশও বেশি ভাল থাকে না। গ্রামের বাজার বলে কথা। কিছু কিছু দোকানে ইন্ভার্টারের লাইট জ্বলছে। দুজনেই ভাবতে ভাবতে এগোচ্ছে, হঠাৎই নীরদের বৌ রমার সঙ্গে দেখা। দুজনেই একটু

আশ্বস্ত হল, রেখা বলল, কী গো কাকিমা বাজার করতে এস্ছ বুঝি? রমা হেসে উত্তর দিল, হ্যাগো - কিছু কেনাকাটার ছিল — দেখো না হঠাৎ লাইটটা চলে গেল। চম্পা দেখল রমার একটা ব্যাগ ভর্তি। কী জানি কী আছে এতে! তাই রমাকে জিজ্ঞেস করল, কিছু তো নিশ্চয়ই কিনেছ? ঐ ব্যাগটা তো ভর্তি, দেখা যাচ্ছে। আমরা তো এইমাত্র এলাম, এখন কী যে করি ! রমা বলল হ্যাঁ, হ্যাঁ কিছু কাপড়চোপড় মানে পর্দার কাপড়টাপড় কিনেছি। ভেবেছিলাম সবজি বাজারে ঢুকব, তা এখন আর কী করে সম্ভব বলো? তা তোমরা কী কিনতে এসেছিলে গো ? বলে উৎসুক দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। রেখা ওদেরকে বড় একটা পছন্দ করে না, তবুও রেখা বলল আমরা? আমরাও সব্জীই কিনতে এসেছিলাম, বলে চম্পার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপ দিল। চম্পা মনে মনে একটু বিরক্ত হল — কী দরকার ছিল রেখার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলার। তাই চম্পা একটু জোরেই রেখাকে বলল, চল্তো বাড়ি চলে যাই। কীগো কাকিমা — বাড়ি যাবে তো? তা হলে চলো একসাথেই যাই। তারপর হাঁটতে লাগলো। অন্ধকার, ঝিঁঝি পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে। এবড় থেবড় পথ। তিনজনে গল্প করতে করতে হাঁটতে লাগল। রেখা রাগে ফুঁসছে। এমনিতে বেরোবার সময়তো পায়ই না। আজ যাও একটু বেরিয়েছি, তাও ভণ্ডুল হয়ে গেল। রাস্তার ধারের দোকান থেকে আলুর চপ, বেগুনি কিনে নিল বাড়ির জন্য। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই ঝম্ঝম্ করে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। রমা আর চম্পা তো আগেই ঢুকে গেছে যার যার বাড়িতে। রেখা দৌড়ে গিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়ল। তখন মনে হল রেখার — না, ভালই হয়েছে তাড়াতাড়ি এসে। নয়ত বৃষ্টিতে আটকে যেত। মা-বাবা চিন্তায় অস্থির হয়ে যেত।

ঘন অন্ধকার — কৃষ্ণপক্ষের রাত। সামনেই অমাবস্যা। বৃষ্টি সহসা থামবে বলে মনে হচ্ছে না। সন্ধ্যারাতকেই মনে হচ্ছে গভীর রাত। মা-বাবা দুজনেই ঘরে বসে ভাবছে মেয়ের কথা, এরই মধ্যে রেখা ঢুকল ঘরে। সালোয়ার কামিজটা সামান্য ভিজেছে। রেখাকে দেখেই শোভা দৌড়ে একটা গামছা নিয়ে এল। চেঁচিয়ে বলে উঠল, কী যে করিস না তোরা। এসময় ছাতা নিয়ে বেরোতে হয় তো! সবই কি বলে দিতে হবে ? একদম ভিজে গেছিস। বলে গামছাটা রেখার হাতে দিয়ে দিল। রেখাকে জিজ্ঞেস করে রেখার জন্য চা আনতে গেল রান্না ঘরে। বাইরে মেঘের তর্জনগর্জন শোনা যাচ্ছে। এদিকে লোড্শেডিংয়ের সময় হয়ে এসেছে। রেখা নিজের ঘরে গিয়ে পোশাক পাল্টে নিল। এসে বাবার পাশে বসল। রেখা বরাবরই বাপ্সোহাগি মেয়ে। খাওয়ার ঠোঙাটা বাবার হাতে দিল। শোভা চা নিয়ে এসে ঢুকল। রেখা জিজ্ঞেস করল, মা দাদা ফেরেনি? শোভা মুখ কালো করে উত্তর দিল না, আসেনি এখনও। ও আবার কবে এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে, বল্তো? মণিময় খুব মনোযোগ দিয়ে বেগুনি, চপ খাচ্ছিল। হঠাৎ শোভার কথার উত্তরে বলে উঠল এত চেঁচামেচি কোরো না তো, রোজই একটা ইস্যু

নিয়ে অশান্তি। এই বয়সের ছেলেদের কি ঘরে মন টেকে? তার মধ্যে চাকুরির খবরও কিছু আসছে না। বলে চোখ বুজে খেতে থাকল। শোভা বিরক্ত হয়ে মণিময়ের দিকে তাকিয়ে রেখাকে বলল, দেখলি — তোর বাবার কথার ছিরি। চাকরি নেই বলে কি শুধু শুধু ঘুরবে? তাছাড়া একটা ইন্টারভিউতেই চাকরি হয়ে যায়? বলে মণিময়ের দিকে আঙুল তুলে বলল, শোনো — আজ তুমি তোমার ছেলের সঙ্গে কথা বলবে। মণিময় মিটিমিটি করে শোভার দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ — কী ব্যাপারে কথা বলব। বলুন মহারানী। বলে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। শোভা দূর - ছাই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে একটা চেয়ারে বসল। রেখা বাবাকে বলল, বাবা, তুমি মাকে রাগাতে খুউব মজা পাও, তাই না? বলে চলে গেল টি. ভি.-র ঘরে। একটু টি.ভি. দেখে তারপর পড়তে বসবে। রেখাও ভাবছে বসে, মা-বাবার যে কত জ্বালা ওদের নিয়ে। অভাব, অনটনের মধ্যে দুই ছেলেমেয়েকে বড় করে তুলেছে। তারপর পড়াশুনা করানো। এখন আবার ছেলের বেকারত্ব — এটা যে কতটা অসহনীয় তা শুধু মা-বাবাই হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছে। তারপরে আবার মেয়েকে পাত্রস্থ করা। এই মুহূর্তে মণিময় শোভা খুবই অস্থির হয়ে পড়েছে রেখার বিয়ের জন্যে। রেখারও বিয়ের বয়স তো হয়েছেই। তারপর তো নিয়তির বিধানে কী লেখা আছে কে জানে। মণিময় সামনের সপ্তাহে খুব সম্ভবত ছোটোবোন কল্যাণীর বাড়ি যাবে দু-চারদিনের জন্য। অনেকদিন যাওয়া হয় না কৃষ্ণনগর। মনটা প্রায়ই খচ্‌খচ্‌ করে ছোটো বোনটার জন্য। এদিকে রেখার বিয়ের ব্যাপারে বা অসীমের চাকরির ব্যাপারেও কোনো খবরাখবর আসছে না। রেখার বিয়ে অঘ্রানে ধরার খুউব ইচ্ছে মণিময়ের। জেলেপাড়ার দক্ষিণে মণ্ডল পাড়ায় মণিময়ের সামান্য কিছু জমি আছে। ওটা বিক্রি করে আর নিজের জমানো সামান্য কিছু যা আছে তা দিয়ে কোনোরকমে হয়তো হয়ে যাবে। শোভা ছেলের জন্য অতটা এখন আর ভাবে না, কী হবে আকাশপাতাল ভেবে? যা হবে তা তো হবেই। মেয়েটাকে পাত্রস্থ করাই এখন সবচেয়ে বড় দায়। আর কোনো দায় নেই। গ্রামেও কিন্তু অনেক ভাল ছেলে রয়েছে। ওরা বেশির ভাগই বাইরে চাকরি-বাকরি করে আবার কেউ ব্যবসাও করে। শোভা মধ্যে মধ্যে এও ভাবে যে মেয়েটা যদি এদের মধ্যেও কাউকে নিজে পছন্দ করত তাহলে হয়তো বিয়েটা আরেকটু সহজ হয়ে যেত। কেননা মণিময় এসব ব্যাপারে খুবই উদার ভাবাপন্ন মানুষ। নিষ্ঠুর, কঠোর হতে সে শেখেনি। শোভার এজন্য মনে মনে খুব রাগ হয় মেয়ের উপর। মেয়েটা যে কী। আজকালকার মেয়েরা কতকিছু করে বেড়াচ্ছে! আর ও কিনা কাউকে পছন্দ করতে পারল না ! আবার পাশাপাশি এ-ও ভাবে, থাকগে একদিকে ভালই হয়েছে, কী না কী পছন্দ করে বসত, জাতে কুলে না হলে আরেক সমস্যার সৃষ্টি হত। বিধি যা লিখেছেন ওর কপালে তাই তো হবে। এসব উল্টোপাল্টা চিন্তা করে কী লাভ? মা, — বলে ডাক দিল রেখা। শোভা হঠাৎ চমকে উঠল, বলল কীরে

ডাকছিস কেন? রেখা মায়ের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, অন্ধকারে বসে কী ভাবছ বলতো? দাদাও তো চলে এসেছে। চল খাওয়া দাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক। চলো। কী হল? আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে, আমি যাচ্ছি রান্না ঘরে তুমি বাবাকে নিয়ে এসো। বলে রেখা চলে গেল ঘর থেকে। অসীমও রান্না ঘরে গেল। শোভা ঢুকে ছেলের দিকে কট্‌মট্‌ করে তাকাল। আজ আর কিছু বলবে না। খাওয়ার সময় খিচ্‌খিচ্‌ করলে মণিময় খুউব বিরক্ত হয়। তাই শোভা চুপচাপই রইল। অসীম মা-র চেহারায় রাগের ভাব দেখে মা-র দিকে তাকিয়ে বলল, মা, আজ মাছের ঝোলটা যা রেঁধেছ না — কী বলব। তাই না বাবা? মণিময় বুঝতে পেরে মৃদু হেসে উত্তর দিল, হ্যাঁ — ঠিক বলেছিস। দারুণ একদম। তবে মাছটাও খুব ভাল ছিল। তাই না গিন্নি? শোভা সবই বুঝতে পারল তাই কোনো উত্তরই দিল না। ওরাই বা কী করবে চুপচাপ উঠে চলে গেল। খাওয়ার পরে এই একই কাজ এখন আর ভালো লাগে না শোভার। এখন তো মেয়ে আছে বলে অনেকটাই সাহায্য পায়। বিয়ে হয়ে গেলে পুরোটাই তো শোভাকে করতে হবে। এখন মাঝেমধ্যে মনে হয় রান্নাবান্না করার জন্য লোক যদি রাখতে পারত তবে শোভা অনেকটাই বিশ্রাম পেত। কিন্তু সে ক্ষমতা কোথায় ? আরও যে কত বছর এমনিভাবে সংসারকে টানতে হবে কে জানে ? আর ছেলে বিয়ে করলে বৌ এসে সেবা করবে, রান্না করে খাওয়াবে সে আশা শোভা মোটেও করে না। শারীরিক অসুবিধা তো প্রায় লেগেই থাকে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে শরীরে ভাঙন তো ধরবেই। তাই সকাল থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত সংসারের সব দায়দায়িত্ব বহন করার মতো মানসিক বা শারীরিক ক্ষমতা কোনোটাই, মনে হয় শোভার নেই। অল্পেতেই ক্লান্তি বোধ করে। এটাও বোঝে সে সবই বয়সের দোষ। গতানুগতিক জীবন নিয়ে চলতে কত ভাল লাগে। কোথাও যাওয়া নেই, বেড়ানো নেই, কেন ? অল্প পয়সার সংসারে কি মানুষ শুধু একঘেয়েমি ভাবেই চলে ? সেখানে কি কারুর সখ -আহ্লাদ থাকতে নেই? মণিময়কেও শোভা দোষ দিতে পারে না, কেননা মণিময়ও কোনোদিন বেড়াতে যাওয়ার নামে কোথাও যায় না। সুতরাং তাকেই বা দোষ দিয়ে লাভ কী ? এই মানুষটাও তো সংসারের জন্য এখন পর্যন্ত সংগ্রাম করেই চলেছে। শোভার খুব কষ্ট হয় এই মহৎ মানুষটাকে কোনো ব্যাপারে দোষারোপ করতে। তাই তো অসীমের উপর খুউব ক্ষুব্ধ হয় শোভা মাঝে মধ্যেই। ও যদি কিছু একটা কাজটাজ পেত তা হলে সংসারের হাল কিছুটা ধরতে পারত। সারারাত ভাবনা চিন্তার মধ্যেই প্রায় কেটেছে শোভার। ঘুমটা কম হওয়াতে শরীরটা বেশি ভাল বোধ করছে না। কাকে বলবে ? ঠাকুর প্রণাম করে তাকিয়েই দেখল, রেখা চায়ের কাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে মনে খুব খুশি হল শোভা। এই না হলে মেয়ে! সকালবেলা রাস্তায় এত লোক! কিসের এত আলোচনা-উত্তেজনা! রেখা এগিয়ে গেটের কাছে গেল — দেখল পাশের বাড়ির রমা কাকিমা দাঁড়িয়ে আছে। রেখা বেশি উৎসাহ দেখাল না। জানতেও চাইল না কী

হয়েছে। ফিরে এল ঘরে। শোভা জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে রে রেখা ? কীসের এত ভিড় রাস্তায়। কিছু জানতে পারলি? রেখা অনিচ্ছায় বলল, না, মা— আমার এত সময় নেই। আমাকে একটু বাদে টিউশনিতে যেতে হবে। বলে ঘরে ঢুকে রেডি হতেলাগল। শোভা অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আজকাল ছেলেমেয়েরা বড়ই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। নিজেদের জগৎ ছাড়া আর কারুর কথা ভাবে না। যাকগে এসব ভেবে এখন আর লাভ নেই। যুগের হাওয়াই এইরকম। অনেক কাজকর্মও পড়ে রয়েছে। মেয়ে তো বেরিয়েই যাবে। কাজের লোকের তো সময়েরই জ্ঞান নেই। কখন আসবে, নাকি আসবেই না কে জানে। মণিময় একটু দেরি করেই ওঠে ঘুম থেকে। ছেলের কথা বলে তো লাভই নেই।

উপেনও রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছে। অঞ্জলি সবে উঠে চায়ের জল চাপিয়েছে। এগিয়ে এসে দাঁড়াল অঞ্জলি ঠিকই। কিন্তু ঠাওর করতে পারছে না কী ব্যাপার ! নয়নপুরে এইরকম জটলা প্রায়ই হয়ে থাকে কোনো না কোনো কারণে। তাই অঞ্জলি বেশি গুরুত্ব না দিয়ে চা নিয়ে বসল। উপেনের চা ঢাকা দিয়ে রেখে দিল। অদ্ভুত এই লোক। পরের দুঃখকষ্টে ঝাঁপিয়ে পড়া ওর অনেক পুরোনো অভ্যাস। আলাপ-আলোচনা শেষ করে কখন ঘরে ঢুকবে একমাত্র ভগবানই জানেন। এজন্য অঞ্জলির একেক সময় খুব বিরক্তি বোধ হয়। পরের ব্যাপারে এত মাথা ঘামানোর কী দরকার। নিজেদের সমস্যা কি কিছু কম আছে নাকি। বললে তো রক্ষা নেই। এসব সাতপাঁচ ভেবে সময় নষ্ট করলে তো আর অঞ্জলির চলবে না ? কাজে হাত দিতে হবে না ? অঞ্জলির এখন একটাই আশা, অলককে একটা বিয়ে করানো। যদিও এখনও দেরি আছে। কেননা বয়স এখনও কম, তাছাড়া মোটামুটি একটা ভাল আয়ের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত এইসব ভাবা নিরর্থক। তবুও অঞ্জলি মনে করে, আশা করতে অসুবিধা কী ? অনেক রকম আশা ভরসা নিয়েই তো মানুষ দিন কাটায়।

উপেন ফিরে এল রাস্তা থেকে। চা খেতে খেতে উপেন নিজের থেকেই বলতে লাগল, কী গো জিজ্ঞেস করলে না তো — কিসের গণ্ডগোল? অঞ্জলি বেশি গ্রাহ্য করল না কথাটা। আপন মনে তরকারি কাটতে লাগল। উপেন আপনমনে বলতে লাগল, শোন তবে আমিই বলছি — কাল রাতে হরিমোহনের বাড়িতে গণ্ডগোল হয়েছে। গণ্ডগোল মানে ওদের বাড়িতে গোপাল নামে একটা ছেলে কাজ করে। ওকে হরিমোহনের ছেলে বেদম পিটিয়েছে। বাচ্চা ছেলে তো, তাই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অঞ্জলি উপেনের দিকে কটাক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, মানে? দশ বারো বছরের এই নিরীহ ছেলেটাকে এইরকমভাবে মারল ? কেন মারল, কী তার অপরাধ — তার কোনো বিচারই হবে না? যদি মরে যেত? উপেন নিচু স্বরে বলল কি যে বলোনা, মরবে কেন ? তাছাড়া হরিমোহনের পরিবারে এরকম হওয়াটাই স্বাভাবিক। যেমনি বাপ, তার তেমনি ছেলে। অঞ্জলি বুঝল যে উপেন এই ব্যাপারটি নিয়ে এত ভাবছে না। তবুও

অঞ্জলি কৌতূহলী ভঙ্গিতে বলল, এটা নিয়ে এত জটলা ? কেউ তো আর ওর ছেলেকে শায়েস্তা করার সাহস পাবে না। তাই মুখে মুখে আলাপ আলোচনা করেই গোপালের জন্য সহানুভূতি দেখাবে। তাই না ? উপেন অবাক দৃষ্টিতে অঞ্জলির দিকে তাকাল। আর ভাবল বাঃ ওর কণ্ঠেও ফুটে উঠেছে প্রতিবাদী সুর। যে নাকি সারাক্ষণ স্বামী সন্তানের সংসারের চিন্তায় ব্যস্ত। বাইরের জগতের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই বললেই চলে। উপেন সন্তুষ্ট হল অঞ্জলির যুক্তিসঙ্গত কথাগুলো শুনে। তাছাড়া হরিমোহনের ছেলে রঞ্জন খুবই উচ্ছৃঙ্খল টাইপের ছেলে। পাড়ায় পাড়ায় সকাল থেকে এ নিয়েই জল্পনাকল্পনা চলছে নয়নপুরে। শিশুশ্রম আইনত দণ্ডনীয় । আজকাল গ্রামেশহরে সব জায়গাতেই এই কথা সবাই অবগত। তারপরেও হরিমোহন একটা গরিব শিশুকে আশ্রয় দেওয়ার নাম করে ওর সাথে এইরকম অমানবিক আচরণ করবে! এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু মেনে না নিয়ে উপায় কী ? কে যাবে ওর সঙ্গে কথা বলে অপমানিত হতে ? তাছাড়া অনেকেই ভাবে নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর দরকার কী ? আবার অনেকে পিছনে পিছনে হরিমোহনের বিরোধিতা করে বা করছে। লাভ কী ! তবে হ্যাঁ আজ কিন্তু নয়নপুর গ্রামের হরিমোহনের পাড়া তপ্ত হয়ে আছে এই গোপালের ইস্যুতে। উপেন - মণিময়ের বাড়ি থেকে হরিমোহনের বাড়ি বেশি দূরে নয়। এক পাড়াই বলা চলে।

স্কুল যাওয়ার পথে উপেন মণিময় এইসব নিয়ে কথা বলতে বলতেই স্কুলে ঢুকল। আজ শনিবার । স্কুল ছুটি হয়ে যাবে আড়াইটার সময়। মণিময় একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখে এনেছে ছুটির জন্য। সামনের বুধবার কল্যাণীর বাড়ি যাবে চার-পাঁচদিনের জন্য। সেটা আজই জমা দিয়ে দেবে ভাবছে। নয়ত ছুটি পাওয়া মুশকিল হয়ে যেতে পারে। গাঁয়ের স্কুলগুলো তো এইরকমই। পাওনা ছুটিও না-মঞ্জুর হয়ে যায়। শিক্ষকের অভাবের জন্যই এইরকম অব্যবস্থা। অফিসরুমে ঢোকার মুখে হঠাৎই মণিময়ের অপর্ণা দিদিমণির সঙ্গে দেখা। অপর্ণা দিদিমণি পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। মণিময়ই জিজ্ঞেস করল কী ব্যাপার অপর্ণাদি, কোনো খবরাখবর আছে কি ? থতমত খেয়ে অপর্ণাদি বলল, কিসের খবর দাদা ? মণিময় একটু অবাকই হল। বলল, মানে ? বেমালুম ভুলে গেলেন ? রেখার বিয়ের সম্বন্ধের ব্যাপারটা ? আপনাকে একটা ফটোও তো দিলাম। বলে মণিময় উত্তরের আশায় রইল। অপর্ণা দিদিমণি দায়সারাভাবে জবাব দিল, ও-মনে পড়েছে। ওরা কিছুই জানায়নি তো! মনে হয় ছেলের অন্য কোথাও ঠিক করাই আছে। আজকালকার ছেলে তো! বলে চলে যাচ্ছিল। মণিময়ের কথায় ফিরে দাঁড়াল। হ্যাঁ— তা তো হতেই পারে। এটার মধ্যে অন্যায়ও কিছু নেই। কিন্তু আপনি তো আমাকে কিছুই জানাবার প্রয়োজন মনে করলেন না, তাই না ? মেয়ের বাবা তো — তাই জানবার গরজটা বেশি তো আমারই। বলে বিষণ্ণ মনে মণিময় অফিসরুমে ঢুকে পড়ল।

নিয়তির বিধানকে তো মানতেই হবে। ঈশ্বর যা করেন ভালোর জন্যই করেন। রেখার বিয়ের সম্বন্ধের ব্যাপারেই বোনের কাছে যাওয়াটা পিছিয়ে দিয়েছিল। এখন আর শোভাকে কিছুই বলবে না মণিময় অপর্ণা দিদিমণির কথা। মায়ের মন - খাবাপ তো লাগতেই পারে। ঘুরে এসেই বলবে। যাওয়ার পর আগে কল্যাণীদের জন্য কিছু কাপড় টাপড় নিয়ে যেতে হবে।

ভাদ্রমাস প্রায় শেষ হতে চলেছে। পুজোও চলে আসছে। কুমোর পাড়ার তোড়জোড় চলছে মায়ের মূর্তি নিয়ে। পুজোর আগে যাবে বলেই বোন-ভাগ্নেদের জন্য নতুন কাপড় নেওয়ার প্রশ্ন। নয়ত কিছু টাকা দিয়ে এলেই চলত। মণিময় ভাবছে এক্ষুনি আর রেখার জন্য পাত্রের সন্ধান করবে না। যদি এমনিতে কোনো সম্বন্ধ আসে, সেটা আলাদা কথা। রবিবারে সব দোকানপাট বন্ধ থাকে। সোমবার বিকেলেই রেখাকে বলবে কাপড়চোপড় কিনে আনতে। স্কুল থেকে ফেরার পথেই একটু বাজার করতে হবে। হয়তো ঘরে তেমন কিছু নেই। দেখি — ভাল ইলিশ মাছ পাই কিনা। রেখাটা বড্ড ভালবাসে। আপনমনে বলতে বলতে স্কুল থেকে বেরিয়ে পড়ল মণিময়। রাস্তায় অন্যমনস্ক হয়েই হাঁটছিল। হঠাৎই সামনে এসে দাঁড়াল নিবারণ কোব্‌রেজ। বললেন, আরে - মণিময় যে। কী ব্যাপার, সেই যে রেখার জন্য জ্বরের ওষুধ নিয়ে গেলে, আর তো তোমার দেখা নেই ভায়া। বলে হা হা করে হাসতে লাগল। মণিময় মনে মনে বিরক্তই হল। আবার কিছুক্ষণ সময় নষ্ট। তবুও বিনয়ী ভাবেই তাঁর কথার উত্তর দিলেন।
নিবারণ কোব্‌রেজ এই নয়নপুরে পুরনো বাসিন্দা। গ্রামে তার যথেষ্ট সুখ্যাতি রয়েছে কোব্‌রেজ হিসেবে। রোজগার ভালমন্দে মেশানো। কোনোরকমে সংসার চালিয়ে নিচ্ছেন। নিঃসন্তান নিবারণ। সংসার বলতে শুধু তাঁর স্ত্রী। এই গাঁয়ের প্রত্যেক পরিবারের সঙ্গেই ওদের ভাল সম্পর্ক রয়েছে। প্রত্যেকের আপদে-বিপদেই এই কোব্‌রেজমশাই ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাই সবাই তাঁকে শ্রদ্ধার চোখেই দেখেন। মণিময়ের বাড়িতে তিনি এমনিতেও আসেন। বসে জমিয়ে গল্প করা আর চা খাওয়া তাঁর একটা অভ্যাসই বলা যায়। বাজারের মাঝামাঝি নিবারণ কোব্‌রেজের চেম্বার। এখানে ওষুধও বিক্রি হয়। নিজের এই গ্রামকে উনি অত্যন্ত ভালবাসেন। তাই পরিশ্রমও করেন যথাসাধ্য। তবে এখন বয়স তো হয়েছে। কিছুটা থিতিয়ে গেছে। মণিময়ের পরিবারের খুচখাচ সমস্যার ওষুধ তিনিই চালিয়ে দেন।
মণিময় বাজার থেকে ইলিশ মাছ কিনে বাড়ি ফিরল। ভাদ্রমাসের তালপাকা গরম। সহ্য হয় না একদম। তারপর তো লোডশেডিংয়ের দৌলতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। ইস্কুলে ছুটির দরখাস্ত দিয়ে দিয়েছে। সপরিবারে কোথাও যাওয়া হয়নি মণিময়ের বহুদিন। ছেলেমেয়ের পড়াশুনো। সংসারের

ঝামেলা কাটিয়ে হয়ে ওঠেনি। এবার ভেবেছিল সবাই মিলেই যাবে। কিন্তু রেখার পরীক্ষা সামনে—তাই আর সম্ভব হচ্ছে না। এমনিতে শোভা কোথাও বেরোবার আগ্রহ প্রকাশ করে না আজকাল। শোভাকে নিয়ে মণিময়ের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। প্রায়ই অসুস্থ থাকে। তার মধ্যে এখানকার ডাক্তারকে দিয়ে যতটুকু চিকিৎসা করানো যায় ততটুকুই। বড় ডাক্তার হলে কলকাতা যেতে হবে। অনেক টাকার প্রয়োজন। কোত্থেকে আসবে এই টাকা ! মণিময়ের ধারণা গরিবের জন্য ঈশ্বর আছেন। তিনিই যা করার করবেন। তাই মণিময় শোভাকে রেখার বিয়ের সম্বন্ধটা নাকচ হয়ে গেছে, সে ব্যাপারে মুখই খুলল না। বারান্দার মেঝেতে দুজনে পাশাপাশি বসে অনেক সুখ-দুঃখের কথা বলতে লাগল। সামনে বিশ্বকর্মা পুজো। যদিও নয়নপুরে একটাই পুজো হয়। বাসস্ট্যান্ডে পুজোটা হয় বিশাল আকারে। কলকাতা থেকে নামিদামী শিল্পীদের এনে বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন হয়। সেই থেকে নয়নপুরেও পুজোর ছোঁয়া লাগতে থাকে। গ্রামের প্রতিটি ঘরে ঘরে মায়ের আগমনীর জৌলুস মানুষের মনে আসতে শুরু করে। মণিময় রাতেই রেখাকে কল্যাণীদের জন্য জামাকাপড় আনার জন্য টাকা দিয়ে দিল। দিন তিনেক বাদেই মণিময় রওনা হবে। বাসে চেপে হাওড়া যাবে। তারপর আবার শিয়ালদা থেকে শান্তিপুর লোকালে চেপে কৃষ্ণনগর। জানালে হয়তো বা ভগ্নীপতি এসে স্টেশনে থাকবে। জানিয়ে লাভ নেই ব্যস্ত হয়ে পড়বে। এর চাইতে না জানিয়ে যাওয়াটা হবে অনেক আনন্দের। মণিময় ভাবছে এবার কল্যাণীকেই বলবে রেখার জন্য একটা পাত্র দেখে দিতে। তা হলে কল্যাণী অবশ্যই চেষ্টা করবে। আর কাকেই বা বলবে।

বুধবার ভোরে উঠে তৈরি হয়ে নিল মণিময়। বাইরে কাঠফাটা রোদ। গরমও তেমনি। শোভা জামাকাপড়ের সঙ্গে একটা ছোট্ট জলের বোতলও ঢুকিয়ে দিল। শুধু চা আর বিস্কুট খেয়ে বেরিয়ে পড়ল। সকাল সাতটার বাসটা ধরতে হবে। বেলা প্রায় দুটো বাজতে চলেছে। কৃষ্ণনগর স্টেশনে পৌঁছে একটা রিকশা নিয়ে নিল। অনেকটাই দূর স্টেশন থেকে। তবুও ভাল লাগছে মনটা। অনেকদিন বাদে বোনটাকে দেখতে পাবে। রিকশা হু হু করে চলছে হাইস্ট্রিট ধরে। রাস্তাও আগের চাইতে অনেক চওড়া হয়ে গেছে। দুধারে বড় বড় দোকানপাটে ভরে গেছে। মাঝখানে রিকশা থামিয়ে কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত মিষ্টির সরপুরিয়া কিনে নিল। রিকশা বেঁকে গিয়ে ঘূর্ণির রাস্তা ধরল। রাস্তা যেন শেষ হতে চাইছে না। ঘূর্ণি ছাড়িয়ে মেঠো পথে নামল রিকশা। তারপর এসে পৌঁছল কল্যাণীর বাড়ির দরজায়। কল্যাণী বারান্দায় বসে হাতপাখা নাড়ছিল। মণিময়কে ঢুকতে দেখে হাঁ করে রইল। বিশ্বাস হচ্ছিল না নিজের চোখকে। দৌড়ে এসে হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে উচ্ছ্বাসে আনন্দে চিৎকার করে উঠল। ছোড়দা তুই ? আয় আয় ভেতরে আয়। আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে তোকে বলে বোঝাতে পারব না। তা আগে জানাস নি কেন ? সত্যি তুই না আগের মতোই রয়ে গেলি। বলে মণিময়কে একটা প্রণাম করল এবং চেয়ারে বসাল। মণিময়ও খুশির আবেগে বোনকে জড়িয়ে ধরল। বলল, পাগলি কোথাকার।

নে ধর্ মিষ্টিগুলো। তোরা সবাই ভাল আছিস তো ? আরেকটা কথা — বলে চুপি চুপি সামনে গিয়ে বলল, আমার কিন্তু বড্ড খিদে পেয়েছে রে কণা। মণিময় আদর করে ওকে কণা বলেই ডাকে। কল্যাণী থতমত খেয়ে বলল, ছিঃ, এতক্ষণ শুধু বকবকই করে যাচ্ছি। আসল কথাই তোকে জিজ্ঞেস করা হয়নি। কল্যাণী রান্নাঘরে যেতে উদ্যত হলে মণিময় ব্যাগ থেকে তোয়ালে বের করতে করতে বলল হ্যাঁরে, তোর খাওয়া হয়েছে? কল্যাণী মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার খাওয়া হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, তুই আয় তো! বাইরে জল আছে হাত-মুখটা ধুয়ে নে। তাড়াতাড়ি আয়। খাওয়ার পরে অনেক গল্প করব। মণিময় বিস্ময় দৃষ্টিতে বলে উঠল, হ্যাঁরে কণা, আমার জন্য ভাত রাঁধতে হবে না? কল্যাণী বিরক্তির সুরে ঝাঁঝিয়ে উঠল, কী যে বলিস না ছোড়দা। রান্না করব ভাত ঠিকই, তবে এখন নয় একটু পরে। ওরা যাতে স্কুল থেকে এসে খেতে পারে। সে চিন্তা তোর নয় বুঝলি ? জানা থাকলে একটু মাংস রান্না করে রাখতাম। মণিময় এসে ডাইনিং টেবিলে বসল। প্রচণ্ড ক্ষিদেতে তৃপ্তি করে খেল মণিময়। খাওয়ার পরে শুয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিল। বয়সের মাপকাঠিতে এতটা ঝক্কি পোহানো চাট্টিখানি কথা নয়। কল্যাণী খুব সুন্দর করে গুছিয়ে রেখেছে ঘরদোর। ওতো বরাবরই পাক্কা সংসারী। এই অল্প মাইনেতেও খুবই ফিট্ফাট্ করে রেখেছে সংসারটাকে। নিজেই সব কাজ করে। মণিময় যত দেখছে ততই অবাক হচ্ছে। সেই ছোট্ট এক রত্তি মেয়ে কণা আজ কত সুন্দরভাবে সংসার করছে। সবই ঈশ্বরের আশীর্বাদ। যাকগে, অরুণ আর ভাগ্নে দুটো বাড়িতে এলেই নতুন জামাকাপড়বের করে সবাইকে দেবে। কল্যাণী এসে বসল মোড়া নিয়ে। সবার খোঁজ খবর নিতে শুরু করল। বারান্দায় বসে ভালই লাগছিল। হাওয়া বইছে অল্প অল্প। অসহ্য গরম থেকে সামান্য রেহাই বোধ হচ্ছে।

সংসারের খিটিমিটি থেকে দূরে এসে মণিময়ের ভালই লাগছে। তার উপর কল্যাণীর আন্তরিকতা। ভাইবোনের নিবিড় বন্ধন মণিময়কে কল্যাণীর শিশুকালের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। সন্তানের স্নেহে লালন পালন করেছে কল্যাণীকে। অনেক অভাব অনটনের মধ্যেই দিনাতিপাত করতে হয়েছে। তাই মণিময়ের সে সব অতীতের কথা মনে করে চোখ ছলছল করে ওঠে। আরেক দিকে স্বামীর ঘরে কল্যাণীর শান্তির পরিবেশ মণিময়কে আনন্দের অশ্রু ঝরাতে বাধ্য করে। ভাবছিল হঠাৎই দেখল কল্যাণী তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। বিকেলের পড়ন্ত রোদ বারান্দায় এসে পড়েছে। আর বসা যায় না। মণিময় হঠাৎই লক্ষ করল গেটের দিকে। দুই ভাগ্নে এসে ঢুকছে। চঞ্চল, মিষ্টি, ফুটফুটে। দুই বছরে যেন অনেকটাই বড় হয়ে গেছে। অবাক বিস্ময়ে মণিময়ের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। মণিময়ই এগিয়ে গিয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে বলল, কীরে তোরা চিনতে পারছিস না আমাকে? মনে নেই বুঝি ? বলতে বলতে ওদের নিয়ে ঘরে ঢুকল। রাজু, কল্যাণীর বড় ছেলে। সে ঠিকই চিনতেপেরেছে ছোটো মামাকে। ছোটো ছেলে রামু দ্বিধাগ্রস্ত মনে এদিকওদিক তাকিয়ে

জামা-জুতো খুলে গুছিয়ে রাখছে। চমৎকার দুটি ছেলে কল্যাণীর। মানুষের মতো মানুষ হয়ে বেঁচে থাকুক। এটাই মণিময়ের আবেদন ঈশ্বরের কাছে। দুজনেই হাতমুখ ধুয়ে ডাইনিং টেবিলে বসে পড়ল। কল্যাণী খাবার দিল এবং বলল, কী রে রাজু, চিনেছিস তো ছোটো মামাকে ? তোর তো ভুলবার কথা নয়। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে যাও মামার সঙ্গে বসে গল্প করো। তার আগে দুজনেই মামাকে প্রণাম করবি, বুঝলি ? সবই তো শিখিয়ে দিতে হয়। বলে রান্নাঘরে গিয়ে চায়ের জল চাপাল। মণিময় ঘরে পায়চারি করছে। অরুণ এখনও আসছে না! হয়তো বা চাকরির সুবাদে রোজই এরকম দেরি হয়। দেখল, ভাগ্নে দুটো খেয়ে দেয়ে নিজেদের থালা-বাসন ধুয়ে এনে রাখল। অপূর্ব কল্যাণীর শিক্ষা, সংস্কার। খাওয়া দাওয়া সেরে দুই ভাই ছোটো মামার পাশে বিছানায় এসে বসল। হঠাৎ মনে পড়াতে প্রণামটাও সেরে নিল। এরই মাঝে কল্যাণীও ছোড়দার জন্য চা নিয়ে এসে বসল। থমথমে ভাব। রাজু, রামু দুজনেই মাকে একটু ভয়ই পায়। তাই চুপচাপ বসে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। মণিময় বলল, হ্যাঁরে কণা, তোর ছেলেরা মানে আমার ভাগ্নে দুটো তো খুবই বাধ্যের ছেলে হয়েছে রে। কল্যাণী বলে উঠল, বাদ দে তো ছোড়দা ওদের কথা। তোর কথা বল্। অসীম এখন কী করছে ? কতদিন দেখি না ওকে। বল। মণিময় হেসে বলল, তুইতো এখন পাকা গিন্নী হয়ে সংসার করছিস। তোকে যেতে বলতেও তো .... । কল্যাণী ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, আমি সংসার করছি ? আর তোরা কী করছিস ? সংসার করছিস না ? অবিশ্যি তুই কী বুঝবি সংসারের। সবইতো বৌদির ওপর। সত্যি ছোড়দা — এমন বৌ পেয়েছিলিস বলে বর্তে গেছিস। নইলে .... মণিময় চায়ে চুমুক দিয়ে স্নেহের সুরে বলল, ছাড়তকশা, এসব কথা। তুই অসীমের কথা জিজ্ঞেস করছিলি না ? অসীম একটা সাধারণ কাজের ইন্টারভিউ দিয়েছে। এখনও কোনো খবরাখবর নেই। জানিস তো, ছেলেটা খুব ভেঙে পড়েছে বেকার বলে। আমি কী করব বল্ ? বলে মণিময় কল্যাণীর মুখের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কল্যাণী নরম সুরে মণিময়কে বোঝাল, এর জন্য অসীমের মন খারাপ করলে তো চলবে না। চেষ্টা তো চালিয়েই যেতে হবে। তাই না ? তাছাড়া তোরই বা কী করার আছে ? তুই বরং রেখার বিয়ের চেষ্টা কর্। হঠাৎ রাজুর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, কীরে এবার তোরা গল্প কর মামার সঙ্গে। আমি তোর বাবার জন্য একটু টিফিনের ব্যবস্থা করি। এক্ষুনি হয়তো চলে আসবে। বলে উঠে চলে গেল। প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, এখনো অরুণ এলো না। নতুন জামা কাপড়গুলোও দেওয়া হচ্ছে না। যাকগে — যখন আসবে তখনই দিতে হবে। মণিময় বসে ভাগ্নেদের সঙ্গে জমিয়ে গল্প করতে লাগল। পড়াশুনোর ব্যাপারেও খোঁজ খবর নিল। মণিময়ের মনে হল বড়টির চাইতে ছোটো ভাগ্নেটি অতি বুদ্ধিমান। এমনিতেও বড়রা একটু সহজ সরলই হয়। রাজু উঠে চলে গেল। মাকে জিজ্ঞেস করল, কী গো মা, বাবা এত দেরি করছে কেন ? কল্যাণী খিঁচিয়ে উঠে বলল, তা আমি কি করে বলব ? তোর বাবার কিসের এত রাজকার্য। বলে প্রদীপ নিয়ে তুলসীতলায়

চলে গেল। রাজু ততক্ষণে পড়ার ঘরে চলে গেছে। রামু বসে মণিময়ের সঙ্গে কথা বলছে। বাইরে আকাশটা কালো হয়ে এসেছে। কিছু কিছু মেঘ জমেছে। এই তীব্র গরমে কিছুটা বৃষ্টি হলে স্বস্তি পাওয়া যেত। তার উপর মশার উপদ্রব। মণিময় রামুকে জড়িয়ে ধরে বাইরের উঠানে এসে দাঁড়াল। আহা— কী সুন্দর ঠান্ডা বাতাস। মণিময় কল্যাণীকে দেখল ঘরদোর গোছগাছ করছে। উঠান থেকে হাঁক দিয়ে মণিময় বলল, কণা - যাই একটু বাজার থেকে ঘুরে আসি। একটু হাঁটাও হবে। কী বলিস ? কণা কাপড় ভাঁজ করতে করতে উত্তর দিল, কেন রে ছোড়দা—এই তো সবে এলি — আজকেই যেতে হবে বাজারে ? দূর তোর স্বভাবটা—না একটুও পাল্টাল না। মণিময় হেসে উড়িয়ে দিল। বলল, না, স্বভাব আমার ঠিকই আছে রে। বাজারে গিয়ে দেখতাম আর কী — কী মাছটাছ পাওয়া যায় রাতের বেলায়। তাহলে ....। বলে আড়চোখে তাকাল কল্যাণীর দিকে। কল্যাণী মুচকি হেসে বলল, ঠিক আছে ছোড়দা — তোমাদের জামাই আসুক না। এক সঙ্গেই যেও। তাই নয় কি? এখন বল, তুমি কি খাবে? মুড়ি বা চিড়ে ভেজে দেব? মণিময় কোনো উত্তর দিচ্ছে না দেখে কল্যাণী মণিময়ের হাত ধরে সবেগে বলল, আচ্ছা মানুষ তো তুই ছোড়্দা ? কোন্টা খাবি এটা বলতেও তোর লজ্জা আমার কাছে ? সত্যিই তুই একটুও বদলালি না। মণিময় নম্র ভঙ্গীতে বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে আমাকে অল্প করে মুড়ি ভাজা করে দে। ভেবেছিলাম অরুণ এলে একসাথেই খাব। তা তুই অরুণের জন্যও কিছু একটা করে রাখ্ না। তা সরপুরিয়া তো বাচ্চাদের দিলি না কণা ? বলে মণিময় টিভির সুইচটা অন্ করে দিল। এখনই খবর আরম্ভ হবে। প্রায় সাড়ে ছয়টা বাজে। ভাগ্নে দুটো পড়তে বসেছে। কল্যাণী রান্নাঘরে চায়ের ব্যবস্থা করছে আর অরুণের জন্য অপেক্ষা করছে।

গেট খোলার শব্দে কল্যাণী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখল অরুণ ঢুকছে। হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে। কল্যাণী এগিয়ে গিয়ে ব্যাগটা ধরল এবং বলল, কী গো এত দেরি হল? এই ব্যাগে কী আছে? বলে হনহন করে ঘরে গিয়ে ঢুকল যেখানে মণিময় বসে টিভি দেখছে। অরুণও পেছন পেছন ঢুকে মণিময়কে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রণাম করল এবং বলল, আমি আগেই জেনে গেছি আপনি এসেছেন। তা কেমন আছেন ছোড়দা? বলে শার্টের বোতাম খুলতে আরম্ভ করল। মণিময় খুশিতে গদ গদ হয়ে বলল, হ্যাঁ ভাই — আছি ভালই, মানে এই বয়সে যেমন থাকা দরকার। তুমি কেমন আছ? চাকরি বাকরি ভাল চলছে তো? অরুণ এসে পাশে বসে মণিময়কে বলল, তবে ছোড়দা — একটা কথা ঠিক আপনার বয়স বোঝা যায় না। বৌদি, রেখা, অসীম ভাল তো? যেতেও সময় পাই না। দেখা সাক্ষাৎও হয় না। হঠাৎ চেঁচিয়ে অরুণ কল্যাণীকে ডেকে বলল, কীগো — চা টা দিলে না আমাদের? এভাবে খালি মুখে কি আড্ডা মারা যায় ? কল্যাণী ট্রে-তে করে চা-মুড়ি ভাজা নিয়ে এসে বসল বিছানার উপর। কল্যাণী চা খেতে খেতে অরুণের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কী করে জানলে যে

ছোড়দা এসেছে। তাই বুঝি বাজার নিয়ে এসেছো। ভালই করেছ। তোমার এত বুদ্ধি কবে থেকে হল গো ? অরুণ মণিময়ের সামনে সলজ্জ ভঙ্গীতে বলল, কী যে বল না — আমি বাড়িতেই আসছিলাম। পোস্ট অফিসের সামনে হঠাৎ চন্দ্রনাথ বাবুর সাথে দেখা। তিনিই আমাকে বললেন ছোড়দা এসেছেন। এজন্য আমি একেবারেই বাজার করে নিয়েই ফিরলাম। এতে বুদ্ধির কী হল বলুন তো ছোড়দা? মণিময় ধীরে ধীরে বলল, ঠিক আছে ঠিক আছে। ভালই তো করেছে, আর বেরোতে হবে না। তবে অরুণ, আমিও কিন্তু যেতে চেয়েছিলাম। কণাটাই তো বাধা দিল। যাক বাদ দাও এসব কথা। এবার বলো তোমার খবরাখবর। অরুণ খুব বিনয়ী ছেলে। বিনয়ের সুরেই উত্তর দিল, আমার আর খবর কী থাকতে পারে বলুন। আপনি তো জানেনই ছোড়দা এ চাকরিতে কী পরিশ্রম। প্রায়ই গ্রামে গঞ্জেও যেতে হয়। আস্তে আস্তে বয়স তো বাড়ছে। তাই একটু পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ি আরকী। আর বাকি তো সব ঠিকই চলছে। আপনার বোনের উপর সংসারের চাপটা বেশি পড়ে — এই আর কি। ওদের পড়াশুনাটাও ওকেই দেখতে হয়। এবার বলুন তো ছোড়দা — রেখার বিয়ের সম্বন্ধ খুঁজছেন কি? আপনার চিঠি পাওয়ার পর থেকে আমরাও খুঁজছি। আসল কথা ভাল পাত্র পাওয়া খুবই মুস্কিল। মণিময় উঠে ব্যাগের থেকে ওদের জন্য আনা কাপড়গুলো বের করে নিল। তারপর কল্যাণীকে ডাকল। অরুণের সামনে কল্যাণীর হাতেই সব প্যাকেট দিয়ে দিল। কল্যাণী আড়ষ্টভাবে বলল, আচ্ছা ছোড়দা - প্রতিবারই কি দিতে হয়, আমি তো তোমাদের কিছুই দিতে পারি না। অরুণ মাথা নিচু করে বসে রইল। সে বরাবরই একটু লাজুক প্রকৃতির লোক। হঠাৎই কল্যাণীকে বলে উঠল, সত্যি, ছোড়দার সঙ্গে আমাদের কত তফাত তাই না? কল্যাণী আড়চোখে তাকিয়ে বলল, সে তো অবশ্যই। সংসার চালিয়ে আমরা তো কোনো কর্তব্যই করতে পারি না। কিন্তু ছোড়দা ? হাজার কষ্ট হলেও আমাদের প্রতি কর্তব্য ঠিক চালিয়ে যাচ্ছে। এই নাও তোমার প্যাকেট বলে — শার্টের প্যাকেটটা অরুণের হাতে ধরিয়ে দিল। মণিময় বাইরে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এল। আকাশের গুমোট ভাব, ধীরে ধীরে গরমটা বাড়ছে। বোনের বাড়িতেএসে তো আর খালি গায়ে থাকা যায় না। তাই লুঙ্গির ওপরে একটা গেঞ্জি চাপাতেই হয়েছে। কল্যাণীর ছিমছাম সংসার মণিময়কে খুব মুগ্ধ করেছে। একজনের রোজগারে খুব সুন্দর করে সংসার করছে কল্যাণী। তবুতো অরুণ একটা সরকারি চাকুরি করে। মেয়ে নেই — থাকলে তো তার বিয়ের জন্যও টাকা জমাতে হত। এখনই বা কী করছে কে জানে ! কিছু টাকা পয়সা তো সঞ্চয় করা অবশ্যই দরকার। সব কথা তো আর বোনকে জিজ্ঞেস করা যায় না। তাই মণিময়ের মনের মধ্যে একটা সন্দেহের দানা বেঁধেছে। দুটো ছেলের ভবিষ্যতের কথাও তো ভাবতে হবে। মণিময়ের তো আর তেমন আর্থিক সঙ্গতি নেই যে অসুবিধায় পড়লে ভগ্নিপতিকে সামান্য সাহায্যটুকু করবে। মণিময় ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে রান্নাঘরে উঁকি দিল। দেখল কল্যাণী ভাত চাপিয়েছে আর বসে সব্জী কাটছে। অরুণকে ধারে

কাছে কোথাও দেখল না। হয়তো বা বাথরুমে ঢুকেছে। কল্যাণী মণিময়কে দেখে চমকে বলল, আরে ছোড়দা — আয় বসবি রান্নাঘরে ? যা গরম পড়েছে .... নয়ত ফ্যানের নীচে শুয়ে একটু বিশ্রাম কর্। মণিময় হেসে ফেলল এসে অবধি তো বিশ্রামই করছি - তোর খুউব কষ্ট হচ্ছে না রে কণা ? গরমটা তো বেশি তাই বলছিলাম .... । কল্যাণী উঠে দাঁড়িয়ে হাত মুছতে মুছতে উত্তর দিল, না রে — আমার তো অভ্যাস আছেই। আমি কি তুই এসছিস বলে রান্না করছি নাকি ? রান্না প্রায় হয়ে আসছে। এবার মাছটা করব । খাওয়ার পরে এক গ্লাস দুধ খেতে হবে কিন্তু ছোড়দা ?

ছোড়দা তো দুদিনের জন্য এসেছে, ভাবতেও কল্যাণীর চোখে জল এসে যায়। এই মণিময়ের জন্যই আজ কল্যাণী সুন্দর একটা সংসার পেয়েছে। একটা ভাল মানুষকে জীবনসাথী হিসেবে পেয়েছে। তা কি ভুলতে পারে কল্যাণী ! এই ছোড়দাই কতই না চেষ্টা করেছে কল্যাণীকে পড়ানোর জন্য। কিন্তু কিছুই ফল হয়নি। আজ যদি লেখাপড়াটা সম্পূর্ণ করত তা হলে ছেলেদের ও-ই পড়াতে পারত। আজ ভাবলে খুবই খারাপ লাগে কল্যাণীর। আজকের যুগে শিক্ষার বিকল্প কিছুই নেই। সেখানে ছেলেমেয়ের প্রভেদ নেই। শিক্ষায় সবাইকেই এগিয়ে যেতে হচ্ছে। কল্যাণীর ব্যাপারে মণিময়ের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। পড়াশুনো হয়নি বলেই কল্যাণীকে খুব তাড়াতাড়ি সংসারে ঢুকতে হয়েছে। স্বামী হিসেবে অরুণকে পেয়ে কল্যাণী খুবই খুশি। অন্ধকারে তলিয়ে যেতে হয়নি। অরুণের সংসারে কল্যাণী শুধু আলোর দেখাই পেয়েছে, অর্থ সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তাই দুজনের মধ্যে কোনো অশান্তিও দানা বাঁধতে পারেনি কোনোদিন। বিয়ের সময় কল্যাণীর বয়স কম ছিল বলে এই মণিময়ই শিখিয়েছিল কল্যাণীকে স্বামীর ঘরকে কীভাবে ভালবাসা দিয়ে গড়তে হয়। সেখানে অভাবকে তুচ্ছ করতে হয়, শান্তিকে কাছে টানতে হয়। তবেই সেই সংসার পরিপূর্ণ হয়। আজ সেই শান্তির পরিবেশেই কল্যাণী নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। পেরেছে ছোড়দাকে মান্য করতে। সেই ছোড়দাকে যখনই কাছে পায়, পিতৃতুল্য সম্মান দিতে অরুণ এবং কল্যাণী কেউই কার্পণ্য করে না। মনে পড়ে যায় কল্যাণীর ছোটোবেলার স্কুলের কথা, গ্রামের কথা, স্কুলের মাঠের কাছে সেই বিশাল বটগাছ, ধূ ধূ করা মাঠ পেরোনো, পুরানো শিবমন্দির। ছোড়দার হাত ধরেই স্কুলে যেত। গ্রামের মেঠো পথ ধরে হাঁটতে হত অনেকটাই। সেই পথের ধারে ছিল 'দাদুর চায়ের দোকান। সেখানেই ছোড়দা মাঝে মধ্যে চা খেত। আরও অনেকেই থাকত। এখন আর তাদের কথা মনে নেই। ছাত্রী-অবস্থা থেকেই কল্যাণীর প্রতি মণিময়ের পিতৃবাৎসল্য এখনও কল্যাণীর হৃদয়কে নাড়া দেয়। এখনও চোখে জল এসে যায়। হৃদয়-গভীরে পিতার সমান দাদাকে বসিয়ে সর্বদাই পূজা করে কল্যাণী। চিন্তামগ্ন হয়ে অনেকটা সময়ই কাটিয়ে দিল কল্যাণী। রাত দশটা - সাড়ে দশটা বাজতে চলেছে। অরুণকে হাঁক দিয়ে বলল, কীগো - ছোড়দাকে নিয়ে এসো না খেতে। রাত হয়ে গেছে কত ! বলতে বলতে ডাইনিং টেবিলে সব রেডি করে

নিল। অরুণ মণিময়কে নিয়ে এসে বসল খেতে। খেতে খেতে পরিতৃপ্ত হয়ে মণিময় বলল কল্যাণীকে, হ্যাঁরে কণা এখনও তুই এত ভাল রান্না করিস ! মাছটা এত সুন্দর রান্না করেছিস যে বলাই বাহুল্য। কল্যাণী গদগদ হয়ে বলল, নারে ছোড়দা — অনেকদিন পর বাড়ির বাইরে খাচ্ছিস তো ! তাই এরকম লাগছে, আর কিছু নয়। অরুণ গম্ভীর হয়ে বলল, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, তবে তোমার হাতের রান্না তো খুবই সুস্বাদু — ছোড়দা একেবারে মিথ্যে বলেনি, বলে মিটি মিটি হাসতে লাগল। কল্যাণী চোখ বড় করে অরুণের দিকে তাকিয়ে বলল থাক থাক - তোমাকে আর ফোড়ন কাটতে হবে না। বলে ছোড়দা অনুমতি নিয়ে খাওয়া শেষ করে উঠে গিয়ে মুখ ধুয়ে নিল। তারপরে ওদেরও খাওয়া শেষ হলে সব পরিষ্কার করে রেখে এক গ্লাস দুধ নিয়ে শোওয়ার ঘরে ঢুকল। দুধের গ্লাসটা টেবিলের ওপর রেখে বলল, ছোড়দা, শোওয়ার আগে দুধটা খেয়ে নিস কিন্তু। আমি আবার খাওয়ার পর বসে থাকতে পারি না। সেটা তুই অবিশ্যি ভালই জানিস। ভীষণ ঘুম পেয়ে যায়। বলে বিছানার পাশে একটু বসল। মণিময় কল্যাণীর মাথায় হাত রেখে বলল, কী হল, ঘুম পেয়েছে বলে বসে পড়লি কেন ? আমি তো তোর এই অভ্যাস ভাল করেই জানি রে। যা বোন, ঘুমো গিয়ে। আমিও একটু পরেই শুয়ে পড়ব। কল্যাণী চলে গেল। অরুণ কিছুক্ষণ মণিময়কে সঙ্গ দিল। সারাদিনের পরিশ্রমের পর সেও ক্লান্ত, তাই দেখে মণিময় অরুণকে বলল, ভাই — যাও শুয়ে পড়ো। যা পরিশ্রম তোমার দেখছি। মণিময় বলার পর অরুণও শুতে চলে গেল। মণিময় এবার শোবে। চারদিক নিঝুম, নিস্তব্ধ, রাত প্রায় এগারটা বাজে। মাঝেমধ্যে রিকশার আওয়াজ, গাড়ির হর্ন শোনা যাচ্ছে। পাশের বাড়ি থেকে টি.ভি.র আওয়াজ আসছে। তীব্র দহনে সব মানুষই অস্থির। এটা তো আর গ্রামাঞ্চল নয়, তাই রাত এগারটা এখানকার বাসিন্দাদের কাছে কিছুই নয়। কাছাকাছি বাড়ি থেকে বাসনপত্রের আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। মণিময় বারান্দায় এসে একটু দাঁড়াল। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঠিকই কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে ছিটেফোঁটা। তাই গরমটাও অসহ্যভাবে বেড়ে চলেছে। কী জানি কী করছে এখন শোভা। মণিময় আবার সর্বদাই পত্নীনিষ্ঠ। সে ভাবে শোভার মতো সহধর্মিণী পাওয়া খুবই ভাগ্যের কথা। তবে আজকাল ওর শরীরটা বড্ড একটা ভাল যায় না। তাহলেও তো সংসারে প্রায় অনেক কাজই শোভাকে করতে হয়। কোমরের ব্যথা তো একটা লেগেই আছে। তার উপর রেখার জন্য চিন্তা, অসীমের জন্য তো বটেই। কে জানে কবে ঈশ্বর সহায় হবেন। রেখার বিয়ের জন্য পাত্র ঠিক হবে। অসীমেরও একটা কিছু ব্যবস্থা হবে। বারান্দার চেয়ারে বসে হাতপাখা নাড়তে নাড়তে মণিময় এইসব আকাশ পাতাল ভাবছিল। না, এবার শোয়া দরকার। তাই মণিময় পা টিপে গিয়ে ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। আবার না কোনোরকম শব্দে কল্যাণী ওরা জেগে যায়।

পরের দিন সকাল দশটা নাগাদ মণিময় চান করে ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে পড়ল ঘুরতে। কৃষ্ণনগর শহরটা বেশ সুন্দর লাগে মণিময়ের কাছে। প্রচণ্ড রোদে হেঁটে বেড়ানো তো অসম্ভব,

তাই একটা রিকশায় চেপে ঘূর্ণির দিকে রওয়ানা হল। আগে এখানে এত যানজট ছিল না রাস্তাঘাটে। কিন্তু এখন ? এখন অনেকটাই বেড়েছে। জনচঞ্চলতাও এতটাই বেড়েছে। বড় বড় বিল্ডিংয়ে সরকারি অফিস, শপিং মল, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি নিয়ে শহরটি বেশ সুন্দর করে সেজে উঠেছে। কৃষ্ণনগর শহরটি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রদের আমলের। তাই রাজবাড়িটি এখনও অতীতের স্মৃতি বহনকারী হিসেবে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। অরুণের স্কুলের পাশ দিয়ে রিকশাটি যাচ্ছিল। শহর থেকে অনেকটা দূরেই 'ঘূর্ণি' নামক জায়গাটি। তবে রাস্তা তো পিচ্‌ঢালা। মসৃণ, পরিচ্ছন্ন। তবে গরমের দাপটে বেশিক্ষণ বাইরে থাকা অসম্ভব। তাই কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল বিখ্যাত বলে দু-চারটা শো-পিস্ কিনে নিল। কল্যাণীর জন্যও একটা কিনেছে। মণিময় জানে কল্যাণী এসব বাজে খরচ পছন্দ করে না। খিচমিচ তো অবশ্যই করবে। তবুও মণিময় এসব মনের মধ্যে না রেখে কিনেই ফেলল। বাড়ি ফেরার পথে কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত মিষ্টি দোকান থেকে ল্যাংচা আর ছানার পায়েস কিনে বাড়িতে ঢুকল প্রায় বেলা একটা বাজে। পরিষ্কার আকাশ, রোদে ঝিকমিক করছে। কল্যাণীর বাড়ির উঠোন রোদে পরিপূর্ণ। বাড়িতে ঢুকেই মণিময়ের মনে হল কল্যাণী এখনও রান্নাঘরে। তাছাড়া রান্নার সুন্দর গন্ধও আসছে। ঘরে ঢুকে চুপি চুপি ডাইনিং টেবিলের উপর জিনিসগুলো রাখল। রান্না ঘরে চুপি দিয়ে বলল, কীরে কণা, এত বেলা অবধি রান্না ? এখনও চান করিসনি বুঝি ? চমকে ফিরে তাকাল কল্যাণী, বললে হেসে, আরে ছোড়দা — আমি তো টেরই পেলাম না কখন এলি। হঠাৎ টেবিলের ওপর নজর পড়তেই জোরে বলে উঠল, একী — আবার মিষ্টি — দেখো — ছোড়দা, এসব ভদ্রতা আমার সঙ্গে কেন করিস বুঝি না। আমি তো তোর বোন না কি ? শুধু শুধু বাজে খরচ। মণিময় সস্নেহে বলল দেখ্ — কণা — আমার কিন্তু খিদে পেয়েছে বড্ড। তোর রান্না এখনও হয়নি ? বলতে বলতে মণিময় চলে এল ড্রয়িং রুমে। এসে পাখাটা চালিয়ে একটু বসল। পেছন পেছন কল্যাণীও এসে বসল ছোড়দার পাশে। এক গ্লাস জল মণিময়কে দিল। তারপর মণিময়ের দিকে তাকিয়ে বলল, জলটা খেয়ে একটু বিশ্রাম করে নে। তারপর আমরা দুজনেই খেয়ে নেব। ততক্ষণে মাংসটাও হয়ে যাবে। মণিময় জল খেতে গিয়ে হঠাৎ থমকে বলল, মাংস ? মাংস এল কোত্থেকে ? কাল তো অরুণ মাংস আনেনি, তবে ? রান্নাঘর থেকে কুকারের সিটির আওয়াজ শোনা মাত্রই কল্যাণী উঠে যেতে উদ্যত হয়ে বলল, হ্যাঁরে ছোড়দা, ও স্কুলে গিয়ে পিয়নকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। যাওয়ার সময়ই হয়তো বাজারে ঢুকেছিল। তাই একটু দেরি হয়ে গেল, বলে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। মণিময়ও কম যায় না। সুযোগ বুঝে বলল, ও, এটা বুঝি ভদ্রতা নয় আমার প্রতি ? আর আমি কিছু করলেই ভদ্রতা, তাই না ? কল্যাণী সব রেডি করে মণিময়কে ডাকল, আয় তো ছোড়দা বেশি বকবক করিস না তো। দুদিন বই তো নয়। কালই তো রওনা হচ্ছিস। মণিময় হাতমুখ ধুয়ে গিয়ে খেতে বসল। মাছ, মাংস, তরকারি রান্না করে তৃপ্তি করে খাওয়াল কল্যাণী। মণিময়ও

খিদের পেটে যথেষ্ট তৃপ্তি করে খেল। খেতে খেতে কল্যাণী বলল, ছোড়দা, তোর কাল কখন ট্রেন রে? কালই যেতে হবে ? আর দুটো দিন তো থাকতে পারতিস। মণিময়ের খাওয়ার শেষেও বসে রইল — কল্যাণীর অপেক্ষায়। সস্নেহে বলল, নারে কণা — আমার ছুটি নেই। তাছাড়া তোকে দেখে গেলাম ভাল আছিস, এটাই আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া যে কণা। আবার সুযোগ পেলেই চলে আসব। কী না বলছিলি — কখন ট্রেন। ট্রেন হচ্ছে দশটা পঞ্চান্নতে। পৌনে দশটায় বেরিয়ে পড়ব। কল্যাণী বলল তোর তো সবকিছুতেই তাড়াহুড়ো ? দশটায় বেরোলেও চলবে। এখান থেকে তো পনের মিনিটের রাস্তা মোটে। মণিময় কল্যাণীর কথায় সায় দিয়ে উঠে গেল মুখ ধুতে।

মণিময় রওয়ানা হবার মুহূর্তে — কল্যাণী-অরুণ এসে প্রণাম করল। ভাগ্নে দুটো আগেই স্কুলে চলে গেছে। কল্যাণীর চোখ ছলছল করে উঠল। মণিময় আবেগে বোনকে জড়িয়ে ধরে বলল, কণা, এ রকম করিস না যাওয়ার সময়। লক্ষ্মীসোনা বোন আমার। ওদের পরীক্ষা হয়ে গেলে তো তোরাও দুদিনের জন্য আসতে পারিস। কতদিন তো যাস না। হঠাৎ মনে পড়তেই অরুণকে বলল ভাই — তোমাকে একটা কথা বলি, বাইরে তো তোমার অনেক চেনাজানা পরিচিত মহল আছে। তা তুমি যদি রেখার জন্য একটা সুপাত্রের সন্ধান দিতে পার তা হলে খুব ভাল হয়। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা আমি। এর বেশি তোমাকে আর কী বলব, বলো ! অরুণ বিনম্রভাবে বলল, না না ছোড়দা অত কিছু বলতে হবে না, রেখা তো আমাদেরও মেয়ে। আমি অবশ্যই দেখব। আপনি চিন্তা করবেন না একটুও। আমরা তো আছি। কী বলো কল্যাণী ! কল্যাণী চোখ মুছতে মুছতে ছোড়দাকে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ — আমরা তো আছি। দেরি হয়ে যাচ্ছে - তুই এবার রওনা হ তো। কপালে হাত ঠেকিয়ে দুর্গা দুর্গা বলে রওনা করিয়ে দিল। কল্যাণী রেখা অসীমের জন্য নারকেলের নাড়ু বানিয়ে দিয়ে দিয়েছে। দুদিন ছিল মণিময়, তাতেই কল্যাণীর ঘরটা একদম ফাঁকা লাগছে। কল্যাণীর নিজের মানুষ বলতে এই ছোড়দাই আছে। যে নাকি এখনও সমস্ত দায়িত্ব কর্তব্য পালন করে আসছে। কল্যাণী ঘরে ঢুকে চুপ করে বসে রইল। মনটা খাঁ খাঁ করছে। অরুণও বেরিয়ে গেছে ছোড়দার সঙ্গে। আবার সেই রান্না, ঘর গুছানো, সেই চিরাচরিত কাজ। আজ অবিশ্যি কল্যাণীকে নারী সমিতি অফিসে যেতেই হবে। দুদিন যায়নি। ছোড়দাকে ইচ্ছে করেই কল্যাণী এ ব্যাপারে কিছুই বলেনি। গোপনই রেখেছে। আর তাছাড়া কল্যাণী সংসারের একঘেয়েমি থেকে রক্ষা পাবার জন্যই এতে যোগ দিয়েছে। এতে অরুণের উৎসাহই বেশি। বাইরে জগতের হাবভাব বোঝাটাই এর প্রধান কারণ। অবিশ্যি মাঝেমধ্যে লোকনাথ বাবার আশ্রমেও যায়। অরুণ আবার এসব বেশি পছন্দ করে না। তা সত্ত্বেও কল্যাণীকে সে বাধা দেয় না কোনো কিছুতেই। এভাবেই কল্যাণীর দিন কেটে যায়। নারী সমিতিতে যোগ দেবার পর ওর অনেকরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। বাইরের জগতের কত মানুষ যে কীরকম নিষ্ঠুরতার সম্মুখীন হয় তা তো কল্যাণী বাইরে বেরিয়েই

অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা কল্যাণীর কাছে খুবই চমকপ্রদ। ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যেই আজ মহিলারা কমবেশি নির্যাতিতা। উন্নত বা অনুন্নত বলতে এখন কিছু নেই। সব সম্প্রদায়েই নারকীয় ঘটনা ঘটছে। এসব ঘটনাই কল্যাণীর কাছে বাস্তব অভিজ্ঞতা।

চারদিকে যেন অগ্নিবন্যা বইছে। প্রখর তাপে তপ্ত এই পৃথিবীর মাটি। বৃষ্টির অভাবে মাঠ ঘাট শুকিয়ে খাঁ খাঁ করছে। নয়নপুরেও তাই হয়েছে। এই প্রচণ্ড গরমে শোভা হাঁসফাঁস করছে। প্রেশারের রোগীতো। তাই হয়তো গরমটাও একটু বেশিই বোধ হয়। বিছানায় শুয়েও শান্তি পাচ্ছে না। ফ্যানের বাতাসেও যেন গরম হাওয়া আসছে। রেখা তো এর মধ্যেই নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে। বেলাও পড়ে আসছে। বাজে প্রায় তিনটা। মণিময়েরও আজই আসার কথা। শোভা ভাবছে। এতক্ষণেও এল না, কী জানে আসবে কিনা। আলুচচ্চড়ি করে রেখেছে। এলে দুটো লুচি ভেজে দেবে। এতটা পথ পেরিয়ে আসবে। আসতে অনেকটা সময়ও লাগে। মণিময় রাস্তায় আবার চা ছাড়া কিছুই খায় না। শোভা জানে কল্যাণী রাস্তায় খাওয়ার জন্য কিছু দিতে চাইলেও সে আনবে না। এমনি এক অদ্ভুত মানুষ মণিময়। এদিকে বাসনপত্র সব পড়ে আছে রান্নাঘরে। পটলার মা এখনও আসেনি। বিকেলের কাজে ও প্রায়ই আসে না। আজ আসবে কিনা কে জানে। হঠাৎই গেট খোলার শব্দে শোভা তাকিয়ে দেখল পট লার মা ঢুকছে। যাই হোক কিছুটা শান্তি অনুভব করল শোভা। পট লার মা ঢুকেই হাসিমুখে বলল, মাসীমা, মেশোমশাই এসেছে গো ! দেখে এলাম উপেন স্যারের সঙ্গে কথা বলছে : দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। শোভা উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল, তুই আবার কোথায় দেখে এলি? কাকে না কাকে দেখেছিস ! আর বলছিস ....। পটলার মা জোরে বলে উঠল — আরে — আমি কি কানা ? চোখে দেখতে পাই না নাকি ? মেশোমশাইকে চিনি না ? কী যে বল না তুমি। এই তো ইস্কুল মাঠের কোনা দেখে এলুম। বলে বিরক্তভাবে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। শোভা বারান্দায় বসে হাতপাখা নাড়তে লাগল। হাই তুলতে তুলতে রেখা এসে বারান্দায় দাঁড়াল। মার উদ্দেশ্যে বলল, আচ্ছা মা, পট লার মা-র সঙ্গে কী নিয়ে কথা বলছিলে গো ? এতেই তো আমার ঘুমটা ভেঙে গেল। সত্যি তোমরা পারও বটে। শোভা তীক্ষ্ণ সুরে বলল, কেন? না হলে কি আরও ঘুমুতিস নাকি ? ঘড়িতে কটা বাজে দেখেছিস ? তোর না টিউশন আছে ? এমনি সময় মণিময় ঢুকল। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, গরমের দাপটে সারা শরীর ঘর্মাক্ত। শোভা ফিরে তাকাল, রেখা আওয়াজ পেয়ে দৌড়ে এসে বাবার হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে বলল, আরে, বাবা তুমি

নাকি কোথায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলে, পটলার মা বলছিল। মণিময় বারান্দায় উঠে একটু চেয়ারে বসল। অনেকটা পথ তো। খুবই ক্লান্ত। রেখার কথার উত্তরে মণিময় বলল, হ্যাঁরে মা, উপেনদার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। তাই একটু কথা বলতেই হল, এর জন্য একটু দেরি হল। শোভা দাঁড়িয়েছিল পাশেই। বাপ মেয়ের কথাবার্তা শুনছিল। যাই — তোমার জন্য একটু খাওয়ার ব্যবস্থা করি। বলে চলে গেল।

তিনদিন পর বাড়িতে ফিরে মণিময় বেশ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছে। যতই হোক নিজের বাড়ির মাহাত্ম্যই আলাদা। তার উপর শোভার মতো কর্তব্যপরায়ণা স্ত্রী আছে যার। সব কাজের বাইরে তার স্বামীর প্রতি নিষ্ঠা শোভার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মণিময়ও শোভার এই আচরণগুলোকে যথেষ্টভাবেই সম্মান দেয়। এই অসচ্ছল পরিবারে স্ত্রীর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসাই মণিময়ের সৌখিনতা। যা অর্থ দিয়ে পরিপূর্ণ রূপ দেওয়া যায় না। এখন তো এই পরিবার অনেকটাই অভাব কাটিয়ে উঠেছে। চূড়ান্ত কায়ক্লেশের মধ্যেও শোভা নিজের স্বামীকে ধরেই এই সংসারকে তিলতিল করে সাজিয়ে গুছিয়ে সেই ভয়ানক অভাবকে তাড়িয়েছে। মণিময়ের অক্লান্ত পরিশ্রম শোভাকে মনের দৃঢ়তা বাড়িয়ে সাহস জুগিয়েছে। সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে — এই কথাগুলো শোভার জন্য সত্যিই উপযুক্ত। আজও শোভা স্বামীর জন্য আগের মতোই দায়িত্বশীলা স্ত্রী। এরজন্য মণিময় সত্যিই গর্বিত। হয়তো বা ছেলেমেয়ে দুটো মায়ের আদবকায়দায় বড় হয়েছে বলেই সবাই ভাল বলে। জীবনের দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন তোয়াক্কা না করেই শোভা বয়ে নিয়ে চলেছে মণিময়ের সংসার। তার না আছে কোনো চাহিদা, না আছে কোনো অভিযোগ। ঈশ্বরের কাছে আবেদন তার একটাই, আজীবন যেন স্বামী তার পাশে থাকে। তিনদিন মণিময়ের বাড়িতে অনুপস্থিতির দরুণ শোভারও মন মেজাজ বিষিয়ে ছিল। ছেলেমেয়েও আজকাল এসব বুঝতে পারে। তাছাড়া এমনিতেও শোভার শরীর আজকাল বেশি ভাল থাকে না। সবসময়েই চিন্তা ভাবনায় জর্জরিত থাকে। মণিময়ও তাই শোভাকে প্রায়ই বলে এখানে যে সরকারি ডাক্তার আছে, তাকে দেখিয়ে আসতে। শোভা রাজি হলে তো ! এটাও আরেক সমস্যা — শোভা কিছুতেই অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা করবে না। হোমিওপ্যাথি ওষুধ এনে খাবে। সব অসুস্থতা তো আর হোমিওপ্যাথিতে নিরাময় হয় না। এই সামান্য কথাটা শোভা কিছুতেই বুঝতে চায় না।

নয়নপুরে মোটামুটি সবাই সবাইকে চেনে। বিশেষ করে মণিময় আর উপেনবাবুকে তো এখানে প্রায় সকলেই সজ্জন বলে মান্যি করে। এমনিতে এখনও গ্রামের মানুষদের মধ্যে সহজসরলতার ছাপ সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। সবকিছুতেই যেন একটা প্রাণের মেলবন্ধন লক্ষ করা যায়। শিক্ষার প্রসার এতটা নেই ঠিকই তবে লোকজনের মনের প্রসার অগাধ। গ্রামবাংলার জীবন এখনও অতি আধুনিক যুগে অত্যন্ত স্বচ্ছ। বিকেলের নয়নপুর যেন কনে দেখা আলোয়

সেজে রয়েছে। ঠান্ডা হাওয়া বইছে, যেন দূরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে। দুপুরের নিস্তব্ধতার পরে নয়নপুরের রাস্তায় লোকের আনাগোনা শুরু হয়েছে। কেউবা ঘরে ফিরছে, কেউ বা হাঁটতে বেরিয়েছে, স্কুল অনেকক্ষণ ছুটি হয়ে গেছে, তাই ছেলেমেয়েদের বড্ড একটা দেখা যাচ্ছে না। শুধু স্কুল মাঠে ছোটো ছোটো ছেলেরা ফুটবল খেলছে। সন্ধ্যে হতে না হতেই ঘরে ফিরে যাবে সবাই। এ গ্রামের অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা মোটামুটি সবাই লেখাপড়া করে । কেউ পড়ে স্কুলে। কেউ পড়ে কলেজে। দু-এক জন আবার কলকাতায়ও পড়াশুনো করে। সন্ধ্যে হতে চলেছে। অফিস, দোকান, সব সেরে লোকজন ফিরতে শুরু করেছে। এরপর অন্ধকারে চলাফেরা খুবই কষ্টকর। তার উপর লোড্‌শেডিং তো লেগেই থাকে।

গ্রামের সজ্জন, অমায়িক এবং শিক্ষিত যুবক দীনুও তাই সত্বরই বাড়ি ফেরে। প্রণতিকে নয়ত দেখা যায় বারান্দায় পায়চারি করতে দীনু না ফেরে পর্যন্ত। তাই দীনু স্ত্রীকে কষ্ট দিতে চায় না। বারান্দায় একটা ইজি চেয়ার মানে আরাম কেদারা পাতা আছে। দীনু সকালবিকাল এটাতে বসেই চা খায়। আর বাইরের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করে। রাস্তা দিয়ে অনেক পরিচিত লোকও তো যাতায়াত করে। তা দেখতেও মন্দ লাগে না দীনুর। প্রণতি এল চা নিয়ে। পরনে হাল্কা গোলাপি রংয়ের সালোয়ার কামিজ। চোখে মুখে উচ্ছলতার ছাপ। দীনু হাঁ করে তাকিয়ে রইল প্রণতির দিকে। ভাবছে, একি সেই প্রণতি, যাকে সতের বছর আগে বিয়ে করে এনেছিল। এখনও একই রকম আছে সৌন্দর্যে, স্বভাবে। কিছুই পাল্টায়নি। এই সংসারে এসে প্রণতিকে অনেক কিছুই মানিয়ে চলতে হয়েছে। তবে হ্যাঁ, দীনু কোনোদিনই প্রণতিকে অসম্মান করেনি, বা কোনো কথা বলে অপমানও করেনি। তাই হয়তো প্রণতির চেহারায় কোনো বিড়ম্বনার ছাপ পড়েনি। আজ ওরা যথেষ্টই সুখী। একমাত্র ছেলে রাজুও যথেষ্ট ভালই হয়েছে। প্রণতির স্বপ্ন শুধু রাজুকে মানুষের মতো মানুষ তৈরি করা শুধু শিক্ষা দীক্ষায় নয়, সবদিক দিয়েই যেন রাজু প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এই সমাজসংসারে, এই চেষ্টাই শুধু প্রণতি চালিয়ে যাচ্ছে।

দীনু প্রণতির হাত থেকে চায়ের কাপ নিল ঠিকই দৃষ্টি কিন্তু প্রণতির চোখের দিকে। প্রণতি একটু আড়ষ্ট বোধ করল এবং বলল, কী হল ? এভাবে কী দেখছ! কোনোদিন দেখনি মনে হয় আমাকে ? দীনু চমকে উঠল। প্রণতির কাছ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, না না, এমনি। কাজের ব্যস্ততার জন্য তোমাকে কতদিন ভাল করে দেখিনি। তাই আজ দেখে চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। প্রণতি সলজ্জ ভঙ্গীতে দীনুর পাশের চেয়ারটায় বসল এবং বলল, সত্যি — তুমি না সেই ছেলেমানুষই রয়ে গেলে। রোমান্স করতে ইচ্ছে করছে বুঝি ? সেটি এই বয়সে আর হচ্ছে না মশাই। বলে উঠতে যাচ্ছিল, দীনু হাতটা ধরে বলল, একটু বসো না। সংসারের চাপে দুজনেই এত কর্মব্যস্ত থাকি যে দুজনে বসে দুটো মনের কথা বলারও সময় পাই না। দীনু অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। প্রণতি বলল, ছাড়ো তো এসব কথা। আমি তো সব কাজে

তোমার পাশেই আছি। তাছাড়া — এখন তো আমাদের নিজেদের সবকিছু ভুলে রাজুর জন্য ভাবা উচিত। তাই নয় কি ? দীন না বোঝার ভান করে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। প্রণতি চুপচাপ উঠে ভিতরে চলে গেল। এখুনি রাজু ফিরবে টিউশন সেরে। বুড়োমাসি পেছনের বারান্দায় বসে হাতপাখা নাড়ছে। ওকে গিয়ে প্রণতি বলল রাজুর টিফিনের ব্যবস্থা করতে। বুড়োমাসি আছে ঠিকই। কিন্তু প্রণতিকে অনেক কাজ নিজের করতে হয়। চোখেও ভাল দেখতে পায় না, বয়সও হয়েছে — তবুও বিশ্বাসী বলেই এই মাসিকে রাখা। রাজুর বয়স যখন বছর চারেক তখন প্রণতির মা এই বুড়ো মাসিকে এনে দিয়েছিল। আজ অবধি সে আছে শাশুড়ির পজিশন নিয়ে। মধ্যে মধ্যে আবার দীনু প্রণতিকে শাসনটাসনও করে। রাজু তো চোখের মণি। ওকে কিছু বলা যাবে না। বুড়ো হলেও গ্রামের প্রত্যেক ঘরের খবর সে রাখে। কাজের ফাঁকে হুটহাট বেরিয়ে যায়। প্রণতি কিছুই বলে না। পুরনো মানুষটাকে তো আর অশ্রদ্ধা করা যায় না। হোক না কাজের মানুষ। এতদিনে এই পরিবারের সদস্যের মতোই হয়ে গেছে।

বারান্দা থেকে কার যেন কথা শোনা যাচ্ছে। দীনু কথা বলছে। নিশ্চয়ই কেউ এসেছে। প্রণতি তড়িঘড়ি করে বারান্দায় এসে দেখল কে যেন দাঁড়িয়ে দীনুর সঙ্গে কথা বলছে। প্রণতি সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আরে, রেখা তুই ? প্রণতি অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, বোস বোস - কতদিন পরে এলি ? রেখা হেসে চেয়ারটায় বসল। প্রণতিকে বলল, হ্যাঁ, বৌদি — একদম সময় পাই না। আমার ছাত্র আজ পড়েনি, তাই তোমাদের এখানে এলাম। তা তোমরাও তো ও পাড়ায় যাওয়া ছেড়েই দিয়েছ। দীনু উঠে দাঁড়িয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে বলল, রেখাকে ভেতরে এনে বসাও না, মশার জন্য তো বারান্দায় বসা যাচ্ছে না। প্রণতি রেখাকে নিয়ে নিজেদের শোবার ঘরে বসাল। সুন্দর — সুসজ্জিত বেডরুম। নয়নপুরেও এইরকম রুচিসম্পন্ন মানুষ বাস করে। সত্যি — ভাবছিলও ভাল লাগে। দামী দামী আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো দেখে রেখার একটু বিস্ময়ই হল। অবাক দৃষ্টিতে দেখতে লাগল চারদিক। সবই আসলে প্রণতি বৌদিরই রুচিমাফিক সাজানো হয়েছে। ঠাকুর ঘর থেকে সুন্দর ধূপের গন্ধ আসছে। ব্যবসায়ী হলেও দীনু তো শিক্ষিত, মার্জিত গোছেরই লোক। সেও কম যায় না। এ বাড়িতে তারও একটা স্টাডি রুম রয়েছে। সেখানে দীনু সন্ধ্যের পর বসে এবং অনেক ধরনের বইপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করে। ভবিষ্যতে ছেলে রাজুরও কাজে লাগবে বলেই এই স্টাডি রুমের পরিকল্পনা। অবিশ্যি রাজু যদি পড়াশুনোর খাতিরে বাইরে চলে যায় বা চাকুরি সূত্রে এই গ্রামের বাইরে চলে যেতে হয়, তবেও এটা দীনুরই কাজে লাগবে ভবিষ্যতে অবসর কাটানোর জন্য। রেখা জানে দীনুর ভীষণ বই-এর নেশা। তাই তো অন্য কোনো নেশা নেই। প্রণতি রেখার জন্য জলখাবার নিয়ে এল। রেখা বিস্ময়ে প্রণতিকে বলল, এসব কী করেছ বৌদি ? আমি কি নতুন এসছি তোমাদের

বাড়ি ? ছিঃ — এরকম ভদ্রতা আমার সঙ্গে করলে — আমি কিন্তু আর আসব না তোমার কাছে। প্রণতি খাওয়ার প্লেটটা টেবিলে রেখে রেখার দিকে মুচকি হেসে বলল, তাই নাকি ? আমার ননদিনীর যে এত রাগ, তাতো আমি জানতাম না। আরে পাগলি মেয়ে, রাজুর জন্য খাবার তৈরি করেছে মাসি। তার থেকে দুটো লুচি তোকে দিলাম। এতে ভদ্রতার কী আছে বল ! রেখা হেসে ফেলল। এদিকওদিক তাকিয়ে বলল, আচ্ছা বৌদি - রাজু বাড়িনেই বুঝি ? না রে ও এখুনি আসবে টিউশন থেকে। বলে রেখার সঙ্গে গল্প করতে লাগল। রেখাও প্রণতিকে খুব পছন্দ করে। গল্প করার মতো লোক কোথায় পায় রেখা। নয়নপুরের মেয়ে - বৌদের যা অবস্থা এদের সঙ্গে আবার গল্প ? ভাবাই যায় না। বেশির ভাগই তো অশিক্ষিত, ক্ষেতে কাজ করা লোকজন। তাই প্রণতিকে রেখার খুবই ভাল লাগে। এত সুন্দর অমায়িক ব্যবহারে রেখা সবসময়েই মুগ্ধ। আচ্ছা বৌদি — কবে যাবে আমাদের বাড়ি ? তোমরা তিনজনেই একদিন এসো না। মা-বাবা খুউব খুশি হবে। বলে রেখা প্রণতির উত্তরের অপেক্ষায় তাকিয়ে রইল প্রণতির দিকে। প্রণতি রেখার পিঠে আল্‌তোভাবে হাত রেখে বলল, যাব রে যাব। এর মধ্যেই যাব। তোর দীনুদা, রাজুর কথা আমি জানি না, আমি তো অবশ্যই যাব। হঠাৎ দীনু এসে ঢুকল বেড্‌রুমে, হাতে একটা মোটা বই। রেখার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, কী বলছে রে তোর বৌদি ? আমাকে না নিয়ে যাবে তোদের বাড়ি ? যাকনা যাক— আমি কি পথ চিনিনা নাকি ? স্যারের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে রাস্তায় দেখা হয়। কিন্তু ভাবছি - এবার একদিন গিয়ে স্যারের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা মেরে আসব। রেখা কথার পাত্তা না দিয়ে বলে উঠল, তুমি যাবে আমাদের বাড়ি ? তোমার সময় কোথায় ? ব্যবসায়ী মানুষ তুমি ! জান তো দীনুদা — বাবা কিন্তু প্রায়ই তোমাদের কথা বলে ! কেন যে তোমরা আমাদের এত এড়িয়ে চল, বুঝিনা বাপু। খুউব কথা বলতে শিখেছিস তো! বলে প্রণতির দিকে তাকিলে বলল, দেখ্‌ছ - রেখা যে বড় হয়েছে তারই প্রমাণ দিচ্ছে কথাবার্তায়। এবার ওর জন্য একটা পাত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। দাঁড়া — এবার তোর একটা ব্যবস্থা করতে হবে, বলে তাকাল রেখার দিকে। রেখা লজ্জা একটু পেল বটে। প্রণতি দীনুকে খুব মিষ্টি করে বলে উঠল, এই যে মশাই — এবার আপনি যান এখান থেকে। যাও তো যাও - দেখছ না রেখা লজ্জা পাচ্ছে। স্ত্রীর কথায় দীনু চলে গেল। রাজু এসে টিফিন করে পড়তে বসে গেছে। বাড়িতে থাকলেও ওর সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। সন্ধ্যে প্রায় সাতটা বাজে। রেখা এখন বাড়ি ফিরবে। তাই প্রণতিকে বলল, বৌদি আমি এবার যাচ্ছি। তুমি যে কোনো দিন বিকেলের দিকে চলে এসো আমাদের বাড়ি। তড়িঘড়ি করে উঠে পড়ল। রাস্তায় এসে শুনতে পেল বস্তির থেকে আসা ঝগড়াঝাঁটি। গালিগালাজের আওয়াজ। দীনুদার বাড়ির পাশেই আছে একটা অনুন্নত সম্প্রদায়ের বস্তি। সন্ধ্যের পর থেকেই ওদের পরিবারের মধ্যে শুরু হয় মারপিট। মাতলামো করা, ইত্যাদি। এই হচ্ছে অশিক্ষার দৃষ্টান্ত। নোংরামি করা এদের

স্বভাবজাত দোষ। এর প্রতিকারে কেউই এগিয়ে আসে না। এদের পরিবারে মেয়েরা প্রতিনিয়তই মার খাচ্ছে। স্বামীরা স্ত্রীকে পিটিয়ে নিজেদের পুরুষত্ব বজায় রাখে। আর স্ত্রীরা নীরবে এইসব জঘন্যতম অত্যাচারগুলো সহ্য করে আসছে। রেখা পথ চলতে চলতে এই সবই ভাবতে লাগল। উৎপীড়নের ক্ষমতা শুধু কি পুরুষদেরই থাকে। আর সেটা মুখ বুজে সহ্য করার ক্ষমতাই শুধু মেয়েদের থাকবে ? কে বা কারা এর প্রতিকারে এগিয়ে আসবে রেখা তা জানে না। শুধু এটুকু জানে, যে কোনো মেয়েই স্বামীর ঘরে গিয়ে ভালবাসার স্বর্গ গড়তে চায়। সেখানে প্রতিপদে অপমানিত হতে-যায় না। উপেনের স্কুলের দারোয়ানটাও এই বস্তিতেই থাকে। সেও নিশ্চয়ই তার বৌকেও এভাবে অত্যাচার করে। রেখারও তো বিয়ে হবে। রেখা কিন্তু ভাবছিল সে পারবে না শ্বশুর বাড়ি গিয়ে মেয়েদের এই লাঞ্ছনা সহ্য করতে। এর চাইতে বিয়ে না করাটাই তো ভাল। পত্র-পত্রিকায় তো আজকাল ভদ্রলোকেদের কুকীর্তির কথাও ওঠে। শিক্ষিত সমাজেও এইসব বাদ যায় না। রেখার মনে খুব পীড়া দেয় এইসব অবলা মেয়েদের কথা ভাবলে। সারা ভারতবর্ষ জুড়েই চলেছে এইরকম নারকীয় ঘটনাপ্রবাহ। স্কুল মাঠের কোণা আসতেই হঠাৎ অসীমের সঙ্গে দেখা। আবছা আলোয় অসীম আসতেই হঠাৎ চমকে উঠল রেখা। বিস্ময় দৃষ্টিতে বলল, আরে দাদা — তুই? কোথায় যাচ্ছিস ? অসীম বলল তুই এখন বাড়ি যা তাড়াতাড়ি, বাবা খুব টেনশন করছেন তোর জন্য। কেন? আমি তো রোজই পড়িয়ে এই সময়ই বাড়ি যাই। তা হলে আজ? বলে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। অসীম বাজারের থলেটা দেখিয়ে বলল, আমি বাজারে যাচ্ছি। বাবা এতটা জার্নি করে এসে একটু পরিশ্রান্ত বোধ করছে। তাই আমিই যাই — বাজারটা করে আনি। আমি যাচ্ছি। বলে সোজা বাজারের দিকে চলে গেল। রেখা আপন মনে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি চলে এলো। কিন্তু মণিময় বাড়ি ছিল না। রেখা শোভাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল মণিময় উপেনবাবুর বাড়িগেছে — কতক্ষণ আর ঘরে বসে থাকবে। তাই সময় কাটাতে গেছে।

উপেন ঘরে বসে টি.ভি.র খবর শুনছিল। গেট খোলার শব্দে বুঝতে পারল হয়তো বা মণিময়ই এসেছে। সন্ধ্যার পর এছাড়া বড় বেশি কেউ একটা আসে না, আসবেই বা কে ! বাইরে ঘন অন্ধকার, অমাবস্যার তিথি চলছে। বাইরে একটা লাইট জ্বালানোই থাকে। উপেন উঠে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল অঞ্জলি ধারেকাছে নেই। হয়তো বা রান্নাঘরে আছে। গেটের শব্দ তাই শুনতে পায়নি। মণিময় ঢুকে হাঁক দিল, উপেনদা আছেন নাকি ? উপেনদা ? হ্যাঁ, হ্যাঁ ভাই এসো এসো বলে উপেন মণিময়কে নিয়ে বসার ঘরে ঢুকল। তুমি ভাই বাঁচালে আমাকে, নয়ত সন্ধ্যার পর থেকে সময় কাটানো খুবই দুষ্কর। এবার অনেক আড্ডা মারা যাবে। তাই নয় কি ? কথার শেষে উপেন মণিময়কে নিয়ে সোফায় বসল। মণিময় দরজার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, বৌঠান কোথায় ! দেখতে পাচ্ছি না তো ! বলতে বলতেই

অঞ্জলি ঘোমটা টেনে এসে দাঁড়াল। পরিচ্ছন্ন চেহারায় সাদাসিধে পোশাকে অঞ্জলি যেন বাংলার গায়ের বধূর প্রকৃত ভাবমূর্তি। আপনারা বসুন, গল্প করুন — আমি চা করে নিয়ে আসছি বলে অঞ্জলি চলে গেল। পাশে কোনার ঘরে হীরক পড়ছে। তাই মণিময় উপেন আস্তে আস্তে কথাবার্তা বলতে লাগল। উপেনদা, বেশ দুদিন কাটিয়ে এলাম। সংসারের ঝামেলা থেকে মুক্ত। গতানুগতিক জীবনধারা থেকে অনেকটাই দূরে চলে গিয়েছিলাম। আর আমার বোনটাকে তো চেনেনই ! আদরে যত্নে একেবারে তটস্থ ভাব। কথা শেষ করে মণিময় ভাবুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। উপেন স্মিত হেসে বলল, তা ঠিক বলেছ ভাই। বাড়ি থেকে দূরে দু-চারদিনের জন্য ভালই লাগে। তা যদি কেউ সে আপন হয়। তাছাড়া কল্যাণীর কাছে তো তোমার ভাল লাগবেই। ও তো আমাদের কত আপন। কতদিন ওকে দেখি না। কেমন আছে ওরা ভাই ? মণিময় পরিতৃপ্তির সুরে উত্তর দিল, কণা খুব ভাল আছে উপেনদা। যেমনি ওর ছেলেরা তেমনি ওর স্বামী অরুণ। অদ্ভুত ভাল ছেলে বটে অরুণ। আমার ভাগ্নে দুটোও হয়েছে চমৎকার স্বভাবের। পড়াশুনায় মোটামুটি হয়েছে। কিন্তু আদবকায়দা বড়ই মধুর।

উপেন হা হা করে উচ্চস্বরে হেসে উঠল। পরম তৃপ্তি বোধ করল মণিময়ের মুখে কল্যাণীর কথা শুনে। এরকম একই বয়সী একটা বোন উপেনেরও ছিল। মাত্র দশ বৎসর বয়সে এ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে যায়। দেশের বাড়িতে থাকাকালীন এক ভয়ানক বন্যার কবলে পড়েছিল। সেই সময় সামান্য জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় বোনটা মারা যায়। হঠাৎ এসব ভাবতে গিয়ে উপেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। মণিময়ের ডাকে চমকে উঠে দেখল অঞ্জলি চা নিয়ে এসেছে। দাদা, নিন চা খান— অঞ্জলি চায়ের কাপ এগিয়ে দিল মণিময়ের দিকে। বিনম্র ভঙ্গীতে আবারও বলল, অনেকদিন বাদে এসেছেন, তাই না দাদা ? দিদি, রেখা, অসীম ভাল আছে তো ? সংসারের ঝামেলায় একদম বেরোতে পারি না, তাই দেখা সাক্ষাৎও হয় না। মণিময় অঞ্জলির দিকে তাকিয়ে বলল, বসুন না, বৌঠান। আপনি একদিন আসুন না সময় করে। এমনিতে ওরা আছে মোটামুটি। আপনি কেমন আছেন ? এই চলে যাচ্ছে বলে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল অঞ্জলি। রান্না রয়েছে, আপনারা গল্প করুন, বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অঞ্জলি। চলে যাওয়ার পর উপেন ধীরস্বরে মণিময়কে বলল, জানতো ভাই উপেন তোমার বৌঠানের শরীরটা আজকাল প্রায়ই খারাপ যাচ্ছে। আগের চাইতে স্বাস্থ্যও খারাপ হয়ে গেছে। তাছাড়া আগের চাইতে কথাবার্তাও কম বলে। কী যে করব, ভেবেই পাচ্ছিনা। মণিময় অবাক হয়ে বলল, কী বলছেন উপেনদা ? কী করবেন মানে ? ডাক্তার দেখাবেন। এভাবে হেলাফেলা করবেন না। উপেন মাথা নীচু করে বসে রইল। উপেনদা, কী হল দাদা — চুপ হয়ে গেলেন যে। ডাক্তার দেখাবেন না ? হ্যাঁ ভাই তাতো দেখাতেই হবে। কিন্তু নয়নপুরের ডাক্তার দেখিয়ে কিছু লাভ হবে কি — ? উপেন চিন্তিত ভঙ্গীতে মণিময়ের দিকে তাকাল। মণিময় সায় দিয়ে

বলল, এটা অবিশ্যি ঠিকই বলেছেন। নয়নপুরের ডাক্তার তো রোগ নির্ণয়ই করতে জানে না। সেবার দেখলেন না দক্ষিণ পাড়ার অমৃতের রোগই ধরতেপারছিল না। তারপর তো হাওড়া হসপিটালে গিয়ে চিকিৎসা করে সুস্থ হল।

উপেন মণিময়ের কথায় আশ্বস্ত হল। ছাড়ো তো এসব কথা, কাল জয়েন করছ তো ? নাকি বাড়িতে দুদিন ছুটি কাটাবে? উপেনের কথা শুনে মণিময় বাড়ি যাবার জন্য উদ্যত হয়ে বলল হ্যাঁ, হ্যাঁ কালই জয়েন করব। আজ ত াহলে চলি দাদা। রাত প্রায় নয়টা বাজে। আরেকটা কথা — বৌঠানের ব্যাপারটা গাফিলতি করবেন না। কোনোরকম সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমাকে বলবেন। কেমন ? উপেন খুশি হয়ে বলল, হ্যাঁ ভাই প্রয়োজনে তোমাকেই সব বলি ভাই। এই নয়নপুরে আর কেই বা আছে আমার, বলো ? চলো তোমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। যা অন্ধকার ! বলে উপেন মণিময়কে প্রায় বাড়ির কাছাকাছি ছেড়ে এল।

উপেন বাড়ি ঢোকার পর গেটে তালা লাগিয়ে ঘরে এসে ঢুকল। এত রাতের পর আর কেউ তো আসার সম্ভাবনাই নেই। অঞ্জলি এই ফাঁকে হাতমুখ ধুয়ে ফ্যান চালিয়ে বিছানায় শুয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছে। আজকাল প্রায়ই বিকেলের দিকেই শরীরটা খারাপ লাগে। কেননা উপেন এইসব ব্যাপারে সবসময়ই উদাসীন। মণিময়কে কী বলেছে সবই শুনেছে অঞ্জলি রান্নাঘর থেকে। যতটা মুখে বলে ততটা উপেন স্ত্রীকে নিয়ে ভাবে না। এটা খুউব ভালই জানে অঞ্জলি। তাই ভাবে এই লোকটাকে শুধু শুধু বিব্রত করে লাভ কী ! এত বছর সংসার করে এইটুকু তো অঞ্জলি বুঝতে পেরেছে — উপেন কোন্ গোত্রের লোক ! পতিব্রতা স্ত্রী হিসেবে যা যা করার সবই করে এসেছে অঞ্জলি, এবং আজও করেই যাচ্ছে। এতে উপেনের কিছু যায় আসে না। হয়তো ভাবে, স্ত্রীকে তো তার দায়িত্ব পালন করতেই হবে। স্বামীরও যে অনেক দায়িত্ব কর্তব্য থাকে সে ব্যাপারে উপেনের কোনো চেতনা নেই। আজ দুজনেরই বয়স হয়েছে। চিন্তার পাহাড় জমেছে অঞ্জলির মনেই, উপেনের নয়।

আজকাল আর অঞ্জলির কাজেকর্মেও মন লাগে না। বড় ছেলে অলকটাও হয়েছে তেমনি। অনেকটাই বাপের মতন। ভীষণ খামখেয়ালি স্বভাবের। চাকুরি সূত্রে কলকাতা থাকে ঠিক আছে, তা বলে কি মা-বাবা, ভাই-এর খোঁজখবর নেওয়া যায় না? মাসে একবার আসার কথা। তাও প্রতি মাসে আসে না। তারজন্য কৈফিয়ত দিতেও নারাজ। সন্তানের বয়স যতই হোক মা-বাবার কাছে তো সে ছোটোই থাকে। এটাই হয়তো আজকালের ছেলেমেয়েরা বুঝতে চায় না। অবিশ্যি উপেন বড় বেশি অলকের এই ধরনের আচরণকে তোয়াক্কা করে না। অঞ্জলির হয়েছে যত জ্বালা। ছেলে মাকে ভুলে থাকতে পারে, কোনো মা কি পারে তার ছেলেকে ভুলে থাকতে ? উপেনের সামনে অলকের কথা বেশি বলতেও পারে না অঞ্জলি। তা হলেই পরিস্থিতি গরম হয়ে ওঠে। ছেলে আসুক না আসুক এতে উপেনের বড় একটা আসে যায় না। ভাল আছে এটুকু জানলেই হল। কিন্তু অঞ্জলি? মনেপ্রাণে চায় যে অলক

অন্তত একবার বাড়ি এসে ঘুরে যাক। এটার অন্যথা হলেই অঞ্জলির মন মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। স্বামী হিসেবে উপেন কিন্তু স্ত্রীর এইটুকু মমত্ববোধকেও বুঝতে চায় না। এমন স্বামীকে যে এত বৎসর যাবৎ মানিয়েই এসেছে। এমন কী ছেলের সঙ্গেও মানিয়ে চলতে হবে। সব ছেলেরা যেমন ভাল হয় না, তেমনি সব ছেলেরা তো খারাপও হয় না। মায়ের কাছে কোনো সন্তানই খারাপ হয় না। কিন্তু অঞ্জলি তো সারাটা বিবাহিত জীবন শুধুই সংসারের জাঁতাকলে পিষে এসেছে। বাইরের জগৎ সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান নেই বললেই চলে। আজ এই বার্ধক্যের দোর গোড়ায় এসে অঞ্জলির কীই বা চাহিদা থাকতে পারে ? শুধু এইটুকুই — ছেলের কাছ থেকে পিতামাতার প্রতি কর্তব্য যতটুকু ততটুকুই। এর চাইতে বেশি কিছুই চায় না অঞ্জলি। সংসারে কলুর বলদের মতো ঘানিই টেনে গেল। তার বদলে পাওয়ার মতো কিছুই সে পায়নি। ভেবেছিল বড় ছেলে অলক অন্তত মাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে প্রতি পদক্ষেপে মায়ের প্রয়োজন অনুভব করবে। কিন্তু এ যে অভাবনীয়। অলক এভাবে শহরের ভিড়ে হারিয়ে যাবে শুধুমাত্র নিজের অস্তিত্বটুকু নিয়ে ? এ রকম শিক্ষা তো অঞ্জলি দেয়নি ছেলেকে। তবে ? সবই অদৃষ্টের পরিহাস। এসব ভাবতেভাবতে চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে অঞ্জলির। কী হল ভাত-টাত দেবে না নাকি ? হঠাৎ উপেনের ডাকে চমকে উঠে পড়ল অঞ্জলি। উপেনের কণ্ঠস্বরের রুক্ষতা অঞ্জলির অতি পরিচিত। তাই এসবে আর ওর মন খারাপ করে না। খেতে দেওয়ার আগে হীরককে ডেকে নিল। বাইরের আকাশটা মনে হয় মেঘাচ্ছন্ন। যদি দুফোঁটা বৃষ্টি হত তবে নয়নপুরের মাটিতে মানুষগুলো একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারত। এত গরম বলেই অঞ্জলির শরীরটা খারাপই থাকে। বিশ্রামের তো কোনো উপায়ই নেই। খাওয়াদাওয়ার পরে আজ অঞ্জলি বাসনপত্র রেখেই দিল। এখন আর ইচ্ছে করছে না কাজ করতে। হীরকের বিছানা রেডি করে সোজা নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। উপেন বসে এখন টি.ভি র খবর শুনবে। তারপর ঘুমাবে। হঠাৎই কী মনে হল অঞ্জলির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, জান তো আজ মণিময়কে তোমার শরীর খারাপের কথা সব বললাম। কী গো ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ? অঞ্জলি পাশ ফিরে শুয়েই রইল। অগত্যা উত্তর দিল, না— আমি শুনেছি সব, দাদাকে কী বলেছ। এখন আর নতুন করে বলে কাজ নেই। আমার ঘুম পেয়েছে। আর তাছাড়া ...। তাছাড়া কী ? খেঁকিয়ে উঠল উপেন, শরীর খারাপ ? এই তো ! সে তো শুনতে শুনতে আমার কান পচে গেল। শহরে গিয়ে ডাক্তার দেখাতে হলে তো পয়সাকড়ি যোগাড় করতে হবে নাকি ? অঞ্জলি উপেনের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি কি তাই বলেছি নাকি ? তাছাড়া আমার এমন কি হয়েছে যে বড় ডাক্তার দেখাতে হবে ? রাত্তির হয়েছে অনেক। এখন আর চিৎকার কোরো না তো । আমাকে ঘুমুতে দাও। বলে অঞ্জলি আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। ঘুম কি আর আসে সহজে ! আজকাল যে কত চিন্তা ঘুরপাক খায় অঞ্জলির মাথায়। আরেক দিকে এটাও চিন্তা, উপেনেরও বয়স হয়েছে। সংসারের দায়িত্বতো

পুরোই উপেনের কাঁধেই। উপযুক্ত ছেলে রয়েছে তবুও উপেনের কোনো দায়িত্বই কমে নি। অলক যদি নিজের বাবার, মানে সংসারের, কিছু দায়িত্ব নিত, তাহলে তো উপেনও অনেকটাই ভারমুক্ত থাকতে পারত। উপেনেরও কপাল মন্দ। সংসার নামক রথটি টেনেই চলেছে। তাই হয়তো আরও কর্কশ হয়ে গেছে। অঞ্জলি যে বোঝে না কিছু, তা নয়। সামনে আবার রয়েছে হীরকের পরীক্ষা। তারপর আবার ওর ভবিষ্যৎ ভাবনা। অলক বাড়িতে এলেও এসব নিয়ে বাবার সঙ্গে কোন আলোচনাই করে না। কেমন যেন একটা উড়ুউড়ু ভাব নিয়ে থাকে। অঞ্জলির এ সমস্ত আচরণ মোটেই ভাল লাগে না। এবার অলক এলে সংসারের সমস্যাগুলি ওর সামনে তুলে ধরতে হবে। নয়ত এই ছেলে গা ছাড়া ভাবেই চলবে। মায়ের দুঃখ ওকে বুঝতে হবে না। কিন্তু বাবা ? যে শরীরের রক্ত জল করে ছোটো থেকে বড় করেছে, পড়াশুনো শিখিয়েছে, তার মূল্যায়ন তো করতেই হবে অলককে। সন্তানকে সঠিক পথে চালানোর দায়িত্ব মায়েরই বেশি থাকে। তাই চেষ্টা অঞ্জলিকে করতেই হবে।

ভোর রাতে মনে হয় বৃষ্টি হয়ে ছিল। তাই গাঁয়ের রাস্তা ভেজা ভাব। গরমের দাপটও কমেছে অনেকটাই। তিনদিন পরই বিশ্বকর্মা পূজা। গ্রামে কোনো বিশ্বকর্মা পুজো হয় না, বাসস্ট্যান্ডে একটা হয়। বড় প্যান্ডেল করে জাঁকজমকপূর্ণ পুজোই হয়। নয়নপুরের বাসিন্দাদের কাছ থেকেও ওরা চাঁদা আদায় করে। মাতব্বরদের কাছ থেকে মোটা টাকাই ছিনিয়ে নেয়। এই গ্রামেও অরাজকতা আছে। আগের শান্ত-সুনিবিড় নয়নপুর এখন আর নেই। দুর্জন লোকের আধিপত্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে। প্রাণের স্বচ্ছতা আজ মানুষের মধ্যে নেই বললেই চলে। কিন্তু নয়নপুর আজও ভদ্র, সভ্য মানদণ্ড ধরে রেখেছে শুধুমাত্র কয়েকজন শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মানুষের জন্য। নয়ত এই গ্রাম কবেই সভ্যতার অন্ধকারে তলিয়ে যেত। অনেক পরিবার আছে, যে পরিবার এই নয়নপুরের মাটিতেই বংশানুক্রমিক বেড়েছে আর এখন ওদের ছেলেপিলেরা সংসার করছে। এই প্রজন্মে যেমন অনেক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটছে, তেমনি আবার এই আধুনিক প্রকৌশলী যুগে বেশিরভাগ ছেলেমেয়েরা পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্যহীন হয়ে পড়ছে। আজকের সমাজব্যবস্থায় মানুষের মধ্যে নানা বিষয়ে সচেতনতাবোধ বেড়েছে যেমন একদিকে, তেমনি অন্যদিকে এই সমাজ নানারকম লোভ, মোহের শিকার হয়ে বিষাক্ত হয়ে পড়ছে। আগের মতো মানবিকতাবোধ, মনুষত্ব্যবোধ আজ আর সকলের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। শিক্ষার ডাল পালা যতই ছড়াচ্ছে তত শিক্ষার মানদণ্ড কমে যাচ্ছে। আকাশেবাতাসে ছড়াচ্ছে শুধু অপসংস্কৃতির গন্ধ। শিক্ষিত লোকরা দুর্নীতির চাদর পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গোটা সমাজটাই রাজনীতির দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। নীতিজ্ঞানহীন হয়ে কত মানুষই আজকাল ভুল পথে নিজেকে চালাচ্ছে। সহজসরল পথে চলতে মানুষ ভুলে গেছে। অনেকটা সেই প্রবাহেই চলছে এই নয়নপুর গ্রাম। এখানকার চল্লিশভাগ লোকই শিক্ষিত, এবং এই চল্লিশভাগ লোকের মধ্যে শিক্ষার গুণ যথেষ্টই রয়েছে। হয়তো বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওদের

জ্ঞানের পরিধি খুবই কম বলে ! অথবা শহরের ছোঁয়া ততটা লাগেনি বলে। গ্রামে বসবাস করলেও এদের অনেকেরই বুদ্ধিমত্তা কিন্তু স্বল্প পরিসরে সীমাবদ্ধ নেই। এরাও পারে এ যুগের হাওয়া মানিয়ে চলতে, নিজেদের বুদ্ধিদীপ্ততার পরিচয় দিতে। কোনো গ্রামই এজন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। শিক্ষার দায়বদ্ধতায় আজ গ্রাম-শহর একাকার। নয়নপুর গ্রাম হলেও এখন আর অতটা পিছিয়ে নেই। কিন্তু যতটা উন্নত হওয়ার কথা ছিল এই গ্রামের ততটা হতে দেয়নি কিছু মাতব্বর গোছের দুশ্চরিত্র লোক। এরা সবাই এই গ্রামেরই বাসিন্দা। এদের মধ্যে দু-চারজন শিক্ষিত যেমন আছে, আবার অশিক্ষিত মূর্খও আছে। এদের দুর্নীতিপরায়ণতার জন্য কিছু সংখ্যকগ্রামবাসী আজ বিপর্যস্ত অবস্থায় দিন কালাতিপাত করছে। এদের অরাজকতা গ্রামের উন্নয়নে বাধা পড়ছে। সাধারণ অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকেরা এদের ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। প্রতিবাদ কি এরা করতে জানে না ? নিশ্চই জানে, কিন্তু এরা এতই নিরীহ যে প্রতিবাদের ভাষা খুঁজেই পাচ্ছে না। গাঁওপ্রধান হরিমোহন মজুমদার এই নিকৃষ্ট শ্রেণীর মধ্যেই পড়ে। একশ্রেণীর পরিশ্রমী লোকেরা এই হরিমোহনকে ভগবানের ন্যায় মান্য করে, মানে মান্য করতে বাধ্য হয়। উপেন মণিময় এই গ্রামের বিদ্বজ্জন। তারা হরিমোহনকে একরকম এড়িয়েই চলে। কিন্তু হরিমোহন ? সে কিন্তু নয়নপুরে যত শিক্ষিত, পণ্ডিত ব্যক্তিরা আছেন তাদের সঙ্গে গায়ে পড়ে সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করে। সে এতই মিষ্টভাষী যে প্রথম আলাপে কেউই তাকে বুঝতে পারে না সে যে কী প্রকৃতির ধূর্ত লোক। তবে হ্যাঁ— পাড়া প্রতিবেশী ছেলে মেয়েদের সে নিজের সন্তানের চোখেই দেখে। ওদের জন্য ভাল চিন্তাধারাও করে। তাই ভাল একটা চিন্তাধারা নিয়েই হরিমোহন মণিময়ের বাড়ির দোরগোড়ায় উপস্থিত হল। হরিমোহন মণিময়কে যথেষ্ট সম্মান করেই চলে। শিক্ষিত, মার্জিত বলে সে মণিময়ের সাথে কথা বলতে যথেষ্ট দ্বিধাই করে। আজও ইতস্তত করছিল মণিময়ের বাড়িতে ঢুকতে। হঠাৎ রেখাকে উঠানে দেখল —— ভেজা কাপড় ছড়াচ্ছে। রেখাকে দেখে হরিমোহন ভিতরে ঢুকল এবং জিজ্ঞেস করল, রেখা মা, স্যার আছেন তো ? একটু দরকার ছিল। রেখা সম্মান প্রদর্শন করেই বলল হ্যাঁ, আছেন। আপনি আসুন না। ভিতরে আসুন। না মা না আমি ঠিক আছি। স্যারের সঙ্গে দুটো কথা বলেই চলে যাব। এই বলে হরিমোহন বিনয়ের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েই রইল। রেখা কথা না বাড়িয়ে ভিতরে গেল মণিময়কে ডাকতে। কী মতলবে হরিমোহন এসেছে কে জানে ! শোভা এসে উঁকি মেরে দেখে আবার ভিতরে চলে গেল। শোভা কোনো সময়েই হরিমোহনকে পছন্দ করে না। হরিমোহন ঠায় দাঁড়িয়েই রইল। মণিময় বেরিয়ে এল বারান্দায়। বাড়িতে শত্রু এলেও তাকে অবজ্ঞা করতে নেই —- এটাই মানে মণিময়। তাছাড়া হরিমোহন তো শত্রু নয়। যাক— মণিময় অভ্যর্থনা করে হরিমোহনকে বারান্দায় চেয়ারে বসাল। রেখা এসে সামনে দাঁড়ালে, ইশারা করে চা নিয়ে আসতে বলল। শোভা ভিতরের ঘরে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল। মণিময় স্বভঙ্গিমায় হরিমোহনকে বলল, বলুন,

হরিমোহনবাবু — আপনার কী কথা। আজ স্কুলে একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে — তাই বলছিলাম, বলে ফেলুন। হরিমোহন সরাসরি মণিময়কে বলে ফেলল স্যার — রেখার জন্য একটা ভাল পাত্রের সন্ধান এনেছি। রেখা মায়ের বিয়ে দেবেন তো ? মণিময় হাঁ করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ হরিমোহনের দিকে, এই লোকটা এনেছে রেখার বিয়ের সম্বন্ধ ! তাও কিনা আবার ভাল। বিস্ময়ের ভঙ্গীতে বলল মণিময়, তাই নাকি? মেয়েকে তো বিয়ে দিতেই হবে। তা আপনি কোথায় পেলেন ভাল পাত্রের সন্ধান? এর মধ্যে রেখা চা নিয়ে এল এবং হরিমোহনের হাতে দিল। মণিময় ভদ্রতার ভঙ্গীতে বলল, নিন—চা খান হরিমোহনবাবু। আপনি একটা ভাল খবর নিয়ে এসেছেন, সে তো খুবই প্রশংসনীয়। কিন্তু আপনার হঠাৎ রেখার ব্যাপারে এত আগ্রহ? ঠিক বুঝলাম না। হরিমোহন চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, না স্যার, আমাকে ভুল বুঝবেন না। রেখা মা আমার সন্তানের মতো। আমাকে যদিও অনেকেই পছন্দ করে না, তাই বলে কি এটুকু কর্তব্য আমি করতে পারি না? তাছাড়া রেখার মতো মেয়ে এ গ্রামের গর্ব। এতক্ষণ মণিময় মনোযোগ দিয়ে হরিমোহনের কথাগুলি শুনছিল। অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, এখন বলুন — কোথায় পেলেন পাত্রের সন্ধান ? হরিমোহন উৎসুক হয়ে বলল, স্যার কাল ব্লক অফিসে পঞ্চায়েত স্তরের মিটিং ছিল। সেখানে মিটিং শেষে ঐ অফিসের ক্যাশিয়ার কথায় কথায় বললেন, একটি ভাল ছেলের জন্য একটি ভাল মেয়ে খুঁজে দিতে। মণিময় দেখল ঘড়িতে প্রায় নয়টা বাজে। শোভা রান্নার আয়োজন করছে। মণিময়ের সময় হয়ে যাচ্ছে। হরিমোহন এসেছে একটা ভাল কাজ নিয়ে। তাকে বা কী করে বলে চলে যেতে! শুনুন হরিমোহনবাবু - আপনি পাত্রের একটা বায়োডাটা আমাকে এনে দিতে পারবেন তো ? তাহলে খুব ভাল হয়। হরিমোহন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ও হো, স্যার আপনার দেরি করে দিলাম। আর পাত্রের বায়োডাটা ? সে আমি অবশ্যই এনে দেব, দু-চার দিন দেরি হবে হয়তো ! ঠিক আছে - আজ আসি স্যার, বলে হাতজোড় করে নমস্কার করল এবং চলে গেল।

শোভা রান্নাঘর থেকে মোটামুটি সবই শুনেছে। হয়তো বা মণিময় এই ব্যাপারটাকে বেশি গ্রাহ্য করতে চাইবে না হরিমোহনের দেওয়া সম্বন্ধ বলে ! শোভা ভাবছে হরিমোহনের কথাকে গুরুত্ব না দেওয়ার বা কী আছে ! আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের মধ্যে আজ পর্যন্ত তো মেয়েটার জন্য ছিটেফোঁটা চিন্তাও করেনি কেউ। তবুও তো হরিমোহন খারাপ লোক হলেও রেখার কথা মনে রেখে এগিয়ে তো এসেছে সাহায্য করতে। হয়তো বা এটা ঈশ্বরেরই ইচ্ছা। কে কখন কার দ্বারা উপকৃত হয়, কেউ বলতে পারে ? সুতরাং শোভা মনে মনে ঠিক করল, বিকেলে স্কুলের থেকে ফিরলে মণিময়কে বোঝাতে হবে এই ব্যাপারটা যেন এড়িয়ে না যায়। মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছে তখন তাকে পাত্রস্থ করার দায়িত্ব তো মা-বাবারই থাকে। তাই হরিমোহনের সঙ্গে যোগাযোগ করে সম্বন্ধটা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। নিজেদের স্বার্থেই এটা মণিময়ের

করা উচিত। বিয়ে হওয়া না হওয়া তো নিয়তির হাতে। হরিমোহন লোক হিসেবে যত খারাপই হোক না কেন শোভার দৃঢ় বিশ্বাস— রেখার জন্য আজেবাজে বিয়ের সম্বন্ধ আনবে না। নিজে খারাপ বলে কি তার ভালমন্দের বিচার করার ক্ষমতা নেই নাকি ? তাছাড়া — হরিমোহন রেখাকে নিজের মেয়ের মতোই দেখে। এই লোকটাকে দিয়ে যদি কার্যোদ্ধার হয় তাতে কারো আপত্তি থাকার তো কথা নয়। শোভা অনেক সময় বিরক্তি প্রকাশ করে মণিময়ের এই ধরনের আচরণে। তার মতে যে যেরকম বিয়ের প্রস্তাবই দিক না কেন তা গ্রহণ করা উচিত। কে জানে রেখার কোথায় কার সঙ্গে ভাগ্য জুড়ে রয়েছে। মেয়েটার বয়স হচ্ছে তো! মণিময় এইসব ব্যাপারে সবসময়েই উদাসীন। মেয়েকে পাত্রস্থ করার ব্যাপারে সে কোনো সময়েই সিরিয়াসলি চিন্তা-ভাবনা করে না। শোভার ইচ্ছে ছিল হরিমোহনের সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলে ! তাতেও তো মণিময়ের আপত্তি ! হরিমোহনের মতো মানুষের সঙ্গে কথা বলা পছন্দ করে না। তাই অগত্যা চুপ করেই রইল শোভা। শোভা মনেমনে ঠিক করে ফেলল এবার মণিময়কে চাপ দেবে হরিমোহনের প্রস্তাবের খোঁজখবর নিতে। প্রয়োজনে হরিমোহনের বাড়িও যেতে বলবে। এভাবে সবকিছু এড়িয়ে চললে তো হবে না !

হরিমোহন বাড়িতে ঢুকল। বেলা গড়িয়েছে অনেকটাই। খাঁ খাঁ করা রোদে তেতে পুড়ে এসেছে। হরিমোহনের স্ত্রী লাবণ্য এল হরিমোহনের কাছে। হাতে এক গ্লাস জল নিয়ে। আশ্চর্য তো লোকটা, এত চুপচাপ, গম্ভীর। বাড়িতে ঢুকেই তো হল্লা আরম্ভ করে দেয়। আজ কী হয়েছে কে জানে। শরীরটরির খারাপ নয়ত ; গোপাল বা রঞ্জন কারুর খোঁজও করছে না। ভাবছিল লাবণ্য হরিমোহনের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, কী গো কিছু হয়েছে তোমার ? এত ঠান্ডা মেজাজে বসে আছ ? হরিমোহন ফিরে তাকাল লাবণ্যের দিকে। জলের গ্লাসটা হাত বাড়িয়ে নিল। মাথা নেড়ে জানাল কিছুই হয়নি। তবুও লাবণ্যর একটু দ্বিধা মনে রয়েই গেল, বিশ্বাস হল না। আবারও নাছোড়বান্দা হয়ে বলল, উঁহু, কিছু একটা তো হয়েছেই। আর সেটা আমার কাছে লুকোচ্ছ। তাই তো ? আর তাছাড়া, আমাকে কবেই বা কিছু বল। তুমিই তো তোমার ইচ্ছেমতোই চলছ ? বলে আবেগপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল হরিমোহনের দিকে। হরিমোহন উঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গায়ের গেঞ্জিটাও খুলে ফেলল। প্রচন্ড গরম, ফ্যানও চলছে পুরোদমে। হরিমোহন ইজিচেয়ারটা টেনে আনল ফ্যানের নীচে এবং বসল। লাবণ্যকে বলল মুচকি হেসে, আরে না, না। কিছুই হয়নি। কী আবার হবে ? তুমি শুধু শুধু ভাবছ লাবণ্য ! যাও, খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা কর, আমি এক্ষুনি চান করে আসছি। বলে বাথরুমের দিকে যাওয়ার জন্য উদ্যত হল। লাবণ্য সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আজ হরিমোহনের কাছ থেকে কথা বের করতেই হবে। হরিমোহন তার স্বামী। স্ত্রী হিসেবে লাবণ্যর কর্তব্য স্বামীর মনের কোণে পড়ে থাকা গোপন কথা বের করে উত্তেজনা প্রশমিত করা। তাই একরকম জোর করেই লাবণ্য বাধ্য করল হরিমোহনকে উত্তর দিতে। হরিমোহন লাবণ্যের স্পষ্ট ভঙ্গিমার কাছে নিজেকে

আত্মসমর্পণ করল। তাই নম্র গলায় বলল, তেমন কিছু নয়, তবুও তুমি নাছোড়বান্দা, তাই বলছি। আজ আমি মণিময় স্যারের বাড়ি গেছিলাম একটা বিশেষ কাজে।— তাই নাকি ? খুশী হয়ে লাবণ্য বলল। হরিমোহন জানালার দিকে তাকিয়ে উদাসভাবে বলল, জান তো লাবণ্য, আমি রেখার জন্য একটা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গেছিলাম। রেখা তো আমাদেরও মেয়ে। এই ভাবনা নিয়েই গেছিলাম, কিন্তু ....। লাবণ্য সামনে এগিয়ে এসে বলল, কিন্তু ? কিন্তু কী ? ওরা তো নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়েছে ?— হরিমোহন লাবণ্যের কথার কোন পাত্তা না দিয়েই বলল, হবে হয়তো। আমি বুঝিনি। জান তো লাবণ্য - সেরকম কোনো সাড়া পেলাম না। মণিময় স্যার তো ভাল করে কথাই বললেন না। মনে হচ্ছিল যেন আমারই গরজ বেশি। নিজের কাছে নিজেকে আজ খুব ছোটো মনে হচ্ছিল। লাবণ্য ধীরে জিজ্ঞেস করল তোমাকে চা টা খাওয়াল ? না কি তাও খাওয়ায় নি ? হরিমোহন হেসে বলল, না, না তা খাইয়েছে। লাবণ্য একটু উত্তেজিত হয়েই বলল, তাহলে ? তাছাড়া তুমি তো একটা ভাল প্রস্তাব নিয়েই গেছ! আজকালকার দিনে কে কার জন্য ভাবে। আর কেই বা উপকার করতে এগিয়ে আসে ! তা তুমি তো ওদের ভাল করতেই এগিয়ে গেছ। তা নয় গেছি, বলে এগোল লাবণ্যর দিকে হরিমোহন। বলল অভিমানের সুরে, কিন্তু ওরা তো আমাকে ভালভাবে নেয়নি। আজ বুঝতে পারছি লাবণ্য— আমি মানুষটা খুব খারাপ। এই নয়নপুর গ্রামে আমার যে সুনাম নেই, সেটা যেমন সবাই জানে, তেমনি তুমিও তো জান। মণিময় স্যারের মতো খাঁটি মানুষ আমাকে পছন্দ করবেন কেন ? আমি শিক্ষিতও নই, ভদ্রও নই। আমি একটা অর্থলোভী মানুষ। আজ বুঝতে পারছি গো, অর্থ সব কিছু নয়। একটা মানুষের শিক্ষার অগ্রগতি, মনের প্রসার, মানসিকতা, ভাল আদবকায়দা, ভাল আচরণ ইত্যাদি একান্তই থাকা দরকার। যার কোনটাই আমার মধ্যে নেই। তাই আজ রেখাদের বাড়িতে গিয়ে বুঝলাম যে একটা নামের সুখ্যাতি কত দরকার। বলে হরিমোহন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। পরিবেশ যথেষ্ট দুঃখদায়ক হয়ে যাচ্ছে বলে লাবণ্য ঠোঁটের কোণে একটু হাসি নিয়ে বলল হরিমোহনকে, ছাড়ো তো, তোমার আত্মকথা। খারাপ ভাল মিশিয়েই মানুষ তৈরি হয়। তোমাকে কি কেউ অপমান করেছে নাকি ? মণিময়বাবু সবসময়েই রাশভারী গোছের লোক। কিন্তু রেখার মা তো খুবই অমায়িক প্রকৃতির মানুষ, আমি তো তাঁকে ভালই চিনি। বলে লাবণ্য তোয়ালেটা নিয়ে হরিমোহনের হাতে দিয়ে বলল, এবার যাও চানে। বেলা প্রায় দেড়টা বাজে। বাকি কথা পরে শুনব। বলে হন্‌হন্ করে বেরিয়ে গেল লাবণ্য রান্নাঘরের দিকে। গোপাল রান্নাঘরের মেঝেতে বসেছিল। লাবণ্য গোপালকে নির্দেশ দিল টেবিলে খাওয়ারগুলো সাজিয়ে রাখতে। লাবণ্য দেখল হরিমোহন বাথরুমের দিকে যাচ্ছে। লাবণ্য মনে মনে ভাবল, আজ লোকটা বুঝতে পারছে সে কতটা খারাপ লোক। তার সুখ্যাতি কতটা এই গ্রামে! গাঁওপ্রধান বলেই সবার কাছে সে কতটুকু গ্রহণযোগ্য হরিমোহন তিলে তিলে আরও বুঝতে পারবে। এ তো কিছুই নয়। আজ মণিময়ের মতো শিক্ষিত, ভদ্রলোকের

সামান্য সংস্পর্শে এসেই তার বিবেক দংশন হচ্ছে। লাবণ্য তো এত বছরে বিবাহিত জীবনে বুঝতেই পেরেছে, তার স্বামীটি কী ধাঁচের তৈরি মানুষ। তাই বলে সে কোনোদিন অসম্মান বা অবমাননার চোখে দেখেনি হরিমোহনকে। তার সমস্ত অন্যায় অবিচারকে মুখ বুজেই সহ্য করে এসেছে। প্রতিবাদ যে করেনি তা নয়। হরিমোহন তা গ্রাহ্য করেনি কোনোদিন। ছেলেটাও হয়েছে একই ধাঁচের। আজ হরিমোহনের আত্ম বিশ্লেষণে লাবণ্য মনে মনে খুশিই হয়েছে। এই আত্মবিশ্লেষণের প্রভাবটা যদি ছেলের উপর পড়ে, তা হলে হয়তোবা ছেলে রঞ্জনকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করতে পারে। এখনও সময় পেরিয়ে যায় নি। মানুষের সাধ্যের বাইরে কিছুই নেই। রঞ্জন আজ যৌবনের কাঠগড়ায় নিজেকে শুধু বলি দিয়ে যাচ্ছে। প্রতি পদক্ষেপে নিজেকে ধ্বংসের মুখোমুখি ঠেলে দিচ্ছে। পিতা হিসেবে একমাত্র হরিমোহনই পারে রঞ্জনকে ফিরিয়ে আনতে। লাবণ্য কোনোদিন যে হরিমোহনের সাথে এসব নিয়ে আলোচনা করেনি তা নয়, অনেকবারই করেছে। কিন্তু ফল কিছুই হয়নি, অশান্তি ছাড়া। লাবণ্য ভাবছে, ঈশ্বর কি তা হলে মুখ তুলে তাকিয়েছেন! সে জন্যই কি হরিমোহন নিজের দোষগুলি খুঁজে পেয়েছে ? পথে চলতে গিয়ে একবার হলেও হোঁচট খেতে হয় সবাইকেই, আবার সেই পথ যদি কর্দমাক্ত হয়, পিচ্ছিল হয়। যাকগে লাবণ্যর এই ভাবনার তরী কোথায় গিয়ে থামবে, তা লাবণ্য নিজেও জানে না।

আজ বাংলার ঘরে ঘরে, বিশেষ করে সমাজের নীচু স্তরের মধ্যে নারী নির্যাতন যেভাবে চলছে বা যে করুণভাবে নারীরা নিগৃহীত হচ্ছে তা বলাই বাহুল্য। আজ উঁচু তলার মানুষের মধ্যে এই নোংরা, ঘৃণ্য মনোবৃত্তির কুপ্রভাব ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছে। লাবণ্য যদিও এতটা অত্যাচারিত হয় নি কখনও, কিন্তু মানসিকভাবে যথেষ্টই ভগ্ন -গ্রস্ত থাকে প্রায়শই। একদিকে স্বামী, অন্যদিকে ছেলে দুজনের কাছ থেকে লাবণ্য মোটামুটি মানসিকভাবে নির্যাতিতা তো হয়েই চলেছে। এটাকেও তো নির্যাতনই বলা যায়। হরিমোহনকে নিয়ে সংসার করা যে কী দুরূহ ব্যাপার তা একমাত্র লাবণ্যই বুঝতে পেরেছে। আজ গ্রামে গঞ্জে, শহরে, ধনীদরিদ্র যেমনই হোক না কেন বিয়ের পর অনেক মেয়েরাই শুধু স্বামীর নয়, শ্বশুর, শাশুড়ি, দেওর, ননদ প্রত্যেকেরই নানারকম অত্যাচার মুখ বুঝে সহ্য করছে। আবার অনেকে প্রতিবাদ করতেও এগিয়ে আসে। লাবণ্যর পরিস্থিতি যদিও ততটা খারাপ নয়। কিন্তু রেখা ? সেও তো একটা ভদ্র-সভ্য পরিবারের মেয়ে। হরিমোহন ওর জন্য পাত্রের সন্ধান কোথায় পেল, এটা তো জিজ্ঞেস করা হয়নি হরিমোহনকে ! যাকগে খাওয়ার টেবিলে বসে এসব আলোচনা করাটা ঠিক হবে না ভেবে লাবণ্য চুপচাপ খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলল। রঞ্জন আসেনি এখনও। বেলা প্রায় তিনটে বাজে। এলে গোপালই রঞ্জনকে ভাতটা বেড়ে দেবে। টেবিলে সব ঢাকা দেওয়া আছে।

বিকেলের রোদটা গোধূলির কোণে দেখা আলোর মতো নয়নপুর গ্রামটাকে ছেয়ে রয়েছে।

আকাশের এক কোণে একফালি কালো মেঘও রয়েছে। হয়তো বা রাতে বৃষ্টির হাতছানি দিচ্ছে। বিছানায় শুয়ে লাবণ্যর চোখটা লেগে গেছিল। হঠাৎ খোলা জানালা দিয়ে একটু একটু ঠান্ডা হাওয়ার আগমনে লাবণ্য চম্‌কে উঠল। সুন্দর বিকেলটা লাবণ্যর হৃদয়কে ছুঁয়ে গেল। লাবণ্য এমনিতেই একটু আবেগপ্রবণ। বিছানায় বসে বাইরের প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগল। পাশের খাটে হরিমোহন নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে রয়েছে। হঠাৎ গোপাল এসে ঢুকল ঘরে, চা করবে কিনা জিজ্ঞেস করতে। লাবণ্য গোপালের কাছ থেকেই জানতে পারল রঞ্জন কখন এসে ভাত খেয়েছে। মায়ের কর্তব্য হিসেবেই জিজ্ঞেস করা। আর কিছুই নয়। গোপালকে বলে দিল দু-কাপ চা আনতে। এই ফাঁকে হরিমোহনও উঠবে নিশ্চয়ই। লাবণ্য ডাকবেনা, যখন খুশি উঠুক। চা খেয়ে ঠাকুর ঘরে ঢুকবে। যদি সুযোগ হয় তো রেখার পাত্রের ব্যাপারে অবশ্যই জিজ্ঞেস করতে হবে। লাবণ্য উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসেই রইল। কী গো— চা খাওয়াবে না ? হঠাৎ পাশ ফিরে লাবণ্যকে বলে উঠল হরিমোহন। লাবণ্য দৃষ্টি না ফিরিয়েই বলল, হ্যাঁ — বলেছি গোপালকে। এখুনি নিয়ে আসবে। চোখে মুখে জল দিয়ে এসো ! হরিমোহন উঠে হাই তুলতে তুলতে চলে গেল ঘরের বাইরে। ঘর থেকে হঠাৎ বাইরে চিৎকার চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে। হরিমোহনেরই আওয়াজ। কী রে হতভাগা গোপাল, দু-কাপ চা করতে এতক্ষণ ! কখন তোকে বলা হয়েছে। আমি সবই শুনতে পেয়েছি ! লাবণ্য তড়িঘড়ি করে ঘর থেকে বেরিয়ে উঠানে চলে এল। স্বামীর উদ্দেশে বলল, কী হল, এত চেঁচামেচি করছ কেন ? ঘুম থেকে উঠেই শুরু করে দিলে ? ততক্ষণে গোপাল ট্রে-তে করে চা নিয়ে শোওয়ার ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। নিরীহ গোপালকে কখনও লাবণ্য বকাবকি করে না। বরং অন্য কেউ বকলে খুব রাগ হয় লাবণ্যর। খুবই কষ্টবোধ হয় ছেলেটার জন্য। সেজন্য নিজেই অনেক কাজ করে নেয় লাবণ্য। ভারী কাজগুলো গোপালকে দিয়ে করাতে ভাল লাগে না। ও তো একটা শিশু। গোপালকে বলল চায়ের কাপগুলো রেখে চলে যেতে। হরিমোহন এসে বসল ইজিচেয়ারে। চায়ের কাপটা হাতে নিয়েই বলে উঠল স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে, এ হারামজাদাটা কখন ঢুকেছে গো বাড়িতে ? স্বামীর বিশ্রী মন্তব্য ছেলের প্রতি, লাবণ্যর কাছে নতুন কিছু নয়। তাই কোনো উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করল না। তাকিয়ে রইল হরিমোহনের দিকে, আর ভাবতে লাগল এই মানুষটা কি আদৌ কোনোদিন শুধরাবে ? মণিময় স্যারের বাড়ি থেকে এসে তো এমন ভাব করছিল যেন আর কোনোদিন সে খারাপ আচরণ করবে না। খারাপ কথাও বলবে না। তবুও লাবণ্য রেখার ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে সক্ষম হল না। নরম সুরে হরিমোহনের দিকে তাকিয়ে বলল, আচ্ছা শোনো — তোমার সঙ্গে দুটো কথা আছে। ঠিকঠিকউত্তর দেবে তো ? হরিমোহন হেসে বলল, কেন দেব না ? তুমি বলেই দেখ না ! আমি কি এতই খারাপ ? লাবণ্য থতমত খেয়ে বলে উঠল, না, না সে কথা নয়। এবার আমাকে বলো — তুমি যে রেখার জন্য পাত্র দেখেছ, সে কোথাকার এবং কেমন ? হরিমোহন অবাক

হল না একটুও। স্ত্রী হিসেবে তো এটা তার অধিকার রয়েছেই।
হরিমোহন ইজি চেয়ারটাকে ঘুরিয়ে বসল লাবণ্যর মুখোমুখি হয়ে। উচ্ছ্বসিত সুরে বলতে লাগল, আরে তুমি তো চিনবেই। হাই স্কুলেরই ক্যাশিয়ার ছিলেন সুনির্মল ভৌমিক। মনে পড়ে? তিনি একাই ভাড়া থাকতেন দক্ষিণপাড়ায়। দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে তাঁর স্ত্রী থাকত বাপের বাড়ি সোনারপুরে। লাবণ্যর হঠাৎ মনে পড়ল সবকিছু। ছেলেকে দেখেওছে। এখন দেখলে হয়তো চিনতেই পারবে না। লাবণ্য পুনরায় উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, তাই নাকি? তা সুনির্মলবাবু তো রিটায়ার্ড করেছেন অনেকদিন। শুনেছিলাম সোনারপুরে বাড়ি করেছেন এবং ওখানেই থাকেন। ছেলেটার নামটা যেন কী - একদম মনে করতে পারছি না।
হরিমোহন এদিকে বেরোবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তবুও স্ত্রীর কথায় সায় দিয়ে বলে উঠল, ছেলেটার নাম উৎপল। ডাক নাম মানে, আমরা ওকে রাজু বলেই ডাকতাম। এখন সে ওকালতি পাশ করে উকিল হয়েছে। শুধু তাই নয়, সে কলকাতা হাইকোর্টের সিনিয়র এড্‌ভোকেট-এর কাছে জুনিয়র হিসেবে কাজ করছে। বাপের মতোই খুব চালাক চতুর হয়েছে ছেলেও। আবার লাবণ্যর কৌতূহলী প্রশ্ন, মেয়েতো ছোটো। ও কী করছে ? কলেজেটলেজে পড়ে হয়তো। বলে হরিমোহন স্ত্রীর দিকে হাত জোড় করে বলল, ক্ষমা করো — আর কিছু এখন বলতে পারব না। আমি একটু বেরোচ্ছি, বাজারেই থাকব। গোপালকে পাঠিয়ে দিও — একটু মাছ তরকারি কিনে দেব। বলে হন হন করে বেরিয়ে চলে গেল।

সন্ধ্যা নেমেছে। নয়নপুরের প্রতিটি ঘরেই সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলতে আরম্ভ করেছে। বৃষ্টির আহ্বানে ব্যাঙেরা সারি বেঁধে ডাকাডাকি করছে। আকাশটা যথেষ্ট থমথমে। বৃষ্টি এলেও আসতে পারে। গরমের দাপট ঠিকই আছে। বৃষ্টি হলে মন্দ হত না। অপর দিকে লোডশেডিংয়ের কবলে পড়লে গ্রামটা নিঝুম নিস্তব্ধ হয়ে অন্ধকারে ডুবে যায়। সেই সময়টার বৃষ্টিটা যেন রাতটাকে ভয়ানক করে তোলে। যেন প্রতি পদক্ষেপে দৈত্যদানবের ছায়া ঘুরে বেড়ায়। পুরো পৃথিবীটা যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এই কালো হাতের থাবা যেখানে পড়ে সেখানে কারুরই কিছু করতে ভাল লাগে না, বসে থাকা ছাড়া আর কিই বা করার থাকে!
মণিময়ের বাড়ির উঠোন। বারান্দায় একটা লাইট জ্বলছে এখনও। উঠোনে মণিময় চেয়ারে আর শোভা মোড়ায় বসে আছে। বাইরের আবহাওয়াটা খুবই স্বস্তিকর। অনেকদিনের অভ্যাস

দুজনের, বাইরে বসে প্রকৃতির হাওয়া খাওয়ার। অবিশ্যিই শীতে নয়। ছেলেমেয়ে দুজনেই বাইরে। রেখা ফেরার সময় হয়েছে। কিন্তু অসীম ? তার তো কোনো সময়ের ঠিকই নেই। ছেলেটাকে নিয়ে হয়েছে যত জ্বালা! এই বয়সের একটা ছেলে, আজও বেকার। এইসব নানা চিন্তায় শোভা সর্বদাই বিব্রত থাকে। মণিময় এই সমস্ত ব্যাপারে সবসময়েই উদাসীন। সে ভাবে, যখন যা হওয়ার হবে, এত ভাবনা চিন্তার কী আছে! তাই শোভা স্বামীকে এসব ব্যাপারে কথাবার্তা বেশি বলে না, শুধু শুধু পরিবেশ তিক্ত করে লাভ কী ! কিন্তু তবুও তো বলতে হয়। তবে মণিময় কোনোসময়েই শোভার কোনো কথায় বিরক্তি প্রকাশ করে না। তবে শোভা এত বছরের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারে মণিময় কোন কথায় ক্ষুব্ধ হয়। তাই অনেক কথাই যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেই চেষ্টা করে। শোভার এই মুহূর্তে মণিময়ের উপর রাগে শরীরটা রিরি করছে। কেননা সকালে হরিমোহন যে একটা প্রস্তাব দিয়ে গেল, সে ব্যাপারে এখন পর্যন্ত টুঁ শব্দটি করছে না লোকটা। তাই বাধ্য হয়ে শোভাকেই আলাপের উদ্বোধনটা করতে হবে। দেখা যাক কী হয়। রেখার অনুপস্থিতিতেই একটু আলাপ করে নেওয়া যাক। এটাই উপযুক্ত সময়। শোভা দ্বিধাগ্রস্ত মনে বলে উঠল, আশ্চর্য মানুষ বটে তুমি। কোনো কথাতেই গুরুত্ব দাও না তুমি ! মণিময় হাতপাখা নাড়তে নাড়তে বলল, কী ব্যাপার বলো তো ? হেঁয়ালি করে কথা বলছ কেন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না গো। শোভা আড়চোখে তাকিয়ে দেখল মণিময়কে। কি অদ্ভুতগোছের লোক রে বাবা? এত বড় কথাটা বেমালুম ভুলে গেল ? নাকি ইচ্ছে করে এড়িয়ে যাচ্ছে হরিমোহনের প্রস্তাব বলে। শোভাও কম নয়। তিক্ততার সঙ্গে মণিময়কে প্রশ্ন করল, মানে ? কিছুই বুঝতে পারছ না ? সত্যি মাস্টারি করতে করতে মাথা আর অন্যদিকে কাজ করছে না। মণিময় অবাক ভঙ্গীতে বলল, আচ্ছা গিন্নি — তুমি একটু পরিষ্কার করে বলো না, কী ব্যাপারে কথা বলতে চাইছ তুমি? বলো ! বলে উত্তরের অপেক্ষায় শোভার দিকে তাকিয়ে রইল। শোভা বুঝতে পারছে, মণিময় সত্যিই বিচলিত হয়ে উঠেছে শোভার মুখের থেকে আসল কথা জানার জন্য। খুব বিরক্তও হয়েছে শোভা মণিময়ের উপর। এতগুলো কথার পরেও কেন যে এমন ভাব দেখাচ্ছে কে জানে। এদিকে রেখা যে কোনো সময় চলে আসতে পারে এই চিন্তাও শোভার আছে। চলে এলে তো শোভা যতটুকু এগিয়েছে ততটুকু পিছিয়ে যাবে। তাতে মণিময়ের কী আসবে যাবে! শোভা তো আসল কথা এখনও বলতেই পারল না। তাই তড়িঘড়ি করে শোভা মণিময়ের উদ্দেশ্যে বলেই ফেলল আবেগপ্রবণ হয়ে, কী আবার ! সকালবেলা হরিমোহনবাবু এসে যে রেখার একটা বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে গেল, তা নিয়ে তো তুমি কিছুই বলছ না। সব ব্যাপারে তোমার এত খামখেয়ালিপনা আমার মোটেও ভাল লাগে না। মণিময়ের হঠাৎ মনে পড়ল। শোভার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল,ওহো এই কথা ? হরিমোহনের প্রস্তাব তো ! ও আমি গ্রাহ্য করি না গো গিন্নি। বলে দিয়েছি তো যা বলার। তোমার সামনেই তো বললাম। এ নিয়ে আবার আলোচনার কী আছে,

বল তো ? তাছাড়া তুমি অত চিন্তা কোরো না তো, প্রেশারটা আবার বাড়বে। গেট খোলার শব্দ হল। শোভা তাকিয়ে দেখল রেখা ঢুকছে। যাইহোক দু-চার কথা তো বলা হল। একদিকে গরম, অন্যদিকে মশা, এই দুই মিলে জীবন অতিষ্ঠকরে ফেলছে। এবার উঠতে হবে। বাইরে আর বসা যাচ্ছে না। রেখাও এসে সোজা ঢুকে গেল ঘরে। কোনো কথাবার্তা বলল না। শোভার মনে হল রেখা নিশ্চয়ই ওদের দুজনের আলোচনা শুনতে পেয়েছে। হয়তো বা এসব আলাপ আলোচনা রেখার পছন্দ নয়। তবে কি হরিমোহনের প্রস্তাবে রেখারও আপত্তি? থাক্‌কনা রেখার আপত্তি। আগে তো পাত্রের সন্ধান করা, তারপর তার ভালমন্দ বিচার করা, তারপর তো রেখার মতামত। সে অনেক দেরির ব্যাপার। হরিমোহন খারাপ লোক হতেপারে, তার মানে এই নয় যে তার দেওয়া বিয়ের প্রস্তাবও খারাপ হবে ! ভালও তো হতে পারে। চেষ্টা তো করতেই হবে।

শোভা মণিময় দুজনেই উঠে ঘরে চলে গেল। শোভা দেখল রেখা চুপচাপ হাত পা ধুয়ে এসে পড়ার টেবিলে বসল। শোভা বেশি পাত্তা দিল না রেখার এই আচরণকে। রান্নাও করতে হবে। এখন আর রেখার সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। অনেকটা সময় নষ্ট হবে। লোডশেডিংয়ের আগে রান্নাটা শেষ করতে পারলেই হয়। অন্যদিন এসে রেখা মণিময়কে চা-এর কথা জিজ্ঞেস করে। আজ রেখা কিছুই করল না। মণিময়ও লক্ষ করল। কী হয়েছে রেখার কে জানে। শোভা চা করে রেখাকে দিয়ে এল। মণিময়ও চা খেল। শোভা ভাবছে — রেখা বা অসীম কেউই তো আজকালকার ছেলেমেয়েদের মতো নয়, ওরা মা-বাবাকে যথেষ্টই গুরুত্ব দিয়েই চলে। এইসব শিক্ষাদীক্ষা মণিময়ের কাছ থেকেই পেয়েছে। যাকগে — সাময়িক হয়তো কোনো কারণে রেখার মনটা খারাপ হয়েছে। এখন অসীম এলেই সব ঠিক হয়ে যেত। শোভা এসব নিয়ে বেশি না ভেবে চলে গেল নিজের কাজে। মণিময় বসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একখানা উপন্যাস পড়তে লাগল। আজই এনেছে বইখানা স্কুলের লাইব্রেরি থেকে। অবসর সময়ে শোভাও পড়তে পারবে। এই উদ্দেশ্যেই আনা। কেননা মণিময় জানে বই-ই হচ্ছে অবসর সময়ের সবচেয়ে ভাল সঙ্গী। বিশেষ করে ভাল লেখকের লেখা হলে তো কথাই নেই। বই-এর ব্যাপারে তার অগাধ জ্ঞান। বইয়েও ঠিকমত মন বসাতে পারছে না মণিময়, রাত প্রায় নয়টা বাজে, এখনও ছেলেটার ঘরে ফেরার নাম নেই। আর কিছুক্ষণ পরই তো শোভার প্যানপ্যানানি শুরু হয়ে যাবে। অসীমটা যে কী করে। বাড়িতে বসেও তো গল্পগুজব করা যায়। দুর ছাই এতসব চিন্তা বাদ দিয়ে টি.ভি.র খবরটাই দেখা যাক— এই ভেবে মণিময় টি.ভি.র সামনে গিয়ে বসল।

তাও তো মন বসছে কই ? মেয়েটাই বা এত চুপচাপ হয়ে আছে কেন কে জানে ! উঠে চলে গেল মণিময় রেখার পড়ার ঘরে। রেখার মনটা খুবই অস্থির হয়ে আছে, বোঝাই যাচ্ছে। চোখ তুলে তাকাল বাবার দিকে। তখুনি মণিময় জিজ্ঞেস করল, কীরে রেখা — তোর কি মনটন

খারাপ কোনো কারণে ? তাই যদি হয়, তবে কারণটা জানতে পারি কি ? রেখা মাথা নিচু করে রইল। বাবা-মাকে অসম্মান করতে ওরা শেখেনি। তাই মণিময়ের কথার উত্তর না দিয়ে পারল না। বইয়ে মুখ লুকিয়ে বলল, হ্যাঁ বাবা — আমার ভীষণ টেনশন হচ্ছে ! টেনশন, কেন, তোর আবার কিসের টেনশন রে, বলে মণিময় হাসতে লাগল। রেখার উত্তরের অপেক্ষায় মণিময় রেখার দিকে তাকিয়ে রইল। রেখা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, আচ্ছা বাবা — তুমিই বল আমি কী করব। সামনে আর কটা দিন পরীক্ষার বাকি — তার মধ্যে অবিনাশ স্যার চলে যাচ্ছেন। মণিময় অবাক হলো মেয়ের কথায়। বলল,তার মানে? উনি আবার এই মুহূর্তে কোথায় যাচ্ছেন রে ? রেখা মুখটা কালো করে বসে রইল। আস্তে আস্তে বাবাকে বলল, মনে হয়, তিনি বারাসতে যাচ্ছেন ছেলের কাছে, আর সময় পেল না যাওয়ার ? এখনও কত নোট দেওয়া বাকি জান বাবা? তাই তো টেনশন হচ্ছে। মণিময় রেখাকে আশ্বস্ত করতে গিয়ে মেয়ের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, দেখ্ মা — কোনোকিছু নিয়ে এত চিন্তা করতে নেই। যখন যা হবার হবে। রেখা বিস্ময় দৃষ্টিতে তাকাল মণিময়ের দিকে। এবং উত্তেজিত হয়ে বলল কী বলছ বাবা ? এখন আমরা ইকনমিক্স আর পলিটিক্যাল সায়েন্সের বাকি নোট কখন করব আর কখনই বা পড়ব ? থাকি তো এমন একটা জায়গায়, যেখানে অন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থাও নেই। মণিময় সব বুঝেও কিছুই না বোঝার ভান করে বলল, সে তো বুঝলাম। এই দুটো সাবজেক্টের জন্য চিন্তা করতে করতে তো অন্য সাবজেক্টগুলো এড়িয়ে যেতে পারিস না — তাই না ? এত চিন্তা করিস্ না, তাঁর অনুপস্থিতিতে একটা কিছু ব্যবস্থা তোরাই করতে পারবি। বলে মণিময় আবার টি.ভি.র ঘরে চলে গেল। শোভা রান্না শেষ করে বিছানায় বসে ফ্যানের বাতাস খাচ্ছিল। অসীম দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকে মাকে দেখল। রাত প্রায় সাড়ে নয়টা হবে হয়তো।.এতক্ষণে রাজপুত্তুরের আসার সময় হল। মণিময় চুপ করে খবরের শেষটুকু দেখছে। মণিময় কোনোদিনই ছেলেমেয়ের সঙ্গে অযথা অশান্তি পছন্দ করে না। করবেই বা কী ছেলেটা। এই বয়সের ছেলে কতক্ষণ ঘরে বসে থাকবে। তবে আজ একটু দেরি করেই বাড়িতে ফিরেছে। এদিকে শোভা রেখার সঙ্গে মণিময়ের কথোপকথনও শুন্‌তে পেয়েছে। সত্যিই তো — ভদ্রলোক হঠাৎ এই সময়েই চলে যাচ্ছেনই বা কেন ! নিশ্চই বিশেষ প্রয়োজনেই যাচ্ছেন। যাক গে শোভার এত সমস্ত ভেবে কাজ নেই। মেয়েরটা মেয়েই বুঝে নেবে। তাছাড়া এই গাঁয়ে আর তো কোনো প্রফেসরও নেই অবিনাশ বাবুর মতো। যদিও শোভার এসব ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে কোনো লাভ নেই, মণিময়ই মেয়েকে যা বোঝানোর বুঝিয়েছে। তাছাড়া রেখা মাকেপড়াশুনার ব্যাপারে কিছুই বলে না। রেখা জানে শোভার মতো মা পাওয়া অনেক ভাগ্যের ফল। ছোটোবেলা থেকেই দেখে এসেছে সংসারের প্রতি মায়ের একনিষ্ঠতা, বাবার প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান, অনেক অভাব অনটন ভরা বিষাদময় দিনগুলোকেও শান্তিপূর্ণ করে রেখেছে শোভা। এইরকম মা বলেই সম্ভব হয়েছে। রেখার সবকিছুই মনে আছে। প্রাথমিক শিক্ষা

মায়ের কাছেই শুরু হয়ে ছিল। ভাত রান্না করতে করতে দুই ভাইবোনকে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে প্রথম শিক্ষার আলো এই মা-ই ফুটিয়েছে। আজ তাই রেখা বা অসীম কেউই তাদের নিজস্ব কোনো বিড়ম্বনার কথা শোভাকে জানাতে দ্বিধা করে। মণিময়কেই সব বলে। কেননা মণিময় এমনই একটা মানুষ, সে যে - কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা অতি সহজে করতে সক্ষম হয়। কোনো চিন্তাই সে মনের মধ্যে পুষে রাখতে পারে না। সংসারের যত ঝামেলা সেজন্য শোভাকেই সইতে হয়। শোভাও ছেলেমেয়ের পড়াশুনোর ব্যাপারে এখন আর মাথা ঘামায় না। তাছাড়া শোভার শরীরটাও বেশি ভাল থাকে না আজকাল। হঠাৎই অসীম এসে মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, কী গো মা, খেতেটেতে দেবে না? রেখাকে দেখলাম পড়ার টেবিলে খাতা দিয়ে চোখ বুজে রয়েছে। চলো না মা, বলে শোভাকে টেনে রান্না ঘরে নিয়ে গেল। শোভা আর রাগ করে থাকতে পারল না। বলল, যা, বাবাকে আর রেখাকে ডেকে আন্ অসীম বলল, হ্যাঁ যাচ্ছি। জান তো মা — হীরকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল রাস্তায়। বলল, অঞ্জলি কাকিমার শরীর নাকি ভাল না। শোভা অসীমের দিকে তাকিয়ে বলল,তাই নাকি ? বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীর খারাপ তো হতেই পারে। যাক— বাকি কথা কাল শুনব। যা এখন ওদের ডাকতো ! খাওয়ার পাটটা শেষ করি। শোভার কথামতো অসীম তৎক্ষণাৎ মণিময় ও রেখাকে ডাকতে চলে গেল।

বর্ধিষ্ণু গ্রাম বটে নয়নপুর, তবে অনেক উন্নতির বাকিও রয়েছে। প্রশাসন যদি নড়বড়ে হয়, তাহলে চরম উন্নতি তো কোনোদিনও সম্ভব নয়। ব্লক, পঞ্চায়েত, থানা, স্কুল, হাসপাতাল সবই আছে। কিন্তু কৃষি মাধ্যমই এই গ্রামের আসল বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার প্রসারও তেমন নেই। চাষবাস করে খেটে খাওয়া মানুষের সংখ্যাই এখানে বেশি। শিক্ষার মান এদের নেই বললেই চলে। কুসংস্কার, কুপ্রথা তাই এই গোষ্ঠীর লোকেদের ঘিরে রয়েছে। আবার এই শ্রেণীর মধ্যেই নারী নির্যাতনও বেশি পরিলক্ষিত হয়। অবিশ্যি আজকের আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় উচ্চবিত্তের পরিবারেও নারীদের প্রতি অবহেলা অতি অনায়াসেই চোখে পড়ে। নয়নপুর তো সেক্ষেত্রে অনেক নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত দিয়েই আবৃত।

আকাশে মেঘের ফাঁকে সূর্যের আলো দেখা যাচ্ছে বটে তবে সেটা ভোরের আলোর মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারেনি। কাকভোরে নয়নপুর যেমনি শান্ত, স্নিগ্ধ, তেমনি শান্ত নিবিড় তার আচ্ছাদন। গত রাতের গুমোট গরমের পর ভোরের হাওয়ার সাথে ইলশেগুড়ি বৃষ্টি গরমের দাপটটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এই গায়ের মানুষ তাই হয়তো সকালবেলার ঘুমটাকে জড়িয়ে ধরেছে নিজের মতো করে। সেটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু রাস্তায় এত জটলা কিসের? পুলিশের গাড়ি দাঁড়ানো জলধরের বাড়ির কাছাকাছি। প্রাতঃভ্রমণ শেষে অনেকেই দাঁড়িয়েপড়েছে হতবাক হয়ে। কী এমন ব্যাপার ঘটল! একবার খোঁজ নিতে হয়। উপেনবাবুও প্রাতঃভ্রমণ সেরে দাঁড়িয়েপড়ল লোকেদের জটলার মুখে। এছাড়াও থানার বড়বাবু দাঁড়িয়ে

আছেন। কার বাড়িতে কী দুর্ঘটনা ঘটল কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। বাড়ি থেকে বেরোবার সময়ও এই দৃশ্য চোখে পড়েনি উপেনের। কিছু আঁচও পড়েনি কোনো ঘটনার। থানার বড়বাবু উপেনকে দেখে এগিয়ে এসে বললেন, কী খবর স্যার। বেড়িয়ে এলেন বুঝি? উপেন এদিকওদিক তাকিয়ে অবাক হয়ে বলল, আমার আবার কিসের খবর ? খবর তো আপনাদের। কী হয়েছে বলুন তো ? আপনিও এখানে ? বড়বাবু ফিসফিসিয়ে বলল, আর বলেন কেন স্যার। এই দেখুন না কাল রাতে বুঝি জলধর তার বৌকে ধরে পিটিয়েছে । তাই ... । মানে ? মানে লতাকে মেরেছে জলধর? এ আবার নতুন কী ? বলে উপেন চলে যাচ্ছিল। বড়বাবু আটকে দিয়ে বলল স্যার - শুনে যান। জলধরের বাড়ির পেছনে এক বস্তির মতো আছে। সেটা জানেন তো? উপেন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলল হ্যাঁ সে তো আছেই। কেন ? বস্তির লোকেরা আবার কী করল ? দারোগাবাবু উপেনের দিকে তাকিয়ে বলল,ওরাই তো আসল কাজ করল। বস্তির চার পাঁচজন মহিলা মিলে ভোর চারটা-সাড়ে চারটায় থানায় গিয়ে হঠাৎ হাজির হয়। বুঝুন এবার, অশিক্ষিত সমাজেও নারী সচেতনতা কতটা বেড়েছে। নয়ত আমরা তো খবরই পেতাম না। উপেন বড়বাবুর দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, ওদের সচেতনতা? তাও আবার বেড়েছে ? কী যে বলেন মাথামুন্ডু কিছুই বোধগম্য হবার নয়। শুনুন — জলধর টলধর এরা নিতান্তই অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোক। ভদ্রলোক তো নয়ই। এজন্যই কিছু হলেই বৌকে ধরে পেটায়। আমিও যে জানি না ব্যাপারটা, তা নয়, তবে ..... । তবে কী ? বড়বাবু সামান্য উত্তেজিত হয়ে ভ্রূ কুঁচকে বলল, তা হলে আপনি তো কোনোদিন এ ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলেন নি। তাই না ? আপনি তো স্যার শিক্ষিত। সভ্য সম্প্রদায়ের লোক। তাহলেই বিচার করুন সচেতনতাবোধ কাদের বেশি। আপনারা ব্যাপারটাকে এড়িয়ে গেছেন অথবা এদের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাননি তাই তো ? উপেন খুব বিরক্ত বোধ করল, সকালসকাল এ কোন্ ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল। পরিবেশটা যথেষ্টই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। পাড়া প্রতিবেশী অনেকেই বিচ্ছিন্নভাবে দাঁড়িয়ে আছে। উপেন বাড়ি যেতে পা বাড়াল। স্ত্রী অঞ্জলিও খুবই অসুস্থ। বাড়ি ফিরে কিছু কাজকর্মও করতে হবে। তাই কথা না বাড়িয়ে বাড়ির দিকে রওনা হল। হঠাৎই চোখে পড়ল উপেনের। দেখল জলধরকে পুলিশ গাড়িতে তুলছে। অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। মনে হল উপেনের, এতে ওর বৌয়ের কোনো দোষ নেই। পাড়ার দুচারজন মহিলাই প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। এবং জলধরকে হাজতে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। উপেন এসব উপেক্ষা করে চলে গেল বাড়িতে।

শহরে, গ্রামেগঞ্জে সকল স্তরের মানুষের মধ্যেই এই দূষিত আবহাওয়া ছড়িয়ে গেছে। জলধর এমনিতে খুবই নিরীহ প্রকৃতির লোক। সে কারুর সাতেপাঁচে থাকে না। থাকতে ভালওবাসে না। অতি সাধারণ আর অতি অসাধারণ চরিত্রকে নিয়েই সুস্পষ্টভাবে লেখা যায়। অতি সাধারণ স্তরের মানুষ এই জলধর। গত রাতে হরিমোহনের ছেলের সঙ্গে বসে সে মদ্যপান

করে বেশি রাতে বাড়ি ফিরেছিল। সেই থেকে বৌ লতার সঙ্গে অশান্তি। গ্রামের আটপৌরে মেয়ে এই লতা বছর কয়েক আগে জলধরের সংসারে বৌ হয়ে আসে। সেই থেকে ওদের দাম্পত্যজীবন যথেষ্ট সুখেরই ছিল। দুই সন্তানের জননী এই লতা খুবই স্পষ্টভাষী। সততা, নিষ্ঠার সঙ্গে জলধরকে নিয়ে সংসার করাই ওর একমাত্র কর্তব্য বলে মনে করে। জলধর হরিমোহনের পেছনে ঘোরাঘুরি করে, এটা লতার খুবই অপছন্দের। এমনিতেই অভাবের সংসার, দুবেলা দুমুঠো ভাতের ব্যবস্থা করতেই ওদের প্রাণান্তকর অবস্থা। তারমধ্যে হরিমোহনের দুর্বুদ্ধিতা জলধরের সংসারে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। বেশি রাতে ফেরার পর নেশাগ্রস্ত জলধরকে লতা কী বলেছে, সেটা শোনা যায়নি। তবে খুব তর্কাতর্কি হয়েছে দুজনের মধ্যে, তারই জেরে প্রচণ্ড মারধোর করেছে জলধর বৌকে। তারপরেই জলধরের হাজতবাস। এখনও তো সমাজ পুরুষপ্রধান, তাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই নীতি শক্তভাবে প্রয়োগ হয়। তাই আজও সমাজ কলঙ্কমুক্ত হতে পারেনি। যাই হোক — এখন একমাত্র হরিমোহনই পারে জলধরকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসতে। যদিও নয়নপুরে এটা নতুন ঘটনা নয়। মহিলা কমিশন থেকেও মেম্বাররা এসে এখানে সরেজমিনে তদন্ত করে গেছে। কিন্তু মহিলাদের প্রতি নির্যাতন বেড়েই চলেছে। তাই তো কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছে মেয়ের বিয়ে নিয়ে।

বেলা নয়টা বাজে। কড়া রোদের চমকে রাস্তাঘাট ঝকমক করছে। সকলেরই যার যার কাজে যাবার তাড়া। গ্রামের বাইরে শহরেও যায় অনেকেই জীবিকা নির্বাহ করতে। সে যে কী কষ্টসাধ্য সেটা যারা করে তারাই বুঝতে পারে। কিন্তু সংসারের চাহিদা মেটাতে গেলে এইটুকু কষ্ট তো করতেই হবে। তবে এখন নয়নপুরের থেকে যাতায়াতের সুবিধা অনেক ভাল হয়ে গেছে। দিন তো চলেই যাচ্ছে। মর্নিং সেকশনের ছেলেমেয়েরা টিফিন পিরিয়ডে স্কুলের মাঠে খেলা করছে। রোদ, গরম উপেক্ষা করেই শিশুরা মেতে উঠেছে নিজেদের মন ভোলাতে। কিন্তু রাস্তার জটলা কমে এসেছে। কেউ বা গাছের নীচে, কেউ বা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে জলধরের ব্যাপারটা নিয়েই শুধু ফিসফিস করছে। হয়তো বা হরিমোহনই জলধরকে মুক্তি পাইয়ে দেবে। শেষপর্যন্ত তাই হল। থানায় গিয়ে সেকেন্ড অফিসারকে বলে জামিনে জলধরকে নিয়ে এল। এসব ব্যাপারে হরিমোহনের জুড়ি নেই। এসব তার বাঁ হাতের খেল। সবাই তাই জানে।

মণিময় স্কুলে যাচ্ছিল, রাস্তায় উপেনের সঙ্গে দেখা। উপেনের কাছেই সব শুনল। সব শোনার পর মণিময় মন্তব্য করল, তবে দাদা, হরিমোহনের ক্ষমতা মানতেই হয়, তাই না ? উপেন আড়চোখে মণিময়ের দিকে তাকিয়ে বলল, ঠিকই বলেছ ভায়া। হঠাৎ মনে পড়ে গেল একটা কথা। হরিমোহন তোমাকে পাত্রের বায়োডাটা দিয়েছে ? মণিময় স্মিত হেসে বলল হ্যাঁ দিয়েছে দাদা দিয়েছে। পাত্র তো আপনারও চেনা। তাই নাকি ? অবাক বিস্ময়ে বলল উপেন, আমিও চিনি! তা কে বল না! বলে হাঁ করে উত্তরের অপেক্ষায় উপেন মণিময়ের দিকে

তাকিয়ে রইল। মণিময় এবার গম্ভীর মুখ করে তাকাল এবং বলল, পাত্র হচ্ছে আমাদের স্কুলের প্রাক্তন ক্যাশিয়ার সুনির্মলবাবুর ছেলে। কলকাতা হাইকোর্টে সিনিয়র এড্‌ভোকেট-এর জুনিয়র হিসেবে কাজ করছে। উপেন বলল, তাই নাকি? তা হলে সে ওকালতি পাশ করেছে, ওকে তো আমরা রাজু নামে ডাকতাম। তাই না? হ্যাঁ - ঠিক তাই। উপেন স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে বলল, ওর ভাল নাম উৎপল। পরে সব কথা হবে। স্কুলের দেরি হয়ে যাচ্ছে। চলুন তাড়াতাড়ি, বলে দুজনেই তাড়াতাড়ি করে স্কুলে ঢুকে পড়ল।

এদিকে শোভা কাজকর্ম সেরে ফ্যানের নীচে শুয়ে আকাশপাতাল ভাবছে। কাল রাতের জলধরের ঘটনা শোভার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। রেখা কেমন স্বামীর হাতে পড়বে একমাত্র ঈশ্বরই জানে। রেখা পুজো দিয়ে এসে মার পাশে বসল। কী হল মা, কিছু ভাবছ বুঝি ? বলে মাকে জড়িয়ে ধরল। শোভা ঠোঁটের কোণে একটু হাসি নিয়ে বলল, নারে, কী আবার ভাবব! আচ্ছা — জলধরটা কী কাণ্ডই না করল বল্‌ তো ! এত নির্দয় স্বামী হয় কী করে ? রেখা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলল ছাড়ো তো মা, ওদের কথা, ওরা হচ্ছে ছোটোলোক, ভদ্রলোক তো নয়! বসে বসে কী যে মাথামুন্ডু ভাব, কে জানে ! শোভা দেখল রেখার মধ্যে শিক্ষার বড়াই খুব, কিন্তু আজকাল তো শিক্ষিত সমাজেও এসব হচ্ছে। সেটা কি রেখা জানে না। শোভা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল রেখার দিকে। আবারও কথা আরম্ভ করল। এই সময়টাই ভাল রেখার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলার। রেখার পিঠে সস্নেহে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, আচ্ছা রেখা, তোর ভয় হয় না, স্বামীর বাড়িতে যদি তোর উপর এই ধরনের অত্যাচার হয় ; তা হলে? রেখা অবাক হয়ে মাকে বলল, এসব কী বলছ মা ! আমার তো শিক্ষিত ছেলের সঙ্গেই বিয়ে দেবে, নাকি জলধরের মতো ..., বলতে বলতে উঠে যাচ্ছিল। শোভা হাত ধরে বসাল মেয়েকে। না রে মা — শিক্ষিত তো হবেই। কিন্তু আজকাল পত্রপত্রিকায় তো যা দেখি, তাতে শিক্ষিত সম্প্রদায় তো বাদ যায় না। সমাজে এটা তো একটা বিশাল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুই কি কিছুই জানিস না রে? সবই জানি মা, বলে রেখা ফিরে তাকাল। আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। আগেই এসব ভেবে কেন মনটা খারাপ করছ বলত মা ? সত্যি তোমার চিন্তার কোনো শেষ নেই। তাছাড়া পড়ে পড়ে মার খাওয়ার মতো মেয়ে আমি নই। আমি তো তোমাদেরই মেয়ে, তোমাদের শিক্ষায়ই শিক্ষিত। সুতরাং, এসব বাজে চিন্তা মাথা থেকে দূর করো তো। আমার একটুও ভাল লাগছে না এসব কথা। অন্য গল্প করো। বলে রেখা মার-দিকে তাকিয়ে দেখল মা-র চোখ ছল্‌ছল্‌ করছে। রেখা বুঝতে পারল — মা তো, তাই খারাপ চিন্তাটাই ভাবে বেশি মেয়ের ব্যাপারে। পরিবেশটাকে হাল্কা করার জন্য রেখা মা-র চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলল,অনেক হয়েছে মা, আর নয়, চলো আমরা টি.ভি. দেখি। বাংলা সিনেমা দেখাচ্ছে। বলে মাকে টানতে টানতে টি.ভি.র সামনে নিয়ে গেল।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। পটলার মা এসে সব কাজ করে গেছে। শোভার মনটা ভাল নেই

পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। মণিময় বাড়ি এলে শোভা আজ রেখার সম্বন্ধের ব্যাপারে কথা বলবেই। হরিমোহন তো কবেই একটা পাত্রের সন্ধান দিয়ে গেছিল। মণিময়ের এই একটা মস্ত দোষ, কোনো কিছুই গ্রাহ্য করে না। শেষ পর্যন্ত কী হল সেটা জানা শোভার একান্ত দরকার। মেয়েকে তো পাত্রস্থ করতেই হবে। সেটা যত দুঃখেরই হোক না কেন, কন্যাদান যে কোনো পিতার পক্ষে জীবনের সবচেয়ে মহৎ কাজ হিসেবেই মানা হয়। শোভা জানে নয়নপুরে জলধরের ঘটনাটা নতুন নয়। এরকম আরও অত্যাচারের ঘটনা শোনা গেছে। কিন্তু তবুও শোভার শরীর ও মন এই ঘটনাতেই বেশি বিচলিত হয়ে পড়েছে। আগে কোনোদিন শোভা এরকম ভাবে ভেঙ্গে পড়ে নি। দেশে তো আইন কানুনের অভাব নেই, তবে কেন শুধু মেয়েরাই অত্যাচারিত হয়? আজও সমাজ পুরুষতান্ত্রিক। তাই হয়তো পুরুষদের ক্ষমতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। কিন্তু মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। এই যুগে তো ছেলেমেয়ে সমান সমান হয়েই কাজকর্ম করছে। তবে কেন এই কলঙ্ক সমাজ থেকে দূর হচ্ছে না। আজ শোভার যেন নতুন করে বিবেকবুদ্ধি জেগে উঠেছে। পড়াশুনো অল্প হলেও টি.ভি. ও পত্রিকার দৌলতে শোভার জ্ঞানবুদ্ধি আগের থেকে অনেক পরিণত রূপ ধারণ করেছে। শুধু শোভা কেন, আজকের দিনে প্রত্যেক মায়ের মনেই এইসব প্রশ্ন জাগবেই। মমতাভরা মায়ের হৃদয়ে ঝড় উঠবেই।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে, মণিময়ের বাড়ি ফেরার নাম নেই। শোভা ভেবে ভেবে অস্থির। লোকটার উপর খুব রাগ হয়। গল্প পেলে আর বাড়ির কথা মনে থাকে না।

এদিকে উপেন স্কুল ছুটির পর মণিময়কে একরকম জোর করেই নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। রাস্তায় দীনুর সঙ্গে দেখা হতে তাকেও পাকড়াও করল বাড়িতে যাওয়ার জন্য। উপেনের স্ত্রী অঞ্জলি তো কিছুদিন যাবৎই অসুস্থ। উপেন অতটা গ্রাহ্য করে না বলেই অঞ্জলির সুস্থতার কোনো লক্ষণ নেই। উপেনের এই বেপরোয়া মনোভাব খুবই অপছন্দের। উপেনকে কিছু বলেও না মণিময়। বলতে যে ইচ্ছে করে না তা নয়, কিন্তু অতটা প্রয়োজন মনে করে না মণিময়। ভিতরের ঘরে হয়তো অঞ্জলি শুয়েই ছিল। ওদের আসার শব্দ পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। অসুস্থ শরীর নিয়েই এখন চা করতে হবে অঞ্জলিকে । তাই মণিময় ঘরে ঢুকেই বলে দিল, আমি কিন্তু চা-টা কিছু খাব না বৌঠান। ওদিকে গিন্নি বসে আছে আমার অপেক্ষায়। আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে। অঞ্জলি কিছুই বলল না। উপেন তৎপর হয়ে বলল, জানি, জানি, ভাই তোমার গিন্নি যে বসে থাকবে। তার জন্য — একটু চাও খাবে না ? না দাদা, যা গরম, এক্ষুনি আমি চা খাব না। আপনারা খান, বাড়ি গিয়ে গা ধুয়ে যা খাওয়ার খাব। এইতো দীনু আছে — ওকে নিয়ে বসে আপনারা চা খান। অঞ্জলি সামনেই চেয়ারে বসেছিল। খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। অঞ্জলির দিকে তাকিয়ে বলল মণিময় *কী খবর বৌঠান — শরীরটা ভাল নেই?*

আছি একরকম, বলে অঞ্জলি চুপ করে রইল ।

অঞ্জলিকে দেখে মণিময়ের মনে খুউব কষ্ট অনুভব হল। উপেনদার সবসময়েই এই

খামখেয়ালিপনা মনোভাব লক্ষ করে এসেছে মণিময়। এই স্বভাবজাত দোষগুলি পাল্টানো খুবই কষ্টকর ।তাছাড়া কেই বা তাঁকে বোঝাবে এই ব্যাপারে। এইজন্য ঘরে একটা কন্যাসন্তান থাকা একান্ত দরকার । মেয়েরা মায়ের কষ্ট দুঃখ যতটা অনুভব করতে পারে, ছেলেরা ততটা একদমই পারে না । মণিময় শুধু শুধুই এইসব ভাবছে। ততক্ষণে দীনু উঠে এসে অঞ্জলির পাশের চেয়ারে বসে পড়ল। অঞ্জলির দিকে তাকিয়ে উপেনের উদ্দেশে বলল, স্যার, কাকিমা যে এতটা অসুস্থ, জানতাম না তো? কিছুটা অসুস্থ শুনেছিলাম । অতটা বাড়াবাড়ি তো জানতাম না। ডাক্তারটাক্তার দেখিয়েছেন ? উপেন আমতা আমতা করে বলল, না রে দীনু, ডাক্তার দেখানো হয়নি। কী বলছেন স্যার ! অবাক কণ্ঠে দীনুর প্রশ্ন, কোনো ডাক্তারই দেখানো হয়নি ? এইসব বাগ্‌বিতণ্ডার মধ্যে অঞ্জলির বসে থাকতে ভাল লাগছিল না ।উঠতে যাচ্ছিল, মণিময় বাধা দিয়ে বলল, বৌঠান — আপনি চা-টা করতে যাবেন না। বরং কিছুক্ষণ শুয়ে থাকুন। অঞ্জলি মণিময়ের কথা শুনে মনের মধ্যে তৃপ্তি অনুভব করল। তার স্বামীও তো এরকম কথা বলতে পারে ।কেন বলে না, নাকি বলতে জানেই না। কে জানে। এটাও এক ধরনের মানসিক অত্যাচার অঞ্জলির প্রতি উপেনের। বয়সের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এখন আর এসব ভেবে লাভ কী!

দীনু আন্তরিকভাবে উপেনকে বলল, স্যার— এখানকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজন নতুন ডাক্তারবাবু এসেছেন, খুব ভাল ডাক্তার। উপেন নিজস্ব ভঙ্গীতে দীনুদের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, কী করে বুঝলে, ভাল ডাক্তার ।তুমি কি চেন তাকে ? মণিময় এগিয়ে এসে বলল, কেন ? না চিনলে বুঝি ডাক্তার ভাল হয় না ? উপেনদা, মতিভ্রম হয়েছে আপনার। আপনি স্বামী হয়ে স্ত্রীর প্রতি আপনার এত অবজ্ঞার মনোভাব কেন ? বলেই মণিময় নিজেকে সহজ করার চেষ্টা করল। দীনু বলল, না স্যার — ডাক্তার হিসেবে ভালই । কিছুদিন আগে রাজুর ভাইরাল জ্বর হয়েছিল। এই ডাক্তারকে দেখিয়েছিলাম ।ওঁর ওষুধেই রাজু সুস্থ হয়ে যায় ।তাছাড়া রাস্তায় কানাঘুষাও শুনেছি উনি নাকি মানে ওঁর নাকি সঠিক অসুখ নির্ণয়ের ক্ষমতা আছে। উপেন আগ্রহান্বিত হয়ে বলল, তাই নাকি ? খুউব ভালই তো হয়েছে নয়নপুরের জন্য ।এবার তা হলে দেখাতে পারব, কী বলো মণিময়। তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ ভাই, এখানে আগে কোনো ভাল ডাক্তার কি ছিল ? সেইজন্যেই তো হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করাচ্ছিলাম । কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখানোর ক্ষমতা তো আর আমার নেই. তুমি তো ভাই সবই জান। মণিময় চুপ করে দাঁড়িয়েই রইল ।কোনো কথাই বলল না ।দীনু সবসময়েই পরোপকারী মানুষ। সে যে কোনো মানুষের দুঃখ-কষ্টের ভাগীদার হতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না ।তাই দীনু বলল, ঠিক আছে স্যার, আমি ডাক্তারবাবুকে বলে বাড়িতেই নিয়ে আসব । আপনার কিছু ভাবতে হবে না ।কবে আসব, সেটা আমি আগেই জানিয়ে দেব। বলে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। মণিময়কে বলল, চলুন স্যার, বাড়ি যাবেন তো ? মণিময় আর দীনু বেরিয়ে গেল উপেনের

বাড়ি থেকে।

এতদিন নয়নপুরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি অতি জীর্ণ পরিবেশে তার অস্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়েছিল । গ্রামবাসীর দৌলতে এবং আপ্রাণ চেষ্টায় এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার অনেকটাই সমাধান হয়েছে । আগে কোনো ভাল ডাক্তার নয়নপুরে আসেনি । তাই এখানকার লোকেদের দুর্ভোগও পোয়াতে হয়েছে সীমাহীন। যদিও পুরো নয়নপুরের জন্য একজন ডাক্তার যথেষ্ট নয়। তবুও অগত্যা ডাক্তার যদি ভাল হয় তবুও কিছুটা সুরাহার পথ বের করা যায় । আট শয্যাবিশিষ্ট এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে একজন ডাক্তার ছাড়াও আছে চারজন নার্স । একজন কম্পাউন্ডার অর্থাৎ ফার্মাসিস্ট, দুইজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী । এছাড়া ক্লিনার তো আছেই । আরেক ডাক্তার আনার চেষ্টা চলছে। নতুন যিনি এসেছেন, তিনি একদম হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন । চিকিৎসা পদ্ধতি এখন এত ভাল যে প্রতিদিনই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উপচে পড়া রোগীর ভিড় থাকে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাশেই ছোট্ট ছিমছাম কোয়ার্টারে থাকেন ডাঃ রায় । একাই থাকেন । পুরো নাম শোনা গেছে ডাঃ অভিনব রায়। বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে। উনি বিদেশ থেকে এম. ডি. করে কিছুদিন কলকাতায় চাকুরি করেছেন । তারপরেই সরকারি চাকুরির আনুকূল্যে এই নয়নপুরে পোস্টিং। হয়তো বা নিজের আগ্রহেই এই গ্রামে আসা । নয়ত বিলেত ফেরত ডাক্তার এই গ্রামে ! পশ্চিমবঙ্গের বেশির ভাগ গ্রামেরই চিকিৎসা পরিষেবা লাটে উঠেছে । খুবই ন্যক্কারজনক যে, ভাবতেও অবাক লাগে ছোটো বড় কোন ডাক্তারই কোনো গ্রামে যেতে নারাজ । তা হলে গ্রামের মানুষজন কি বিনা চিকিৎসায় মরবে ? গ্রামের অসহায়, সম্বলহীন মানুষগুলোর পাশে তা হলে কে দাঁড়াবে ? যাই হোক নয়নপুরে হয়তো এতদিনে আশার আলো ফুটতে চলেছে। দীনুর পরামর্শটা উপেনের মনে ধরেছে । দীনু খবর দিলেই উপেন অঞ্জলিকে নিয়ে যাবে ডাক্তারের কাছে । মণিময়ও কতগুলি কথা শুনিয়ে গেল উপেনকে । উপেনের সমস্যাটা যে কী সেটা কেউ বুঝতে চায় না, অবিশ্যি উপেনও নিজের আর্থিক অক্ষমতার কথা বলতে যথেষ্ট দ্বিধাবোধ করে । কিন্তু মণিময়? মণিময় তো সবই জানে । মণিময়ের পাওনা টাকাগুলো পর্যন্ত আজও দিয়ে উঠতে পারেনি উপেন । কাকে বোঝাবে এইসব কথা । আর স্ত্রী অঞ্জলি ? সে তো তার নারীসুলভ মন দিয়ে সব চিন্তাভাবনা করে । সে হয়তো ভাবে স্বামী হয়ে উপেন তার কর্তব্যে গাফিলতি করছে । এত বছরের বিবাহিত জীবনে অঞ্জলিকে কোনোদিন আর্থিক সমস্যা নিয়ে ভাবতে হয়নি । উপেনই সংসারের সমস্ত সমস্যার সমাধান করে আসছে। এখনও করছে । সংসারের যাবতীয় কাজের দায়দায়িত্ব সবই অঞ্জলির ঘাড়েই কিন্তু এর বেশি কিছু নয় । সংসারের আয়ব্যয়ের হিসাব সে কোনোদিনই রাখেনি । এখনও উপেনই এসব সামলে যাচ্ছে । সত্যি কথা বলতে কী অঞ্জলির এসব বোধগম্য বরাবরই কম । এত গভীর চিন্তাশক্তি তার নেই । মুখে প্রকাশ না করলেও অঞ্জলির অনুযোগ অভিযোগ উপেনের বিরুদ্ধে লেগেই রয়েছে । সেই কারণে হয়তো বা রোগের অভিব্যক্তি আরও প্রকট হয়ে

উঠছে। যতদিন যাচ্ছে ততই মানসিক ও শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে অঞ্জলি । উপেন ভাবছে, আর্থিকভাবে সক্ষম হলে অঞ্জলিকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারত । কিন্তু তাও তো সম্ভব হচ্ছে না । অলকটাও চাকুরি পাওয়ার পর কেমন যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে । না হলে ছেলেও তো মা-বাবার প্রতি কত কর্তব্য করে বা করতে পারে। তবে সেই ছেলেকে হতে হবে মানুষের মতো মানুষ । উপেন জানে অলক সেইরকম ছেলে তৈরি হয়নি । ও একটা পুরোপুরি স্বার্থপর প্রকৃতির ছেলে হয়েছে । হয়তো বা মা-বাবারই অদৃষ্ট খারাপ । উপেনের আশা ছিল অলক সুবুদ্ধিসম্পন্ন ছেলে হবে । ভবিষ্যতে মা-বাবার পথ অনুসরণ করে চলবে । ছোটো ভাইয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে। অঞ্জলিও এইসব চিন্তা নিয়েই দিন কাটাচ্ছে । অলকের ভাবনায় সে প্রায়ই কান্নাকাটি করে। অতীতে হয়তো বা অনেক কারণে স্ত্রীর প্রতি উপেন অনেকসময় অমানবিক হয়ে পড়ত, কিন্তু সন্তানদের প্রতি ? কখনই নয় । বিশেষ করে অলকের প্রতি তো ওদের স্নেহ ছিল অন্ধ । অলক প্রথম সন্তান হওয়াতে অনেক বেশি আদরে যত্নে প্রতিপালিত হয়েছে । তাই তো অঞ্জলির এত কষ্ট অলকের আচার ব্যবহারে। এখন ওদের দুজনেরই মনে হয় মেয়ে হলে হয়তো বা এতটা নির্দয় হতে পারত না যতটা অলক ছেলে হয়ে মা-বাবার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। মায়ের অসুখ শুনেও যে সন্তান মুখ ফিরিয়ে থাকে, তাকে আর যাই বলা যাকনা কেন 'মানুষ' বলা যায় না । যে মা অনেক কষ্ট, অভাবের মধ্যে ছেলেকে তিলে তিলে বড় করে তোলে আর স্বপ্ন দেখে অনেক । আর প্রতিদানে যদি মেলে শুধুই অবজ্ঞা, তা হলে সেই মায়ের একমাত্র সঙ্গী হয়ে দাঁড়ায় চোখের জল । ব্যর্থতায় ভরে যায় হৃদয়ের অনুভূতি। উপেন ভাল করেই জানে অঞ্জলির শারীরিক অবনতির প্রধান কারণই হচ্ছে ছেলে অলক। এই সমস্যার সমাধান তো উপেনের হাতে নেই। অঞ্জলি জানে পিতা হিসেবে উপেনের কোনোদিকেই ত্রুটি নেই । চাকুরির জন্য যে টাকা দরকার ছিল তাও উপেন মণিময়ের কাছ থেকে ধার করে অলককে দিয়েছিল। ভেবেছিল ছেলেই শোধ করে দেবে কিস্তিতে টাকা দিয়ে। চাকুরিতে যোগ দেওয়ার আগে পর্যন্ত অলক অনেক আশার আলো দেখিয়েছিল এই পরিবারকে । কিন্তু কোথায় হারিয়ে গেল অলকের এই সংসারের জন্য দায়িত্ববোধ বা কর্তব্য- পরায়ণতাবোধ ! উপেন এটাও ভাবে — হয়তো বা আজকাল ছেলেরা এই রকমই ধীরে ধীরে অপদার্থতার চরম শিখরে পৌঁছে যায় । মা-বাবা ভাইয়ের প্রতি ভালবাসা তাদের হারিয়ে যায় । দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে অর্থের পেছনে ছুটতে থাকে । এটাই হয়তো আধুনিক যুগের নিদর্শন । অঞ্জলি তো মা — তাই তার মমতা তাকে প্রতি মুহূর্তে কশাঘাত করে । মাতৃস্নেহ ফুটে ওঠে অবিরল অশ্রুধারায়। তাকে মানানো কি অত সহজ ! তাই উপেন হাজার চেষ্টা করেও অঞ্জলিকে আজও মানসিকভাবে শক্ত করে তুলতে পারেনি । একদিকে ছোটো ছেলে হীরকের ভবিষ্যতের চিন্তা, অপরদিকে অঞ্জলিকে যেভাবে হোক সুস্থ করে তোলা । এই দুটোই হচ্ছে এখন উপেনের

প্রধান চেষ্টা ।

টি.ভি. র সামনে বসে উপেন ভাবছিল হঠাৎ হীরকের ঘরের দিকে লক্ষ করল । আলো জ্বলছে । হীরক টিউশন থেকে ফিরেছে হয়তো। ছেলেটার উপরও পড়ার প্রচণ্ড চাপ । সামনের বছর মাধ্যমিক দেবে । কী রেজাল্ট করবে কে জানে। যাকগে — উপেন উঠে এসে দরজার সামনে দাঁড়াল, দেখল অঞ্জলি খাওয়ার ব্যবস্থা করছে । উপেন খেতে যাওয়ার আগে হীরককে ডেকে নিল । অঞ্জলির শরীরটা আজ একটু তুলনামূলক ভাল বলেই মনে হল উপেনের । উপেন হীরককে বলল, টেবিলে জলের গ্লাসগুলো ভরে নিতে। অঞ্জলি ততক্ষণে তিনজনের ভাতই টেবিলে রাখল। অনেকদিন পর মনে হয় উপেন অঞ্জলির দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল । সত্যি — অঞ্জলির স্বাস্থ্যটা অনেক ভেঙেছে । জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা ধারণ করেছে, সংসারের জন্য তো সে আজও কষ্ট করে চলেছে ।

বাইরের জগতের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগই নেই। উপেন কখনও কোথাও নিয়েও যায়নি । আজ তাই অঞ্জলির কাছে সংসার হচ্ছে হতাশাব্যঞ্জক চিত্র । অতি পরিশ্রমেই হয়তো বা আজ তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে । উপেনের মনে খুবই দুঃখ হল অঞ্জলিকে হঠাৎ করে আজ দেখে । খেতে বসে উপেন অঞ্জলিকে বলল, দীনু এসে খবরটা দিলেই তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব । আর আরেকটা কথা — পটলার মাকে বলে দিও সামনের মাস থেকে দুবেলা কাজ করে দিতে। উপেন দেখল অঞ্জলি এইসব কথার কোনো উত্তরই দিচ্ছে না । একবার শুধু একটু তাকাল উপেনের দিকে । উপেন আবারও বলল, কী হল — উত্তর দিচ্ছ না যে ! আমি কি খুউব খারাপ কথা বলেছি না কি ? মা-র দিকে তাকিয়ে হীরক বাবাকে বলল, আচ্ছা বাবা — দেখছ তো, মা কোনো কথা বলছে না, তাও তুমি বলেই যাচ্ছ। যখন যাওয়ার তখন নিয়ে যেও । আর পটলার মাকে আমি বলব মা-র সঙ্গে দেখা করতে। বলে হীরক খাওয়া সেরে উঠে গেল । অঞ্জলি হঠাৎ করে ক্ষোভে ফেটে উঠে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ - আমাকে উদ্ধার করবি। তুইও তো অলকের মতোই স্বার্থপর হবি। ভাল হবি কোত্থেকে? অঞ্জলি খাওয়া সেরে সব গোছগাছ করতে করতে - গজগজ করতে লাগল। উপেন জানে অঞ্জলির এই একটা স্বভাব। হঠাৎ করে রেগে যায় । উপেন পরিবেশটাকে শান্ত করার লক্ষ্যে তৎপর হয়ে উঠল। নয়ত অঞ্জলি আরও অসুস্থ হয়ে পড়বে। তাই উপেন অঞ্জলিকে বলল, আঃ কী ! হচ্ছে কী - ছেলেটাকে অযথা বকাবকি করছ কেন ? ওতো ভাল কথাই বলেছে। তাই নয় কি ? বলে উপেন তাকিয়ে রইল অঞ্জলির দিকে । অঞ্জলি উত্তেজিত হয়ে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ সবাই তো ভাল কথাই বলে। আমিই খারাপ। তাই হয়তো আমার ছেলেরাও খারাপ হয়েছে । হঠাৎ উপেনের দিকে তাকিলে বলল, তোমার মতো তো হতে পারত ! তোমার মতো আদর্শবান, নীতিবাদী ! বিদ্রুপের ভঙ্গীতে হেসে উপেনের দিকে এগিয়ে গেল — কী হল, ঠিক বলিনি? শিক্ষিত হয়েও তোমার বড় ছেলে মূর্খের মতো কাজ করছে।

তা বড় হয়ে হীরকও সেই পথই যে অনুসরণ করবে না তা কি তুমি হলপ করে বলতে পার? অশান্তিকে না বাড়িয়ে উপেন একদম চুপচাপ রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল রাত প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। ছেলেটার মনটা হয়তো খারাপ হয়েছে। এই ভেবে উপেন হীরকের ঘরে গিয়ে ঢুকল। দেখল পড়াশুনা করছে। উপেন ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বলল, কী রে — আর কত রাত্রি অবধি পড়বি ? হীরক চমকে উঠল বাবাকে দেখে, কেননা বাবা এই ঘরে আসে না বললেও চলে। ওঃ তুমি! কী ব্যাপার বাবা ? হঠাৎ ? পড়ার কথা বলছ ? আর কিছুক্ষণ তো পড়বই। বলে হীরক বই-এর প্রতি মনোযোগ দিল। উপেন আর না বলে থাকতে পারল না। ছেলের মনোযোগ বিঘ্ন করেই বলল, মা'র কথায় কিছু মনে করিস না রে বাবা। মা-বাবা তো সন্তানদের কত কিছুই বলে। দরকার হলে শাসনও করে। তাই না? হীরক মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়ে হেসে বলল, আচ্ছা বাবা — এসব কী বলছ আমাকে! আমি জানি মা-র শরীরটা ভাল না। তবুও মা আমাদের জন্য কত করে। আর তা ছাড়া মা হাজার বকলেও আমি কিছু মনেই রাখি না। উপেন আশ্বস্ত হল ছেলের কথায়। চলেই আসছিল ঘর থেকে, হঠাৎ হীরক উপেনের মুখোমুখি উঠে দাঁড়াল এবং বলল, বাবা - এবার আর মা-র শরীর খারাপ নিয়ে হেলা-ফেলা কর না। দীনুদার কাছে গিয়ে তুমি খবরাখবর নিয়ে এসো ডাক্তারের ব্যাপারে। তারপর মাকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে এসো। আর অবহেলা করা মনে হয় ঠিক হবে না। উপেন অবাক হয়ে শুনল ছেলের কথাগুলো। এত বুদ্ধি ছেলেটার কবে হল। চমৎকার লাগল উপেনের কথাগুলো শুনতে! কীভাবে যে হীরক তিলে তিলে বড় হয়ে উঠেছে, উপেন তো কিছুই টের পায়নি। তবে অলকও তো এইরকম ধাঁচের কথাবার্তাই বলত। কিন্তু আজ মা-বাবার নাগালের বাইরে চলে গেল কী করে! মাথা নিচু করে উপেন হীরকের কথার সম্মতি জানিয়ে চলে এল নিজের ঘরে। অঞ্জলি কখন শুয়ে পড়েছে কে জানে। সব সময়েই আজকাল সে ক্লান্ত বোধ করে। তাই হয়তো ঘুমিয়েও পড়েছে। তাই শোবার ঘরের লাইটটা নিভিয়ে দিয়ে, টিভি-র ঘরে এসে বসল খবরটা শুনতে। খুব আস্তে টি.ভি.-র সাউন্ড দিয়ে খবর শুনতে লাগল। বাইরে গাঢ় অন্ধকার। ঠান্ডা হাওয়াও আসছে জানালা দিয়ে। হয়তো দূরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে। নয়নপুরের আকাশেও ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বৃষ্টি হলে মন্দ হত না। রাত হয়েছে অনেক। উপেন টি.ভি. বন্ধ করে গিয়ে শুয়ে পড়ল। রাতের নয়নপুর যেন সমস্ত দিকআঁধার করে নিজেই ঝিমিয়ে পড়েছে। ঝিঁঝিঁর ডাক, জোনাকির আলো, হাওয়ায় দোলা গাছের পাতার মর্মর শব্দ যেন এই পৃথিবীর আরেকটি আশ্রয়স্থল নয়নপুরকে নিঃশব্দ গভীরতার মাঝে নিদ্রিত করে রেখেছে। ধরিত্রীর মাটিতে এই ছোট্ট অপরিসর গ্রামটি যেন কারোর কোলে মাথা রেখে শান্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। কিন্তু কলকোলাহলে কি সেই শান্তি বজায় থাকে ? থাকে শুধু রাতের অন্ধকারে শায়িত প্রাণের ক্ষণিকের শান্তি। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই শুরু হয়ে যায় কোথাও কলহ। বিবাদ অশান্তির জ্বালা, আবার কোথাও বা আশা-নিরাশার আস্বাদন, আনন্দানুভূতি। সব মিলিয়েই এই জগৎ সংসার চলছে।

ব্যবধান

আকাশে শরৎ মেঘের আনাগোনা চলছে । কাশবনে ফুলের সমারোহ মায়ের আগমনের ইঙ্গিত দিচ্ছে । বিশ্বকর্মা পুজো সবে শেষ হয়ে গেল । আর তো কটা দিন বাকি পুজোর । নয়নপুরে খুব বেশি একটা পুজো হয় না । গ্রাম বাংলার চালচিত্রে মা জগৎজননীকে আহ্বান করা হয় । শ্রদ্ধা, ভক্তি, অতি নিষ্ঠার সঙ্গেই মাকে পূজা করা হয় । গরিব, দুঃখী, ধনী, মধ্যবিত্ত সকলের জন্যই তো মায়ের আগমন ঘটে ! প্রতি বছরের মতো এবারও এ গ্রামে সব মিলিয়ে চার-পাঁচখানা পূজা অনুষ্ঠিত হবে। বাসস্ট্যান্ডের কাছে দুখানা ছাড়া গ্রামে হবে দু-তিনখানা । এর মধ্যে ক্লাবের পুজো তো আছেই । এখানে মহা ধুমধামে কেউই পুজোর কেনাকাটা করতে বেরোয় না । যারা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের তারাও অনেকে নতুন জামাকাপড় পরে মাকে বরণ করতে পারে না । বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব এই দুর্গাপূজা ঠিকই, কিন্তু আজকের যুগে বেকার সমস্যায় জর্জরিত সমাজে কি সবাই এই উৎসবের আনন্দ পুরোপুরি ভোগ করতে পারে ? পারে না । নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে মানুষ আজ নিজেদের আনন্দানুভূতি অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে । এই নয়নপুরেই এমন অনেক পরিবার আছে যারা নিজেদের সন্তানের মুখে দুবেলা দুমুঠো ভাত তুলে দিতে পারে না । তারা কীভাবে এই উৎসবকে আন্তরিকভাবে উপভোগ করবে ! অভাবের তাড়না তাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে । মা দশভুজার প্রতি এই নিম্নবিত্তদেরও অন্তরে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ভক্তি ঠিকই অটুট থাকে, কিন্তু আর্থিক টানাপোড়েনই আনন্দের ভাগীদার হতে অনেকটাই বাধা হয়ে দাড়ায় । শরতের আলোয় নয়নপুর আলোকিত হলেও, সেই আলোর ছটা কিন্তু এই গায়ের সকল বাসিন্দাদের আলোকিত করতে পারে না । ফোটাতে পারে না সকলের মুখে আনন্দের হাসি । প্রতিটি গ্রামবাংলার চিত্রই প্রায় দুর্দশাগস্ত জমিদারি প্রথা বিলোপ হওয়ার পরও গাঁয়ের মানুষ সহজভাবে বাঁচতে পারছে না । দরিদ্র পরিবারে যদিও বা শিক্ষার অগ্রগতি হচ্ছে, কিন্তু কী হচ্ছে তাতে ? বেকার সমস্যা বাড়ছে । বাড়ছে অনাহার, শিক্ষার সংস্কৃতি লাটে উঠেছে । বাড়ছে দুর্নীতি । সাধারণ মানুষ আজ হীনমন্যতায় ভুগছে। সমাজ হয়ে উঠেছে হিংসাদীর্ণ পরিবেশাচ্ছন্ন । সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতি বিরাজ করছে। তারমধ্যে নারী নির্যাতন বিশেষ ভূমিকা পালন করছে । নারীর প্রতি পুরুষদের অমানুষিক অত্যাচার ক্রমাগত বেড়েই চলেছে । একটা অশুভ শক্তি তাদেরকে ঘিরে রেখেছে । অনাচারে সমাজ এতই কলঙ্কময় হয়ে উঠেছে যে একের প্রতি অপরের বিশ্বাস কোথায় যেন হারিয়ে গেছে । মানুষ তার নিজস্ব সরলতা, আন্তরিকতা কোন্ নির্দয় অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে, যা ফিরে পাওয়া সম্ভব কিনা তা বলাই বাহুল্য । মা দুর্গা প্রতি বছরই

আসেন মর্ত্যবাসীর কাছে। এবারও আসছেন যথারীতি। আড়ম্বরের শেষ নেই। কিন্তু ভক্তি-নিষ্ঠা কি আগের মতো আছে ? ক্লাবগুলোর কথা বলে তো লাভই নেই।

রোববারের সকাল। উপেন ভাবছে আজ হয়তো দীনু আসবে ডাক্তারের খবর নিয়ে। ভাবতে ভাবতে চায়ের কাপে চুমুক দিল। বারান্দা থেকে সামনের রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যায়। হ্যাঁ ঐ তো দীনু। এদিকেই তো আসছে। সঙ্গে আরও দু-চারজন ছেলে রয়েছে। নিশ্চয়ই পুজোর চাঁদা তুলতে বেরিয়েছে। উপেনের হঠাৎ মনে হল দীনু তো কোনো একটা ক্লাবের সেক্রেটারি পদে আছে। গেট খুলে ঢুকল একে একে দীনুরা। গেটের শব্দে অঞ্জলি ঘর থেকে বেরিয়ে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। উপেন মনে মনে একটু বিরক্ত হল। কিন্তু কিছু করার তো নেই। একগাল হেসে বলল, কী ব্যাপার তোমরা এত সকালে? দীনু থতমত খেয়ে বলল, স্যার — পুজো তো এসে গেল। চাঁদা তোলার ব্যাপার তো রয়েছে। তাই আজ ছুটির দিন বলে, আমি সঙ্গে বেরিয়েছি। অঞ্জলি দূর থেকে রসিকতার সুরে দীনুকে বলল, আরে — কি বলছ তুমি দীনু ? তুমি তো সেক্রেটারি, তুমি কেন বেরিয়েছ চাঁদা তুলতে? বলে অঞ্জলি দুটো মোড়া এনে রাখল উঠানে। দীনু আমতা আমতা করে উত্তর দিল, না কাকিমা, মানে - ওরা তো আজই প্রথম বেরিয়েছে তাই আর কী। উপেন তাকিয়ে রইল দীনুর দিকে। দীনু ইতস্তত করে চাঁদার রসিদটা উপেনের হাতে দিল। উপেন দেখল — দুইশো টাকার রসিদ কেটেছে দীনু। উপেন কিছুই বলল না। দেওয়ার সময় যা দেওয়ার দেবে। দীনুরা চলে যাচ্ছিল, উপেন হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, কী হল দীনু — ডাক্তারের খবর নিয়েছিলে ? দীনু বলল, স্যার, ভোলার কাছে শুনলাম ডাক্তারবাবু নাকি কলকাতা গেছেন হাসপাতালের কাজে। বুধবার আসবেন, তাই আমি যোগাযোগ করিনি। আপনি চিন্তা করবেন না স্যার। আমি সময় মতো আপনাকে বলব। আজ তাহলে আসি স্যার ! উপেন গদগদ হয়ে বলল, হ্যাঁ বাবা এসো।

দীনু জানে উপেন স্যার দুশো টাকা দেবে না। ইচ্ছে করেই একটু বাড়িয়ে লিখেছে। দীনু রাস্তায় বেরিয়ে গেল। এখন হরিমোহনের বাড়ি গেলে মন্দ হয় না। নয়ত ক্লাবের অন্য মেম্বাররা ওর কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করতে পারবে না। তাই দীনুকে যেতেই হবে। রোদে ঝলমল আকাশে যেন পুজোর হাওয়া বইছে। দূরদূরান্তে মাঠে ধানের শীষে সোনার রং ধরেছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নয়নপুরে মানুষদের ব্যস্ততাও বাড়তে থাকে। হরিমোহনও এই ব্যস্ত মানুষদের মধ্যেই পড়ে। সবে ঘুম থেকে উঠে হরিমোহন ইজিচেয়ারে বসে চা খাচ্ছে। স্ত্রী লাবণ্যও সামনেই বসে আছে। দীনুর সঙ্গে হরিমোহনের খুব যে একটা ভালো সম্পর্ক রয়েছে তা নয়, মাঝে তো খুবই বিরোধ ছিল দুজনের মধ্যে। তারপর বেগতিক অবস্থায় পড়ে হরিমোহনই মিটমাট করে নেয় দীনুর সঙ্গে। দুইজনেই বিপরীত চরিত্রের লোক। হরিমোহন যতই খারাপ হোক চাঁদার ব্যাপারে সে মুক্তহস্ত। চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে হরিমোহন বাথরুমে চলে গেল। লাবণ্য বসে ভাবছে বাজারে পাঠাতে হবে হরিমোহনকে

। অন্য কোনো কাজকর্ম আছে কিনা কে জানে । এত বছরেও মানুষটাকে সংসারী বানাতে পারল না লাবণ্য । স্ত্রী হিসেবে লাবণ্য এইসব নিয়ে প্রায়ই ভাবনা চিন্তা করে । তবে হ্যাঁ - বাজারে যেদিন যাবে সেদিন হরিমোহন বাজারের সেরা জিনিসই কিনে নিয়ে আসে । টাকা পয়সার কার্পণ্য করে না । সংসারের হিসাবনিকাশ সব লাবণ্যর হাতেই । আজ আবার মণিময়ের বাড়িতে যাওয়ার কথা হরিমোহনের রেখার বিয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে । লাবণ্য এটা মনেপ্রাণেই চাইছে । হরিমোহন যেন এ ব্যাপারে মণিময়কে সাহায্য করে । হরিমোহন জামাকাপড় পরে প্রস্তুত হচ্ছে বেরোবার জন্য । লাবণ্য রান্নাঘরে ঢুকল হরিমোহনের ব্রেকফাস্ট রেডি করতে । গোপাল হাতেহাতে কাজ এগিয়ে দিচ্ছে । লাবণ্য রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়াতেই দেখল দীনু উঠানে দাঁড়িয়ে। সঙ্গে আরও দুজন । হরিমোহন ঘরের ভিতর ছিল। তাই লাবণ্য এগিয়ে এল । দীনুকে ডেকে নিয়ে গেল বসার ঘরে। দীনু আপত্তিকর ভঙ্গীতে বলল, না আমি বসব না এখন, আপনি বরং কাকুকে ডাকুন। একটু দরকার আছে। লাবণ্য কিছু না বলে চলে গেল হরিমোহনকে ডাকতে। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল লাবণ্য। একটু স্মিত হাসি দিয়ে দীনুকে বলল, উনি আসছেন, একটু বসো। প্রণতি কেমন আছে বাবা ? আর রাজু ? দীনু এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছিল হরিমোহন আসছে কিনা । হঠাৎই লাবণ্যর কথার উত্তর দিতে গিয়ে বলল, হ্যাঁ কাকিমা । ওরা ভালই আছে মোটামুটি । তা আপনি ভাল আছেন তো ? মাঝেমধ্যে বেড়াতে যেতে পারেন আমাদের বাড়িতে । লাবণ্য স্নেহভরা সুরে বলল, হ্যাঁ বাবা তা তো পারিই, এবং উচিতও যাওয়া । কিন্তু জানতো বাবা কীভাবে যে দিন কেটে যায়, একদম ফুরসৎ পাই না। — দীনু লাবণ্যর কথার কোনো উত্তর দিল না। বাড়িটাকে দেখছিল দীনু। অনেক দিন বাদে তো আসা এই বাড়িতে । ভালই বানিয়েছে বাড়িটাকে । সবরকম সুবন্দোবস্তই করেছে হরিমোহন । কোন্ গরিব চাষীর মাঠের ধান হাতিয়ে নিয়েছে কে জানে । এ ধরনের লোকেরাই আজ সমাজের মাথা হয়ে সমাজকে গিলে খাচ্ছে । গরিব মেহনতী মানুষের রক্ত চুষে খাচ্ছে । নয়ত হরিমোহনের রোজগারের সেইরকম উৎস কোথায় ? অপরের জিনিস হাতিয়ে নেওয়াই যার আসল ধর্ম তার পরিণতি আর যাই হোক ভাল হতে পারে না। এখন পর্যন্ত ভাল আছে ঠিকই । তবে ছেলেটা তো কুলাঙ্গার তৈরি হয়েছে । এটাও হয়তো বা কুকর্মেরই ফল । এসব ভেবে দীনুর খুব অস্বস্তি হল। না এলেই বোধহয় ভাল ছিল। যাক এসেই যখন পড়েছে তখন হরিমোহনের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করেই যাবে দীনু। ফিন্‌ফিনে ধুতি পাঞ্জাবী পরে হরিমোহন এসে আরেকটা চেয়ারে বসল । লাবণ্য উঠে চলে গেল । কিছুক্ষণের মধ্যেই গোপাল চা নিয়ে এল । দীনু চা খেতে খেতে বলল হরিমোহনকে, তা হলে কাকু, টাকা পরে এসে নিয়ে যাবে ওরা । হরিমোহন সহাস্যে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি এক হাজার এক টাকা দিয়ে দেব । রসিদ টসিদ দিতে হবে না। দীনু একথায় একটু

বিরক্ত হয়েই বলল, কেন, কেন ? এ তো পুজোর চাঁদা। এটা তো কেউ পকেটে ঢোকাচ্ছে না। তাই তো রসিদ লাগবেই। হরিমোহন থতমত খেয়ে গেল। এক মুহূর্তের জন্য, নিজের আত্মবিশ্লেষণ করে ফেলল । দীনু হরিমোহনকে খোঁচা দিয়ে বলল না তো ! হয়তো তাই । দীনু রসিদটা হরিমোহনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ওদের বাড়ির থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল । রাস্তায় বেরিয়ে বোধ করল দীনু কী প্রচণ্ড রোদের কড়কড়ানি শরতের ঝলমলে রোদে এত প্রখর তাপ! ভুলবশত ছাতাটাও সঙ্গে নেই । এই তোরা চলে যা, আমি এখন বাড়ি যাব, বলে দীনু স্কুলমাঠের কোণা থেকে আলাদা হয়ে গেল। হঠাৎ মনে হল একটু স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঘুরে গেলে হয়। গিয়েই বা লাভ কী ? ডাক্তার তো বুধবারের আগে আসছে না । এই ভেবে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দিকে গেলই না। বেলা প্রায় দশটা সাড়ে দশটা বাজে। রাজু হয়তো বা বেরিয়ে পড়েছে টিউশনের উদ্দেশ্যে । প্রণতি কলিংবেলের আওয়াজ শুনে এসে দরজা খুলে দিল। এতক্ষণে তোমার আসবার সময় হল ? সত্যি — তোমার সবকিছুতেই বাড়াবাড়ি । এখনও তোমাকে চাঁদা তুলতে বেরোতে হয় ? বলে প্রণতি দীনুর জন্য ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করতে চলে গেল। এমনিতেই রোদে তেতেপুড়ে এসেছে দীনু । তারপর আবার প্রণতির বিরক্তিজনক কথাবার্তা! সব সময়েতে সবকিছু ভাল লাগে না । প্রণতিকে আবার কিছু বলতেও পারে না দীনু। কেননা সংসারটা টিকেই আছে প্রণতির জন্য। শুধু টাকা রোজগারের দায়িত্ব দীনুর। বাজারহাট, দোকানপাট সব প্রণতির দায়িত্ব সব নিজের মতো করে অনেক কঠোর পরিশ্রম, অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে আজ প্রণতি দীনুর সংসারকে সোনার সংসারের রূপ দিয়েছে । রাজুর পড়াশুনার বেশির ভাগটাই প্রণতি দেখাশুনা করে। রাজুকে নিয়ে ওদের অনেক স্বপ্ন, অনেক আশা-ভরসা। দীনুও পড়াশুনায় মেধাবী থাকা সত্ত্বেও টাকাপয়সার অভাবে উচ্চশিক্ষার দরজায় পৌঁছোতে পারেনি। আজ দীনু সচ্ছল। তাই ঈশ্বরের কৃপায় যদি রাজু পরীক্ষায় সাফল্য পায়, তা হলে দীনুর জীবনের একটা বড় আশা পুরোপুরি সফলতা পাবে। তবে দীনু এবং প্রণতির সবচেয়ে বড় ইচ্ছা, ছেলেটা আগে মানুষের মতো মানুষ তৈরি হোক। তারপর ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর যা হবার হবে ।

প্রণতি তড়িঘড়ি করে দীনুর জন্য খাওয়ার নিয়ে এল । দীনু হাতমুখ ধুয়ে সেই অপেক্ষায়ই বসেছিল। কী গো, তুমি খাবে না ? নিয়ে এসো। খাওয়া আরম্ভ করে দীনু বলল, প্রণতি সামনে দাঁড়িয়ে হাত মুছছিল, উত্তরে বলল — আমি রাজুর সাথে খেয়ে নিয়েছি । তুমি খাও। দীনু হেসে বলল, খেয়ে নিয়েছ? বেশ করেছ। বেলা তো কম হয়নি, বলো ? প্রণতি ব্যঙ্গ করে বলল, বুঝেছ তা হলে সময়টা। কোথাও গেলে তো তোমার সময়ের জ্ঞানই থাকে না। দীনু কিছুই বলল না । ব্রেকফাস্ট সেরে দীনু দোকানের কিছু হিসেবনিকেশ নিয়ে বসল । মনে হয় প্রণতি মাংস বসিয়েছে । সুন্দর গন্ধে সারা বাড়ি ভরে গেছে । ছুটির দিনে দীনুদের বাড়িতে

মাংসই রান্না হয় । কেননা মোটামুটি সচ্ছল পরিবারে তাই হয় । ছুটির দিনেই ছুটির আমেজ ভোগ করতে হয় । ভালমন্দ খাওয়াটাও এই আমেজের মধ্যেই পড়ে।
এদিকে আজ রোববার, তাই মণিময়ের বাড়িতে হরিমোহন এসেছে । বিকেলের চা এখানেই সম্পন্ন করে যাবে বলে মনে হয় । মণিময়ের ডাকেই এসেছে হরিমোহন । বিকেলের টিমে রোদে গরমটা অত বোধ হচ্ছে না । বারান্দায়ই বসেছে হরিমোহনকে নিয়ে । অল্প-অল্প বাতাস যেন শরীরটাকে ঠান্ডা করে দিয়ে যাচ্ছে । রেখা বাড়ি নেই, রোববার বিকেলে ওর নিজের টিউশনি থাকে । তাই বাড়িতে থাকে না কোনো রোববারেই । তাই কথা বলার জন্য এই সময়টা এবং এই দিনটাই প্রযোজ্য। শোভা রান্না ঘরে চা করছে। সকালেই অসীমকে দিয়ে একটু মিষ্টি এনে রেখে দিয়েছিল। হরিমোহনের জন্য এসব করা, সবই স্বার্থের তাগিদে । শোভা মনে করে যে খুশী সম্বন্ধ আনুক না কেন, নিয়তির বিধানে রেখার বিয়েটা যদি কোনোরকমে হয়ে যায় । হরিমোহন চেয়ারে বসে চা খাচ্ছে । সামনের টেবিলে প্লেটভর্তি মিষ্টি । মণিময় ইজিচেয়ারে বসা। সুনির্মলবাবুর ছেলে এখন পরিণত বয়স্ক । কেমন তার স্বভাব, কেমন তার চারিত্রিক গঠন, এগুলো তো মণিময়কে জানতে হবে। নিজের মেয়ে বলে কথা । পাত্রের বায়োডাটা নিয়ে মণিময় হরিমোহনের সঙ্গে আলোচনা করতে লাগল। শোভাও এসে বসল এক কোণে একটা মোড়ায় । মিষ্টির প্লেটটা হাতে নিয়ে নিল হরিমোহন । খেতে খেতে বলল মণিময়ের দিকে তাকিয়ে, স্যার, আপনি তো ভালই চেনেন । তাছাড়া আরও খবরাখবরও তো আমাদের নিতে হবে । হুট্ করে তো আর একটা মেয়েকে পাত্রস্থ করা যায় না, তাই না ? ঠিক তাই, সেই জন্যই আমাদের আরও কিছু খবরাখবর পাত্রের সম্বন্ধে নিতে হবে । তাছাড়া কত ছোটো ওকে দেখেছি । এখন সে কেমন হয়েছে দেখতে ? এই বলে মণিময় চু প করে হরিমোহনের দিকে তাকিয়ে রইল । হরিমোহন বলল, সে তো অবশ্যই স্যার । আপনি এজন্য একদম চিন্তা করবেন না, আমিই সব ব্যবস্থা করব। আমি অলরেডি সুনির্মলবাবুর কাছে প্রস্তাব পাঠিয়ে দিয়েছি। এসব শুনে মণিময় কিছুই বলল না। ভাবল, হরিমোহন তো তাহলে অনেকটাই এগিয়েছে। বাকিটাও যদি করতে সাহায্য করে, তাহলে মন্দ কী । শোভা এতক্ষণ বসে সব শুনছিল। হঠাৎই বলে উঠল, ঠিক আছে, ঠিক আছে — আপনিই দয়া করে বাকি খোঁজখবরগুলো আমাদের কাছে এনে দিন। আর তাছাড়া এই প্রস্তাবে সুনির্মলবাবু যদি রাজি থাকেন, তবেই তো আমাদের এগোতে হবে, তাই না ? হরিমোহন উৎসাহভরা সুরে বলল, কী বলছেন বৌঠান ? রাজি হবে না মানে ? রেখা যদি ওদের সংসারে বৌ হয়ে যায়, তা হলে তো ওরা ধন্য হয়ে যাবে ।— মণিময় হরিমোহনের এই মন্তব্য বেশি পছন্দসই মনে হলো না । তাই হরিমোহনকে আপত্তিকর ভঙ্গীতে বলে উঠল, না না এসব আপনি কী বলছেন । কারুর সম্পর্কেই এই ধরনের মন্তব্য করাটা আমার মনে হয় ঠিক না। পাত্রই বা কম যায় কিসে?

সেই তুলনায় আমাদের মেয়ে তো অতি সাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন । মণিময়ের কথায় হরিমোহন থতমত খেয়ে গেল, মিষ্টির প্লেট টেবিলে রেখে কাঁচুমাচু হয়ে বসে রইল । শোভা কটমট করে তাকাল মণিময়ের দিকে । সব জায়গাতেই এই লোকটার জ্ঞানের বক্তৃতা না দিলে হয় না ? রেখার কথাই তো বলেছে । এতে তো খুশি হওয়ার কথা । পরিবেশটাকে সহজ করার জন্য শোভা একটু হেসে বলল, হরিমোহনবাবু আপনি কিন্তু থেমে থাকবেন না। আপনি ওদের সাথে আমাদের কথাবার্তা বলার যোগাযোগটা করিয়ে দিন। ব্যাস — বাকিটা আপনার স্যার করবে। কেমন ? হরিমোহন গদগদ হয়ে বলল, নিশ্চয়ই বৌঠান, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুনির্মলবাবুকে বলব এখানে আসতে । তখন সামনাসামনি কথাবার্তা হবে । এই ফাঁকে আর কোনো খবর সংগ্রহ করা যায় কিনা দেখছি । কথা শেষ হতেই হরিমোহন উঠে দাঁড়াল। স্যার এখন আসছি । আমি শিগগিরই আবার আসব। বলে হরিমোহন মণিময়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। মণিময় ভদ্রতার খাতিরে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

মণিময়ের ভাবতে অবাক লাগছে এই লোকটাও কারুর উপকারে আসতে পারে । সত্যিই ঈশ্বরেরই অমোঘ বিধান। সে যেই হোক এগিয়ে আসবেই সাহায্য করতে। এটা তো সত্যি — কখন যে কে কার সাহায্যে হাত বাড়ায়, কিছুই বলা সম্ভব নয় আগের থেকে । এই হরিমোহনের মতো লোকও, যে নাকি কারুর অপকার ছাড়া উপকার বড় একটা করে না, সে কিনা আজ মণিময়ের মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে । দেখাই যাকনা শেষ পর্যন্ত কী হয়। হলে হতেও পারে । সবই তো নিয়তির লিখনের উপর নির্ভরশীল । তবে মণিময় স্থির করেছে নিজেও খোঁজখবর করবে । শুধু হরিমোহনের উপর নির্ভর করলে তো হবে না। সুনির্মল লোকটা মন্দ নয়, ওর স্ত্রী তো বেশ হাসিখুশি গোছের মহিলা ছিলেন । এখন কেমন আছেন কে বলবে । দীর্ঘ কয়েকটা বছর তো পেরিয়ে গেছে । একটিই তো মেয়ে তাঁর। বেশ সুশ্রী, নম্র, ভদ্র, রেখার মতোই অনেকটা । কয়েক বছরের পরিচিতিতে তো একটা গোটা পরিবারকে চেনা যায় না ! তাছাড়া বংশ মর্যাদা বলে তো একটা কথা থেকেই যায় ।

রেখার বান্ধবী চম্পার বিয়ে হয়ে গেছে গত বৈশাখে। মায়ের স্নেহে প্রতিপালিত মেয়েটি শুনেছি মোটামুটি ভালই বিয়ে হয়েছে । মামাদের দেখাশুনোয় এই বিয়ে ঠিক হয় । বাবার অবর্তমানে চম্পার জন্য যে যতটুকু করেছে তাই যথেষ্ট মনে করে মণিময় । বইপত্রর সব শ্বশুরবাড়ি নিয়ে গেছে । যদি বি.এ. পরীক্ষাটা দিতে পারে। জামাইও সাধারণ গ্র্যাজুয়েট । যেখানে চাকুরি করে, সেখানেই একটা বাড়িভাড়া করে থাকে । সঙ্গে মা এবং ছোটো ভাই থাকে। খুব একটা সচ্ছল নয়। কোথায় থাকে বা কী চাকুরি করে এসব অবিশ্যি মণিময় জানে না। মণিময় কোনো সময়েই অপরের ব্যাপারে এত মাথা ঘামানো পছন্দ করে না । তবে হ্যাঁ, চম্পা চলে যাওয়ার পর রেখা একটু একা হয়ে পড়েছে । মণিময়ও মনে মনে মনস্থির করে ফেলেছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এখানেই রেখার বিয়ে দেবে । তবে ফাইনাল পরীক্ষার

পর।

ভেবেচিন্তে অস্থির শোভা হন্তদন্ত হয়ে এসে দাঁড়াল মণিময়ের পাশে। শোন তুমি তো বাবা, তোমারও তো একটা দায়িত্ব আছে নাকি ! বলে শোভা রাগে ফুঁসতে লাগল । মণিময় বলল, হ্যাঁ তাতো আছেই। আমি কি বলেছি যে আমার কোনো দায়িত্ব নেই ? হঠাৎ তোমার এইরকম মন্তব্য ? শোভা রাগের সুরে বলল, মন্তব্য করব না ? তোমায় হাত জোড় করে বলছি, অনেকদিন তো গা এলিয়ে চলেছ, এবার নিজেকে এ ব্যাপারে একটু প্রাধান্য দাও, খোঁজ খবর নাও, কথাবার্তা বলো সুনির্মলবাবুর সাথে । নয়ত ... । মণিময় শোভার দিকে তাকিয়ে বলল, নয়ত কী ? নয়ত আমি গলায় দড়ি দেব, বুঝলে ? গলায় দড়ি দেব। শোভার উক্তিতে মণিময় একটু অবাক যেমন হল, তেমনি মনে মনে হাসির উদ্রেকও হলো। মণিময় সবই বোঝে । মায়ের মন তো, তাই এত অস্থিরতা, এবং এটাই স্বাভাবিক তাই শোভার অস্থিরতা না মেনে নেওয়ার কোনো কারণ নেই । মণিময় তাই গিন্নিকে আশ্বস্ত করতে শোভার কাছে গিয়ে বলল, শোনো গিন্নি, রেখার বিয়ের জন্য নিঃসন্দেহে এটা ভাল প্রস্তাব । তাই ভাবছি গিরিজাকে একটা চিঠি দিয়ে পুরো ব্যাপারটা আগে জানাই। শোভা বসে একটু পান খাচ্ছিল। মণিময়ের কথাটা মনে হয় শোভার মনঃপূত হয়েছে, তাই নরম সুরে বলল, হ্যাঁগো, তাই করো। তবে তাড়াতাড়ি করতে হবে যাই কর না কেন । তবে তিনি কি কিছু করবেন ?— কেন করবে না? আর তাছাড়া করার কী আছে? শুধু তো পাত্রের এবং তার পরিবারের খোঁজখবর নেওয়া। এইটুকুই তো । গিরিজাও উকিল। তাই হয়তো বা ওর পক্ষেই সম্ভব হবে খোঁজখবর নেওয়ার। বলে মণিময় বারান্দায় পায়চারি করতে লাগল। শোভা কোথায় যেন একটা আশার বাণী শুনতে পেল । উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ঠিক বলেছ । এবার যদি একটা হিল্লে হয় আমার মেয়েটার । তাই না গো? মণিময় ঠোঁটের কোণে হাসি এনে কথাটাকে সমর্থন জানাল ।

রেখা বাড়ি এল । শোভা দেখে রেখার পেছন পেছন গিয়ে রেখার পড়ার ঘরে ঢুকল । হঠাৎই প্রশ্ন শোভার রেখার প্রতি, হ্যাঁরে রেখা — চম্পা কেমন আছেরে শ্বশুর বাড়িতে ? রেখা হতচকিত হয়ে বলল, হয়তো ভালই আছে। কিন্তু মা তোমার হঠাৎ চম্পার খবরে কী দরকার বল তো? শোভা আমতা আমতা করে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, না, মানে এমনিতেই । দেখো মেয়ের কাণ্ড। চম্পার খবর জানতে ইচ্ছে করে না ? হ্যাঁ, মা অবশ্যই জানতে ইচ্ছে করাটা উচিত । কিন্তু তা বলে এক্ষুনিই । সত্যি তোমাকে নিয়ে ... বলে রেখা শোবার ঘরের দিকে যাচ্ছিল। শোভা এসে রেখার হাতটা ধরে চেয়ারটায় বসাল। রেখা একটু আশ্চর্য হল মায়ের আচরণে । চম্পার ব্যাপারে কিসের জন্য এত উৎসাহ। কিছু যে আন্দাজ করতে পারেনি রেখা তা নয় । তবুও রেখা মা-র দিকে হতবাকদৃষ্টিতে তাকিয়েই রইল। এদিকে বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। প্রচণ্ড রোদে শরীর ঘর্মাক্ত বোধ হচ্ছে । স্নান করার সময় হয়েছে। চান করলেই

শরীরটা একটু ঠান্ডা হবে । কিন্তু কী করে যাবে। মা-র এই কৌতূহলী মনোভাব না কাটলে রেখার তো কিছু করার নেই । রেখা চেয়ারে বসে নরম সুরে জিজ্ঞেস করল শোভাকে, আচ্ছা মা, তোমার কী হয়েছে বল তো? তাড়াতাড়ি বলো কী বলবে। আমার ভাল লাগছে না। শোভা গদগদ হয়ে রেখাকে বলল, জানিস তো রেখা — আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে আজকালকার মেয়েরা শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে নতুন অবস্থায় কীরকম থাকে। শ্বশুর বাড়ির মানুষদের কাছ থেকে ভাল ব্যবহার পায় কিনা ! এই আর কী । আর কিচ্ছু নয়। রেখা খুব বিরক্ত বোধ করল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল । শোভার দিকে কটমট করে তাকাল, দেখ মা — আমি সব বুঝি, কেন তোমার এত কৌতহল। বলে রেখা মাথা নিচু করে চলে গেল এ ঘর থেকে । শোভা ভাবল রেখা ঠিকই বুঝেছে । শোভা তো মা, তাই মেয়ের ব্যাপারে নানারকম জটিলতার প্রশ্ন মনে আসাটাই স্বাভাবিক। মানুষের শিক্ষা, সংস্কার, আজ কতটুকু আছে তা তো নারী নির্যাতনের বহর দেখেই তা বোঝা যাচ্ছে । তাই শোভা প্রায়ই ভাবে রেখাও যদি শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে শান্তি না পায় — এইসব উদ্ভট চিন্তা মা-বাবার মনেই আসে । কিন্তু ঈশ্বরের বিধান তো মানতেই হবে । সব দেখে শুনে বিয়ে দেওয়ার পরেও যদি কোনো মেয়ে সুখী না হয় তবে কার দোষ ? এটাই নিয়তির পরিহাস ।

শোভা বিছানায় বসে আকাশপাতাল ভাবতে লাগল । যথেষ্ট খোঁজখবর নিয়েই বিয়ের ব্যাপারে এগোতে হবে । পরিবারটা খুবই পরিচিত । তবে রাজু মানে উৎপলের ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়াটাই এখন প্রাথমিক আবশ্যকতার মধ্যে পড়ে। দিনকাল মোটেও ভাল নয় । এই যুগের ছেলে সে, যতই শিক্ষিত হোক — আর ভাল পরিবারের ছেলে হোক — মনের সন্দেহ দূর করতে হলে পাত্রের সম্পর্কে পুরোপুরি তথ্য জানাটা একান্ত দরকার, চোখ বুজে ভাবছিল শোভা হঠাৎই চমকে উঠল রেখার ডাকে, কী গো মা — কিছু খাওয়ার জন্য দাও না । ভীষণ খিদে পেয়েছে। শোভা বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল । রেখাকে বলল, যা-না মা রান্না ঘরে। রেখার মনে হয় ভাল লাগছিল না । বিরক্ত হয়ে বলল, কেন মা — রান্নাঘরে গিয়ে কী করব। তুমিই দাও। আমার ভাল লাগছে না । আমি এক্ষুনি কোনো কাজ করতে পারব না । শোভা ভাবল, আরে রেখার কী হল। এমনটা তো কোনো সময় করে না । যাক— আর কদিনই বা আব্দার করবে মেয়েটা । দুদিন পরে পরের ঘরে চলে যাবে । এইসব ভেবে শোভা চুপচাপ রান্নাঘরে গিয়ে রেখার জন্য খাওয়ার রেডি করে নিয়ে এল। এই নে — খেয়ে নে। তারপর একটু বিশ্রাম করে নে। একটু বাদেই তো ভাত খাবি । তাই কম করেই দিয়েছি । রেখা হাত বাড়িয়ে নিল বাটিটা। মাকেবলল, মা, তোমার কাজ কমপ্লিট করেছ তো । যদি কিছু থাকে তো বল — আমি করে দেব। শোভা হাসিমুখে উত্তর দিল, না, রে মা — তোকে কিচ্ছু করতে হবে না। শুধু ভাতটা করব। ততক্ষণে অসীমও চলে আসবে হয়তো। গরম গরম সবাই খেয়ে নেব। রেখা খাওয়া সেরে বিছানায় একটু গড়িয়ে নিল ।

অতি সাধারণ পরিবারে মানুষ হয়েছে রেখা । মণিময়ের মতো আদর্শবান বাপের মেয়ে হয়ে রেখা নিজেকে সর্বদাই ধন্য মনে করে । রেখা মনে করে, ওর বাবার মতো বড় মাপের মানুষ সারা নয়নপুর খুঁজলেও পাওয়া যাবে না । আর্থিক সঙ্গতি কম হলেও মণিময়ের সন্তানের প্রতিপালনে মানসিক দৃঢ়তা ছিল অনবদ্য । যার ফলস্বরূপ মণিময়ের দুই সন্তানই পিতার আদর্শে, সুষ্ঠু চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়েই ওরা বড় হয়েছে এবং সুস্থ চিন্তাধারার বশবর্তী হয়ে এ সমাজে বসবাস করছে। কৃত্রিম চাকচিক্য ওদের নেই বলেই নয়নপুর বাসীদের মুখে মুখে ওরা প্রশংসনীয় ।এ জন্য মণিময়, শোভা দুজনেই সন্তানদের নিয়ে গর্বিত । হয়তো বা গ্রামের সুস্থ, শীতল পরিবেশে ধীরে ধীরে বড় হয়েছে বলেই আধুনিক যুগের বদ্‌লে যাওয়া হাওয়া ওদের স্পর্শ করতে পারেনি ।এটা মণিময়ের জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্য। তাই মণিময়ের একমাত্র স্বপ্ন হল এখন একটাই । সেটা হল মেয়েটাকে সুপাত্রস্থ করা । যেন রেখাও সুস্থ জীবনযাপন করতে পারে। তাও যেন অবশ্যই হয় শান্তির পরিমণ্ডলে ।এটাই ঈশ্বরের কাছে মণিময়ের একমাত্র প্রার্থনা।

পুজো কেটে গেছে অনেকদিন। নয়নপুরের বাসিন্দারা মায়ের পুজোয় অনাবিল আনন্দেই কাটিয়েছে ।শরতের মেঘ সরে গিয়ে হেমন্তের হিমপড়া শুরু হয়ে গেছে। গ্রাম বলেই হয়তো বা এত তাড়াতাড়ি শীতের আমেজ ধরা পড়ছে। গাছ-গাছালির খোলা হাওয়ায় বাংলার প্রতিটি গ্রাম বোধহয় এমনিভাবেই শীতের আগমনী গান গায়। প্রকৃতির রুক্ষতা প্রতিটি দেহমনে সতর্কবার্তা বয়ে নিয়ে আসছে। মাঠ-ক্ষেত সব শুকিয়ে এ ধরার বুকে রুক্ষতার ছাপ এনে দিয়েছে। হেমন্তের ঠান্ডা হাওয়ায় এ ভুবন ভাসছে। পাশাপাশি ঋতু পরিবর্তনের জেরে এই গ্রামের প্রায় প্রতিটি ঘরেই অসুখ-বিসুখ দেখা দিচ্ছে। এসব তো হওয়ারই - এ যে প্রকৃতির নিয়মের মধ্যেই পড়ে ।চাষীরা মাঠে মাঠে ধানের চারা রোপণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ।অগ্রহায়ণে এই ধান উঠতেই হবে । গ্রাম বাংলার সুপরিচিত উৎসব হচ্ছে 'নবান্ন'। শহরে আজকাল এসব শোনাই যায় না। আশ্বিন মাস প্রায় শেষ হতে চলেছে ।বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত ফসলের যে কী হবে কে জানে ।তাইতো চাষীদের মাথায় হাত ।

এদিকে গত সপ্তাহে সুনির্মল, আর তার ছেলে এসেছিল মণিময়ের বাড়িতে। আগের থেকেই জানা ছিল বলে শোভার কোনো অসুবিধা হয়নি আপ্যায়ন করতে। সুনির্মলের ছেলে উৎপলকে

দেখে শোভা খুব খুশী । সেই কবে ছোটোবেলা দেখেছিল। আর আজ দেখল । বেশ হয়েছে দেখতে। সুঠাম দেহ, মাঝারি রং, বেশ লম্বা চওড়া চেহারা হয়েছে রাজুর মানে উৎপলের । খুবই শান্তশিষ্ট । আশ্চর্য মেয়ে রেখা, উৎপলের সামনেই এল না। সুনির্মল অবশ্য রেখার সঙ্গে কথাবার্তা বলে গেছে । রেখার ভালই লেগেছে সুনির্মলকে শ্বশুর হিসেবে । শোভার খুব ইচ্ছে ছিল উৎপলের সঙ্গে রেখার কথাবার্তা হোক। মণিময়েরও তাই ইচ্ছে ছিল । কিন্তু রেখাকে কে রাজি করাবে ! তাই ইচ্ছাও পূরণ হলো না । মোটামুটি পাকা কথাই বলে গেছে ওরা। এরপর মণিময়, শোভা যাবে কলকাতায় সুনির্মলের বাড়িতে। যে বাড়িতেরেখা সংসার পাতবে সেই বাড়িটাও তো দেখা দরকার ! সেই ভেবেই সুনির্মল মণিময়কে যাওয়ার জন্য বলে গেছে । শোভা তো যাবেই । মণিময় ভাবছে হরিমোহনকেও নিয়ে যাবে । কারণ হরিমোহনই তো এই সম্বন্ধের উদ্যোক্তা । তাই তাকে বাদ দেওয়া ঠিক হবে না । তাছাড়া — নানা চিন্তায় জর্জরিত মণিময় কোত্থেকে কী ব্যবস্থা করবে বুঝে উঠতে পারছে না । আর্থিক অবস্থা ভালো থাকলে কোনো মা-বাবারই এত চিন্তা হয় না । সুনির্মলের পরিবার তো মোটামুটি সচ্ছলই বলা চলে ।

সুনির্মলের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক করতে গেলে ওদের মান অনুযায়ী রেখাকে তো সাজিয়ে দিতে হবে । এত টাকা আসবে কোত্থেকে — কে জানে । অর্থকড়ির অভাবের জন্য এত ভাল পাত্র হাতছাড়া করতেও মন চায় না মণিময়ের । অথচ মণিময়ের পাশে দাঁড়াবারও কেউ নেই ! এখন একমাত্র ভরসা — ঈশ্বরের কৃপা । তাঁর কৃপা ছাড়া কন্যাদায় থেকে উদ্ধার হওয়া অসম্ভব । যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি কলকাতা যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে । আজ ছুটির দিন — তাই মণিময়ের এত অবকাশ। সারাটা দুপুর এসব ভেবেই কেটে গেল । একটুও ঘুম এল না। বেলা পড়ে এল । শোভা নিশ্চয়ই রান্নাঘরে চা করতে ঢুকেছে । যাইহোক চা খেতে খেতে শোভার সঙ্গে বসে একটু কথাবার্তা বলে নেবে । রেখা মনে হয় ঘুমুচ্ছে । মেয়েটা খুব পরিশ্রম করে । টিউশনি করেই নিজের বই-খাতার ব্যবস্থা করে । মণিময়ের কাছে এসব আজকাল আর চায় না ।

হঠাৎই শোভা এসে ঢুকল চা নিয়ে । মণিময় উঠে বসে চায়ের কাপটা নিল। শোভা পাশে বসে মণিময়ের দিকে তাকিয়ে রইল। মণিময় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, কী হল — অমন করে তাকিয়ে কী দেখছ । আমার কি রূপ বেড়েছে নাকি! শোভা প্রাণখোলা হাসি দিয়ে বলল, এই বয়সে তোমার রূপ কে দেখতে যাচ্ছে শুনি ! কথার কী ছিরি ! আমি ভাবছি অন্য কথা — আর উনি এখানে ঠাট্টা করছেন। মণিময় হেসে ফেলল, বলল, আরে বল কী গো, তুমিও ভাবছিলে ? না, না — আমি বিশ্বাস করি না । শোভার খুব রাগ হল মণিময়ের উপর। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। মণিময় বুঝতে পারল শোভা রাগ করেছে । তাই চুপ করেই রইল । শোভা বিরক্তির সুরে বলল, বিশ্বাস কর না, তাই না ? তাছাড়া তোমার বিশ্বাস করা না করায়

আমার কিছু আসে যায় না। আমি চিন্তা করছি অন্য কিছু । মণিময় অবাক হয়ে শোভার পাশে গিয়ে দাঁড়াল । আস্তে আস্তে বলল, শোভা, বল তুমি — কী নিয়ে তোমার এত চিন্তা ! আমি তো আছি না কি ! বল না, এত রাগের কী আছে ! আমি তো ইয়ার্কি করছিলাম। শোভা জানে, মণিময় সারা জীবনই এই প্রকৃতির লোক । কোনো সমস্যাকেই সে সমস্যা বলে মনে করে না। সহজ পথে চলতে সে চিরকালই ভালবাসে । তাই শোভা কখনই নিজের রাগ প্রকাশ করতে পারে না মণিময়ের কাছে । শোভা সহজ সুরে বলল, বলছিলাম, সুনির্মলবাবু তো এসে সবকিছু দেখে গেলেন । আমাদেরও তো যাওয়া দরকার । যে বাড়িতে মেয়েকে বিয়ে দেব, সে বাড়িঘর আমরা দেখব না ? মণিময় উৎসাহিত হয়ে কাছে এগিয়ে গিয়ে উত্তর দিল, হ্যাঁ অবশ্যই যাব ! আমি তো সেটাই ভাবছিলাম। ছুটির দিন ছাড়া তো যেতেও পারব না। তুমিই বল কবে যাওয়া যায়। তার আগে তো সুনির্মলবাবুকে জানাতে হবে। শোভা মণিময়ের কথায় সায় দিয়ে চলে যাচ্ছিল। মণিময় হঠাৎ ডেকে বলল, আরে, যাচ্ছ কোথায় ? একটু বসো, তোমার সঙ্গে বসে ঠিক করতে হবে না, কবে যাব ! তবে হ্যাঁ - এত দিনক্ষণ দেখার দরকার নেই । সবদিনই ঈশ্বরের। সুতরাং ... । শোভা মনে খুশি হল কলকাতা যাওয়ার ব্যাপারে । শোভার এখন কত কাজ ! পরমদয়ালের কৃপায় যদি বিয়েটা ঠিক হয়ে যায় ! শোভা আগ্রহের সুরে মণিময়কে বলল, ঠিক আছে — সামনের রোববার চল, যাই । শোনো — হরিমোহনবাবুকে বলতে যেন ভুল কোরো না — বলে শোভা রেখাকে ডাকতে চলে গেল । এতক্ষণ ধরে ঘুমুচ্ছে মেয়েটা । সন্ধ্যায় আবার টিউশনিতে যাবে। বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েটা এ সংসারের চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্তি পাবে । অভাবের সংসারে বড় হতে গিয়ে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে ওকে । শুধু ওকে কেন, ছেলেটাকেও। এ ধরনের অনেক কথা ভাবতে গিয়ে শোভা খুব কষ্ট পায় । মায়ের মন বলে কথা। চোখ জলে ভরে যায় । যদি এবার ঈশ্বর একটু কৃপা করেন ।

মণিময় চা খাওয়ার পর পোশাকটা পাল্টে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া বাইরে । বেশ লাগছে হাঁটতে। পাতার ফাঁকে রোদের সামান্য ঝিকিমিকি এখনও দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমের আকাশটা লাল হয়ে আছে । সূর্য অস্ত যাচ্ছে প্রায়। আকাশে হাল্কা মেঘের আনাগোনা চলছে । মণিময় বেশ উৎফুল্ল হৃদয়ে এসব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যগুলো অনুভব করছিল । হঠাৎই উপেনের ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেলো। আরে মণিময় যে, এত তাড়াতাড়ি হাঁটতে বেরিয়েছ? তবে দেখো — আজকের আবহাওয়া কিন্তু সত্যিই খুউব সুন্দর । মণিময় হেসে দাঁড়িয়ে পড়ল। উপেনকে এসময়ে রাস্তায় দেখে একটু অবাকই হল । বলল, কী ব্যাপার দাদা! আপনি কোত্থেকে এলেন ? উপেন হাঁটতে লাগল বাড়ির দিকে । বলল, আমি একটু বাজারের দিকে গেছিলাম। অঞ্জলির একটা ওষুধ ফুরিয়ে গেছে, তাই আনতে গেছিলাম। মণিময় অঞ্জলির শারীরিক অবস্থা সবই জানে। তবুও উপেনকে জিজ্ঞেস করল, বৌঠান এখন কেমন আছেন ?

ওষুধ কি সাড়া দিচ্ছে ? উপেন কোনো কালেই গ্রামের ডাক্তারদের বিশ্বাস করে না । এদিকে ক্ষমতাও নেই যে কলকাতা গিয়ে বড় ডাক্তার দেখাবে । তাই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ঐ আর কী, ওষুধ খেতে হবে, তাই খাচ্ছে । খুব একটা ফল পাচ্ছে বলে আমার মনে হয় না। মণিময় অবাক হয়ে তাকিয়ে আবারও জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা দাদা, এত ওষুধ খাওয়ার পরও বৌঠানের কোনো উন্নতি হয়নি ? এ আবার কেমন ধারার চিকিৎসা! উপেন মণিময়ের দিকে তাকিয়ে বলল, চলো, ভাই আমার সঙ্গে, নিজের চোখেই দেখে আসবে । আমি তো আবার অতশত বুঝি না বাপু। চলো, চলো, এককাপ চাও খেয়ে আসবে । মণিময় ভাবল মন্দ নয় এই আপ্যায়নটা । তাছাড়া উপেনদার বাড়ি অনেকদিন যাওয়াও হয় না । কিন্তু রেখার বিয়ের ব্যাপারে তো কিছুই বলা যাবে না। শোভা নিষেধ করে রেখেছে । মণিময় কথা না বাড়িয়ে উপেনের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল।

অঞ্জলি শুয়েই ছিল বিছানায়। এখন অবশ্য সংসারের কাজ অনেকটাই কম করতে হয় । পটলার মাকে রেখেছে কাজের জন্য। কিন্তু রান্নাটা তো করতেই হয়। যাই হোক, গেট খোলার আওয়াজেই অঞ্জলি বুঝল উপেন এসেছে। পেছনে মণিময়কে দেখে বিছানা ছেড়ে উঠে বসল। আলুথালু রুক্ষচুল । খুবই দর্বল দেখাচ্ছে অঞ্জলিকে। যদি জানত মণিময় আসবে, হয়তো অঞ্জলি একটু পরি স্কার হয়েই থাকত। অন্ততপক্ষে চুলটা আঁচড়ে রাখত । অঞ্জলি একটু অপ্রস্তত হয়ে গেল। উপেনের এসব বোধশক্তি কোনোদিনই নেই। উপেনের হাবেভাবে ধরা পড়ে বাধ্য হয়ে অঞ্জলির চিকিৎসা চালাচ্ছে । সেরকম মনের আগ্রহ নিয়ে কিছুই করছে না। বাধ্য হয়েই যা করার করছে। অঞ্জলিও জানে উপেনের এই স্বভাবটা মণিময়েরও পছন্দ নয়। কিন্তু কিছু করারও তো নেই। এত বছর পেরিয়ে গেছে বিবাহিত জীবনের । এখন আর বাদানুবাদে লাভ কী ! উপেন ও মণিময় এসে ঘরে ঢুকল। মণিময় বসে পড়ল বিছানার পাশে একটা সোফায়। অঞ্জলি আড়ষ্টভাবে বসে ঠোঁটের কোণে একটু হাসি এনে বলল, অনেক দিন বাদে এলেন ঠাকুরপো । কী খবর আপনাদের! মণিময় অঞ্জলির শরীরের এই অবস্থায় হতবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, আমরা আছি তো ভালোই, কিন্তু আপনার এখন শরীর কেমন চলছে? ওষুধে কাজ হচ্ছে তো বৌঠান ? অঞ্জলি বিছানা ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, শরীরের কথা বলবেন না, ওষুধে কতটুকু কাজ হচ্ছে তাও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না । খুব একটা পরিবর্তনও বোধ করছি না । উপেন হঠাৎ এসে দাঁড়িয়ে অঞ্জলির কথায় বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন আমাদের একটু চা করে খাওয়াও তো । তাছাড়া মণিময়ও জানে তার বেশি ক্ষমতা আমার নেই। বড় ডাক্তার দেখাতে গেলে পয়সাটা কোত্থেকে আসবে শুনি ? মণিময় বুঝল অঞ্জলি খুব দুঃখ পেয়েছে এসব কথায়। কিন্তু উপেনদাকে কে আটকাবে, পরিস্থিতি অনুযায়ী যে কথাই বলতে পারে না। সব কথা সব ক্ষেত্রে বলা যায় না। মণিময় চুপ করে রইল। উপেন পাশের চেয়ারে বসে মণিময়কে বলল, ভাই, হীরকেরও

পড়াশুনার একটু ডিসটার্ব হচ্ছে । কিন্তু কিছু করারও তো নেই, ঘরে মা যদি অসুস্থ থাকে, তা হলে ছেলে-মেয়ের তো একটু ঝঞ্ঝাট পোয়াতেই হয়, তাই না ? মণিময় ঘাড় নেড়ে উপেনের কথার সম্মতি জানাল। এমন সময় অঞ্জলি চা নিয়ে এল । সঙ্গে কয়েকটা বিস্কুটও রয়েছে । মণিময় হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নিয়ে বলল, বৌঠান, আপনার চা কোথায় ? বসুন না, বসুন। অঞ্জলি চলেই যাচ্ছিল, মণিময়ের কথার উত্তর দিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, আমি তো চা খাই না এখন। অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি। মণিময় আগ্রহের সুরে বলল, কেন বৌঠান, চাও তো শরীরের জন্য ভাল। তাহলে বন্ধ করলেন যে ! অঞ্জলি দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে বসে পড়ল বিছানায়। উপেন চা খেতে খেতে মণিময়কে বলল, দূর, ভাই ছাড় তো এসব কথা। ওর চা খেতে ভাল লাগে না তাই খায় না ! যার যেটা ভাল লাগে না, সেটা না খাওয়াই ভাল। মণিময় উপেনের কথায় অবাক হয়ে রইল । উপেনের তাচ্ছিল্যভরা কথাগুলো মণিময়ের একটুও ভাল লাগল না । স্ত্রীর প্রতি এত অবজ্ঞার কথা কোনো স্বামীর মুখেই মানায় না । মণিময়ের মনে হল, এজন্য বড় ছেলে তিলকটাও হয়ত্রে উপেনের মতোই হয়েছে। যার দায় উপেন কোনোদিনই এড়াতে পারবে না। এই জগৎ সংসারে স্বামী-স্ত্রীর মতো ভালবাসার সম্পর্ক আর কিছু হতে পারে না। সেই সম্পর্ককে কোনো পুরুষের সম্মান দেওয়ার মানসিকতা না থাকলেও অসম্মানিত করার অধিকারও থাকার কথা নয়। এটা মণিময়ের আদর্শের গণ্ডির মধ্যেই পড়ে। সেখানে অভাব-অনটন, তিক্ততা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। যে সংসারে এটুকু সম্ভ্রমবোধ থাকে না, সে সংসার ক্রমেই অশান্তির নরক হয়ে উঠতে থাকে । অঞ্জলির সুস্থ না হয়ে ওঠার পেছনে উপেনের এই কদর্য ব্যবহারও দায়ী । মণিময় মনে মনে খুউব বিরক্ত হয়ে ভাবল, এই পরিবেশে না এলেই ভাল হত। অঞ্জলি বৌঠানের সহ্যশক্তি অপরিসীম, এটা মণিময়-শোভা অনেক আগে থেকেই জানে। এই মানসিক চাপই অঞ্জলিকে এত দর্বল করে দিয়েছে। তার উপর সন্তানের স্বার্থপরতা। মণিময় চা খাওয়া শেষ করে উপেনকে বলল, আচ্ছা, দাদা অলকের কী খবর? ভাল আছে তো? উপেন উত্তর দেওয়ার আগেই অঞ্জলি বিরক্তির সুরে বলল, কেমন আবার থাকবে, ভালই থাকবে। আজকালকার দিনে ওর মতো স্বার্থপর ছেলেরা ভাল থাকারই কথা। জানেন তো ঠাকুরপো, একটা কুলাঙ্গারকে জন্ম দিয়েছিলাম। উপেন মণিময়কে এ ব্যাপারে এড়িয়ে যাবার ভান করে হঠাৎই বলে উঠল, আঃ — হচ্ছেটা কী! এখন আবার এসব কথা কেন? তোমার তো ছেলের কথা শুরু হলে আর থামতে চাও না। যত্তসব ...., বলে ভ্রূ কুঁচকেঅঞ্জলির দিকে তাকাল। মণিময় উপেনের কথায় অস্বস্তিবোধ করল। অলকের কথা না বললেই ভাল ছিল। মণিময় যাবার জন্য সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। উপেন নিজেকে সামলে মণিময়কে বলল, আরে ভাই, উঠলে কেন? এই তো মাত্র এলে, আরেকটু বোসো, আমাকে আবার বাজারে যেতে হবে। মণিময় পরিস্থিতিটা সহজ

করার জন্য বলল, এই তো এলেন, আবার বেরোবেন ? অঞ্জলি ততক্ষণে এ ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেছে।

মনে হয় সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাতে গেছে । মণিময় উপেনের কথা অগ্রাহ্য করেই বেরিয়ে এল। বাইরে দেখল গাঁ চমৎকার সৌন্দর্যে ভরপুর হয়ে আছে । কনে দেখা আলোয় ভাসছে নয়নপুর গ্রাম । বাস্তব জীবনের অন্ধকার দিকটা এই আলোয় ফিকে হয়ে আসছে। তা ছাড়া মণিময় এইসব বাস্তব চিত্রগুলো মনের ছবিতে রাখতে চায় না, নিজেরই অনেক সমস্যা রয়েছে মণিময়ের । শোভাকে উপেনের বাড়ির পরিস্থিতি জানিয়ে কোনো লাভ নেই । কালই একবার যেতে হবে হরিমোহনের বাড়ি। অন্ধকার হয়ে আসছে । হিমেল হাওয়ায় দেহ মন তাজা হয়ে উঠছে । আর কিছুক্ষণ পরেই রাস্তাঘাট নীরব হয়ে আসবে । নিস্তব্ধ অন্ধকারে ডুবে যাবে এই নয়নপুর গ্রাম । এইরকম রাতভোর হলেই শান্তি ।

হরিমোহনের বিছানা ছেড়ে উঠতে বরাবরই দেরি হয়। বেশি রাত করে ঘুমায় বলেই সকালসকাল উঠতে পারে না। হরিমোহনের প্রাত্যহিক জীবনে কোনো সময়েই শৃঙ্খলা নেই। কোনোকিছুই সময়মতো করতে জানে না । বিয়ের পর থেকে আজ অবধি লাবণ্য অনেক চেষ্টা করেছে হরিমোহনকে শৃঙ্খলিত জীবনে ফিরিয়ে আনতে । না পারল স্বামীকে, না পারল ছেলেকে । ওরা কেউই সুন্দর সুষ্ঠু জীবন আশা করে না । তাই লাবণ্য এখন আর এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না । লাবণ্য সকালের অন্যান্য কাজকর্ম সেরে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। গোপাল চা রেডি করে রেখেছে । লাবণ্য গোপালকে বলল হরিমোহনকে চা দিয়ে আসতে। বেলা একেবারে কম হয়নি । পরিষ্কার আকাশকে সূর্যদেবতা আলোকোজ্জ্বল করে রেখেছে। ঠান্ডা হাওয়া বইছে । চনমনে রোদে মানুষের মেজাজও চনমনে থাকা উচিত।

লাবণ্য চায়ের.কাপ হাতে নিয়ে ঢুকল গিয়ে শোবার ঘরে। হরিমোহনের শিয়রে গোপাল চায়ের কাপ রেখে গেছে। আর হরিমোহন নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে । লাবণ্য ভাবল, এখন লোকটাকে ডাকা দরকার । নয়ত গোপালকে আবার হুকুম করবে চায়ের জন্য। তাই লাবণ্য চেঁচিয়ে ডাকল কী হল ! আর কত ঘুমুবে, চা যে জল হয়ে গেল। হরিমোহন আঁতকে উঠে বিছানায় বসে লাবণ্যর দিকে তাকাল । বলল, আচ্ছা, সকালবেলা এত চেঁচাও কেন বল তো! দিলে তো নষ্ট করে সকালের ঘুমটা। বলে হাই তুলে চায়ের কাপটা হাতে নিল। লাবণ্য ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল প্রায় সাড়ে আটটা বাজতে চলেছে। রান্না খাওয়ার আয়োজন আরম্ভ করতে হবে। তার আগে প্রাতরাশ তো বাকিই আছে । নিত্যদিনেব এই একই কাজ এখন আর লাবণ্যর ভাল লাগে না । ছেলেটা যদি মানুষ হতো তাহলে বিয়ে করিয়ে পুত্রবধূর হাতে সংসার সঁপে দিয়ে একটু শান্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারত । কিন্তু তা তো হবার নয় । এইরকম ছেলের হাতে কোন্ পিতা তার মেয়েকে দেবে ! কেউই দেবে না । তাই লাবণ্য চেষ্টাও করে না। লাবণ্য ঘর থেকে বেরিয়ে এল বাইরে । হতাশার বাসা বেধেই রয়েছে লাবণ্যর মনে।

সাংসারিক শান্তি সে কোনোদিনই পায় নি । এককালে সহ্য করতে হয়েছে হরিমোহনের দৌরাত্ম্য, আর এখন সহ্য করতে হচ্ছে ছেলের দৌরাত্ম্য । শুধু সেইজন্যই 'শান্তির' অর্থ খুঁজে পায়নি লাবণ্য। সংসারে অর্থকড়ির অভাব যে কোনো মেয়েই সহ্য করতে পারে । কিন্তু স্বামীর ভালবাসার অভাব কোনো মেয়েই সহ্য করতে পারে না । এটাই বদ্ধমূল ধারণা লাবণ্যর। গোপালের ডাকে লাবণ্য চমকে উঠল । মামি, দেখুন তাকিয়ে কে এসেছে। মণিময় এসে গেট খুলে ঢুকল। লাবণ্য অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল । এ কাকে দেখছে হরিমোহনের বাড়িতে । আকাশ থেকে তারা খসে পড়ল নাকি ! মণিময় চিরদিনই লাবণ্যর কাছে পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত । সে নাকি আজ হরিমোহনের বাড়িতে, ভাবতেও অবাক লাগছে লাবণ্যর। হঠাৎ চমকে লাবণ্য ইতস্তত সুরে বলল, আসুন স্যার আসুন । কী সৌভাগ্য আমাদের, আপনি আমাদের বাড়িতেএসেছেন । আসুন। বলে ড্রয়িংরুমে নিয়ে গিয়ে বসাল । গোপাল এদিকে হরিমোহনকে খবরটা দিয়ে দিয়েছে । হরিমোহনের পরনে লুঙ্গি, গায়ে ফতুয়া। তাই নিয়েই প্রায় দৌড়ে এসেই ঢুকল । মণিময় স্মিত হেসে হরিমোহনকে বলল, কী হল, অসময়ে এসে ডিসটার্ব করলাম না তো ! হরিমোহন বিগলিত হয়ে বলল, এসব কী বলছেন স্যার । আপনার যখন খুশি আপনি আসতে পারেন। লাবণ্য গোপালকে ইশারা করে চা করতে বলল। লাবণ্য বুঝতে পারছে হরিমোহন এই মুহূর্তে একটু বেকায়দায় পড়ে গেছে । কারণ, তার মতো মানুষ আশাই করতে পারেনি কোনোদিন মণিময়ের মতো আদর্শবান শিক্ষক নীতিবাদী মানুষ এ বাড়িতে আসতে পারে । তাই মণিময়ের উপস্থিতি হরিমোহনকে তাজ্জব বানিয়ে দিয়েছে । লাবণ্যর দিকে তাকিয়ে হরিমোহন অতি নরম সুরে বলল, যাও না গো, স্যারের জন্য একটু চা-টায়ের ব্যবস্থা কর। মণিময় তীব্র আপত্তিতে বলে উঠল, না, না — হরিমোহনবাবু, এসবের কোনো দরকারই নেই । আমি এক্ষুনি চা খেয়ে এসছি। এখন তাই চা বা টা কিছুই খাব না । লাবণ্য থমকে গিয়ে বলল, না, স্যার — এক কাপ চা অন্তত খেতে হবেই । মণিময় ভদ্রতার খাতিরে চা খেতে স্বীকার করে নিল। লাবণ্য চলে গেল চা আনতে। হরিমোহন একটা মোড়ায় বসল । মণিময় সময় নষ্ট না করে হরিমোহনকে বলল, শুনুন, হরিমোহনবাবু আমাদের তো একবার সুনির্মলবাবুর বাড়ি যাওয়া দরকার। তিনি তো আপনাকেও বলে গেছেন । আপনি কবে যেতে পারবেন জানিয়ে দিলে আমি সেই অনুযায়ী ডেটটা ঠিক করে নিতাম। হরিমোহন বলল, স্যার, আমাকেও যেতে হবে ? আপনি আর বৌঠান তো যেতে পারেন। মণিময় হেসে বলল, আরে কী বলছেন ! আপনাকে না নিয়ে তো আমরা যাবই না । আপনার জন্যেই তো এতটা অগ্রসর হয়েছে সম্বন্ধটা। আপনার যেদিন সময় হবে সেদিনই আমরা রওনা হব । হরিমোহন মণিময়ের কথায় খুব খুশি হল। এরই ফাঁকে লাবণ্য ট্রে-তে করে সুন্দর কাপে চা নিয়ে এল । লাবণ্য কৌতূহলী ভঙ্গীতে তাকিয়ে বলল মণিময়কে, স্যার — আপনারা যাবেন বুঝি কলকাতায় সুনির্মলবাবুর বাড়ি ? মণিময় মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল । মুখে কিছুই বলল

না । লাবণ্য বুঝে নিল হরিমোহনও সঙ্গে যাবে । লাবণ্যর মতে রেখা গ্রামের মেয়ে । ওর একটা ভাল সংসার অবশ্যই দরকার। সেক্ষেত্রে সুনির্মলের পরিবার যথেষ্টই স্বচ্ছ এবং সুন্দর। নির্ঝঞ্ঝাটও বটে। উৎপলের সঙ্গে বিয়েটা হলে, রেখা শান্তিতেই থাকবে । মণিময় ওদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল । লাবণ্য মনেমনে খুবই খুশি এই ভেবে যে মণিময় স্যার হরিমোহনের বাড়িতে পা রেখেছে ! তিনি যে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা ! তাই হয়তো কোনো দ্বিধা না করেই এ বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছেন । তবে লাবণ্য এটাও জানে — বহুদিন পর হরিমোহন একটা খুব ভাল কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেছে। এর চাইতে মহৎ কাজ আর কী আছে ! ঈশ্বর হরিমোহনকে সুবুদ্ধি দিয়েছে — বোঝা যাচ্ছে ।

লাবণ্য বরাবরই আবেগপ্রবণ । তাই অনেকদূর পর্যন্ত ভাবতে হয়তো ভালবাসে। ভাবছে একদিন রেখাদের বাড়ি গিয়ে বেড়িয়ে আসলে মন্দ হয় না। আগে তো শোভা বৌদির সঙ্গে খুবই অন্তরঙ্গতা ছিল । পাশাপাশি গ্রামের বাসিন্দা ছিল ওরা দুজনে । শোভা লাবণ্য চাইতে বয়সে কিছুটা বড়। মণিময়ের সঙ্গে বিয়ের পরেও কয়েক বছর শোভা-লাবণ্যর যাতায়াত ছিল, হরিমোহনের কিছু অমানবিক আচরণে মণিময়ের মনে অবিশ্বাসের দানা বেঁধে যায়, নানা কারণে ওরা হরিমোহনকে এড়িয়ে চলতে আরম্ভ করে । স্বাভাবিকভাবে শোভাও লাবণ্যর কাছ থেকে দূরে সরে যায়। তাই আজও ওদের যাতায়াত বন্ধ হয়েই আছে । আজ সেই হরিমোহনের জন্যই মণিময় এ বাড়িতে ঢুকেছে ।এখন লাবণ্য চায় সম্পর্কটা আরও স্বাভাবিক হোক। ও মনে মনে স্থির করে ফেলেছে একদিন শোভা বৌদির কাছে যাবেই । দরজায় দাঁড়িয়ে এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে হরিমোহনও বেরিয়ে গেছে বলতেই পারে না লাবণ্য । লাবণ্যকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গোপাল এসে বলল, কী গো— মামি, কত বেলা হয়ে গেল — তুমি খাবেটাবে না ? আমিও তো খাই নি। লাবণ্য হঠাৎ চমকে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, চল্, আগে আমি আর তুই খেয়ে নিই । তোর দাদা কোথায় রে গোপাল ? গোপাল বলল, কেন, তুমি দেখ নি, দুজনেই তো বেরিয়ে গেছে । তবে খেয়েই গেছে ! গোপালের দায়িত্বজ্ঞান দেখে লাবণ্য মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল গোপালের দিকে । সত্যি এ ছেলেটা না থাকলে যে লাবণ্য কীভাবে এ সংসার সামলাত কে জানে ! রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে দেখল গোপাল প্লেটে খাবার সাজিয়ে নিয়েছে । লাবণ্য গোপালকে ভাতটা চাপানোর জন্য নির্দেশ দিল । প্রাতরাশ সেরে চানটান করে পুজো দিয়েই লাবণ্য সর্বদা রান্না করতে ঢোকে । এই ফাঁকে গোপাল অনেক কাজ এগিয়ে রাখে। হরিমোহন বা রঞ্জন হঠাৎ এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল কেন, লাবণ্য তা জানতেই পারল না । সারাদিনের মধ্যে বিকেলের ঐ গল্প করার সময়টুকুই লাবণ্যর কাছে অতি সুখের সময় । নয়ত এ সংসারের কোনো আদবকায়দাই লাবণ্যর পছন্দ নয় । তবুও এত

বছরে কিছুটা তো মানিয়ে নিয়েছেই লাবণ্য। স্বামী-সন্তানের সংসারে হয়তো প্রত্যেক মাকেই অল্পবিস্তর মানিয়ে চলতেই হয়।

বিকেলের সোনা রোদে এ ধরার মাটি যেন ঝকঝক করছে। স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। তাই ছোটো-বড় ছেলে মেয়েরা পিঁপড়ের সারির মতো মাঠের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে যার যার বাড়ির উদ্দেশে। দিগন্তের কোণে আকাশে মেঘ জমেছে। বৃষ্টি আসতেও পারে রাতের দিকে। মেঘকে উপেক্ষা করে এখনও রোদের উজ্জ্বলতার পরশে নয়নপুর যেন আলোকিত হয়ে রয়েছে। হরিমোহন ছুটে চলেছে পঞ্চায়েত অফিসের দিকে। গ্রামের রাস্তার উন্নয়নের ব্যাপারে একটা জরুরি সভা ডেকেছেন বি.ডি.ও. সাহেব। এই মিটিংয়ে হরিমোহনের উপস্থিতির গুরুত্ব অনেকটাই। তাই মনে করে হরিমোহন নিজে। কিন্তু গ্রামবাসীর অধিকাংশের মতামত অন্যরকম। হরিমোহন গাঁওপ্রধান বলেই রাস্তাঘাটের উন্নয়ন এখনও সম্ভব হয়নি। গ্রামবাসীর চাহিদা পূরণের লক্ষ্যেই ব্লক আধিকারিক এই সভা ডেকেছেন। সরকারি কোষাগারের অর্থ বরাদ্দ নিয়েও তিনি কথাবার্তা বলবেন। হরিমোহন পঞ্চায়েত অফিস কক্ষে ঠিক সময়েই উপস্থিত হল। মিটিং শেষে হরিমোহন মণিময়ের বাড়ি গিয়ে বলে এল রবিবার সুনির্মলবাবুর বাড়ি যাওয়ার ব্যবস্থা করতে।

রবিবার অতি ভোরে রওনা দিল — মণিময়, শোভা আর হরিমোহন। দক্ষিণ কলকাতার কোনো একটা জায়গায় সুনির্মলের বাড়ি, মণিময় এটুকুই জানে। বাসে করে বর্ধমান পর্যন্ত গিয়ে, তারপর ট্রেনে গিয়ে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছোল ওরা। হরিমোহন তো এসব ব্যাপারে বরাবরই চোস্ত। তাই মণিময় শোভার কোনো অসুবিধাই হল না কলকাতা পৌঁছোতে। হরিমোহন খুব সাবধানে ওদের নিয়ে এগোতে লাগল যাতে মণিময় স্যারের কোনো অসুবিধা না হয়। হরিমোহনের স্বভাবের এটাই ভাল দিক— সে যথাযোগ্য স্থানে সম্মান দিতে জানে। শোভার তো বাকরুদ্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হাওড়া স্টেশনের পরিস্থিতি দেখে। হাজার হাজার মানুষের ঢল বইছে। সারি সারি ট্রেন দাঁড়িয়ে, এত আতিশয্য কলকাতার। শোভা এই নিয়ে খুব সম্ভবত দুবার এল কলকাতায়। একবার এসেছিল সেই কবে ছোটো বেলায় বাবার হাত ধরে। আর আজ এল স্বামীর সঙ্গে। সেই কলকাতার সঙ্গে আজকের কলকাতার আকাশপাতাল তারতম্য। স্টেশন থেকে বেরিয়ে হরিমোহন কোনো দ্বিধা না করে একটা ট্যাকসি নিয়ে নিল।

মণিময় শোভা দুজনেই হতবাক, এত গাড়ি, এত মানুষের সমারোহ, আর আছে রাস্তার পাশেপাশে বড় বড় অট্টালিকা, চোখ ধাঁধানো তার রূপ । এ জন্যই বলে মহানগরী ! গাড়ি যাচ্ছে তো যাচ্ছে। শহরের ইট বালি সিমেন্টের কল্যাণে, কলকারখানা, মানুষের অতিসংখ্যকতায় গ্রামের চাইতে কলকাতার পরিবেশটা একটু অস্বস্তিকরই মনে হচ্ছে মণিময়ের । হেমন্তের ফুরফুরে হাওয়া কলকাতাবাসীরা উপভোগ করতে পারে না । সামনেই শীত, অথচ পরিবেশ, পরিস্থিতি কিছুই বুঝতে দিচ্ছে না। একী রাস্তার চেহারা । মহানগরির রাস্তা এত রুক্ষ । কোথাও গর্ত, কোথাও পাইপ ফেটে জল জমে আছে। পৌরসভার এ কী অদ্ভুত কার্যকলাপ । শোভা ভাবছে আর কতটা দূর যেতে হবে কে জানে । হরিমোহনকে জিজ্ঞেসও করতে পারছে না ।

তারপর যথাসময়ে গাড়ি এসে থামল সুনির্মলের বাড়ির দরজায় । শোভার মনে পড়েছে এই জায়গাটার নাম সোনারপুর । গ্রাম বলা চলে না ঠিকই । শহরতলি বলতে যা বোঝায় তা হচ্ছে এই সোনারপুর । সুনির্মল ও তার স্ত্রী এসে ওদের আপ্যায়ন করে ঘরে নিয়ে বসাল । ছিমছামভাবে সাজানো ড্রয়িংরুম । খুব আহামরি কিছু নয় । দেওয়ালে সাজানো রয়েছে ছেলেমেয়ের ছোটোবেলাকার ছবি । টেবিলের উপর একখানা ফুলদানিতে কিছু ফুল রয়েছে । মেঝেতে কার্পেট বিছানো, মোটামুটি রুচিপূর্ণ গোছগাছ করেই রেখেছে ঘরখানা । মণিময় দেখল সুনির্মলের বাচনভঙ্গী, আদবকায়দা আগের মতোই আছে । চুলেও পাক ধরেছে, শরীরটা আগের মতোই আছে । উৎপল মনে হয় বাড়ি নেই । মেয়ে এসে সবাইকে প্রণাম করল । সুশ্রী চেহারা, সুন্দরী বলা চলে না. । সুনির্মলের স্ত্রী চলে গেল মেয়েকে নিয়ে চায়ের ব্যবস্থা করতে । এই ফাঁকে কিছু কথাবার্তা মণিময় সেরে নিল সুনির্মলের সাথে। সুনির্মলের কথাবার্তা, আতিথেয়তা মণিময়ের মন কেড়ে নিল । এই সুনির্মল ছিল অত্যন্ত চালাক এবং ধূর্ত প্রকৃতির লোক । কিন্তু আজ মণিময়ের ধারণা একদম পাল্টে গেল । সুনির্মলের স্ত্রী এল চা মিষ্টি নিয়ে। খুবই সাধারণ, সাদাসিধে গোছের মহিলা। হাসিটা সর্বদাই ঠোঁটের কোণে লেগেই থাকে । হাজার হলেও পাত্রের মা বলে কথা। যথেষ্টই বরেণ্য । তাছাড়া পুরানো পরিচিত হয়ে অনেক বেশি ওদের আন্তরিকতা বোধ করছে মণিময় শোভা। হরিমোহন বেশি কথাটথা বলছে না । এতটা জার্নির পর চা-টা বেশ মজা করেই খেল সবাই । সমস্ত কথাবার্তার শেষে মণিময় বুঝতে পারল রেখাকে ওদের খুবই পছন্দ । এখানে দেনাপাওনার কোনো ব্যাপার নেই ।

বেলা গড়িয়ে এল । খাওয়াদাওয়ার পর্বও শেষ হোলো। আপ্যায়নে কোনো ত্রুটি নেই সুনির্মলের। রাজু মানে উৎপলকেও দেখা হল । শোভার খুব পছন্দ হয়েছে রাজুকে । সেই ছোট্ট রাজু আজ কত সুন্দর, সুপুরুষ হয়েছে ভাবাই যায় না । তেমনি তার আচার-ব্যবহারও মনে দাগ কাটে । হয়তো বা রেখা সব মিলিয়ে ভালোই থাকবে। হরিমোহন একটু তাড়া দিচ্ছিল বেরোবার জন্যে । নয়ত ট্রেনে উঠতে ঝামেলা হবে। মণিময় শোভা দুজনেই অভিভূত সুনির্মলের পারিবারিক পরিকাঠামো দেখে। এখন বাকিটা ঈশ্বরের কৃপা। সুনির্মলের ইচ্ছে — অঘ্রান

মাসে শুভকাজ সারার। এই ইচ্ছায় সহমত পোষণ করেছে মণিময় । দিনক্ষণ ধার্য করে সুনির্মল সপরিবারে একবার নয়নপুরে আসবে। মণিময় শোভার এই অনুরোধকে সুনির্মল অগ্রাহ্য করতে পারেনি । হরিমোহন বুঝতে পারল — তার চেষ্টা সফল হতে যাচ্ছে। এজন্য সে খুব গর্বিতবোধ করছে । রেখাও কোনো অংশে কম নয় । রেখার মতো পুত্রবধূ পেলে ওরা ধন্য হয়ে যাবে। এইরকম কিছু ভাল কাজ যে হরিমোহন করে না, তা নয় । রঞ্জনের সঙ্গে রেখার তুলনা করতে গিয়ে হরিমোহনের চোখ জলে ভরে উঠল। এখন পুরোপুরিই বুঝতে পারছে হরিমোহন — নিজের সন্তান যদি মানুষের মতো মানুষ না হয় — তাহলে মা-বাবার লালনপালনের ত্রুটি ধরা পড়ে যায় । এইসবই আজ হরিমোহনের মনকে বিক্ষিপ্ত করে তুলেছে । অপরদিকে মণিময় শোভা ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হরিমোহনের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল বাড়ির উদ্দেশে। মণিময়ের মনটা আজ সত্যিই চিন্তামুক্ত।

ওদের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল রাজু এবং সুনির্মল । ঘরে ঢুকে প্রসন্নচিত্তে সুনির্মল সোফায় বসল । রাজু এসে বসল বাবার পাশে। মুচকি হেসে সুনির্মল বলল, কীরে, বসে পড়লি যে ? কিছু বলবি ? রাজু হঠাৎ চমকে বলল, না, বাবা, আমি আর কী বলব! তোমরা তো সব বলেই দিলে। তোমাদের কথা রক্ষা করাই তো আমার কর্তব্য ! তাই না ? বলে মুখ ঘুরিয়ে বসে রইল। অবাক হয়ে গেল সুনির্মল ছেলের কথায় । ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, এসব তুই কী বলছিস রাজু ? আমরা কি কিছু ভুল করেছি ? তুই এমন করে কথা বলছিস কেন ? রেখাকে তোর পছন্দ নয়? রাজু হঠাৎ থতমত খেয়ে উঠল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সারা ঘরময় হাঁটতে লাগল । বাবার এই প্রশ্নের উত্তর সে কীভাবে দেবে তাই ভাবছিল লাগল। সেই কবে ছোটোবেলায় রেখাকে দেখেছে । আর সেদিন দেখল । সুনির্মল উত্তরের আশায় ছেলের মুখের দিকে তাকিয়েই রইল। তারপরেই রাজু বলল, পছন্দ নয়, একথা আমি বলেছি নাকি ? কিন্তু বাবা, রেখা তো গ্রামে বড় হয়েছে, শহরের আদবকায়দার সঙ্গে মানাতে পারবে তো? সুনির্মল ভাবছিল — ছেলের আবার হঠাৎ কী হল। হয়তো বা পছন্দই হয়নি রেখাকে । রাজুর কথায় সম্বিৎ ফিরে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সুনির্মল । উত্তরে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ — অবশ্যই পারবে রে বাবা। রেখা খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। নয়নপুর গ্রামে ওর খুউব সুনাম আছে রে । তুই এসব নিয়ে চিন্তা করিস না একদম। এরই মাঝে সুনির্মলের স্ত্রী গীতা ট্রেতে করে চা নিয়ে এল দুজনের জন্য । রাজুকে বলল, এই ছেলে — কী এত কথা বলছিলি রে বাবার সঙ্গে ? আমাকে বলবি না ? বলে কাপটা এগিয়ে দিল ছেলের দিকে । গীতা হাসতে লাগল। সুনির্মল চুপ করে বসে চা খেতে আরম্ভ করল । রাজু মায়ের হঠাৎ প্রশ্নে হতভম্ব হয়ে গেল। বলল মাকে জড়িয়ে ধরে, কী বলছ তুমি মা? তোমাকে কোন্ কথাটা বলি না বলো? গীতা মুখ বেঁকিয়ে বলল, ছাড় তো আমাকে, ঠাকুর ঘরে ঢুকতে হবে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। বলে গীতা ছেলের হাত ছাড়িয়ে চলে গেল। মাকেকিছুই বলা হল না রাজুর । হঠাৎ বাবাকে

প্রশ্ন করল, আচ্ছা বাবা — রুমা কোথায় গেছে গো ! কখন থেকে ওকে দেখছি না ! সুনির্মল মনোযোগ দিয়ে টিভি দেখছিল । ছেলের প্রশ্নে আচমকাই ফিরে তাকাল । একটু বিরক্ত হয়েই উত্তর দিল, আচ্ছা রাজু, এসব প্রশ্ন আমাকে কেন করিস বল্ তো ! কে কোথায় যায় না যায় সব তোর মা জানে । বিরক্ত করিস না তো! খবরটা শুনতে দে। বলে সুনির্মল টি.ভি.র দিকে তাকিয়ে রইল । রাজু আর কী বলবে। রাজু জানে সুনির্মল কী প্রকৃতির লোক । চিরকালই একটু বদমেজাজী টাইপের স্বভাব। অবসর জীবনে গল্পের বই পড়া, আর টিভি দেখা ছাড়া আর কোনো কাজ সুনির্মলের নেই । মধ্যে মধ্যে অবশ্য বাজার হাট করে । তাও বেশির ভাগ গীতাই এ ব্যাপারে সাহায্য করে সুনির্মলকে । রাজু কোনো সময়েই বাজার হাটে অভ্যস্ত নয়। মানে এখনও সেইরকম প্রয়োজন পড়েনি । বিয়ের পর হয়তো বা এইরকম অনেক দায়িত্বই পালন করতে হবে। সুনির্মলের বিরক্তিতে রাজু মোটেই আশ্চর্য হল না । তবুও প্রতিবাদ না করে পারল না । বলল, কী বললে বাবা ! সব মা জানে । কেন ? তুমি তো বাবা, সেই সুবাদে তুমি তোমার মেয়ের খবরাখবর রাখবে না ? কোথায় যায়, কী করে । কার সঙ্গে মেশে — এইসব খবরাখবরে কী তোমার কোনো দায়িত্বকর্তব্য নেই ? সুনির্মল অবাক চোখেই ছেলের দিকে তাকালো । সত্যি, আজকালকার ছেলেমেয়েদের বুঝি এমনই হতে হয় । নয়ত যুগের সঙ্গে মানাবে কীভাবে ! টিভিটা বন্ধ করে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। রাজুর দিকে এগিয়ে এসে বলল, আচ্ছা বল্ তো রাজু — তুই আমার বাবা, নাকি আমি তোর বাবা? একটা সামান্য ইস্যু নিয়ে এত চেঁচামেচি করছিস কেন ? রুমা হয়তো বা একটু বেড়াতে গেছে । চলে আসবে সময় হলে । এতে এত হৈচৈ-এর কী আছে ? রাজু নরম সুরে বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, না, বাবা হৈচৈ আমি করছি না । আর এটা সাধারণ ইস্যুও নয়। পত্রিকার প্রতিটি লাইন তো পড়, তার পরেও তোমার চিন্তা হয় না ! রুমা কলেজে পড়ছে । এই বয়সের মেয়েদের কী যখন তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া ভাল ? নাকি উচিত ! রাজু তাকিয়ে দেখল সুনির্মল ভিতরের ঘরে চলে গেছে । হয়তো বা ভাল লাগছিল না মেয়ের এই স্বাধীনচেতা মনোভাবকে । সাধারণতঃ মেয়েদের এই বেপরোয়া চালচলনের জন্য মায়েরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়ী থাকে। সুনির্মলের মেয়ের ক্ষেত্রেও এটাই প্রযোজ্য। রাজু এদিক ওদিক তাকিয়ে আর দাঁড়াল না, সদর দরজা ডিঙিয়ে বাইরে চলে গেল। সোনারপুর নয়নপুরের মতো অতটা গ্রাম নয় । কলকাতার মফস্বল শহর এই সোনারপুর। গ্রামবাংলার আভিজাত্যের ছাপ রয়েছে যথেষ্টই । সন্ধ্যারাতের হিমেল হাওয়ায় যেন সকল প্রাণে শীতের আমেজ ছড়িয়ে দিয়েছে । কিন্তু লোড শেডিংয়ের যন্ত্রণায় এখানকার মানুষের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তবে গরমেব যন্ত্রণা অনেকটাই কম বলে রক্ষা। রাস্তার পাশেপাশে প্রচুর সাইকেল, বাইক, আর গাড়ি দাঁড় করানো। বাজারের দিকেই চলেছে রাজু । সন্ধ্যে হতে না হতেই মিষ্টির দোকানে, রেস্টুরেন্টে, প্রচুর জন সমাগম দেখা যায় । লোকজন রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে কখন বাস আসবে, এই অপেক্ষায় । হঠাৎ দেখল

রাজু, রুমা হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে। কাঁধে বই-এর ব্যাগ। যাক— বোঝা গেল, রুমা টিচার-এর বাড়িথেকেই আসছে। দাদা হিসেবে রাজু বরাবরই রক্ষণশীল। ছোটোবোনের বেপরোয়া চালচলন কোনোসময়েই সে পছন্দ করে না। এজন্য প্রায়ই দুভাই বোনে কথা কাটাকাটি হয়। আবার ঠিকও হয়ে যায়। রাজুর আচমকা নজরে পড়ল সদ্য বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী একটা স্টেশনারি দোকান থেকে বেরোচ্ছে। হাতে ছোটোখাটো ব্যাগ ঝুলছে। হাসি-খুসি, উচ্ছল প্রাণবন্ত দম্পতি। রাজুর খুব ভাল লাগল।

সত্যি মানুষের জীবনে ভালবাসা হচ্ছে বিশাল মূল্যবান সম্পদ। স্বামী-স্ত্রীর গভীর ভালবাসা সংসারকে শান্তির মন্দির করে গড়ে তুলতে পারে। পারবে কি রেখা পরিপূর্ণভাবে ভালবাসা দিতে রাজুকে। রাজুর চোখে রেখা সুন্দরী না হলেও সুশ্রী তো বটেই। গায়ের রংটা রেখার চাপা হলেও তার মধ্যে মসৃণতা বেশ চোখ টেনে নেয়। সব মিলিয়ে রেখাকে মনে ধরেছে বলেই তো বিয়েতে রাজু মত দিয়েছে। নিজের বিয়ের পরেই ভাবছে বোন রুমার বিয়ের কথা ভাবতে হবে। দায়িত্বজ্ঞানহীন বেপরোয়া হওয়া রাজুর পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব নয়। মা-বাবা-বোনকে নিয়ে ছোট্ট সংসার রাজুর। মাইনের টাকা যদিও সুনির্মলের হাতেই দেয়, তবুও ছেলে হিসেবে কিছুটা হলেও মাথা ঘামায় সে সংসারেরর প্রতিটি ক্ষেত্রে। রেখা এলে, ওকেও রাজু শিখিয়ে পড়িয়ে নেবে, যাতে সংসারের ঝামেলা থেকে মা-বাবাকে কিছুটা রেহাই দেওয়া যায়। তবে এটা নিশ্চিত যে রেখা অবশ্যই পারবে রাজুকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে। রাজুদের পাশের বাড়ির অনিমেষদা, রাজু তাই বলে ডাকে। সে একটা বিলিতি কোম্পানিতে মোটামুটি ভালই চাকরি করে। অনিমেষ খুব ভাল টাইপের মানুষ। অফিসের পরে সোজা বাড়িতে চলে আসে। কোনো আড্ডা নেই। বন্ধুবান্ধব নিয়ে সিনেমা দেখার কোনোরকম আগ্রহই ওর নেই। বাড়িতে স্ত্রী আর শিশুকন্যা নিয়েই অনিমেষ সময় কাটায়। খুবই সুখী দম্পতি বলেই জানে পাড়াপ্রতিবেশী। রাজুরও মনে মনে এটাই স্বপ্ন যে সে রেখাকে খুব সুখে শান্তিতে রাখবে। তা বলে স্ত্রী যদি অন্যায় আবদার করে রাজু তা হলে মানতে পারবে না। সেখানে যদি দ্বন্দ্ব হয় তার সমাধান কী করে হবে তা কিন্তু রাজুর চিন্তার মধ্যে একেবারেই নেই। কেননা প্রত্যেকেরই একটা ব্যক্তিত্ব থাকে। স্ত্রীকে ভালবাসা দেওয়া আর স্ত্রীর কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়া তো এক হতে পারে না। রাজুর কাছে পুরো ব্যাপারটাই একটু ভয়ের মনে হল। রাজুর একমাত্র নেশা বই পড়া। সে বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকতে ভালবাসে। রেখা এসে যদি সেটা পছন্দ না করে — তবে কি পারবে এতদিনের অভ্যাসটা পাল্টাতে! দূর এসব ভাবতেই রাজুর বিশ্রী লাগছে। তবে এটাও ভাবা উচিত যে, ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের পৃথিবী জটিল। যদিও আজকাল মেয়েরা এইসব কথা মানতে রাজি নয়। শুধু শুধুই রেখাকে নিয়ে এত ভাবনা। মণিময় স্যারের আদর্শে যে মেয়ে মানুষ হয়েছে, তাকে ঘিরে এত চিন্তার

কোনো অর্থই নেই । হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা পথ চলে এসেছে । সামনেই স্টেশনে আপ-লোক্যাল ট্রেন যাচ্ছে । এখন ফেরা দরকার । তাই আবার বাড়ির দিকে রওনা হল রাজু । সোনারপুরে খুব একটা বন্ধুবান্ধব নেই রাজুর । হাইকোর্টেই আছে দু-চারজন উকিল বন্ধু । ঘড়িতে দেখল প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে । গিয়ে আস্তে সাউণ্ড দিয়ে খেলাটা দেখবে । নয়ত রুমার পড়ার ক্ষতি হবে । সুনির্মলও দেখে খেলা । তখন পিতা পুত্র মিলে খুব এনজয় করে। যাক আজকে তো ভালই কাটল। কাল থেকে আবার শুরু হয়ে যাবে জীবনযুদ্ধ, মানে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পরিশ্রম। রাজু তো এমনিতেও কঠোর পরিশ্রমী ছেলে । পুনে থেকে পাঁচ বছর পড়াশুনো করে 'ল'-এর ডিগ্রি নিয়েছে, এবং খুব ভাল রেজাল্টও করেছে । সুনির্মলের ভাগ্য এ ব্যাপারে অতি সুপ্রসন্ন যে ছেলেটা মানুষের মতো মানুষ হয়েছে। তবে দোষের মধ্যে একটা দোষ, রাজু যথেষ্ট বদরাগী টাইপের ছেলে । কিন্তু তার সততা, কর্মনিষ্ঠা, মহৎ মানসিকতা তাকে প্রকৃত মানুষ হতে সাহায্য করেছে । তা ছাড়া প্রতিটি মানুষেরই তো গুণ যেমন থাকে, তেমনি দোষও থাকে । রাজুরও তাই আছে । তবে বাপের মতন অতটা চালাকি বুদ্ধি ওর নেই। নয়নপুরে চাকুরীর ক্ষেত্রে সুনির্মলের চালাকির খপ্পরে অনেকেই পড়েছিল । তারা সবাই সুনির্মলকে এড়িয়েই চলত । রাজু এতসব না জানলেও, এটা জানত যে মণিময় স্যার সুনির্মলকে খুব বেশি একটা পছন্দ করত না । হয়তো বা এতে সুনির্মলেরই দোষ ছিল । লজ্জায়, ভয়ে সে তখন নিজেকে কতদিন গুটিয়ে রেখেছিল । রাজু তখন ক্লাস সেভেন-এইটে সোনারপুরেই পড়ে বা তারও কম হতে পারে । সুনির্মল রিটায়ারমেন্টের পরে ছেলেকে ওকালতি পড়িয়েছে। ভাল টাকাই জমিয়েছিল । মণিময়ের চাইতে অনেকটাই বয়সে বড় সুনির্মল । তবে চেহারার উজ্জ্বলতায় তা প্রকাশ পায় না এখনও । ছেলেবেলায় রাজু আদুরে ধরনের ছেলে ছিল। স্কুলের মাস্টারমশাই থেকে শুরু করে পাড়া প্রতিবেশী সবাই ওকে ভালবাসত । শান্ত, নিরীহ, গোবেচারা টাইপের ছেলে এখনও সে । কিন্তু কোনো ব্যাপারে রাগ হলে আর উপায় থাকে না। আজ রাজু পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসরেই কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস্ করছে । কত উঁচু দরের মানুষের সঙ্গে ওর জানাশোনা - ওঠাবসা ! তাই ওর আদব কায়দাও ভিন্নমাত্রায় রূপ পেয়েছে। নয়নপুরের মতো গণ্ডগ্রামের প্রভাব একটুও পড়েনি ওর উপর । আজ নয়নপুর অনেক উন্নত । কিন্তু সুনির্মলের চাকুরীকালীন সময়ে তো গণ্ডগ্রামই ছিল ।

প্রায় আটটা বাজে । রাজু এসে ঘরে ঢুকল । গীতা-সুনির্মল দুজনেই টিভি সিরিয়াল দেখছে, আবার মাঝে মধ্যে খেলাও দেখছে । ছেলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ওরা উঠে পড়ল, কেননা এবার রাজু খেলা নিয়ে বসবে । ভিতরের ঘর থেকে রুমার পড়ার আওয়াজ আসছে। রাজু বসে পড়ল সোফায়। বাবার দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে বলল, আরে কী হল বাবা ? তোমরা উঠছ কেন ? আমি তো এখন হাত-পা ধোব, তারপর চা খাব, তারপর ... বসো তো — এখনও আমার অনেক দেরি খেলা দেখার । তুমি দেখো বসে। মা তুমি আমাকে চা করে দিও,

কেমন। অনুনয়ের সুরে বলে সোজা ভিতরে চলে গেল । সুনির্মল বরাবরই গর্বিত ছেলেকে নিয়ে । তবুও একটা অজানা আশঙ্কায় মনটা মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে । যদি ছেলে সবসময়ে এইরকম না থাকে, যদি পাল্টে যায় — তখন কী হবে । টাকাপয়সার চিন্তা সে করে না, কিন্তু এইরকম ছেলে যদি হঠাৎ কোনো কারণে বিমুখ হয়ে যায়, তখন ওরা কাকে নিয়ে থাকবে! এই ভেবে প্রায়ই সুনির্মল অসহায় বোধ করে। স্ত্রীকে এই ব্যাপারে সে কিছুই বলে না। তাছাড়া গীতার এ ব্যাপারে কোনো চিন্তা আছে বলে মনে করে না সুনির্মল । হঠাৎ দেখল গীতা বসে টিভিই দেখছে, এদিকে রাজু হাত-পা ধুয়ে হয়তো এক্ষুনি চলে আসবে এ ঘরে । গীতার কাছে সিরিয়াল দেখাটাই বড় হল ! নিজেকে সামলাতে পারল না । বলে উঠল সুনির্মল, কী হল, তোমার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই ? রাজু যে বলল চা খাবে ! আর তুমি কিনা বসেই আছ ! তোমার ভাল না লাগলে মেয়েটাকে বল না দু কাপ চা করে দিতে ! গীতা অন্যমনস্ক হয়েছিল বলে, কথাগুলো শুনে আকাশ থেকে পড়ল, বলল হতচকিত হয়ে , হ্যাঁ, হ্যাঁ - আমিই যাচ্ছি । পাঁচ মিনিটের তো ব্যাপার, রাজু আসুক তো ! আমি চা করে নিয়ে এলাম বলে। গীতা চলে গেল রান্নাঘরে । সুনির্মল ভাবে, গীতাই বা কী করবে । অবস্থাপন্ন বাবার একমাত্র সন্তান গীতা। বাবার পছন্দ করা গরিব কেরানী সুনির্মলের সঙ্গে গীতার বিয়ে হওয়ার পর অনেক ঝামেলাই গীতার সইতে হয়েছে । দুজনের বয়সের তফাৎটাও বেশি । বিয়ের প্রায় চার বছর পরে রাজুর জন্ম । শিশুর ভরণপোষণের বেশির ভাগই খরচাই যোগাত গীতার বাবা । এ নিয়ে সুনির্মলের সঙ্গে প্রায়ই মনোমালিন্য হত । সুনির্মলের এই সমস্ত আচরণ গীতার আত্মসম্মানে আঘাত করত । এরকম অনেক মেয়ে থাকে যাদের মধ্যে মাতৃত্বভাবটা থাকে বেশি, গীতাও সেইরকম স্বভাবের মেয়েই ছিল । মা হয়েই সুখে থাকতে চেয়েছিল । সুনির্মলের আয় যে সীমিত, তা তো গীতা জানতই, তবু ওর একটা অভিমানসম্পন্ন মনোভাব সর্বদা সজাগ থাকত। সুনির্মল সবসময়েই একটু কিপটে স্বভাবের লোক । যতটুকু ব্যয় করার ক্ষমতা সে রাখে ততটুকুও করতে চায় না। নয়নপুর ওরা বেশি বছর ছিল না । নয়নপুর হাইস্কুলে ক্যাশিয়ার পদে যোগ দিয়েছিল সুনির্মল, রাজু তখন একেবারে ছোটো ছিল না। তখনই মণিময়, উপেনের সাথে পরিচয় হয়। হরিমোহনের সঙ্গে সুনির্মলের হৃদ্যতা বেশি ছিল। গীতা আবার এই লোকটাকে বেশি পছন্দ করত না । পরে অবশ্য অতটা তিক্ততা আর ছিল না। আর সেটা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র হরিমোহনের স্ত্রী লাবণ্যর বদান্যতায় । লাবণ্যর অনুপ্রেরণায়ই দুই পরিবারে একটা সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল । সেই সুবাদেই আজ রেখার সঙ্গে রাজুর বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেছে হরিমোহন। এতে গীতাও খুব খুশী । হঠাৎই দেখল সুনির্মল, চায়ের কাপ টেবিলের উপর, রাজুও এসে বসে চা খাচ্ছে । গীতা হয়তো রান্না করতে লেগেছে। অনেক আকাশপাতাল ভাবনা সেরে সুনির্মল চায়ের কাপে চুমুক দিল ।

এদিকে মণিময়, শোভা আর হরিমোহনের নয়নপুর পৌঁছতে রাত হয়ে গেল। সোনারপুর

থেকে হাওড়া যেতেই অনেকটা সময় লেগেছিল । ছুটির দিন হওয়াতে ট্রেনে অতটা ভীড় ছিল না, কিন্তু বাসে প্রচণ্ড ভীড় ছিল। নয়নপুর ঢুকতেই ওরা অন্ধকারে নিমজ্জিত হল । লোডশেডিং শুরু ওয়ে গেছে । রাস্তাঘাটে একটা ভিজে ভাব রয়েছে । মনে হয় এখানে অল্প বৃষ্টি হয়েছে। গ্রাম বলে তো শহরের চাইতে ঠান্ডার ভাবটাও বেশি। রাস্তায় আসতে আসতে হরিমোহন অনেক কথাই বলাবলি করছিল। মণিময় ভদ্রতার খাতিরে সৌজন্যমূলক উত্তর দিয়েছে । শোভা চু পচাপই ছিল। হরিমোহনের বাড়ি আগে। তাই হরিমোহন ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ির পথ ধরল । মণিময় আর শোভা হাঁটতে হাঁটতে বাড়িতে পৌঁছে গেল। ঢুকে দেখল হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রেখা পড়াশুনো করছে । আর অসীম বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে আছে হাতপাখা নিয়ে । নয়ত মশার দৌরাত্ম্যে বসার জো থাকবে না । অসীমকে মণিময় কড়া নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিল বিকেলের পর থেকে ঘরে থাকতে। তাই অসীম বাধ্য ছেলের মতো বাড়িতেই বসে আছে । মা-বাবাকে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এত দেরি ? আমি তো কখন থেকে বসে শুধু চিন্তাই করে যাচ্ছি ! এত দেরি হচ্ছে কেন ! শোভা কোমরে হাত দিয়ে বলল, এই ছেলে, তুই চিন্তা করছিস আমাদের জন্যে ! এটাও বিশ্বাস করতে হবে ? যা তো আমাদের জন্য একটু চা করে নিয়ে আয়, যা ... । অবাক দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি চা করব ? তোমার মেয়েকে কি এখন থেকেই খাটে বসিয়ে রাখবে নাকি ! মণিময় নিজের ঘরে ঢুকে ধুতি পাঞ্জাবি ছেড়ে লুঙ্গি গেঞ্জি পরে ফেলল । মণিময় এসে দাঁড়াল বারান্দায় হাতে গামছা নিয়ে । হাতমুখ তো ধুতে হবে । শোভা ভিতরে গিয়ে পোশাক পরিবর্তন করতে লাগল। ছেলের কথার কোনো উত্তর দিল না । মণিময় বলল, যা তো বাবা, মা যখন বলেছেন, চা-টা কর না ! কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হবে রে ? যা তো যা । — মণিময় উঠোন পেরিয়ে কলতলায় গেল। অসীম অগত্যা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল গজগজ করতে করতে । হাজার অনিচ্ছা থাকলেও অসীম মণিময়ের কথাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না । এটা মণিময়ও জানে। রেখা পড়ার টেবিল ছেড়ে রান্নাঘরে ঢুকে অসীমের সঙ্গে হাসি ঠাট্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল । রান্নাবান্না আগেই শেষ করে রেখেছিল রেখা । তাই শোভা খুব খুশী হয়ে হ্যারিকেনটা নিয়ে বারান্দায় এসে বসল । সারাদিনের সব রিপোর্ট শুনল রেখার কাছে। মণিময়ও বসেছে । অনেক কথাবার্তা হল । অসীম এনে চা দিল মা-বাবাকে । রেখাকে উদ্দেশ্য করে অসীম বলল শোভাকে, আচ্ছা মা — এই পেত্নিটাকে কবে তাড়াচ্ছ গো ! রাজুদা ওকে বিয়ে করবে তো নাকি নাকচ করে দিয়েছে । শোভা দেখল রেখার অস্বস্তিকর চেহারায় লজ্জার ভাব ফুটে উঠেছে । অসীমকে ধমক দিয়ে বলল, আঃ অসীম — হচ্ছেটা কী ! তোর মুখে কিছু আটকায় না রে ? বোন চলে গেলে টের পাবি রে টের পাবি ঘরটা কতটা ফাঁকা ফাঁকা হয়ে যাবে, বলে বিমর্ষ মুখে তাকিয়ে রইল শোভা রেখার দিকে । অসীম তাকাল রেখার দিকে, দেখল ওর চোখ জলে ভরে উঠেছে । অসীম রেখার সামনে গিয়ে রেখার মাথায় হাত দিয়ে সোহাগের সুরে

বলল, এই পাগলি—প্রত্যেক মেয়েদেরই তো বিয়ে করে শ্বশুর বাড়ি যেতে হয়, তোরটা তো নতুন কিছু নয় রে রেখা । মন একদম খারাপ করিস না । আমি তো তোর সঙ্গে ইয়ার্কি করছিলাম। যা পড়তে বস্ গিয়ে। বলে অসীম ঘরে ঢুকে গেল।

রেখা পড়ার ঘরে বসে মাথা নিচু করে ভাবছিল অনেক কিছু । রাজুর মতো উঁচদরের মানুষের সঙ্গে রেখা নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে তো । ওর মতো নিজেকে তৈরি করে নিতে হবে। এমনিতেও তো মেয়েদের অনেক কিছু মানিয়েই চলতে হয়। তার উপর আবার অচেনা, অজানা পরিবেশ । তবে রেখার মনে এটাও জেগেছে যে, শুধু মেয়েরাই কেন মানিয়ে চলবে, বিশেষ করে স্বামীর ঘরে ? সব ব্যাপারে কি শুধু মেয়েদেরই দায় ? ছেলেদের কোনো দায় নেই। এ আবার কেমন ধারা নিয়ম। আদি-অনন্তকাল ধরে এই প্রথাই চলছে। তার উপর আবার ওদের গুরুত্ব না দিয়ে, অবজ্ঞা করা হয়, নিগ্রহ করা হয়। কিন্তু রেখার মনে বারবার এই প্রশ্নটাই জাগে—কেন ? মেয়েরা যদি ঘরের লক্ষ্মীই হয়, তবে সে অবজ্ঞার পাত্রী হয় কী করে ? ওদেরই কেন স্বামীর ঘরে হেনস্তা হতে হয় নানাভাবে ? তবে এটা তো ঠিক সুনির্মলবাবুদের পরিবার এরকম কিছুতেই হতে পারে না। রাজুকে খুব অল্প বয়সে রেখা দেখেছে এই নয়নপুর গ্রামে। মধ্যে মধ্যে এখানে কদিনের জন্য বেড়াতে আসত বাবার কাছে। আবছা, আবছা মনে পড়ে তখনকার কথা। শান্তশিষ্ট, ধীরস্থির ছেলে ছিল। এখনও হয়তো বা তেমনই আছে। যেদিন ওদের বাড়িতে এসেছিল, এই তো কিছুদিন আগে, সেদিন তো আর ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলেনি রেখা। তবে এটাও তো ঠিক ছোটোবেলার স্বভাব চরিত্র অনেকটাই বড় হয়েও বজায় থাকে। আর বাবা-মা তো দেখে কথাবার্তাও বলে এল। ওরা, বিশেষ করে, মণিময় তো মানুষ ভালই চেনে। বাবার উপর এই আস্থা রেখার আছে। রেখার মতে এ পৃথিবীতে বাবা হিসেবে, স্বামী হিসেবে, বন্ধু হিসেবে মণিময় হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তার উপরে কেউ নাই। এইরকম বাবার সংস্কারে আচ্ছাদিত হয়েছে ওরা দুই ভাই বোন। মনের অগোচরে কখন যে রেখা রাজুকে ভালবাসতে শুরু করেছে, তা ধরাছোঁয়ার বাইরে। মনেমনে রাজুকেই স্বামী হিসেবে বরণ করে নিয়েছে । এখন ভালয় ভালয় শুভকাজটা সম্পন্ন হলেই হয় । অনেক রাতের পর রেখার চোখে ঘুম নেমে এল ।

সকালের ঘুম ভাঙতে মণিময়ের একটু দেরীই হয় । বাইরে পটলার মার গলার আওয়াজে মণিময়ের আমেজপূর্ণ ঘুমটা ভেঙে গেল । বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে উপভোগ করল ঠান্ডা হাওয়া। এই আবহাওয়া শরীরের জন্য একটুও ভাল নয়, কেননা এটাই হচ্ছে ঋতু পরিবর্তনের সময়। তাই একটা হাল্কা পাতলা চাদর জড়িয়ে নেওয়াই ভাল । মাঠে ধান পাকতে শুরু করেছে । লোকজনের চলাফেরাও কখন আরম্ভ হয়ে গেছে । হঠাৎ শোভাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল মণিময়, কটা বাজে কো গিন্নি ? শোভা চা করছিল, বিরক্ত হয়েই উত্তর দিল, আমি কি ঘড়ি পরে কাজ করছি নাকি ? সাড়ে সাতটা, আটটা হবে হয়তো। মণিময় হেসে ফেলল, ঠিক

আছে, ঠিক আছে, অত চটছ কেন ? আমার চা-টা কি হয়েছে? হলে দিয়ে দাও। বলে মণিময় কলতলায় গিয়ে মুখটা ধুয়ে নিল। শোভা চায়ের কাপটা বারান্দায় টুলের উপর রাখল। রাত ভোর হলেই শোভার রান্নাবান্নার আয়োজন করতে গেলে মেজাজটা একটু চড়েই থাকে। মণিময় সবই বোঝে, কিন্তু কিছু তো করার নেই। তবু তো রেখা এখনও শোভাকে নানা কাজে সাহায্য করেই চলেছে। কিন্তু মেয়েটা শ্বশুর বাড়ি চলে গেলে, তখন কী হবে ! মণিময়ের মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশা আছে। যদি অসীমটাকে বিয়ে করিয়ে ঘরে আরেকটি মেয়ে আনা যায়, তাহলে মন্দ হয় না।

মণিময় চা খেয়ে রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। দেখল শোভা সব্জি কাটছে। তবুও সাহস করে শোভাকে বলল, আমি একটু বেরোচ্ছি। এক্ষুনি চলে আসব। স্কুলে যেতে হবে তো ! শোভা তরকারী কাটা বন্ধ করে জিজ্ঞেস করল, তা হলে এখন আবার কোথায় যাচ্ছ ? মণিময় হেসে উত্তর দিল, উফ্ —তুমি সবই ভুলে যাও। কাল তোমাকে রাস্তায় বললাম না, গিরিজাকে একটা ফোন করে রেখার বিয়ের ব্যাপারে বিস্তারিত জানাতে হবে, তাই এখনি যাচ্ছি। দেখি গিয়ে বুথের থেকে লাইন পাই কিনা। মণিময় পোশাক পাল্টাতে শোবার ঘরে ঢুকল, শোভা উঠে এল পেছন পেছন। মণিময় বুঝতে পারল শোভা কিছু বলতেই এসেছে। শোভা মনে করিয়ে দিয়ে বলল, শোনো, গিরিদাকে বোলো সম্ভব হলে রাজু সম্পর্কে একটু খোঁজখবর নিতে। উনিও তো উকিল। তাই বলছিলাম আর কী। মণিময় গম্ভীর সুরে বলল, এত কথা কী ফোনে বলতে পারব ? তা ছাড়া গিরিজা তো লিলুয়াতে প্র্যাকটিস করে, ও কী করে খবর নেবে বলো তো ? ঠিক আছে তুমি যখন বলেছ তখন আমি নিশ্চয়ই বলব ওকে। বলে পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে গেল। শোভা সবসময়েই রেখার বিয়ের ব্যাপারে একটু সতর্ক। আজকাল গ্রামেগঞ্জে শুধু নয়, শহরেও যা সব ঘটনা ঘটছে ভাবতেও শরীর হিম হয়ে যায়। এমনিতেও উচিত অর্থাৎ প্রত্যেক মা বাবার দায়িত্ব, যতটুকু সম্ভব খোঁজখবর নিয়ে বিয়ে দেওয়া। তারপর তো ঈশ্বরের ইচ্ছে। কোনো মানুষকেই এখন আর বাইরের আচার ব্যবহার দিয়ে বিচার করা উচিত নয়। সমাজে এখন সৎলোকের চাইতে অসৎ লোকের বাস বেশি। কিন্তু বোঝবার কোনো উপায় নেই। তাই শোভা মা হিসেবে ভীষণভাবেই ভীতসন্ত্রস্ত। যদি মেয়েটা শ্বশুরবাড়িগিয়ে কষ্ট পায়, যদি স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হয়, যদি রাগে দুঃখে, অভিমানে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়। তখন কী হবে ! এইসব নানা চিন্তা শোভার মনকে ঘিরে রেখেছে। যারা নিজেরা পছন্দ করে বিয়ে করে ফেলে, তাদের কথা একেবারেই আলাদা। সম্পর্কের পরিচিতিতেই সব জানাশোনা হয়ে যায়। মা-বাবার এত মাথা ঘামাতে হয় না। কিন্তু রেখা ? এই গ্রামে বড় হওয়াতেই হয়তো এইরকম মানসিকতা ওর তৈরি হয়নি। মা-বাবার উপরই ও সব ব্যাপারে নির্ভরশীল। তাই তো শোভার এতো চিন্তা রেখার বিয়ে নিয়ে। তার মধ্যেও তো সংসারের সব কাজকর্ম দায়িত্ব নিয়ে এখনও করেই যাচ্ছে শোভা। আজকাল

শরীরটাও প্রায়ই খারাপ থাকে। ছেলেটাও তেমন কিছু করার সুযোগ পাচ্ছে না। সব মিলিয়েই শোভার চিন্তা সুদূরপ্রসারী। এদিকে হরিমোহনের বাড়িও যাওয়া দরকার। শোভাই যাবে। হরিমোহনের আগ্রহেই তো সম্বন্ধটা এতটা এগিয়েছে। তাই শোভা ভাবছে একদিন গিয়ে লাবণ্যকে সব বলে আসবে। আগে তো লাবণ্যও আসত শোভার কাছে। দুজনে দুজনের মনের কথা বলাবলি করত। এখন আর কোনো যোগাযোগই নেই। হঠাৎ কী মনে হল শোভা রান্নাঘরে চলে গেল। অসীমও বেরিয়ে গেছে ভোরবেলা। রেখা যাবে টিউশনিতে। একটু বাদেই মণিময় ফিরে এল। গিরিজাকে মোটামুটি বিস্তারিতভাবেই জানিয়ে এসেছে। সুনির্মলকে চেনে গিরিজা। মণিময় আসার পর শোভা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করল। মণিময়ের যে স্কুলের সময় হয়ে যাচ্ছে সেদিকে কোনো খেয়াল নেই। একসময় মণিময় বিরক্ত হয়ে শোভাকে খিঁচিয়ে উঠল। স্নানখাওয়া সেরে স্কুলে চলে গেল। শোভা তো মানুষটাকে চেনে। তাই বকুনি খেয়ে একটুও মন খারাপ করল না। নিজেরই দোষ ভেবে মনটাকে সংযত করে রাখল। এই একটা মানুষের উপরই সব দায়িত্ব। বয়স তো মণিময়েরও কম হয়নি। তার উপর আর্থিক অনটনতো আছেই। স্ত্রী হিসেবে শোভারই তো দায়িত্ব, মণিময়কে সব কাজে সাহায্য করা। চিন্তাভাবনায় মানুষটার ভগ্নদশা প্রায়। এক্ষেত্রে অল্পেতেই শোভার রাগ করা কি মানায়?

স্কুলে এখনও কাউকেই কিছু জানায় নি মণিময়। সময় হলে তো অবশ্যই জানাবে। স্কুল ছুটির পর মণিময় উপেন প্রতিদিনই একসাথে বাড়ি ফেরে। স্কুল ছুটির পর যথারীতি মণিময় উপেন স্কুল থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে আসছে। এরই মাঝে দীনু সাইকেল থামিয়ে দাঁড়াল। বলল, আরে স্যার, আপনারা বাড়ি যাচ্ছেন বুঝি ? উপেনের খুব রাগ হল দীনুর উক্তি শুনে, বলল, তা তোমার কী মনে হয় ! সারাদিন পর আমরা কোথাও বেড়াতে যাচ্ছি ? কী যে প্রশ্ন কর না, কোনো মাথামুণ্ডু নেই। দীনু খুব লজ্জা পেয়ে গেল। উপেন যে কূটবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তা দীনু খুউব ভাল করেই জানে। তাই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েই রইল। মণিময় বলল, আরে দীনু -— তুমি কোথায় যাচ্ছ ? দোকানে, তাই না ? দীনু নরম সুরে বলল, হ্যাঁ স্যার —। উপেন মাঝখানে ফোড়ন কেটে বলল, নয়ত আর কোথায় যাবে! খাওয়ার পরে দিবানিদ্রা সেরে এখন যাচ্ছে দোকানে। চল, চল, মণিময় আমরা এগোই। মণিময়ের খুব অস্বস্তি হচ্ছিল উপেনের কথাবার্তায়। দীনুর মতো ছেলের সঙ্গে এই ধরনের কথা বলার ভঙ্গী মণিময়ের মোটেও ভাল লাগল না। তাই মণিময় দীনুকে বলল, দীনু এর মধ্যে একদিন সময় করে আমার বাড়িতে এসো তো ! তোমার সঙ্গে কথা আছে। দীনু সলজ্জ ভঙ্গীতে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। এবং সাইকেল চেপে চলে গেল। উপেনের আচরণ সর্বদাই এইরকম, কখন যে কাকে কী বলে দেবে তার ঠিক নেই। ভদ্রাচার, শিষ্টাচার জিনিসটা তার মধ্যে নেই বললেই চলে।

মণিময় ভেবেছিল উপেনকে কিছু বলবে । কেন তিনি দীনুর সঙ্গে এইরকম ব্যবহার করলেন। কদিন আগেই তো দীনু অঞ্জলি বৌঠানকে ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। এর মধ্যেই উপেনদা সব ভুলে গেলেন ? সামান্য কৃতজ্ঞতাবোধটুকুও নেই । না — কিছু বলে লাভ নেই, তাই মণিময় চুপচাপ হাঁটতে হাঁটতে বাড়িতে গিয়ে পৌছাল । উপেন আবার মণিময়কে যাওয়ার জন্য বলল, সেটা সন্ধ্যের সময় । মণিময় কোনো উত্তর না দিয়েই ঢুকে গেল বাড়িতে। মনেমনে খুব রাগ হল উপেনের উপর । এ আবার কী ধরনের আচরণ ! তাও কী দীনুর মতো ছেলের সঙ্গে । সারা গ্রাম খুজলেও দীনুর মতো সচ্চরিত্র, ভদ্র অমায়িক ছেলে পাওয়া যাবে না। আর উপেন তো একটু উন্নাসিক স্বভাবের লোক । মানুষের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না । তাই মণিময়ও স্থির করেছে রেখার বিয়ের ব্যাপারে আগাম কোনো খবর উপেনকে দেবে না । দিনক্ষণ ঠিক হলেই জানাবে । হরিমোহনের কাছ থেকে জানতে পারলে জানুক । এতে মণিময়ের কিছু আসে যায় না । দীনু যদি আসে এর মধ্যে তবে দীনুর সাথে এ নিয়ে অবশ্যই কথা বলবে । অপরিসীম দায়িত্ববোধ নিয়েই দীনু আছে এ গ্রামে। সেজন্য ওকে সবাই ভালবাসে।

ওদিকে উপেন বাড়ি গিয়ে পৌছালে, অঞ্জলি চা-মুড়িভাজা করে দিল । শরীরের দুর্বলতার জন্য ইচ্ছে থাকলেও অঞ্জলি অন্য কোনো ভাল জলখাবার আর বানাতে পারে না । সাধ থাকলেও সাধ্য নেই। উপেন ঘরে ঢুকেই দেখল শান্তিবালা মানে চম্পার মা বসে আছে । মনে হয় অনেকক্ষণ এসেছে । উপেন আবার স্কুল থেকে ফিরে কাউকে মানে বাইরের কাউকে ঘরে দেখলে খুব বেশি পছন্দ করে না। শান্তিবালার ক্ষেত্রেও উপেনের এই ব্যবহারই প্রযোজ্য হল । নয়নপুরের পুরনো বাসিন্দা শান্তিবালা খুব ভালই চেনে উপেনকে। অঞ্জলি শান্তিবালাকে চা-বিস্কুট দিল। কিন্তু শান্তিবালা কিছুই খেল না । নিরামিষাশী বলে উনি বাইরে কিছুই খায় না। শান্তিবালা দেখল উপেন বেশি গ্রাহ্য করছে না। কিন্তু এসেছে তো উপেনের কাছেই । বিভাসের ব্যাপারে কথা বলতেই । এখন মনে হচ্ছে শান্তিবালার, মণিময়ের কাছে গেলেই ভাল ছিল। যাক এখানে যখন এসেই পড়েছে তখন তো আলাপ করেই যেতে হবে । অঞ্জলি অস্বস্তিবোধ করছিল উপেনের আচরণে । অথচ শান্তিবালা তো অতি পরিচিত মানুষ। অঞ্জলি শান্তিবালার সামনে চেয়ারে বসে চা খেতে খেতে বলল, দিদি — চম্পার খবর কী । খুব সংসারী হয়ে গেছে তাই না ? শান্তিবালা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, হ্যাঁ — তা তো বটেই । মেয়েটা আবার সংসারের ঝামেলায় বড্ড জড়িয়ে পড়েছে গো । আমার কাছে এসে দুদিন থাকার অবকাশটুকুও পায় না। অঞ্জলি কৌতূহলী ভঙ্গীতে বলল, তাই নাকি ? তা ঝামেলা বলছেন কেন ? সংসার তো করতেই হবে। শান্তিবালা মাথা নিচু করে বসে রইল । তারপর অঞ্জলির কথার উত্তরে বলল, ঝামেলা মানে, জামাইয়ের যে প্রাইভেট কোম্পানির চাকরিটা ছিল, সেটা এখন আর নেই গো অঞ্জলি, তাই কয়েকটা টিউশনি করে সংসারটা কোনোমতে চালাচ্ছে । চম্পাও

বাড়িতে বসেই কটা ছেলেমেয়েকে পড়ায় । তাই দিয়েই কোনোমতে চারজনের সংসার চলছে। অদৃষ্টটা আমারই মন্দ, যার জন্য মেয়েটাও কষ্ট পাচ্ছে । আমিও তো নিরুপায়, বলে উঠে দাঁড়াল শান্তিবালা। অঞ্জলি বলল, ওমা, কোথায় যাচ্ছেন । আপনি নাকি আলাপ করতে এসেছেন । তা না করেই চলে যাবেন ? শান্তিবালা বলে উঠল, না, না — বলেই যাব। তুমি ভাই স্যারকে একটু ডেকে দাও না। অঞ্জলি উঠে গিয়ে উপেনকে পাশের ঘর থেকে এ ঘরে নিয়ে এল । উপেন এসে অন্যদিকে তাকিয়ে শান্তিবালাকে বলল, বলুন, কী বলবেন। আমি আবার একটু বাজার করতে যাব। শান্তিবালা ঘোমটা টেনে মাথা নিচু করে বলল, আপনি হয়তো জানেন স্যার, স্কুল থেকে ফুটবল টিম যাচ্ছে ব্যাঙ্গালোর । এর মধ্যে বিভাসের নামও আছে । তাই ..... । উপেন কথা শেষ না হতেই বলে উঠল, সে তো খুব ভাল কথা । এ বিষয়ে কী বলার আছে আপনার। নিজের কিছু টাকাপয়সা খরচ হবে এই যা। শান্তিবালা উপেনকে বোঝাতে গিয়ে বলল, না স্যার । এইগুলো বলতে আসিনি আমি, আমার তো মাথার উপর কেউ নেই । আপনি তো সবই জানেন । তাই একটু বুঝতে এসেছি যে, বিভাসকে পাঠানো ঠিক হবে কিনা। কোনোদিন তো আর নয়নপুরের বাইরে যায়নি । তাই আমার মনে একটু দ্বিধা হচ্ছে আর কী । উপেন জোর গলায় বলে উঠল, আরে না, না আপনি এ ব্যাপারে কোনো চিন্তা করবেন না । তাছাড়া বিভাস তো যথেষ্ট বুদ্ধিবান ছেলে। ওদের টিমের সঙ্গে তো দুজন টিচারও যাচ্ছে । মাত্র তো সাতদিনের ব্যাপার। এই সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত হবে না । এটুকুই আমি বলতে পারি। বলে উপেন চলেই যাচ্ছিল, শান্তিবালা হঠাৎ করে বলে উঠল, তাহলে স্যার, আপনার কথামতোই সব হবে। বিভাসও খুব খুশী হবে। শুনে উপেন স্মিত হেসে পাশের ঘরে গিয়ে বাজারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল । শান্তিবালাও উপেনের সঙ্গে কথা বলে অনেকটাই আশ্বস্ত হল । শান্তিবালার শিবরাত্রির সলতে এই বিভাস । আরেকটি ছেলে থাকা সত্ত্বেও শান্তিবালার আসল সন্তান বলতে ঐ বিভাস । আরেক ছেলে বিকাশ স্বার্থপরের মতো বউ-বাচ্চা নিয়ে সংসার করছে । মা ভাই বোনের কোনো খবর নেওয়ার প্রয়োজন মনে করে না সে । অঞ্জলি মনে মনে খুউব খুশী হল উপেনের সুপরামর্শদানে । অঞ্জলি আশাই করতে পারেনি উপেন এত ভাল সৎ পরামর্শ দেবে শান্তিবালাকে। উপেন তো এদের সঙ্গে ভাল করে কথাই বলতে চায় না । যাই হোক — শান্তিবালার মান রেখেছে উপেন। শুধু শান্তিবালা কেন, অঞ্জলিরও মান রেখেছে। এটুকুতেই অঞ্জলি সন্তুষ্ট । তবে উপেন সবসময়েই বিভাসের কথা বলে । বিভাসকে খুউব পছন্দও করে । শান্তিবালা চলে গেল। উপেন আগেই বেরিয়ে গেছে বাজারের উদ্দেশে। সন্ধ্যা নেমেছে নয়নপুরে। রাস্তাঘাটে লোকজনের চলাফেরা এখনও আছে। আরেকটু বাদেই তা অনেকটাই স্তিমিত হয়ে আসবে। শুধু থাকবে ঝিঁঝি পোকার ডাক, পাতার শিরশির শব্দ। হাল্কা কুয়াশায় প্রকৃতির রূপ কিছুটা হলেও বদলে যায়। রাতের কুয়াশার চাদর সরিয়ে ভোরের আলোয় ফুটে উঠে চাষীদের খুশীর

ছাপ। মাঠে মাঠে ধানের শিসে ফলন চোখে পড়ার মতো হয়ে উঠেছে। মা লক্ষ্মী ওদের ডাকে সাড়া দিয়েছে । ধানের ফলনে সরকার নানাভাবে চাষীদের সাহায্য করেছে সত্যিই । কিন্তু পরিশ্রম ? এসব তো ওদেরই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। চাষী ভাইদের মুখের হাসি আজ নয়নপুর গ্রামে ছাপিয়ে গেছে। অঘ্রানের নবান্ন উৎসব এগিয়ে আসছে। প্রতিটি ঘরে চলবে খুশীর ফোয়ারা। শহরের মানুষ জানতেও পারে না, চাষবাসের জমির ছোঁয়ায় একটি গ্রাম কতটা পরিপূর্ণ রূপ পায়। পায় কতটা প্রাণের পরশ। দেশের অন্ন যারা জোগায়, তাদের কথা কেউ কি ভাবে! তাদের অন্ন কে জোগায়, কেউ কি তার খবর রাখে। অথচ ওরাই হচ্ছে সবচেয়ে দরিদ্রশ্রেণীর লোক। এরাই হয় উপেক্ষিত, অবহেলিত। এই নয়নপুরেও চাষীদের শোষণ, দমন আজও কিছুটা হলেও আছে। এ ব্যাপারে হরিমোহনই ছিল অগ্রগণ্য।

অবাক হবার বিষয় হল যে, হরিমোহন এখন অনেকটাই পাল্টেগেছে । মণিময়ের জন্যই এই অসাধ্য সাধন হয়েছে। কয়েকদিন মণিময়ের সান্নিধ্যে এসে হরিমোহন নিজেকে অনেকটাই শুধরে নিয়েছে। লোভ, লালসা এখন নেই বললেই চলে। হয়তো অনেক অনাচার, দুর্নীতির পর হরিমোহন সৎভাবে জীবন শুরু করতে চায়। কী লাভ এই অসৎ কর্মনিষ্ঠায়, লোভের কবলে পড়ে অসহায় মানুষের অভিশাপ কুড়ানোর ! সৎভাবে কষ্ট করে বাঁচারও অনেক মূল্য আছে । অনেক চাষীদের ধানের গোলায় হানা দিয়ে বস্তা লুট করতে হরিমোহন সামান্য দ্বিধা করেনি । দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে সহায়সম্বলহীন মানুষের কম সর্বনাশ করেনি । আজ হয়তো বা হরিমোহনের মন অনুতাপের আগুনে জ্বলছে । মণিময়ের মতো অতি সজ্জন মানুষও আজ ওর বাড়ি তে আসা যাওয়া করছে। তা হলে কেন নিজেকে পাল্টাতে পারবে না হরিমোহন? হরিমোহন এমনই একটা মানুষ, যার কোনোরকম অপমানবোধ, আত্মসম্মানবোধ ছিল না বললেই চলে। শুধু অর্থই ছিল সবকিছুর ঊর্ধ্বে । কিন্তু কতদিন চলবে এভাবে হরিমোহন ! আজ তার ছেলে রঞ্জনের জন্য মানসিক উদ্বেগ বেড়েই চলেছে । মনেমনে ভাবছে ছেলেটাকে যদি অন্য কোথাও পাঠিয়ে অর্থাৎ প্রয়োজনে একটা ব্যবসা শুরু করালে মন্দ হয় না । কারণ ছেলেটারও তো একটা সংসারের দরকার । নয়ত কোন্ বাবা দেবে এইরকম উচ্ছৃঙ্খল ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে ? কেউ দেবে না। তাই হরিমোহন আজ নিজের কুকর্মের সাক্ষী নিজেই হতে চাইছে । স্ত্রী লাবণ্যকেও কম যন্ত্রণা দেয়নি । কিন্তু আজ লাবণ্যই স্ত্রী এবং মায়ের রূপে সংসারটাকে ধরে রেখেছে । তবে এটাও তো ঠিক এবং সবাই জানেও যে এই হরিমোহন যতই খারাপ হোক না কেন, কিন্তু পিতামাতার প্রতি তার কর্তব্য ছিল চোখে পড়ার মতো । শুধু মা-বাবা কেন, ভাইবোনের জন্য এই মানুষটা অনেক করেছে। সবার কথা ভাবতে গিয়েই হয়তো ছেলেকে নিয়ে ভাববার অবকাশ পায়নি। এখনকার ভাবনাটা তো হচ্ছে সময় হারিয়ে। এই গ্রামের বাসিন্দারা প্রায় অধিকাংশই হরিমোহনের এই পরিবর্তন লক্ষ করেছে । ওদের মতে এও কি সম্ভব ! হ্যা, সম্ভব নয়ই বা কেন ! একমাত্র মানুষই পারে নিজেকে নিজের

নিয়ন্ত্রণে রাখতে, নিজেকে সুপথে চালনা করতে, অসৎ পথের থেকে নিজেকে ফেরাতে। তবে এটা নিশ্চিত যে, হরিমোহনের সদ্‌ভাবনা নয়নপুরকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করতে যথেষ্ট সাহায্য করবে। কারণ হচ্ছে এই যে, হরিমোহন যথেষ্ট প্রভাবশালী। প্রশাসনের বড়বড় পদাধিকারীদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রয়েছে। হরিমোহন নিজের প্রভাব খাটিয়ে চলতে জানে। আশা করা যাচ্ছে হরিমোহনের পরিবর্তনের সঙ্গে নয়নপুর গ্রামের পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। লাবণ্য দেখল হরিমোহন বাইরে ইজিচেয়ারে বসে কী যেন ভাবছে। বেলা ছোটো হয়ে আসছে বলেই হয়তো সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। মশার তাণ্ডবে বেশিক্ষণ বাইরে বসা যাবে না। লাবণ্য গোপালকে ডেকে চা আনতে বলল।

হরিমোহন বুঝল লাবণ্য কিছু জানতে চাইছে। তাই লাবণ্যকে বলল, কী গো দাঁড়িয়ে রইলে কেন? একটা মোড়া নিয়ে এসে বোসো। লাবণ্য অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এ কোন্ হরিমোহন! মনে মনে অত্যন্ত খুশীও হল। কোন্ স্ত্রী না চায় স্বামীর সঙ্গে বসে গল্প করতে! লাবণ্য তাড়াতাড়ি একটা মোড়া নিয়ে এল এবং হরিমোহনের দিকে মুখ করে বসে পড়ল। গোপাল চা নিয়ে এল। লাবণ্য জিজ্ঞেস করল, কী রে, দাদাকে চা দিয়েছিলি? গোপাল আস্তে বলল, কাকে চা দেব, দাদা তো ভাত খেয়েই বেরিয়ে গেছে। হরিমোহন গোপালের কথাটা শুনে লাবণ্যর দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি তো মা, তুমি পার না ছেলের গতিবিধির খবর রাখতে? তুমি কি ভেবেছ, এভাবে চললেই ওর জীবন কেটে যাবে? না গো না — একটা মানুষের জীবনধারা এভাবে চলতে পারে না। তার একটা ভাল ঠিকানা হওয়া দরকার। নয়ত ওকে দেখবেটা কে! বলতে পার! আমরা আর কতদিন! বলে হরিমোহন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। লাবণ্য একটু রুক্ষ কণ্ঠেই বলল, তা তোমার এতদিনে ছেলের জন্য চেতনা হয়েছে? যে কোনো জিনিস হাতছাড়া হয়ে গেলে আর কি ফেরানো যায়? ছেলেটা তো হয়েছে একটা অমানুষের চূড়ান্ত। তুমি ছাড়া ওকে কেউ ঠিক করতে পারবে না। বুঝলে? বলে লাবণ্য চায়ের কাপ নিয়ে চলে গেল। প্রচণ্ড মশার উৎপত্তি এই গ্রামে। বাইরে আর বসে থাকতে পারছে না। তাই হরিমোহন উঠে চলে গেল ঘরের ভিতর। লাবণ্য কাছে এসে বলল, তুমি এখন বেরোবে না? তোমার তো আবার কী যেন একটা মিটিং আছে না? হরিমোহন কৌতূহলী হয়ে বলল, মিটিং! কিসের মিটিং আমি তো জানি না। তুমি কী করে জানলে? লাবণ্য মুখ কাঁচুমাচু করে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। ও বেলা যে জলধর, পাঁচু, ধনঞ্জয় ওরা এসে মিটিংয়ের কথা বলে গেছিল, তা তো হরিমোহনকে বলাই হয়নি। লাবণ্য আমতা আমতা করতে লাগল। তারপর বলেই ফেলল, আমি তো তোমাকে বলতেই ভুলে গেছি। জলধর ওরা এসেছিল, ওরা কয়েকজন অফিসরুমে একটা মিটিংয়ের ব্যবস্থা করেছে, তাই তোমাকে বলতে এসেছিল। তোমাকে নাকি থাকতেই হবে, বিশেষ প্রয়োজন। হরিমোহন শুনে বেশি কিছু বলল না, উৎসাহও দেখাল না। শুধু ভাবল, লাবণ্য সেই আগের মতোই আছে। সবই

ভুলে যায়। আগে তো এই ভুলো মনের জন্য কত যে বকাঝকা করত হরিমোহন তার ঠিক নেই। শুধু এটুকুই বলল লাবণ্যকে, ঠিক আছে—আবার যদি কেউ আসে ডাকতে তাহলেই যাব, নয়ত এ বেলা আর বেরোবই না। যাক লাবণ্য আজ কতদিন পর সারা সন্ধ্যেটা স্বামীর সঙ্গে কাটাবে । ভাবছিলও লাবণ্যর মন খুশীতে ভরে যাচ্ছে । বাইরে মিশমিশে অন্ধকার। মনে হয় অমাবস্যা এগিয়ে এসেছে। জান্‌লা দিয়ে বেশ ফুরফুরে ঠান্ডা হাওয়া আসছে । রাস্তার লাইটগুলো টিমেতালে জ্বলছে । যেন আলোর সাক্ষী বহন করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। প্রায়দিনই বিকেল বিকেল লাবণ্য পাশাপাশি কোনো বাড়ি থেকে ঘুরে আসে, আজ আর বেরোয়নি । জানালায় দাঁড়িয়েই বাইরের দৃশ্য উপভোগ করছে। আরেকটু পরেই হয়তো লোডশেডিং হয়ে যাবে । যদিও হরিমোহনের বাড়িতে ইনভার্টার রয়েছে। তাই লাবণ্যর কোনো অসুবিধা হয় না । গত বছর গরমে কলকাতার থেকে আনিয়েছিল হরিমোহন এবং লাবণ্যর কথা ভেবেই এনেছিল। স্ত্রীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সন্তানের প্রতি কর্তব্য সবই হরিমোহন নিজের গোচরে রেখেই চলে । এ সবের কোনো ত্রুটি হতে দেয়নি সে । লাবণ্যও সবই জানে এবং বোঝেও। অনেক চেষ্টাও করেছে স্বামীকে সুপথে আনতে । সেই চেষ্টাকে হরিমোহনই আঘাত দিয়ে ব্যর্থ করেছে প্রতিবার । এখন বোধোদয় হচ্ছে হরিমোহনের । বয়সের ভারে শারীরিক এবং মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেললে যা হয়, তাই হচ্ছে হরিমোহনের। বিবেক দংশন হচ্ছে, স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে। এ সংসারে স্ত্রী লাবণ্য ছাড়া আর কেউই তার পাশে থাকবে না। তা ছাড়া যার যার কৃতকর্মের ফল তো একটা থাকেই । ভাল কাজের ভাল ফল, খারাপ কাজের খারাপ ফল। দাঁড়িয়ে ভাবছিল, ভাবছিল কখন যে লাবণ্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে । ঠাকুরঘরে প্রদীপ জ্বালাতে হবে । দেখল হরিমোহন টিভি-তে খেলা দেখছে । এখনও কেউ আসেনি হরিমোহনকে নিয়ে যেতে । লাবণ্য মনেপ্রাণে চাইছে, কেউ না এলেই ভাল। লাবণ্য বেরিয়ে চলে গেল ঠাকুর ঘরে । রাতের আকাশ লাবণ্যর কাছে অনেক বড়, কাটতে চায় না । অনেক বিনিদ্র রজনীও পার করেছে লাবণ্য । নিজের জীবনে আলো না থাকুক, ভোরের আলোটুকু দেখার জন্য যেন প্রাণটুকু উথালপাথাল করে । ভোর হলেই ভাবে আবার একটা দিন শুরু হল।

দিনের আলো ফুটতেই মণিময় শোভার মুখেচোখে খুশীর ছাপ পড়েছে। কাল রাতেই অসীমের মোবাইলে গিরিজার ফোন এসেছে । রাজু সম্পর্কে সব ভাল ভাল খবর দিল গিরিজা। এখন বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করতে আর কোনো বাধা রইল না। এতে হরিমোহনের কৃতিত্বও কম নয়। তাই হরিমোহনকে খবর দিতে হবে মণিময়ের বাড়িতে আসার জন্য । সুনির্মলের মোবাইল নম্বর মণিময়ের কাছেই আছে । যত শিগ্‌গির সম্ভব সুনির্মলের সঙ্গে কথা বলে নেওয়াই ভাল। বিবাহের দিন ধার্য করার জন্য সুনির্মলদেরই আসতে বলবে । মণিময়দের পক্ষে যাওয়াটা খুবই অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে । রেখা এল চা নিয়ে। মণিময় - শোভা আমেজ করে চা খাবে

আজ বারান্দায় বসে । শোভার ইচ্ছে করছে সবাইকে চিৎকার করে জানিয়ে দেয় যে রেখার বিয়ে প্রায় ঠিক । এতে সবাই খুশীই হবে হয়তো। কেন না রেখা শুধু শোভা মণিময়ের মেয়ে নয়, নয়নপুরেরও মেয়ে। এই গ্রাম রেখার কাছে মাতৃতুল্য । রেখাও তাই মানে । যাই হোক মণিময়কে অগ্রাহ্য করে শোভা কিছু করার কথা ভাবতেই পারে না । মণিময় এখনও রেখার বিয়ের ব্যাপারে কাউকে কিছু বলার প্রয়োজন মনে করেনি । ঈশ্বরের কৃপায় সব স্থির হলে তবেই মণিময় সবাইকে জানাবে। বিশেষ করে দীনুকেই আগে জানাবে । দীনুকে মণিময় পুত্রবৎ স্নেহ করে। তাই দীনুর স্থান তার হৃদয়ের অভ্যন্তরে। অসীমও এসে বসল মণিময়ের পাশে। শোভার দিকে তাকিয়ে বলল, তা হলে মা, রেখাকে তাড়াবার একটা ব্যবস্থা হতে যাচ্ছে ? শোভা কট্‌মট্‌ করে তাকাল ছেলের দিকে । মণিময় ফিককরে হেসে ফেলল । শোভা তাই দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল । আক্রমণের ভূমিকায় শোভা মণিময়কে বলল, এটা কী হল ? তুমি বাবা হয়ে মেয়েকে তাড়াবার কথায় হাস্‌ছ? তারপরেই অসীমের দিকে রাগের ভঙ্গীতে তাকিয়ে বলল, এই অপদার্থ ছেলে, তোর কি মুখে কিছু আটকায় না রে। বড্ড বেড়েছিস ! অসীম খুউব বিরক্ত হল। বোনকে নিয়ে একটু ইয়ার্কিও করা যাবে না ?
দিন দিন মা যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে । বোন ভাল শ্বশুর বাড়ি যেন পায় । ঈশ্বরের কাছে অসীমেরও তো এটাই প্রার্থনা। শোভা গজ্‌গজ্‌ করতেই লাগল । হঠাৎ অসীম চটে গিয়ে বলল, দেখো মা, সবসময় তুমি এত খিচ্‌খিচ্‌ কর কেন গো, তোমার সঙ্গে আজকাল আর কথা বলে আরাম পাই না । তুমি কি রসিকতাও বোঝ না ? মণিময় শোভার চোখে মুখে এখনও রাগের আভাস দেখতে পেল । তাই ব্যাপারটা হাল্কা করার জন্য অসীমকেই বলল, এই — যা তো এখান থেকে । মার সঙ্গে ইয়ার্কি হচ্ছে ! শুধু শুধু মাকে রাগিয়ে দিলি ! পরিবেশটাই অন্যরকম হয়ে গেল! অসীম মণিময়ের কথায় হাসি হাসি মুখ করল । শোভা মণিময়কে বলল, তুমি আবার ফোড়নও কাটতে জান ! ছেলেকে শাসন না করে, উস্কে দিচ্ছ! দাও, প্রশ্রয় দাও, আমার কী ! বলে উঠে চলে গেল শোভা। রান্নাবান্না সব পড়ে রয়েছে। অসীম মুখ কালো করে বসেই রইল । মণিময়কে বলল, আচ্ছা বাবা, মা অকারণে আমার সঙ্গে এসব করে কেন ? আমি কোনো কথা বললেই রেগে যায় । মণিময়ের খুব দুঃখ হল অসীমের এই অভিমানপূর্ণ কথায়। অসীমের পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, দূর বোকা । এটাও বুঝিস না তোর মা নানা কারণে এখন বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। তাই তাকে কোনো কথাই বলা যাচ্ছে না। অসীম মণিময়ের এইসব যুক্তি মানতে নারাজ। ওর ধারণা, আজ যদি অসীম রেখার বিয়েতে একটা মোটা অঙ্কের টাকা মণিময়ের হাতে দিতে পারত তাহলে হয়তো বা শোভা অসীমের সঙ্গে এইরকম আচরণ করত না । কিন্তু অসীমের তো মা-বাবা দুজনের প্রতি একইরকম ভালবাসার টান রয়েছে। কপাল মন্দ বলেই তো বড় ভাই হয়ে ও আর্থিক সহায়তা কিছুই করতে পারবে না। কী করবে সে, আজকাল কারুর সুপারিশ ছাড়া কোনো কিছুর ব্যবস্থা হওয়া অসম্ভব ।

অসীমের জন্য কে আছে ! কেউই তো নেই । মণিময়ের অবস্থাও এত সচ্ছল নয় যে, ছেলেকে কলকাতায় রেখে কম্প্যুটার ট্রেনিং দেওয়াবে । এখনকার চাকরির বাজারে কম্প্যুটার জানা একান্ত আবশ্যক । অসীমের তো সেটাও জানা নেই । শোভা তো এসব নিয়ে কোনোকালেই ভাবে না। শুধু ভাবে ছেলের চাকরির দরকার। মণিময়কে সাহায্য করার কোনো পথই অসীমের সামনে খোলা নেই । ইন্টারভিউ তো কয়েকটা দিল । সবই কলকাতায় দিয়েছে । কিন্তু কোনোটারই কোনো খবর এখন পর্যন্ত আসে নি । তবুও তো ঈশ্বরের অসীম কৃপা, রেখার বিয়ে প্রায় পাকা হয়ে এসেছে । এতেও তো মা-বাবার প্রচুর শান্তি মিলবে। হয়তো বা এরপর অসীমেরও একটা কিছু ব্যবস্থা হবে। অন্ততপক্ষে নিজের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা তো করতেই হবে। আর বছরখানেক আছে মণিময়ের চাকরি । এইসব ভাবলে অসীম মানসিকভাবে খুউব দর্বল হয়ে পড়ে । মণিময় হঠাৎ অসীমকে ধাক্কা দিয়ে বলল, কী ভাবছিস রে অসীম! একটুও ভাবিস না, সময় হলে সব হবে, আর আমি তো এখনও আছি নাকি ! তা ছাড়া তোর মা চাকুরীর বাজার সম্পর্কে কতটুকু জানে রে ? কিছুই জানে না। রাগের বসে কয়েকটা কথাই বলতে জানে । যা, ঘরে গিয়ে পত্রিকাটা একটু নাড়াচাড়া কর্ । আমি যাব চান করতে । সময় তো হয়ে আসছে ! অসীম মণিময়ের দিকে তাকিয়ে বলল, বাবা — এত তাড়াতাড়ি চানে যাবে কেন ? মোটে তো সাড়ে আটটা বাজে। — মণিময় শান্তকণ্ঠে বলে উঠল, না, রে বাবা - এখন আর তাড়াহুড়ো করে পারি না । তাই একটু আগে থেকেই আস্তে আস্তে প্রস্তুত হয়ে নেই। কর্মক্ষমতা কমে আসছে তো ! অসীম হঠাৎ করে মণিময়কে জাপটে ধরে বলে উঠল, না, বাবা — তোমার মতো মানুষের কর্মক্ষমতা কোনোদিনও কমবে না । কমতেই পারে না। আর আমার বাবা কোনোদিন বুড়োও হতে পারে না। এসব তুমি একদম বলবে না। মণিময় হঠাৎ ছেলের এই শিশুসুলভ আচরণে হকচকিয়ে উঠল। অসীমকে বলল, ছাড় বাবা, ছাড়। আমি বুড়ো হব না তো কী হব? এখনই তো বার্ধক্যের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছি রে বাবা । বয়সকে কি কেউ বাঁধ মানাতে পারে? পারে না । তোর বাবাও একদিন আরও বুড়ো হবে, তারপর একদিন মরেও যাব । আটকাতে পারবি ? পারবি না, যার যখন ডাক আসে, সেই চলে যায়। এবার ছাড়তো অসীম, নয়ত রেগে যাব। বলে হাসতে লাগল মণিময়। ছেলের সঙ্গে এইরকম অন্তরঙ্গ মুহূর্ত মণিময়ের জীবনে অনেক এসেছে । অসীম মণিময়কে ছেড়ে দিয়ে বলল, বাবা — এই মরনটরনের কথা আর কোনোদিন মুখে আনবে না । আমার ভাল লাগে না। বলে অসীম ভিতরে চলে গেল । মণিময় হাসতে লাগল। ছেলেটা সত্যিই বোকা, আধুনিক সভ্যতায় চলার মতো যোগ্যতা ওর একেবারেই নেই । এখনও ছেলেমানুষই রয়ে গেল। ভবিষ্যতে কী করবে কে জানে। মণিময় ভাবল, শোভাকে বলতে হবে, এত বড় ছেলের সঙ্গে যেন এইরকম দুর্ব্যবহার না করে। এর পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে। মণিময় আর না বসে উঠে চলে গেল স্নানের প্রস্তুতি নিতে। রেখা পড়াশুনা করছে। শোভা রান্না শুরু করে

দিয়েছে। পটলার মা এসে কাজ করে দিয়ে গেছে ।

এমন সময় গেট্ দিয়ে জলধর এসে ঢুকল ।এরা গ্রামের গরিব চাষি, মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। এদের কী আর সময়ের জ্ঞান আছে! উঠানে পা দিয়েই চীৎকার করে ডাকতে লাগল, বাবু, ও বাবু বাড়িআছেন নাকি ! শোভা রান্নাঘর থেকে আওয়াজ পেয়ে ছুটে বেরিয়ে এল বাইরে। মণিময় চান করতে চলে গেছে । শোভা মেজাজ দেখিয়ে বলল, এই জলধর, এটা একটা সময়, বাবুর সঙ্গে কথা বলার ? তোদের কি কোনো আক্কেল বলতে কিছু নেই ? জলধর হতভম্ব হয়ে চেয়েই রইল, না বোঝার ভান করে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েই রইল ।রেখা শোভার হৈচৈ শুনে বেরিয়ে এল। রেখাও মণিময়ের মতো ধীর স্থিরভাবে কথা বলতে পছন্দ করে । তাই জলধরের প্রতি মায়ের এই বিরূপ আচরণ রেখার মোটেও ভাল লাগল না ।রেখা শান্তভাবে বলল, তুমি একটু বসে অপেক্ষা করো, বাবা তো চানে গেছেন, এক্ষুনি এসে পড়বেন, এই নাও মোড়াটায় বোসো, বলে রেখা শোভার মুখের দিকে একটু রাগ হয়েই তাকাল। জলধরের প্রতি শোভার এই রুক্ষ আচরণ রেখা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না ।এরা এমনিতেই নিরীহ দর্বল শ্রেণীর লোক। নিশ্চয়ই মণিময়ের সঙ্গে জরুরি প্রয়োজনেই এসেছে । প্রয়োজন তেমন না হলে জলধর কারুর বাড়িতেই যায় না। হরিমোহনের শোষণ, দমন এদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। তার উপর অভাবের তাড়না তো আছেই। গ্রামের অধিকাংশ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের ভদ্রলোক প্রমাণিত করার জন্য জলধরদের মতো লোকদের এড়িয়েই চলে। সহায়সম্বলহীন মানুষদের এরা হেয় চোখেই দেখে। কিন্তু মণিময় ? এইসব তথাকথিত ভদ্রলোকদের চাইতে মণিময় সবসময়েই আলাদা মনোভাব পোষণ করে ।রেখাও তেমনি, একদম মণিময়ের স্বভাবের পুরোটাই পেয়েছে। রেখার খুব দয়ার শরীর। তাই জলধরকে জিজ্ঞেস করল, জলধরদা, একটু চা খাবে ? জলধর হঠাৎ চমকে উঠে, ঘাড় নেড়ে জানায় সে চা খাবে না । মণিময় চান সেরে এসে দেখল জলধর বসে আছে। মণিময়কে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে রইল। মণিময় হেসে বলল, কীরে, জলধর কেমন আছিস ! জলধর উত্তরে বলল, ভালই আছি বাবু। একটা দরকারে আপনার কাছে এস্ছিলাম। মণিময় দাঁড়িয়ে মাথা মুছতে মুছতে বলল, দরকার! কী দরকার রে, বলে ফেল্ তাড়াতাড়ি, আমি তো স্কুলে যাব, তাই সময়টা কম, বুঝলি ? বল্। — জলধর মাথা চুলকাতে লাগল এবং ইতস্তত ভঙ্গীতে বলল, বাবু — আপনে যদি একখানা দরখাস্ত লিখে দ্যান — মানে আমাদের একখানা পাম্প মেশিন দরকার, তাই ব্লক অফিসে দরখাস্তটা জমা দিতে হবে আর কী । তাই ... । মণিময় সবই বুঝল ।কিন্তু এখন সময় নেই বলে জলধরকে বলল, সে আর কী এমন কঠিন কাজ, অবশ্যই লিখে দেব। তবে এক্ষুনি তো পারব না ।আমি ইস্কুলে বসে লিখে রাখব ।তুই সন্ধ্যার পর এসে নিয়ে যাস, কেমন ? জলধর হেসে বলল, ঠিক আছে বাবু, আমি আসব, মাঠাকরুনকে বইলবেন যেন রাগ না করে, আমি বুইঝতে পারি নাই, অসময়ে চলে এসছি।

মণিময় সবই বুঝল জলধরের কথায়। মণিময় একগাল হাসি দিয়ে জলধরকে বলল, যা, বাবা। এখন আর আমি কথা বলতে পারব না ।
মণিময় বুঝল শোভা নিশ্চয়ই কিছু খারাপ কথা বলেছে জলধরকে । রেখা কিছুই বলল না এ ব্যাপারে মণিময়কে। মণিময় খেতে বসে শোভাকে জিজ্ঞেস করল, অসীম কি বেরিয়ে গেছে? তা খেয়ে বেরিয়েছে তো? শোভা অনিচ্ছার সুরে উত্তর দিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, খাওয়াদাওয়া করেই বেরিয়েছে, তবে অনেক সাধ্য সাধনা করতে হয়েছে খাওয়ার জন্য । ওঁর রাগ হয়েছে আমার উপর। ছেলেকে এখন কোনো কথাই বলা যাবে না দেখছি । মণিময় ভাবল এটাই সুযোগ শোভাকে বলার। তাই বলল, কেন বলবে না, নিশ্চয়ই বলবে। তুমি মা। তুমি বলবে না তো কে বলবে! কিন্তু রয়েসয়ে বলবে। শোভা উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, রয়েসয়ে মানে? তোমার প্রশ্রয়ে ছেলেটা উচ্ছন্নে যাচ্ছে। তাছাড়া এত মেপে কথা, আমি বলতে পারব না । তাও আবার নিজের ছেলের সঙ্গে ? অসম্ভব। মণিময় বুঝল এই অল্প সময়ে শোভাকে বোঝানো নিরর্থক । তাই চুপচাপ খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল। মণিময় ভাবছে, রেখার বিয়েতে যদি গিরিজা আসে, তখন গিরিজার সঙ্গেই অসীমের সম্পর্কে আলাপ করবে । যদি গিরিজা কিছু ব্যবস্থা করতে পারে অসীমের জন্য ! সত্যিই অসীমের মতো ছেলেকেও বেকারত্বের জ্বালা সইতে হচ্ছে ? ঈশ্বরের এই কী বিধান । তবে মণিময়ের অঢেল পয়সা থাকলে অসীমকেও বেকার জীবন- যাপন করতে হত না । অন্তত কোনো ব্যবসার কথা তো ভাবতে পারত। মণিময় গর্ব করে বলতে পারে অসীমের মতো সৎ, কর্মনিষ্ঠ ছেলে পাওয়া আজকালকার দিনে দুষ্কর। এটাও কম কথা নয়। যে কোন মা-বাবার সন্তানভাগ্য ভাল হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কজন বাবা-মা এই ভাগ্য পায় ! মণিময় পেয়েছে, ছেলে-মেয়েকে ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার তৈরি করতে পারেনি ঠিকই, কিন্তু সত্যিকারের মানুষ তো হয়েছে ওরা। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হলেই তো আসল মানুষ হতে পারে না । কারণ শুধু পুঁথিগত বিদ্যা 'মানুষ' হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় । তার জন্য চাই নৈতিক চরিত্র গঠন । সহনশীলতা, ন্যায়পরায়ণতাবোধ ইত্যাদি । কটা মানুষের মধ্যে এইসব গুণগুলো লক্ষ্য করা যায় ? খুবই কম সংখ্যক পরিলক্ষিত হয় । মণিময় কোনোদিনই ছেলের জন্য মানে তার চাকরির জন্য অত টেনশন করে না । মণিময় জানে, সময় হলে সব হবে। ঈশ্বর কাউকে অপূর্ণ রাখে না । এইসব চিন্তা ক্ষণিকের। তাই মণিময় পোশাকপরিচ্ছদ পরে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে গেল স্কুলের উদ্দেশে ।
আজ একটু দেরি হয়ে গেছে মণিময়ের স্কুলে পৌঁছাতে । ফার্স্ট পিরিয়ডে মণিময়ের কোনো ক্লাশ ছিল না, তাই সে কমনরুমে গিয়ে বসল । তাড়াতাড়ি হেঁটে আসাতে মণিময়ের একটু টায়ার্ড বোধ হচ্ছিল। তাই ফ্যানটা চালিয়ে বসল । শৈলমাসি এদিক-ওদিক হাঁটাহাঁটি করছিল । হঠাৎই মণিময়কে লক্ষ করল এবং কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, স্যার, জল খাবেন। জল দেব ? মণিময় ইংরাজি বই নিয়ে চোখ বুলাচ্ছিল। মাসির দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, না

মাসি,কিচ্ছু লাগবে না। তুমি আমাকে ডাস্টার, চক এনে দাও । এরপরে আমার ক্লাস আছে তো! তাই। শৈল মাসি মণিময়ের চাহিদা মতো জিনিসগুলো এনে রাখল টেবিলের উপর। মণিময় বলল, মাসি, আমার জন্য তুমি চা করে রেখো । তবে এক্ষুনি নয়, আগে আমি ক্লাসটা সেরে আসি, তারপর, কেমন ?

শৈলমাসি আনন্দে রাজি হয়ে চলে গেল। মণিময় ঘড়িতে দেখল এখনও ক্লাসের দশ মিনিট বাকি আছে । এই ফাঁকে জলধরের দরখাস্তখানা লিখে ফেলতে পারলে ভালই হত। কিন্তু অন্য এক টিচারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আর সময় হল না । টিফিন পিরিয়ডে লিখে ফেলবে । ভাবল মণিময় । মাথার উপর কত কাজের চাপ আসছে সামনে। তবুও মেয়েটার বিয়ে হোক । ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে উঠল মণিময়ের । ক্ষণিকের জন্য মণিময় আবেগাপ্লুত হয়ে উঠল। শোভার কারণে বাড়িতে বসে এইসব সময়ের কথাগুলি ভাববার অবকাশ পায় না । শোভা মণিময়ের চিন্তান্বিত চেহারা সহ্য করতে পারে না । তাই মণিময়কে শোভার সামনে খুব সহজভাবে থাকতে হয় । মেয়েকে নিয়ে শোভার কত স্বপ্ন, কত কল্পনা, তা মণিময়কে পূর্ণ করতেই হবে । বাবার সংসারে অনেক অর্থাভাবের মধ্যেই দিন কাটিয়েছে রেখা। সখ বা সৌখিনতা কোনোটাই রেখার নেই । অতি সাধারণ জীবনের মানে সে বড় হয়েছে । সেই মেয়ে যদি স্বামীর ঘরে গিয়ে সব সখ-আহ্লাদ পূর্ণ করতে পারে, তবে মা-বাবার চাইতে আর কে বেশি খুশী হবে! মণিময় জানে না । আসলে রেখার জন্য ঈশ্বর কী বিধান লিখে রেখেছেন, কিন্তু বাবা হিসেবে তো মনে সাধ জাগতেই পারে । মেয়েটা অনেক বেশি শান্তিতে জীবনটা কাটাক। বাবার স্নেহ, মায়ের আদর শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে যেন পায় । এসব ভাবতে ভাবতে মণিময়ের চোখ জলে ভরে গেল। মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিল । শৈলমাসি এসে শুধাল, স্যার ক্লাসে যাবেন না ? মণিময় সংক্ষেপে উত্তর দিল, হ্যাঁ — যাচ্ছি মাসি, যাচ্ছি। বলে চলে গেল। স্কুলছুটির ঘণ্টা বাজছে। বেলা পড়ে এসেছে । নয়নপুরের রাস্তাগুলি মোটেও চলার উপযুক্ত নয় । অন্ধকারে গ্রামবাসীদের খুব সমস্যা হয়। স্কুলের সামনের রাস্তাটা শুধু পিচ্‌ঢালা রাস্তা। বাকি রাস্তাগুলো মরা এঁদো গলির মতন্ । এক পশলা বৃষ্টিতেই কর্দমাক্ত হয়ে যায় । প্রশাসনে অনেক কাঠখড় পুড়িয়েও কোনো সংস্কারের পথ আজ পর্যন্ত বেরোয়নি। তাই তো জনগণের রায় হচ্ছে — প্রশাসন নড়বড়ে। গ্রামের কিছু মাতব্বর গোছের লোকদের নিয়ে হরিমোহন বি.ডি.ও. সাহেবের সঙ্গে দেখা করে রাস্তা সংস্কারের জন্য অনুরোধ করে এসেছিলেন । তাইই হয়তো বি.ডি.ও. পীযূষ দত্ত সাহেব এসেছেন রাস্তাঘাট দেখার জন্য। সঙ্গে আছে আরও দু-চারজন অফিসার। আছে গাঁওপ্রধান হরিমোহন। হরিমোহনই একমাত্র পারে, কীভাবে প্রভাব খাটিয়ে কাজ আদায় কবা যায়। রাস্তাগুলো ঠিকঠাক হলে

নয়নপুরের মানুষ অবশ্যই উপকৃত হবে । দক্ষ প্রশাসক হিসেবে পীযূষ দত্তের মোটামুটি সুনাম আছে। তাই আশা করা যাচ্ছে রাস্তাঘাট সংস্কারের নামে কোনো প্রহসন হবে না। আগের বি.ডি.ও.-র কাছে গিয়েও গ্রামবাসী অনেকরকম চেষ্টা করেছে, শুধু রাস্তা মেরামতি ছাড়া অন্যান্য সাহায্য চেয়েও কোনো লাভ হয়নি। কেন না তিনি মোটেও দুর্নীতিমুক্ত ছিলেন না । মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ আমলাদের পদলেহন ছাড়া উনি কিছুই জানতেন না । কিন্তু পীযূষ দত্ত সেরকম নয় । যথেষ্ট দায়িত্বশীল, সৎ, কর্মনিষ্ঠ, কতর্ব্যপরায়ণ তো বটেই । তাই হরিমোহনও কাজের কথা ছাড়া এই বি.ডি.ও. সাহেবের ধারেকাছে বেশি ঘেঁষতে পারে না । প্রশাসনিক কাজকর্মেও মাথা ঘামাতে পারে না । তবে এটা সত্যি হরিমোহনের জন্যই প্রশাসন নড়েচড়ে বসেছে । এর আগেও নয়নপুরে রাস্তাঘাট নির্মাণ নিয়ে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে । কোনো কাজই হয়নি, গ্রামের লোকেরা জানে। কিছু না হওয়ার পেছনে কার হাত ছিল! ভয়েও কেউ মুখ খোলেনি। হরিমোহনের এই সমস্ত অনৈতিক কার্যকলাপ গ্রামের উন্নতিতে শুধু বাধাই সৃষ্টি করেছে । তবে এবার কিন্তু হরিমোহনের কার্যকারিতায় নতুন কিছু লক্ষ করা যাচ্ছে। মানুষটা আসলে অনেকটাই বদলে গেছে । এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই । এটাও তো সত্যি যে, যে কোনো খারাপ লোক ধীরে ধীরে পরিস্থিতির বিবেচনায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে শুধরে নিতে পারে। হরিমোহনের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে । নিজের জীবনধারায় হয়তো নিজেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল । কত আর দুর্নীতির পথে চলা যায় । ন্যায়ের পথে চলে দেখাই যাক না। হয়তো হরিমোহনকে এইসব ভেবে অনেকটাই গোবেচারা টাইপের হয়ে গেছে । দ বুদ্ধিসম্পন্ন হরিমোহন আগেও ছিল শান্তশিষ্ট, কিন্তু যথেষ্টই মতলববাজ ছিল । দুষ্টুবুদ্ধি দিয়ে নিজের স্বার্থোদ্ধারে হরিমোহনের জুড়ি ছিল না । তার সঙ্গী ছিল এই গায়েরই কিছু ধড়িবাজ, অর্থলোভী লোক। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল যে এখন এইসব লোকদের হরিমোহন একরকম এড়িয়েই চলে। ওদের নিয়ে মিটিং, মিছিল সব বন্ধ করে দিয়েছে ।

হরিমোহন আজকাল একটু অন্যমনস্কই থাকে । বি.ডি.ও. সাহেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তাঘাট পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি হরিমোহনকেও লক্ষ করছিল । এই লোকটার এত পরিবর্তন কেন ! হঠাৎ উনি হরিমোহনকে সহজভাবে বলল, কী ব্যাপার, হরিমোহনবাবু, আপনি কিছুই বলছেন না, কিছু বলুন । আপনি তো এ গ্রামের মাথা, তাই না ? হরিমোহন চমকে উঠল । বলল, না, না, আমি কেন গ্রামের মাথা হতে যাব। এখানে আমার চাইতে অনেক বেশি শিক্ষিত সজ্জন মানুষও আছে। আপনি হয়তো ওদের চেনেন না, কিন্তু গ্রামবাসীরা তো চেনে । আমি তো নামেই গাঁওপ্রধান। এই বিশিষ্ট মানুষদের জন্যই এই গ্রাম উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে । হরিমোহনের এই বিনয়ীভাব দেখে বি.ডি.ও. সাহেব মিটিমিটি হাসতে লাগল । হরিমোহনের কথায় মনটাও ভরে গেল। হরিমোহন তার নিজস্ব ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা স্যার, কবে পর্যন্ত কাজ শুরু হতে পারে ? আপনি হুকুম করলে তো কাল থেকেই শুরু হতে পারে স্যার ! আপনার

হাতেই তো সব। বি.ডি.ও. পীযূষ দত্ত হরিমোহনকে নিরাশ না করে বলল, হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন, অনেকটাই ঠিক। কিন্তু এ মাসের শেষ ছাড়া কাজ আরম্ভ করা যাবে না। কেন না পাশের গ্রামের রাস্তা অলরেডি আরম্ভ হয়ে গেছে । ঐ কাজটা মাঝামাঝি অবস্থায় এলে, এই কাজটা শুরু করতে হবে । তাছাড়া আমাকে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট-এর সঙ্গে দেখা করে এই ফাইলটা প্রসেস করার ব্যবস্থা আগে করতে হবে। তারপর ..., বলে হাঁটতে লাগল বি.ডি.ও. সাহেব । হরিমোহন বলল, ঠিক আছে স্যার । আপনি কি চলে যাচ্ছেন ? পীযূষ দত্ত গাড়ির কাছাকাছি গিয়ে বলল, হ্যাঁ—সবই তো দেখলাম। এখন আমাকে অফিসে ঢুকে কিছু কাজকর্ম সারতে হবে, মানে কয়েকটা ফাইল দেখতে হবে, ডাকের চিঠিপত্রগুলো দেখতে হবে । তারপর বাড়ি যাব, হ্যাঁ আরেকটা কথা — এর মধ্যে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে লোক আসবে রাস্তা মাপজোঁক করার জন্য। আপনি সেসময় উপস্থিত থাকবেন এবং ওদের সাহায্য করবেন। ঠিক আছে? বলে সবাইকে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল । হরিমোহন গাড়ির দরজার সামনে গিয়ে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার—অবশ্যই করব। শুধু কাজটা যাতে তাড়াতাড়ি শুরু হয়। আপনি দয়া করে সেটা চেষ্টা করবেন। বি.ডি.ও. সাহেব চলে গেলেন।

হরিমোহনের অভিপ্রায় একটাই, রাস্তাটা যদি রেখার বিয়ের আগে হয়ে যায়, তবে বরকনে আনা নেওয়ার জন্য খুব সুবিধা হবে। তখন তো মণিময় স্যারের গেটের সামনেই গাড়ি যাবে। গাড়ি এখনও যায়, কিন্তু এত এবড় থেবড় রাস্তায় গাড়ি ঢোকানো খুবই বিপজ্জনক। যে কোনো সময় পাশে ধানের ক্ষেতে গাড়ি পড়ে যেতে পারে। হরিমোহনকে এখন এই উদ্ভট চিন্তায় পেয়ে বসেছে। রেখার বিয়ে যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় এটাই মনেপ্রাণে চাইছে হরিমোহন। পাশাপাশি এটাও ভাবছে, নিজের উচ্ছন্নে যাওয়া ছেলেটাকে যদি কোনোভাবে সুপথে আনা যায়, তাহলে তো ওরও একটা সংসার পাতিয়ে দেওয়া হরিমোহনের কতর্ব্যের মধ্যেই পড়ে। হরিমোহন খুউব ভালই জানে, তার ছেলে রঞ্জনেরও এই গ্রামে কোনদিকেই সুনাম নেই। এখানকার নব্বই শতাংশ মানুষই ওকে পছন্দ করে না। বদ্‌মেজাজি, অহঙ্কারী, মস্তান টাইপের ছেলে এই রঞ্জন। পড়াশুনোও সম্পূর্ণ করতে পারেনি । লাবণ্য কোনোদিনই ছেলেকে প্রশ্রয় দেয়নি। কিন্তু হরিমোহন! তার অন্যায় আদরে রঞ্জন আজ উচ্ছৃঙ্খলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। তাকে সুপথে ফেরানো খুবই শক্ত কাজ। সেটা হরিমোহনের পক্ষে আদৌ সম্ভব হবে কিনা, তা হরিমোহনও হলফ করে বলতে পারে না। তবে চেষ্টা তো করতেই হবে। লাবণ্য ছেলের এই অন্যায় আচরণের অনেক প্রতিবাদ করেছে, কিন্তু হরিমোহনের মদতে তা কোনোদিনই সফলতা পায়নি। মা হিসেবে লাবণ্য যতটুকু চেষ্টা করার করেছে । কিন্তু আজ ! আজ লাবণ্য সেই পথ থেকে সরে এসেছে । দিনেদিনে বুঝতে পেরেছে — এই ছেলেকে সামলানো তার পক্ষে সম্ভব নয় । রঞ্জনের বেপরোয়া চালচলনে লাবণ্যের মাতৃত্ববোধে কতবার যে আঘাত হেনেছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই । লাবণ্য মনে করে এটা তার জীবনের একটা কালো

অন্ধকার। সন্তানের সুখ তার কপালে নেই। এই কথাটা আজ ভাবছে হরিমোহন । পিতৃস্নেহ রঞ্জনকে ভাল পথে না নিয়ে, সর্বনাশের পথে ঠেলে দিয়েছে।

বি.ডি.ও. সাহেব চলে যাওয়ার পর হরিমোহন বাড়ি চলে এল । খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে । সন্ধ্যা হয়ে গেছে । লাবণ্য ঠাকুরঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে পুজো করছে। হঠাৎ হরিমোহনের নজরে পড়ল রঞ্জন ফিট্‌ফাট্‌ হয়ে বেরোবার প্রস্তুতি নিচ্ছে । সাধারণত সে সন্ধ্যের অনেক আগেই বেরিয়ে যায়। পরনে জিন্‌সের প্যান্ট — টী শার্ট — ঘাড় পর্যন্ত চুলের বোঝা, হাতে আবার বালাও আছে । এই সুযোগ হরিমোহনের । ওর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলার । তাই সামনে এগিয়ে গিয়ে বলল, এই, তুই একটু আমার ঘরে আয় দিকিনি । কথা আছে। বলে হরিমোহন নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াতেই রঞ্জনের কর্কশ উক্তিতে থমকে দাঁড়াল। কেন, এই সময় আবার তোমার কী কথা মনে পড়ল। আমার সময় নেই। পরে হবে কথা। হরিমোহন নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে নিল, একটুও রাগ না করে বলল, আয় না তুই । বেশিক্ষণ লাগবে না। কাজের কথাই বলব, আয়। বলে হনহন করে হরিমোহন ঘরে গিয়ে ঢুকল । পাখা চালিয়ে বিছানায় বালিশে হেলান দিয়ে বসে পড়ল। রঞ্জনও এসে ঢুকল । দামী পারফিউমের গন্ধে ঘর ভরে গেল। রঞ্জন ঘনঘন ঘড়ি দেখতে লাগল । বাবাকে বলল, বলো, যা বলার তাড়াতাড়ি বলবে । তোমাদের প্যানপ্যানানি আমার ভালো লাগে না। হরিমোহন তবুও ধৈর্য হারাল না। আগের দিন থাকলে হয়তো বা ছেলেকে জুতো পেটা করত। কিন্তু হরিমোহন কোনোটাই করল না। হাঁ করে তাকিয়ে রইল ছেলের দিকে। এই তার ভবিষ্যতের কাণ্ডারী ! শান্তভাবে ছেলেকে বসতে বলল। ততক্ষণে লাবণ্য কিছু একটা হচ্ছে বুঝতে পেরে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে । আজ কী এমন কথা বলবে হরিমোহন ছেলেকে । শোনাই যাক না, সময় থাকতে তো ছেলেকে কোনোদিন শাসন পর্যন্ত করেনি । লাবণ্য কিছু বললে, লাবণ্যর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত । উল্টোপাল্টা বকাবকি করত । লাবণ্য ঠিকই বুঝতে পারল, পরিবর্তনের লক্ষ্যেই আজ হরিমোহন ছেলেকে কাছে ডেকে দুটো কথা বলতে চাইছে। রঞ্জন বসল না। অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করতে লাগল । হরিমোহন অবশেষে বলল, আচ্ছা রঞ্জন — অনেক তো হল, এবার নিজেকে শুধরে নেওয়ার পথটা বের করে নে না রে । আমি আর তোর এই সমস্ত বেপরোয়া চালচলন সহ্য করতে পারছি না । বাবা, কী করবি বল্‌, আমি তোকে সবরকম সাহায্য করব । রঞ্জন ভীষণভাবে অবাক হয়ে তাকাল বাবার দিকে, এ কে কথা বলছে ! এই কি তার বাবা ? রঞ্জন কিছু না বোঝার ভান করে বলল, মানে ? তুমি যে কী বলতে চাইছ । আমি তো তার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। আরেকটু সহজ করে বল তো। এত ইনিয়ে বিনিয়ে বলার কী দরকার। হরিমোহন বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছেলের কছে গিয়ে দাঁড়াল, আর কাতর কণ্ঠে বলল, বুঝতে পারছিস না, না কি বুঝতে চাইছিস না ? কোন্‌টা বল দিকিনি রঞ্জু ! রঞ্জন ক্রমশই উগ্রতার দিকে যাচ্ছে হরিমোহন বুঝতে পারল।

হরিমোহনের কথাকে পাত্তা না দিয়ে বলে উঠল, দেখো বাবা, ঠিক করে কথা বলতে পারলে বলো, নয়ত আমি চললাম, বলে চলে যাবার জন্য উদ্যত হতেই হরিমোহন তার হাতটা ধরে ফেলল। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। চোখ রাঙিয়ে বলে উঠল, এত তাড়া কীসের তোর ? কোন রাজকার্য করতে যাচ্ছিস যে, আমার কথাগুলো ঠিকভাবে শোনার তোর সময় নেই ! বাপের হোটেলে খাওয়া আর বাইক নিয়ে ঘোরা ছাড়া আর কী কাজ আছে তোর । তোর লজ্জা করে না। এতখানি বয়স হয়েছে তবুও নিজের ভবিষ্যতের চিন্তা কিছুই করছিস না! ব্যাপারটা কী — এভাবে কতদিন চলবে ? রঞ্জন থতমত খেয়ে গেল বাবার এইসব উক্তিতে । কোনোদিনই তো হরিমোহন ছেলের সঙ্গে এইরকম রুক্ষভাবে কথা বলেনি। লাবণ্য বাইরে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছিল পিতা-পুত্রের কথোপকথন। রঞ্জন আঁচ করতে পারল কিছু একটা হয়েছে । রঞ্জন হকচকিয়ে গিয়ে বলল, কেন বাবা, তুমি তো কোনোদিন বল নি আমার ভবিষ্যতের চিন্তা আমাকেই করতে হবে ! আজ বলছ কেন বুঝতে পারছি না। হরিমোহন থামল না, আবারও বলল জোর গলায়, কিছু বুঝতে পারছিস না, তাই না ? তাহলে শোন্ — এই যে উপেন স্যার-এর ছেলে অলক কলকাতায় একটা লেদার কোম্পানিতে চাকুরী জুটিয়েছে, সে তো নিজের চেষ্টায়ই, মণিময় স্যার-এর ছেলে অসীম একটার পর একটা ইন্টারভিউ দিয়েই যাচ্ছে মানে চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছে, থেমে নেই কেউই। আর তুই ? তুই, তুই কিনা নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছিস ! রঞ্জন উত্তরে বলল মাথা নিচু করে, আমি কী করব । আমার তো কোনো ডিগ্রিও নেই যে চাকরির চেষ্টা করব । আর তাছাড়া হঠাৎ করে এসব বলার কারণটা কী ? হরিমোহন নিরুত্তর । উত্তর দেবার প্রয়োজন মনে করল না । বারান্দা থেকে লাবণ্য এসে ঘরে ঢুকল। হরিমোহনের উত্তেজনা চরমে পৌঁছে গেছে। এই বয়সে এত উত্তেজনা মোটেও শরীরের জন্য ভাল নয়। তাই লাবণ্য স্বামীর কথা ভেবেই সাহস করে ঘরে ঢুকে পড়ল। এই ছেলেকে দিয়ে কিছু হবে বলে লাবণ্য মোটেও মনে করে না । তবুও হরিমোহনের যে এতদিনে ছেলের ব্যাপারে সম্বিৎ ফিরেছে — এটাই যথেষ্ট । এটাও লাবণ্যর ঠাকুরকে ডাকারই ফল । ঈশ্বরেরই কৃপা, হরিমোহনের সুমতি হয়েছে । লাবণ্যকে দেখে হরিমোহন আশ্বস্তবোধ করল। এই লাবণ্য হরিমোহনের কারণে ছেলের কত অত্যাচারই না সহ্য করেছে। হরিমোহন লাবণ্যকে বলল, তুমি, ছেলেটাকে একটু বোঝাও। এভাবে বেশিদিন চলতে পারে না। আমার কথার অবাধ্য হলে, আমি ওকে ত্যাজ্যপুত্র করে দেব। লাবণ্য ধীর স্থিরভাবে বলল, তোমার কথার অবাধ্য তো রঞ্জু হয়নি! তোমার কথামতো চলেছে বলেই তো আজ ও এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে । এখনও তোমাকেই সামলাতে হবে। আমি ওর কে হই যে আমি বোঝালেই, ও বুঝবে। হরিমোহন লক্ষ করল লাবণ্যর কণ্ঠে অভিমানের সুর। রঞ্জন এককোণে দাঁড়িয়েই রইল । হরিমোহনের হঠাৎ কী হয়েছে বুঝতে না পেরে সে মায়ের শরণাপন্ন হল। মাকে বলল, আচ্ছা মা, বাবার কী হয়েছে গো ? কোনোদিন তো আমাকে নিয়ে ভাবতে বাবাকে

দেখিনি। তবে আজ হঠাৎ কী হল! লাবণ্য ছেলের কথার কোনো উত্তর দেওয়ারই প্রয়োজন মনে করল না । রঞ্জন আবার লাবণ্যকে একই প্রশ্ন করল । কিন্তু লাবণ্য একদম নিশ্চুপ হয়ে বসে রইল। কোনো সাড়াশব্দ নেই দেখে হরিমোহন বলে উঠল, আমার কিছুই হয়নি। আমার কথা তোকে ভাবতে হবে না, তুই তোর নিজের কথা ভাব্, বলে হরিমোহন দরজায় দাঁড়িয়ে গোপালকে ডেকে বলল এক কাপ চা দিয়ে যেতে। কথা বলতে বলতে গলা শুকিয়ে গেছে । আবার গিয়ে বসল লাবণ্যর পাশে, বিছানায়। রঞ্জন ঠায় দাঁড়িয়েই রইল, টেবিলের ওপর রাখা জলের গ্লাস নিয়ে জল খেল । তারপর বলল হরিমোহনকে, তা না হয় ভাবব, কিন্তু কী করার কথা ভাবব। ব্যবসা করতে গেলেও তো টাকা লাগবে। তুমি দেবে তো? হরিমোহন হেসে ফেলল, বলল, আমি না দিলে তোর কোন্ বাপ দেবে, বল্ তো! লাবণ্যর এই ধরনের কথা কোনোদিনই পছন্দ নয়। তাই ভ্রূ কুঁচকে তাকাল হরিমোহনের দিকে। রঞ্জন তো অভ্যস্ত বাবার এই ধরনের উক্তিতে । সে গ্রাহ্যও করল না। হরিমোহনকে বলল, আমি বলি কী, তুমি তো অনেক জায়গায় যাও, অনেকের সঙ্গে তোমার চেনাজানা আছে, তুমিই খোঁজ নাও না , কী ধরনের ব্যবসা আমার জন্য উপযুক্ত । কত টাকা লাগবে, টাগবে । তবে একটা কথা আমি না বলে পারছি না বাবা। বলব? হরিমোহন গম্ভীর হয়ে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ — আমার স্বার্থেই আমি খোঁজ নেব । অমানুষকে তো মানুষ করার চেষ্টা করতে হবে! আর কী যেন একটা বলছিলি, বলে ফেল্, বলে হরিমোহন তাকিয়ে রইল ছেলের দিকে উত্তরের আশায়। রঞ্জন বলল, কথাটা হচ্ছে এই যে - আরও আগে কেন ভাবনি আমাকে নিয়ে? তা হলে তো এতদিনে আমি একটা না একটা রোজগারের পথ বের করে নিতে পারতাম। তাই না? লাবণ্য মনেমনে ছেলেকে সমর্থন জানাল। লাবণ্যর দৃঢ় বিশ্বাস মায়ের আদর্শে বড় হলে আজ ছেলের এইরকম পরিণতি হত না। তাই দুর্ভাগ্যবশত রঞ্জন বরাবরই মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েই আসছে। কেন-না লাবণ্য কোনোদিনই অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করতে শেখেনি। তাই ছেলের বেলাতেও অন্যথা কিছু হয়নি । শুধু ঈশ্বরকে স্মরণ করে আসছে স্বামী পুত্রের জন্য। তিনিই যা করার করবেন। ছেলের কথার রেশ টেনে ভাবল সত্যিই তো — হরিমোহনের ভাবনা অনেক দেরিতে উদয় হয়েছে। তাও সময় হারিয়ে। তবে হ্যাঁ। রঞ্জন নিজে যদি নিজেকে বদলাবার চেষ্টা করে, তাহলে ঈশ্বরও তাকে অবশ্যই আশীর্বাদ করবেন। নিজের ভুল বুঝতে পারে যে মানুষ, সে পরমপিতার কাছে অবশ্যই ক্ষমাযোগ্য হয়ে ওঠে। গোপাল এসে চা দিয়ে গেল হরিমোহনকে । চা-টা খেয়ে নিল হরিমোহন এবং তৃপ্তিবোধ করল। লাবণ্য হরিমোহনকে বলল, তোমাদের আলাপ আলোচনা শেষ হয়েছে, নাকি আরও চলবে ? হরিমোহন বুঝতে পারল লাবণ্যর টি ভি সিরিয়াল দেখার সময় হয়ে যাচ্ছে। তাই এই প্রশ্ন । হরিমোহন কৌতুক ভঙ্গীতে বলল,

শেষ যদি নাও হয়, মানে আমি যদি আরও কথা বলি তা হলে তুমি রঞ্জুর ঘরে গিয়ে দেখবে টি.ভি. । কেমন! লাবণ্য বিরক্ত হয়ে বলল, না, আমি আমার ঘরের বসেই টি.ভি. দেখব। অন্য কোথাও যাব না । কথা বাকি থাকলে তোমরা চলে যাও ঐ ঘরে । আমি ঐ ঘরে এমনিতেও ঢুকি না। বলে লাবণ্য বসে পা নাড়তে লাগল । ভাল লাগছে না লাবণ্যর । সিরিয়ালগুলি দেখতে পারবে কিনা কে জানে । যেমন ছেলে, তেমনি তার বাবা । ধৈর্য ধরে বসে রইল । রঞ্জন মা-র দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল। হরিমোহন রঞ্জনের দিকে তাকিয়েই বুঝল লাবণ্য এক্ষুনি ফেটে পড়বে, তার আগেই ব্যবস্থা নেওয়া দরকার । হরিমোহন তাই ছেলেকে বলল আড়ালে ডেকে নিয়ে, এখন তোর ঘরে যা তুই—এখন আর কোনো কথাবার্তা হবে না। কাল আবার বসব আলাপ-আলোচনা করতে। রঞ্জন মুচকি হেসে হরিমোহনের দিকে তাকিয়ে ভাবল — বাঃ, বাবা ভয় পায় মাকে। আশ্চর্য সব ঘটনা ঘটছে আজকাল। যাই হোক কোনো কথা না বলে রঞ্জন ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল নিজের ঘরে । লাবণ্য দরজার দিকে তাকিয়ে রইল । ভাবল — হরিমোহনই হয়তো পারবে রঞ্জনকে কিছুটা পথে আনতে । আজ হয়তো আর বেরোবে না রঞ্জন । এসব কথাবার্তা যে কোনো মানুষের মনেই একটু হলেও সাড়া জাগাবে। সেইজন্য রঞ্জনের মনেও একটু একটু ঝড় বইবে বৈকি । তাই হয়তো বাইরে বেরোবার মনোবাসনা আর নেই রঞ্জনের। এভাবে যদি ধীরে ধীরে ছেলেটার একটু একটু বুদ্ধি বিবেচনা হয়, তা হলে মা বাবার চাইতে আর কেউ বেশি খুশী হবে না। লাবণ্যের ঈশ্বরের উপর পুরো বিশ্বাস রয়েছে। তিনিই যা করার করবেন। লাবণ্য টি.ভি. খুলে সিরিয়াল দেখতে বসল । হরিমোহন ইজিচেয়ারে শুয়ে পত্রিকা পড়ছে আর ভাবছে, জীবনের অন্তিম অধ্যায়ে এসে পারবে কি এইসব জটিল সমস্যার সমাধান করতে ! তবে এটা তো সত্যি লাবণ্য সর্বদাই ভালকাজে হরিমোহনের পাশে থাকবেই। এরই ফাঁকে লাবণ্য গোপালকে ডেকে বলল ভাত বসাতে আর ফ্রিজ থেকে তরকারিগুলি বের করে গরম করে নিতে। হরিমোহন জানে স্বামী সন্তানের সেবা যত্নের কোনো ত্রুটি রাখে না লাবণ্য। শুধুমাত্র ছেলের অভব্য আচরণগুলি লাবণ্য সইতে পারে না। সেইজন্যই ছেলের সঙ্গে প্রয়োজনাতিরিক্ত কথা লাবণ্য বলে না। পাড়াপ্রতিবেশী জানুক, শুনুক এটা সে কোনোমতেই চায় না। তাই বোবা হয়ে থাকা সবচেয়ে ভাল বুদ্ধি বলেই মনে করে লাবণ্য।

অনেক রাত হয়েছে। রাতের আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটায় একটা ভ্যাপসা গরম বোধ হচ্ছে। বৃষ্টি হলে ভালই হত । বিছানায় যাওয়ার আগে রোজই লাবণ্য বিছানার পাশে জানালার কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়ায় । যেখান থেকে গ্রামের অন্ধকার গলি, মাঠ, ঘাট, ডোবা, নালা, কিছু বাড়ি-ঘর, মোটামুটি সবই দেখা যায় । পূবের আকাশে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কালো মেঘের হাতছানি । আকাশে কয়েকটা তারা জ্বলজ্বল করছে । হেমন্তের আকাশে ঐ কটা তারা যেন

দীপ জ্বালিয়ে অন্ধকারকে আলো দেখাচ্ছে । অমাবস্যার তিথি বলেই আজ এ ধরায় প্রকট অন্ধকার নেমে এসেছে । ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক, শুকনো পাতার ঝরে যাওয়ার শব্দ যেন লাবণ্যর প্রাণে শিহরণ জাগাচ্ছে। হরিমোহন অঘোরে ঘুমুচ্ছে । জানালা দিয়ে ঠান্ডা ফুরফুরে হাওয়া ঢুকছে । লাবণ্য গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল এবং বেড্‌স্যুইচ্‌ টিপে লাইটটা নিবিয়ে দিল। ভাবতে লাগল - ছেলেটা ঘুমিয়েছে কিনা । মনে তো হয় না । কারণ ওর ঘর থেকেই তো টি. ভি. -র আওয়াজ আসছে। রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করার আওয়াজও এল। গোপালটাও তা হলে এই মাত্রই শুয়েছে । নিঝুম, নিস্তব্ধ নয়নপুর যেন কাতর ঘুমে জড়িয়ে পড়েছে।

ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়তেই আকাশের কালো মেঘ ধূসর হয়ে গেল। পথে ঘাটে লোকের ব্যস্ততা, কর্ম প্রসার, মাঠে মাঠে চাষীদের ব্যস্ততায় খুশীর ছাপ দেখা যাচ্ছে। সারাদিনের খাদ্যান্বেষণে বাজারের দিকে জনস্রোত যেন এই গ্রামেও চোখে পড়ার মতো । আগে অতটা ছিল না মানুষের কলরব । এখন ক্রমশ বেড়েই চলেছে । এতে অন্তত পক্ষে এটুকু আন্দাজ করা যায় ভারতবর্ষে জন্মের হার কতটা বেশি । আগে নয়নপুরে লোকালয় বলতে ছিল স্কুলের পাশে দক্ষিণ পাড়ার কয়েকটা বাড়িঘর, আর একটা খেটেখাওয়া মানুষদের কয়েকটা জীর্ণ কুটির । এখন পরিবর্তনের বলয়ের মাঝে নয়নপুরের পরিবর্তনও অভূতপূর্বভাবে লক্ষণীয়। অনেকটা শরৎচন্দ্রের - বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বর্ণিত গ্রামের আকারে সেজেছে এই গ্রাম। ভোর হতে না হতেই এখানে গরুর গাড়িতে চেপে লোকেদের আনাগোনা আজও লক্ষ করা যায় । শহরের উঁচুতলার মানুষদের ভ্রমণসূচীতেও স্থান করে নিয়েছে এই গ্রাম। সরকারি অতিথিশালায় রয়েছে থাকা খাওয়ার সুবন্দোবস্ত । তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খবর হল, এই গ্রামেরই ছেলে দীনু স্কুল বাউন্ডারির পেছনে একটা প্লট কিনে রেখেছে। একটা ছোট হোটেল তৈরির প্ল্যান আছে । সেই অনুযায়ী সরকারের ঘরে কাগজপত্রও জমা দিয়েছে। এখন শুধু পারমিশন-এর অপেক্ষা। তারপরেই একটা ভাল দিন দেখে কাজ আরম্ভ করবে। ভ্রমণপিপাসু মানুষদের জন্যই এই পরিকল্পনা ওর মাথায় এসেছে। কতটুকু সার্থক হবে কে জানে ! বাড়ির কাছাকাছিই রেখেছে প্লটটা । এখন বাউন্ডারি ওয়াল দিয়ে রেখেছে।

বারান্দায় বসে পত্রিকাটা দেখছিল দীনু। খোকনের আজ সকালে কোনো টিচারের বাড়ি যাওয়ার নেই। তাই দীনু একটু দেরি করেই ঘুম থেকে উঠেছে । বুড়ি মাসি চলে যাওয়ার পর থেকে স্ত্রী প্রণতিকেই সকালের চা-জলখাবারটা করতে হয়। এরপর বেলা নটা নাগাদ আসে একটা মাসি । সে রান্না থেকে শুরু করে সবই করে । তাই প্রণতি সকালের ঝক্কিটা পোয়াতে হয় । দীনু চায়ের অপেক্ষায় থাকতে না পেরে হাঁক দিল প্রণতিকে, কি গো, চা হল ! কখন থেকে বসে আছি চা খাব বলে, দূর ভাল লাগছে না। প্রণতি এল ট্রেতে করে চা-বিস্কুট নিয়ে। প্রণতিকে দেখে দীনু একগাল হেসে বলল, কী ব্যাপার, এত দেরি ? প্রণতিও ঠোঁটের কোণে হাসি রেখেই উত্তর দিল, কই, খুব বেশি দেরি তো হয় নি ! তোমার তো সবটাতেই বাড়াবাড়ি।

চিৎকার চেঁচামেচি না করলে তোমার ভাল লাগে না । বলে প্রণতি চায়ের কাপ নিয়ে দীনুর পাশেই বসল । প্রণতি উসখুস করছিল একটা কথা বলার জন্য। দীনু ঠিক বুঝল — প্রণতি কিছু বলতে চায় । প্রণতি জানে দীনু অপরের বাড়ির কানাঘুষো কথাবার্তা বলা একেবারেই পছন্দ করে না। তাই প্রণতি ইতস্তত করছিল। কিন্তু দীনুকে না বললে কী করে হবে ! তাই সাহস করে প্রণতি দীনুকে বলল, হ্যাঁ গো — তুমি কি কিছু শুনেছ রেখার বিয়ের ব্যাপারে ? দীনু টেবিলের উপর চায়ের কাপটা রেখে বলল, রেখার বিয়ে ? কই নাতো আমি তো কিছুই শুনিনি, তুমি কোত্থেকে শুনলে? বলে উত্তরের অপেক্ষায় তাকিয়ে রইল প্রণতির দিকে । প্রণতি হেসে হেসে জবাব দিল, হুঁ — দেখেছ আমি ঘরে বসে যে খবর পাই, তা তুমি বাইরে ঘুরেও জানতে পার না। এটাই হচ্ছে আমাদের কৃতিত্ব। বুঝলেন মশাই ? দীনু অস্থির হয়ে বলল, আগে বলোই না তোমাকে কে বলল। প্রণতি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে লাগল, ঐ যে রেখাদের পাশের বাড়ির মহিলা গো, একদিন এসে মিষ্টির প্যাকেট দিয়ে গেছিল না ! নামটা আমার মনে আসছে না। দীনু প্রণতিকে পাল্টা প্রশ্ন করল, মিষ্টি যে নিয়ে এসছিল সে তো নীরদের বউ রমা। সে কীভাবে জানল রেখার বিয়ের কথা ? যেখানে এ গ্রামের কেউ জানে না ! প্রণতি দীনুর কথা মানতে পারল না। তীব্র আপত্তিতে বলল, মানে ? এখানকার কেউ জানে না বলে রমা জানতে পারবে না। এ আবার কেমন ধারা কথা বলছ ! সত্যি তুমি যে কখন কী বলে ফেল তার ঠিক নেই। দীনু খুব ভাল করেই জানে, রেখার বিয়ে স্থির হলে মণিময় স্যার দীনুকে বলবেই। প্রণতির সঙ্গে এসব নিয়ে কথা বলে লাভ নেই। অযথা সময় নষ্ট । দোকানে যেতে হবে। তার একটা প্রস্তুতি তো রোজই থাকে। প্রণতি বুঝল দীনু কথাটাকে বেশি গুরুত্ব দিতে চাইল না । তাই সে চুপ করে রইল। বসে পত্রিকাটা দেখতে লাগল। খোকন ঘরে বসে পড়াশুনা করছে । প্রণতি হঠাৎ দীনুকে জিজ্ঞেস করল, কী গো, কী খেয়ে যাবে বল তো ! মানে কী বানিয়ে দেব। তোমারও তো একটা ইচ্ছা-অনিচ্ছা আছে । তাই না? এবার বলো। দীনু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল প্রণতির দিকে। আর ভাবল — সত্যি প্রণতির মতো স্ত্রী পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার । হাজার কাজের ফাঁকেও দীনুর জন্য যা যা করণীয় প্রণতি তা অবশ্যই করে । দীনু অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলল, আমি কী বলব বলো! তোমার পছন্দমতো যা তৈরি করবে, তাই আমি খুশী হয়ে খেয়ে নেব। তোমার হাতের ছোঁয়ায় সবই আমার কাছে অমৃত হয়ে যায় গো। প্রণতি দেখল দীনুর চোখেমুখে আবেগের ছোঁয়া। এদিকওদিক তাকিয়ে বলল দীনুকে, এই, হচ্ছেটা কী, ছেলে বড় হয়েছে, তার উপর আবার বাড়িতেই আছে । শুনতে পাচ্ছে না বুঝি। ভালবাসায় গদগদ হয়ে দীনু বলল, কী হয়েছে তাতে। আমার বউকে আমি ভালবেসে দুটো কথাও বলতে পারব না ? ছেলে হয়েছে তো কী হয়েছে । প্রণতি তাড়াতাড়ি দীনুর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, চুপ, চুপ — একদম চুপ — কোনো কথা নয়। যাও, চান করতে যাও । আমি খাবার তৈরি করছি। প্রণতি চায়ের কাপগুলো ট্রেতে করে নিয়ে

চলে গেল। দীনুও চলে গেল ভেতরে । বিছানায় বসে ভাবতে লাগল, নয়নপুরে দীনু এবং প্রণতি যে করেই হোক অনেকটাই মানিয়ে নিয়েছে । কিন্তু খোকন ? লেখাপড়া ছাড়া এই গ্রাম্য পরিবেশে সে এখনও ধাতস্থই হয়নি। এর পিছনে প্রণতিরও দোষ আছে । সে ছেলেকে কারুর সাথে মেলামেশা করতে দেয় না । তাই দীনু ভাবছে ভবিষ্যতে ছেলেকে কলকাতা বা আরও দূরে রেখে পড়াশুনা করাবে । খোকনের ইচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার । ছেলের এই ইচ্ছেটুকু সে পূরণ করবেই । দীনু নিজে খুবই মেধাবী ছাত্র ছিল। বি.কম. পাশ করার পর ইচ্ছে ছিল সি.এ. পড়ার । কিন্তু সংসারের নানা জটিলতায় সেই ইচ্ছে পূরণ হয় নি। সরকারি চাকুরিও হয়নি। তাই আজ সে কাপড়ের ব্যবসা করছে । যাই হোক — খোকনের জন্য সে আলাদা খাতে টাকা সঞ্চয় করছে । প্রণতি এসব খবরও রাখে না । ছেলের ভবিষ্যৎ গড়ার পরিকল্পনা যদিও দুজনেরই রয়েছে ।

ছেলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন কোন্ বাবা মা না দেখে ! কিন্তু সফল হয় কজন মা-বাবা! ছেলেকে নিয়ে ওদের অনেক স্বপ্ন । ভবিষ্যতে দরকার হলে, কলকাতায় একটা ছোটোখাটো আস্তানা করে নেবে। যাতে খোকনের সুবিধা হয় । দীনুর মাথায় এসব প্ল্যান অনেকদিন ধরেই আছে । তেমনি পাশাপাশি হোটেল তৈরির কাজ আরম্ভ করারও একটা পরিকল্পনা রয়েছে দীনুর । ব্যাঙ্ক থেকে লোন নেওয়ার জন্য আবেদন করা হয়ে গেছে। এখন শুধু সরকারের অনুমোদন দরকার। এ ব্যাপারে হয়তো বা হরিমোহন সাহায্য করতে পারে । হরিমোহন দীনুকে খুব স্নেহের চোখে দেখে । তাছাড়া দীনু খুব ভালই বোঝে এসব কাজ আজকাল সুপারিশ ছাড়া হয় না। নেতাদের হস্তক্ষেপেই এই কাজ আরও দ্রুত সমাধা হয় । দীনু রাজনীতিতে একদম বিশ্বাস করে না । সে কোনো দলেই আজ পর্যন্ত নিজেকে জড়ায়নি। এমনকী কোনো সমাবেশ, জমায়েত, মিছিল ইত্যাদিতে কোনো দলের হয়ে অংশও নেয়নি । এই সমস্ত জটিলতার থেকে সে সবসময় নিজেকে গুটিয়েই রাখে। দীনুর হঠাৎ মনে পড়ল — প্রণতি যে বলল রেখার বিয়ের কথা । সেটা কি সত্যি — তাহলে কি এজন্যই মণিময় স্যার যেতে বলেছে! একবার তো যেতেই হবে। রোববার ছাড়া তো যাওয়াও যাবে না । দীনু মনেমনে অতি প্রসন্ন হল, যদি রেখার বিয়েটা হয়ে যায় তা হলে স্যারের টেনশন অনেকটাই কমে যাবে । দরকার হলে মণিময় স্যারকে সে প্রয়োজনমাফিক সাহায্য করতেও রাজি। অগাধ শ্রদ্ধা ও সম্মানের প্রতিফলনেই দীনুর মানসিকতা এত দৃঢ়ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে ।

এরই মাঝে প্রণতি এসে ব্রেকফাস্ট রেডি করে দিয়ে গেল । সেই চিরাচরিত রুটি-তরকারি। যাকগে, প্রণতিই বা কী করবে । রান্নার মাসিটা বেলা নটার আগে আসে না । এর আগের কাজগুলো তো প্রণতিকেই করতে হয়। এরই ফাঁকে ছেলেকে পড়াশুনায়ও সাহায্য করতে হয়। ছুটির দিনে দীনু নিজেও অনেক সময় খোকনকে নিয়ে বসে। বিশেষ করে অঙ্কটা দীনু প্র্যাকটিস করায়। প্রণতির ভালবাসার সংসারে দীনুর টাকা জোগানো ছাড়া আর কিছুই করতে হয় না। প্রণতির মতো স্ত্রী পেয়ে দীনু খুবই গর্বিত। উঁচুস্বরে কখনওই দীনু প্রণতিকে কিছু বলে

না। যেমন নিজে ভালবেসে বিয়ে করেছিল, তেমনি আজও সেই ভালবাসার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। প্রণতিও ভাল করেই জানে স্বামীকে। কোনোকিছুতেই দীনু আপত্তিসূচক কোনো অজুহাত দেখায় না। স্ত্রী-পুত্রকে ভালভাবে রাখা, ওদের স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখা, কোনোকিছুই দীনুর নজর এড়ায় না। পিতার আদর্শেই মানুষ হয়েছে দীননাথ। ব্রজনাথবাবু নিতান্তই দরিদ্র শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু তার আদর্শ, সততার প্রেরণায় বড় হয়েছে তার দুই ছেলে। সুতরাং, সচ্চরিত্রের মানুষ হতে গেলে যে আর্থিক সঙ্গতি বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায় না ব্রজনাথবাবু তার দুই ছেলের মধ্যে সেই দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

দীনু খাওয়া শেষ করে রেডি হয়ে বেরিয়ে গেল দোকানের উদ্দেশে। রাস্তায় হঠাৎই অসীমের সঙ্গে দেখা। অসীমের খুব পছন্দের লোক এই দীনু। তাই অসীম দীনুর হাত ধরে বলল, আরে দীনুদা, তোমার সঙ্গে তো দেখাই হয় না আজকাল। অথচ আমরা একই জায়গায় থাকি। দীনু হেসে ফেলল, বলল, তোর খবর কী বল্ ! কিছু খবরটবর পেলি ? অসীম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, না, গো দীনুদা, কোনো খবর নেই । আমার সময়টাই এখন ভাল না। তাছাড়া এখানে থেকে আমার কিছু হবে বলে মনে হয় না।

দীনু অসীমের কথায় সায় দিয়ে বলল, এটা অবিশ্যি মিথ্যে বলিসনি। কিন্তু কিছু করারও তো নেই, তাই না ? অসীম গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ — বাবার পক্ষে আমার জন্য আর কিছু করার নেই। বাবা যথেষ্ট করেছেন। এখন আমারই উচিত বাবার জন্য কিছু করা। তা আর পারছি কই ! দীনু রেখার বিয়ের ব্যাপারটা ইচ্ছে করেই চেপে গেল, কিছুই জিজ্ঞেস করল না। দীনু নিজে থেকে কিছু বলবে না। দীনু বলল, চল্ তো, হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি। তা তুই যাচ্ছিস কোথায় এখন ? অসীম ইতস্তত করে উত্তর দিল, আমি টিউশনি করতে যাচ্ছি। তোমাদের পাড়ারই দুটো ছেলেকে পড়াই। দীনু উৎসাহ দিয়ে বলল, সে তো খুব ভাল কথা। একদম বসে থাকার চেয়ে এটা মন্দ কী ! খুব ভাল। তাহলে তুই যা, আমি দোকানে যাই, কেমন ? অসীম শান্তগলায় বলল, ঠিক আছে দীনুদা, তুমি একদিন এসো ছুটির দিনে। সামনের রোববারেই তো আসতে পার। দীনু সম্মতি জানিয়ে উত্তর দিল, ঠিক আছে যাব। স্যারও বলেছিলেন যাওয়ার জন্য। যাব, ভাল থাকিস ভাই। আমি চলি। বলে সাইকেলে চেপে দীনু চলে গেল। অসীম তাকিয়ে রইল দীনুর যাওয়ার পথে। এই দীনুদা কত কষ্ট করেই না ব্যবসাটাকে দাঁড় করিয়েছে। এখনও কষ্ট করেই যাচ্ছে। শিক্ষিত হয়েও কোনোদিন চাকুরির চেষ্টা করেনি। দীনুদার সততা, কর্মনিষ্ঠা, দৃঢ় মনোবলই দীনুদার সাফল্যের চাবিকাঠি। মণিময়ের অর্থবল থাকলে হয়তোবা অসীমও এইরকম একটা ব্যবসার ঝুঁকি নিতে পারত। অসীম এইজন্য মানসিকভাবে খুবই ভেঙে পড়েছে। তারমধ্যে বাড়িতে ঢুকলেই মায়ের কণ্ঠে তার প্রতি অবজ্ঞার সুর। সব মিলিয়ে অসীম দিশেহারা হয়ে পড়েছে। হাঁটতে হাঁটতে অসীম আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে চলে গেল গন্তব্যস্থলে।

নয়নপুরের রাস্তাঘাটের কাজ শুরু হয়ে গেছে প্রাথমিকভাবে। দক্ষিণপাড়ার রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। গ্রামবাসী একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছে। বৃষ্টির জলে কর্দমাক্ত রাস্তায় চলাফেরার দিন হয়তো ফুরিয়ে এসেছে। হেলথ্ সেন্টার পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। গাঁওপ্রধান হরিমোহন এখন আর আগের মতো এইসমস্ত কাজে নিজেকে পুরোপুরি নিয়োজিত করে না। একটু দূরেদূরেই থাকতে চায়। হরিমোহনের সাকরেদরা তার এই অদ্ভুত পরিবর্তনে স্তম্ভিত! মধ্যে মধ্যে গিয়ে কাজের তদারকি করে। তাও নিজের গ্রামের স্বার্থে, নিজের স্বার্থে নয়। হরিমোহনের একটা ধান্দা ঠিকই আছে। সেটা হল যদি রঞ্জনকে কন্ট্রাকটরের অধীনে কাজে লাগানো যায়, তাহলে কাজটা তো শিখতে পারবে, নয়ত ওর এই বিদ্যায় কোনোকিছু করাই সম্ভব নয়। ব্লকের কন্ট্রাকটার নরেশ গোপ-এর সঙ্গে হরিমোহনের পুরনো পরিচিতি রয়েছে। আগে অনেক লেনদেনও হয়েছে। হরিমোহনের মতো নরেশও অর্থলোভী লোক। সমাজে আজ সৎ লোকের অভাব বলেই এদের মতো লোকদের দিয়েই প্রয়োজন মেটাতে হয়। হরিমোহনের মতোই নরেশ গোপ মিশমিশে কালো, লম্বা চুল ঘাড় পর্যন্ত। বয়স পঞ্চাশ-বাহান্ন হবে হয়তো। তবে হরিমোহনের চাইতে বয়সে ছোটো। হরিমোহন জানে রঞ্জনকে কাজে ঢোকাতে হলেও নরেশকে আগাম কিছু টাকা দিতেই হবে। ভীষণ নচ্ছার লোক এই নরেশ। কিন্তু কথাবার্তায় এতই মিষ্টভাষী যে মানুষকে অতি সহজেই খুশী করতে পারে। শ্রমিকদের মজুরীতে থাবা বসাতেও সে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। সে বাসস্ট্যান্ডের কাছে একটা দালানের কোঠায় ভাড়া থাকে একাই। ওর পরিবার থাকে বর্ধমান জেলার গলসী গ্রামে। দেশভাগের পরই নরেশের বাবা এই গ্রামে চলে আসে। কিছু জমি ভিটেমাটি আছে। এখন নাকি পাকাবাড়ি করেছে। স্ত্রী-ছেলেমেয়ে, বৃদ্ধা মাকে নিয়ে ওর সংসার। মাসে একবার সে বাড়ি যায়। অভাবের তাড়নায় হয়তো স্বভাব নষ্ট হয়ে গেছে। হরিমোহনের সঙ্গে যোগাযোগ বেশি দিনের নয়। বছর দুয়েক হবে। এই গ্রামেই পুকুর খনন কার্যের সময় এই নরেশের সঙ্গে হরিমোহনের পরিচয়। সরকারি অর্থ আত্মসাৎ-এর ব্যাপারে দুজনের সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। কিন্তু এখন হরিমোহনের বিবেক দংশন হচ্ছে। এই সমস্ত কুকর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখতে চাইছে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলেছে। হরিমোহনের বাড়ির সদর দরজা থেকেই দেখা যাচ্ছে নরেশ কন্ট্রাকটারের আন্ডারে বেশ কিছু শ্রমিক কাজ করছে। সকালের দিকে হরিমোহন কিছুক্ষণ তদারকিতে ছিল। আজ আর যাবে না। আগে লাবণ্যর সঙ্গে একটু আলাপ-আলোচনা করা দরকার। লাবণ্যর মত আছে কিনা রঞ্জনকে কন্ট্রাকটারির কাজে যোগ দিতে। দুদিন বাদেই যা করার করবে হরিমোহন। ছেলের ব্যাপারে এত তাড়াহুড়ো করা উচিত হবে না ভেবেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল। প্রশাসনের দুর্নীতিবাজদের পাল্লায় পড়েও নগর উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। থেমে আছে পল্লী উন্নয়ন, রাস্তাঘাট সংস্কারের কাজ। শুধু হরিমোহন কেন, এমন অনেক

তাবড় তাবড় দুর্নীতিগ্রস্ত লোকের প্রভাবে শহর উন্নয়ন পরিষেবা, গ্রামীণ উন্নয়ন মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। পিছিয়ে রয়েছে নানা উন্নয়নমূলক কাজ। আজকের সমাজে সৎলোকের এতই অভাব যে, কার্যক্ষেত্রে তা খুব স্বচ্ছভাবেই পরিলক্ষিত হয়। সেক্ষেত্রে পরিবর্তন খুব কমই দেখা যায়। এককথায় লুটের রাজত্ব চলছে। সরকারের তরফে অনেক তদন্ত করেও হাতেনাতে ধরা অতি সহজ হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে সৎ হিসেবে যারা পরিচিত, তারাই কোনো না কোনো কারণে জালে জড়িয়ে পড়ছে। আর যারা আসলেই শয়তান, অর্থলোভী ঘুষখোর, তারা ভাল মানুষের মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইসমস্ত অবক্ষয় রোধ করা কি সম্ভব ? তাই তো আজকের সমাজব্যবস্থা নানাভাবে কলুষিত হয়ে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। গ্রাম্য সমাজব্যবস্থাও এর চাইতে আলাদা কিছুই নয়। একদিকে যেমন নারী নিগ্রহের কারণে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার আর্ত চিৎকার এই ধরার আকাশেবাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে, অন্যদিকে পুরুষশাষিত সমাজে বেড়েই চলেছে অত্যাচারী পুরুষদের অকথ্য অত্যাচার, শোষণ, দমনের মাত্রা। সরকারি তরফের অনেক চেষ্টা কোনো সফলতা আনতে পারছে না। মানুষের চারিত্রিক গঠন কি সরকার কোনোভাবে পাল্টাতে পারবে ? তাই সব চেষ্টা বিফল হয়ে সমাজের চিত্র হয়ে যাচ্ছে নগ্ন, কদর্য। নয়নপুরও এ ব্যাপারে কম যায় না। জেলেপাড়ার পেছনে বস্তিতে এসব প্রায়ই শোনা যাচ্ছে। গাঁওপ্রধান হিসেবে মধ্যস্থতা করার জন্য হামেশাই হরিমোহনের ডাক আসে। হরিমোহন এইসব ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েই কয়েকবার এগিয়ে গেছে। কিন্তু কিছুই ফল হয়নি। মহিলা কমিশনের সাথেও হরিমোহনের যোগাযোগ আছে। সেই সুবাদে অনেক ক্ষেত্রে আইনি ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কতিপয় দুর্নীতিগ্রস্ত লোক সমাজের নগ্ন চিত্রকে সামনে রেখে আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাতে দ্বিধা করেনি এবং আজও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। এইসব দেখেশুনে অর্থাৎ, বাস্তবের কুৎসিত রূপটাকে হরিমোহন নিজের অবচেতন মনে ধরে রেখেছে বলেই না রেখার জন্য একটা সুপাত্রের সন্ধান দিতে পেরেছে! বাকিটা তো নিয়তি। এই বিধানে যা আছে তাই হবে। তবে হরিমোহন নিশ্চিত যে রেখার বিয়ে এখানে হলে ভালই হবে। আজকালকার দিনে একটা সুপাত্র পাওয়া খুবই কঠিন। শুধু ভাল চাকরিতেই তো সুপাত্র হওয়া যায় না ! হরিমোহনের শিক্ষার মান নিচু হলেও অনেক লোকের সঙ্গে চলাফেরার কারণে ভালমন্দের জ্ঞান যথেষ্টই রয়েছে। আজ তো শুধুমাত্র হরিমোহনের কারণেই রেখার বিয়ের ব্যাপারটা এতদূর এগিয়েছে। এই গ্রামে তো আরও অনেক শিক্ষিত লোকও আছে। কই, কেউ তো কোনো দিন, মণিময় স্যারের মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষেই আগ্রহ দেখায়নি।

হরিমোহনের এখন একটাই বড় চিন্তা সেটা হচ্ছে রেখার বিয়েটা যাতে সুসম্পন্ন হয়ে যায়। লাবণ্যর সঙ্গে প্রায়ই এসব নিয়ে কথা বলে। ভাল মনের মানুষ লাবণ্যও আন্তরিকভাবে রেখার মঙ্গল কামনা করে। হরিমোহন আর লাবণ্য চা খেতে খেতে এসব নিয়েই আলোচনা

করছিল। পাশাপাশি সমাজের ঘৃণ্যরূপ নিয়েও কথাবার্তা বলছিল। হঠাৎ লাবণ্যর চোখে পড়ল মণিময় স্যারের স্ত্রী শোভা আসছে। একাই আসছে। লাবণ্য দেখেই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। চোখেমুখে উজ্জ্বলতার ছাপ নিয়ে এগিয়ে গেল গেটের দিকে । শোভা এসে ঢুকতেই লাবণ্য জড়িয়ে ধরল। হরিমোহন এইসব দৃশ্য দেখে নিজেকে গর্বিত মনে করল। হরিমোহনই তো এই দুই পরিবারের সম্পর্কটাকে সহজ করে তুলেছে। নয়ত অনেক বছর যাবৎ এই জিনিসটা চাপা পড়েই ছিল। এখন আর মণিময় স্যার হরিমোহনকে এড়িয়ে চলতে পারে না। লাবণ্য শোভাকে নিয়ে এল বসার ঘরে। লাবণ্যর অনুরোধে সোফায় বসল শোভা। কতদিন পর লাবণ্যর সঙ্গে দেখা, অথচ একই গ্রামের পাড়া প্রতিবেশী ওরা। তা সত্ত্বেও নানা জটিলতায় সম্পর্ক ছিল না বললেই চলে। শোভা দেখল, লাবণ্য তো একই আছে। খুব যত্নআত্তিতে থাকে বোঝা যায়। সৌখিনতার চরম নিদর্শন ঘরময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। শোভা দু-এক বছরের বড় হবে লাবণ্যর চাইতে। কিন্তু লাবণ্যর চেহারায় চাকচিক্য এখনও পুরোপুরিই বজায় রয়েছে। যেটা শোভার মধ্যে অতটা এখন আর নেই। আটপৌরে চেহারায় শোভা তার মমত্ববোধ ধরে রেখেছে। লাবণ্য গিয়ে পাশে বসল, বলল, দিদি, তুমি এসেছ — আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে, তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। শোভা লাবণ্যর দিকে তাকিয়ে প্রাণভরে হেসে বলল, আমাকে তো আসতেই হবে লাবণ্য। সবই তো শুনেছ আশা করি। বলে লাবণ্যর দিকে তাকিয়ে রইল। এই লাবণ্যর সঙ্গে শোভার খুব ভাব ছিল এক সময়। আজ আবার এতদিন পর লাবণ্যর দেখা হয়ে আনন্দ উপভোগ করল। লাবণ্য উত্তরে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিদি সবই মোটামুটি শুনেছি। শুধু তোমার মুখ থেকে সোনার জন্য মনটা অস্থির হয়ে উঠেছিল। এই আর কী। শোভা মধুর সুরে বলল, তাই বুঝি ? এতই যদি ইচ্ছে ছিল, তবে তো তুমিও আমার বাড়িতে যেতে পারতে লাবণ্য ! তাই না ? লাবণ্য শোভার হাত ধরে আবেগে বলল, সে তো একশবার দিদি। আমি তো যাবই । দিদি তোমার কত পরিবর্তন হয়েছে। তোমাকে এর মধ্যে তো আর দেখিনি। তাছাড়া দেখবই বা কোত্থেকে। কোথাও তো যাইই না, শুধু আশেপাশের বাড়িতেমাঝেমধ্যে যাই, আর তো কোথাও যাওয়াই হয় না। লাবণ্য একটু গম্ভীর হয়ে গেল। এদিকে হরিমোহন গোপালকে পাঠিয়ে মিষ্টি আনার ব্যবস্থা করল এবং চায়ের ব্যবস্থা করল। লাবণ্য দেখল গোপাল চা-মিষ্টির প্লেট সাজিয়ে ট্রেতে করে নিয়ে এ ঘরে ঢুকেছে। লাবণ্য উঠে দাঁড়িয়ে ট্রেটা গোপালের হাত থেকে নিয়ে শোভার সামনে সাজিয়ে দিল। হরিমোহনের সত্যি সুবুদ্ধি হয়েছে। নয়ত লাবণ্য কোনোদিনই হরিমোহনের কাছ থেকে এসব আশা করে না। তাই লাবণ্য মনে মনে একটু অবাকই হল। যাই হোক লোকটা যথাযোগ্য স্থানে সম্মান দিতে শিখেছে। একটু অন্ধকার হয়ে এসেছে বলে লাবণ্য লাইটের স্যুইচটা অন্ করে দিল। শোভা এত আপ্যায়ন দেখে অস্বস্তিবোধ করে লাবণ্যকে বলল, আচ্ছা লাবণ্য এত ভদ্রতা কিসের আমার সঙ্গে ! এত মিষ্টি কে খাবে ? লাবণ্য তীব্র আপত্তিতে বলল, কেন, তুমি

খাবে। দুটো তো মিষ্টি, তাও আবার তোমার আপত্তি। আমি কোনো কথা শুনব না। তোমাকে খেতেই হবে দিদি। গোপাল লাবণ্যকেও এনে দিল। চা-মিষ্টি দেখে লাবণ্য গোপালকে বলল, কী রে আমাকে দিলি? আমি কি বেড়াতে এসেছি নাকি রে! নে, ধর তুই একটা খা, আমি একটা খাব। বাবুকে দিয়েছিলি তো? গোপাল ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। শোভা হঠাৎ বলল, হরিমোহনবাবু এসময়ে বাড়িতে? বেরোন নি? লাবণ্য হেসে বলল, না এখন আর বড় একটা বেরোয় না, বিশেষ করে সন্ধ্যের পর। যাক্ গে, এবার বল তোমার কথা। আগে চা খেয়ে নাও ঠান্ডা হয়ে যাবে। শোভা দেখল সুন্দর কাপ প্লেটে চা, সুন্দর ডিশে মিষ্টি সাজানো। এ সমস্ত পোশাকি জিনিস তো শোভার বাড়িতে কোনোকালেই ছিল না, এখনও নেই। শোভা বোঝে — সবই আর্থিক সংগতির উপর নির্ভর করে। হরিমোহনের তো পয়সার অভাব নেই। তাই লাবণ্য সব মিলিয়েই আরাম করে যাচ্ছে। এসব ভাবতেগিয়ে শোভা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। লাবণ্য সেটা লক্ষ করে বলল, কী গো দিদি, কী ভাবছ ! ভাবনার কী আর শেষ আছে। রেখার বিয়ে সামনে। তোমাকে তো ভাবতেই হবে! শোভা হকচকিয়ে উঠল। লাবণ্যর কথার উত্তরে বলল, না, না, মানে হ্যাঁ - এখন তো আমার সামনে ভাবনার পাহাড়। তাছাড়া টাকা-পয়সার চিন্তা তো আছেই। তুমি তো সবই জান লাবণ্য। তোমাকে নতুন করে কী বলব। তবুও মেয়েটার যদি একটা কিছু গতি হয়, তাতেই আমরা তুষ্ট। লাবণ্য অবাক হয়ে শোভার কথাগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। সত্যি তো মণিময় স্যার তো কোনো দিন অসদুপায়ে পয়সা রোজগার করেননি। তবে কেন ঈশ্বর তাঁকে ঠকালেন! লাবণ্য বলল, দিদি — তুমি একদম চিন্তা কোরো না এসব নিয়ে। ওপরে ভগবান আছেন, উনি তোমাদের কোনোভাবেই বিপদে ফেলবেন না। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাছাড়া আমরা তো আছি। রেখা কী আমাদের মেয়ে নয়? শুনে শোভার ভালই লাগল। কিন্তু মণিময় তো কোনোদিনই হরিমোহনের কাছে আর্থিক সাহায্য চাইবে না। এটাও শোভা খুব ভাল করেই জানে। লাবণ্যর কথায় হেসে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ - তোমরা তো আছই। তা হলেও বিয়েটা স্থির না হওয়া পর্যন্ত একটা ভয় তো থেকেই যায়। মায়ের মন তো! লাবণ্য বসে ভাবতে লাগল। কই তার স্বামীর কথা তো বলছে না শোভাদিদি। হরিমোহন এত করল। হঠাৎ শোভাই বলে উঠল, তোমার আবার কিসের ভাবনা লাবণ্য ? হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেলে যে! লাবণ্য থতমত খেয়ে শোভার দিকে তাকিয়ে বলল, না, না দিদি — কিছু না তো! তোমার কথা শুনতে শুনতে ভাবছিলাম ছেলে-মেয়ের জন্য মা-বাবার কত দায়িত্ব কর্তব্য! তাই না দিদি? কথাটা ঘুরিয়ে লাবণ্য মনেমনে আশ্বস্ত হল। এদিকওদিক তাকিয়ে শোভা বলল, কই, হরিমোহনবাবু তো এলেন না ? বেরিয়ে গেলেন নাকি! লাবণ্য তড়িঘড়ি করে গিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকতে লাগল, কই গো — তুমি একবার এসো এ ঘরে। বলে লাবণ্য এসে আবার শোভার পাশে চেয়ারে বসল। শোভা হরিমোহনের প্রসঙ্গে, বলল, উনি তো আমাদের জন্য কত বড় উপকার করেছেন। তা একমাত্র ঈশ্বর জানেন। আজ

পর্যন্ত নয়নপুরের কোনো মানুষই আমার মেয়ের ব্যাপারে এতটা আগ্রহই দেখায়নি। লাবণ্যর খুব ভাল লাগল স্বামীর কথা শুনে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত শোভাদিদির মুখ দিয়ে বেরিয়েছে। কেন না হরিমোহনেব প্রশংসা অপরের মুখ থেকে শোনার ভাগ্য লাবণ্যর কোনোদিনই হয়নি। এমনই মানুষ হরিমোহন।

হরিমোহন এসে ঢুকল, পরনে লুঙ্গি, গায়ে একটা ফতুয়া। শোভা সসঙ্কোচে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বসুন, হরিমোহনবাবু, বসুন। হরিমোহন আড়ষ্টভাবে চেয়ারে বসল এবং বলল, খুব ভাল লাগছে। আপনি এসেছেন। শোভা হেসে বলল, আসব না? আপনি আমাদের যে উপকার করেছেন — তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। নয়ত ....। হরিমোহন লজ্জায় মাথা নিচু করে বলল, এসব কী বলছেন বৌঠান? এসব বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না দয়া করে। আমি যা করেছি — সেটা আমার দায়িত্ব কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। তাছাড়া — আপনাদের জন্য কিছু করতে পারলে তো আমি নিজেকে ধন্য মনে করব বৌঠান। শোভা অবাক হয়ে হরিমোহনের দিকে তাকাল। এত বিনয়ী হরিমোহন? লাবণ্য হঠাৎ বলে উঠল, আচ্ছা দিদি — ওরা কবে আসছে বিয়ের দিন ঠিক করতে? শোভা হরিমোহনকে দেখিয়ে বলল, সে তো উনি ভাল জানার কথা। তাই না হরিমোহনবাবু? হরিমোহন নিচুস্বরে উত্তর দিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ — আমি তো দুদিন আগেও কথা বললাম। সুনির্মলবাবু নিজেই বললেন ওরা দিনক্ষণ ঠিক করে একটা ছুটির দিনে এখানে আসবেন। এবং স্যারকে জানিয়ে দেবেন। আপনাদের নাম্বার তো দেওয়াই আছে। শোভা লাবণ্যর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। শোভা চা খেয়ে, একটা মিষ্টি খেয়ে নিল। লাবণ্যকে বলল, তোমার ছেলেকে তো দেখছি না লাবণ্য। অনেকদিন দেখি না। কতটুকু দেখেছিলাম রঞ্জনকে। ও এখন কিছু করছে কী? লাবণ্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও উত্তর দিল, না, না দিদি — কিছুই করছে না। সারাদিন শুধু আড্ডা। আর ঘোরাফেরা ছাড়া আর কোনো কাজ ওর নেই। শোভা ভাবল অসীমের কথা। বেকারত্বের জ্বালা, বড় জ্বালা। রঞ্জনের কথায় শোভা বলল, এখন তো কিছু একটা কাজে লাগা দরকার। হরিমোহনবাবুও তো পারেন একটা কিছু ব্যবস্থা করতে। আমাদের অসীমটারও তো একই অবস্থা। শুধু ইন্টারভিউই দিচ্ছে, ফল কিছুই হচ্ছে না। হরিমোহন শোভার কথায় সায় না দিয়ে বলল, না বৌঠান — অসীম আর রঞ্জন এক নয়। অসীম হচ্ছে একটা শিক্ষিত-মার্জিত ছেলে, আর রঞ্জন ? সে তো একটা অপোগণ্ড, মূর্খ প্রকৃতির ছেলে। তার পক্ষে ব্যবসা ছাড়া আর কিছুই হবে না। লাবণ্যর মনে মনে একটু রাগ হল। শত হলেও সন্তান। সেই সন্তানের নামে অন্যের কাছে বলার কী দরকার ! মা হিসেবে সে এটা মেনে নিতে পারল না। তাই বলল শোভাকে, দিদি, আজকালকার ছেলে তো, বুঝতেই তো পারছ — বাপের আদরে বাঁদর হয়ে উঠেছে। দোষ তো আমাদেরও — সময় থাকতে তো চিন্তা করিনি, এখন চিন্তা করে কতটুকু লাভ হবে কে জানে ! শোভা সহজ

ভঙ্গীতে বলল, না, লাবণ্য — রঞ্জনের এমন কী আর বয়েস! এখনও ওর ঢের সময় আছে। তাছাড়া ছেলেমানুষ — অতটা জ্ঞানবুদ্ধি হওয়ার মতো বয়স কী আর হয়েছে। আর কদিন গেলেই দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে। শোভার মুখে আশার কথা শুনে লাবণ্যর খুব ভাল লাগল, হরিমোহনও আশ্বস্ত হল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তাই শোভা উঠল বাড়ি যাবার জন্য। হরিমোহন এবং লাবণ্য দুজনেই গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

অন্ধকারের পথ ধরে হাঁটতে লাগল শোভা। বাড়ির সামনের রাস্তাটা সারাইয়ের কাজ চলছে। তাই একটু সাবধানে হাঁটাই ভাল। দূরে দেখা যাচ্ছে সরকারি হেলথ্ সেন্টার এখনও খোলা। খেটে খাওয়া মানুষদের মধ্যে রোগের প্রকোপটা বেশি লক্ষ করা যায়। নিত্য অভাব ওদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। বাংলার প্রতিটি গ্রামেই প্রায় একই চিত্র পরিলক্ষিত হয়। শোভার বহু বছরের অভিজ্ঞতা এই নয়নপুর গ্রামকে নিয়ে। আগে তো হাসপাতাল, ডাক্তার, বদ্যি কিছুই ছিল না। ডাক্তার দেখাতে হলে ছুটতে হত শহরে। কুসংকারাচ্ছন্ন এই নিচুতলার মানুষগুলো তখন টোটকা ওষুধে রোগ সারাবার চেষ্টা করত এবং মৃত্যুর মিছিল বয়ে যেত। আজ নয়নপুরের সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভাল ডাক্তার আছে। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করা ওদের রোজকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহুকাল বসবাসের দরুন শোভার এই গ্রামের সব চিত্রই নিজের নজরে রয়েছে। আজ অনেকদিন বাদে শোভা বেরিয়েছে গ্রামের রাস্তায়। ফুরফুরে হাওয়া বইছে। গাছের পাতায় ঝিরঝির শব্দ হচ্ছে। এখনও গ্রামের উন্নয়ন সেভাবে হচ্ছে না। এটুকুও জানে শোভা যে, সরকার সর্বদাই উদাসীন থাকে গ্রামের প্রতি। কিন্তু কেন এই অবিচার! বিভেদও বলা যায়। শোভার মনে প্রশ্ন জাগে, গ্রামের মানুষ কি মানুষ নয়? গ্রাম থেকে যদি অনেক কিছু পেতে পারে, তবে উন্নতিমূলক কিছু গ্রামকে সরকার কেন দিতে পারে না! শান্ত-স্নিগ্ধ-পরিবেশমযুক্ত যে-কোনো গ্রামকে অধিকাংশ মানুষ প্রাণভরে ভালবাসে। তবে কেন সরকারের এই অবহেলা। কেন পারে না উন্নতির উচ্চশিখরে পৌঁছে দিয়ে সর্বসুবিধাযুক্ত করে গড়ে তুলতে একটা গ্রামকে? এইসব অনেক প্রশ্ন জাগছে শোভার মনে। কিছুদিন আগেই তো শহর কলকাতা দেখে এল। কত উন্নতি, রাস্তাঘাটের সংস্কারের নিপুণতা সত্যিই চোখে পড়ার মতো। এইরকম সুন্দর রাস্তাঘাট তো গ্রামেও হতে পারে। তা হলে বাধা কোথায়? যাই হোক নয়নপুরের এই রাস্তাটি যদি সুন্দর হয় তবে রেখার বিয়ের জন্য ভালই হবে। শোভা সকালবেলা বারান্দায় বসে দেখেছে হরিমোহন কাজের তদারকি করছে। যাকগে সময়মতো হলেই হয়। অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে গিয়ে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল নীরদের স্ত্রী রমার সঙ্গে। পাশের বাড়ির বউ রমা। তবুও দেখা সাক্ষাৎ হয় না বললেই চলে। রমা প্রথমে অন্ধকারে ঠাহর করতে পারল না। কে এই মহিলা! তারপর ভাল করে লক্ষ করে দেখল — এসেছে রেখার মা শোভা। শোভা একটু হেসে চলেই যাচ্ছিল। রমার ডাকে ফিরে তাকাল, আরে দিদি কোথায় গেছিলেন! শোভা রমার প্রশ্ন শুনে মনে মনে বিরক্ত হল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও উত্তর দিল শোভা, এদিকেই একটু গেছিলাম।

দরকার ছিল। বলে গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রমা আবারও বলল, প্রায়ই ভাবি গো দিদি, আপনার কাছে যাব গল্প করতে। সময় আর করতে পারি না। তাছাড়া একটা ভাল খবরও শুনতে পেলাম। শোভা ঠিক বুঝতে পারল রমা কী বলতে চাইছে। রমার কথাটাকে শোভা এড়িয়ে গিয়ে বলল, আজ আসি রমা, দেরি হয়ে গেছে এমনিতেই। তুমি একদিন সময় করে এসো, কেমন ? বলে তাড়াতাড়ি শোভা বাড়িতে ঢুকে পড়ল। রমার এই গায়েপড়া স্বভাব শোভার একটুও পছন্দ নয়। রেখার বিয়ের কথাবার্তা হয়তো বা কোনোভাবে ওর কানে গেছে। তাইই হয়তো বলছিল একটা শুভ সংবাদের কথা। অনেক মহিলাদের মধ্যেই এই কৌতূহলী দৃষ্টিভঙ্গী থাকে। এগুলি যার যার স্বভাবগত দোষ। শোভা কোনোদিনই পরের ব্যাপারে কোনোরকম আগ্রহ প্রকাশ করে না। তাই কেউ করলেও ঠিক পছন্দ করতে পারে না।

শোভা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই মণিময় বেরোবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। জানতেও চাইল না হরিমোহনের বাড়িতে কী কথাবার্তা হল। এজন্য শোভার একটু রাগ হল। কিছুই বলল না। মণিময়ের চিরকালের স্বভাব এইরকম। কোনো ব্যাপারে কোন উৎসাহ প্রকাশ পায় না। সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর প্রায় কাটিয়ে তো উঠল শোভা এই মণিময়ের সঙ্গে। জামাকাপড় পরে, হাতে ছাতা নিয়ে এখন আবার কোথায় যাচ্ছে কে জানে! শোভা জানার কোনো উৎসাহও দেখাল না। শোভা ঘরে ঢুকে ফ্যানটা চালিয়ে বিছানায় একটু বসল। এই পথটুকু আসতেই ক্লান্ত লাগছে। রেখা ঘরে বসে পড়ার বইয়ে চোখ বুলাচ্ছে হয়তো! আর অসীম তো কখন বেরিয়ে গেছে! মণিময় যাওয়ার পূর্বে শোভার উদ্দেশে বলল, আমি একটু উপেনদার বাড়ি যাচ্ছি। তুমি কি যাবে ? রেডিই তো আছ, ইচ্ছে করলে যেতে পার। বলে মণিময় উত্তরের অপেক্ষায় শোভার দিকে তাকিয়ে রইল। শোভা কী যেন ভেবে বলল, আমি আবার কেন যাব এখন। এইমাত্র এলাম। আমার ভাল লাগছে না, তুমি যাও। বলে শোভা রেখার ঘরে চলে গেল। মণিময় বেশি গ্রাহ্য করল না। মণিময় খুব ভালই জানে, শোভার উপেনদার বাড়ি গিয়ে ভাল লাগবে না। কারণ তো আছেই। শোভা কোনোকালেই উপেনদাকে পছন্দ করে না। তাই বেশি কিছু বলল না মণিময়। বেরিয়ে গেল। শোভা বুঝতে পারল, মণিময় রেখার বিয়ের কথা জানাতেই উপেনের বাড়ি গেছে। মণিময়ের ব্যক্তিত্ববোধ এতটাই যে সবকিছু নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করাটা অতটা প্রয়োজন মনে করে না। দেশভাগের পর যখন এদেশে আসে তখন থেকেই উপেনের সঙ্গে পরিচয় মণিময়ের। তাছাড়া বলার আরেকটা উদ্দেশ্যও রয়েছে মণিময়ের, যে টাকাটা উপেন নিয়েছিল মণিময়ের কাছ থেকে ধার হিসেবে, সেটা যদি এ মুহূর্তে ফেরত পাওয়া যায়, তাহলে মন্দ কী! সোজাসুজি চাওয়াটা সুখকর নাও হতে পারে। এসব নানা কারণ নিয়ে মণিময় যাচ্ছে উপেনের বাড়ি। মানুষটা একটু স্বার্থপর গোছের হলেও মণিময়কে আজও খুব স্নেহ করে। মণিময়ও যতটুক সম্ভব সমীহ করেই চলে। সেই কারণেই হয়তো সম্পর্কটা

টিকে আছে এখনও।

মণিময় উপেনের বাড়ির কাছে আসতেই শুনতে পেল উপেনের চিৎকার চেঁচামেচি। কী নিয়ে বকাবকি করছে কে জানে। উপেনের এই সমস্ত আচরণ মণিময়ের কাছে খুবই পরিচিত। সেজন্য সে একটুও অবাক হল না। গেট খুলে ঢুকে পড়ল মণিময়। দেখল উঠোনে দাঁড়িয়েই বকছে। তবে কাকে বকছে সেটা পরিষ্কার হল না মণিময়ের কাছে। উপেনের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই উপেন চুপ করে গেল। মণিময় অঞ্জলিকেও দেখতে পেল না ধারেকাছে। হীরককে দেখল পড়ার টেবিলের সামনে বসে আছে। তাই মণিময় ধীর গলায় উপেনকে বলল, কী হল দাদা — চিৎকার করছেন কেন ? এই বয়সে এত উত্তেজনা ভাল নয়! শরীর খারাপ করবে যে। উপেন উত্তেজিত হয়ে উত্তর দিল, চিৎকার করব না কী করব ? বড় ছেলেটা তো অকাল কুষ্মাণ্ড হয়েই গেছে। ছোটোটাও একটা অপদার্থ তৈরি হয়েছে। আমি কাদের জন্য কষ্ট করলাম! এখনও তো করেই যাচ্ছি। আমার ভাগ্যটাই খারাপ ভাই। মণিময় উপেনের হাত ধরে নিয়ে গিয়ে ঘরে বসাল। বলল, বসুন, আপনি, বসুন। এত মাথা গরম করলে চলে না। আমাদের হীরক তো খুবই সাব্যস্তের ছেলে। ও আবার কী করল। উপেন তিক্ত সুরে উত্তর দিল, আর বোলো না ভাই, আজ অঙ্কের ক্লাস টেস্টের খাতা দিয়েছে। নাম্বার এত কম পেয়েছে, তোমাকে কী বলব। অথচ বছরের প্রথম থেকেই টিচার রাখা হয়েছে। পড়াশুনায় তো মনোযোগই নেই। তাইই এইরকম রেজাল্ট। বলে উপেন মাথা নিচু করে বসে রইল। মণিময়ের খুব কষ্ট হল উপেনের ভাবভঙ্গী দেখে। সত্যিই তো সন্তানের জন্যই তো পিতামাতার সব আশা ভরসা। ব্যাপারটাকে সহজ করার জন্য মণিময় বলে উঠল, ও — এই ব্যাপার। সামনের পরীক্ষায় ভাল রেজাল্টকরবে। এতে এত রাগ হওয়ার কী আছে দাদা ? এভাবে ওকে বকাবকি করবেন না। এখন বড় হয়েছে বলে বলছি দাদা বলে মণিময় দেখল উপেন হাসছে। মণিময়ের ভাল লাগল। মণিময় ব্যাপারটা অনেকটাই সহজ করে দিতে পেরেছে। অঞ্জলি ঢুকল চা নিয়ে। বলল, দাদা, অনেকদিন পরে এলেন, তাই না? মণিময় হেসে উত্তর দিল, হ্যাঁ বৌঠান, ঠিকই বলেছেন। নানা কারণে আসতে পারিনি। আপনি বসুন না। মণিময় দেখল অঞ্জলি যেন আরও শীর্ণকায় হয়ে গেছে। মণিময় চায়ের কাপ হাতে নিয়ে চা খেতে আরম্ভ করল। অঞ্জলি সাহস করে বলে ফেলল, দেখলেন তো এসে, কী তাণ্ডব বয়ে গেল বাড়িতে। আপনি এসে পড়াতে রক্ষা, নয়ত যে কী হত কে জানে! আমার এখন এসব একদম ভাল লাগে না। সারা জীবন তো অনেক দেখেছি। চলেই যাচ্ছিল অঞ্জলি। হঠাৎ উপেনের মন্তব্যে থমকে দাঁড়াল । উপেন উঠে দাঁড়িয়ে অবজ্ঞার সুরে বলল, ভাল না লাগলে বাপের বাড়ি চলে গেলেই হয়। সবাই মিলে তো আমার হাড়মাংস চিবিয়ে খাচ্ছ! উপেনের কটূক্তিতে অঞ্জলির আজকাল আর কিছু আসে যায় না। গা সওয়া হয়ে গেছে বলেই হয়তো! অঞ্জলি নীরবে চলে গেল ঘর থেকে। পরিবেশ পরিস্থিতি মণিময়ের একদম ভাল লাগছে না। শিক্ষিত হয়ে ও উপেন নিজের স্ত্রীকে

কোনো দিনই সেভাবে সম্মান দেয়নি। মণিময় জানে, যে সংসারে স্ত্রীকে যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয় না সে সংসারে শান্তি বজায় থাকে না। অঞ্জলির প্রতি এই আচরণে মণিময় খুব বিরক্তি বোধ করল। যে কোনো সংসারেই স্ত্রীর প্রতি স্বামীর এই অভব্য আচরণ অমার্জনীয় অপরাধ। উপেনের আজ মনে হল অঞ্জলির নিরীহ ভাব, ভীত সন্ত্রস্ততা উপেনকে রুক্ষ হতে মদত জুগিয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত মাহাত্ম্য উপেন বজায় রাখতে পেরেছে। যেটায় মণিময় একেবারেই অপারগ। সে মনে করে বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব থাকে স্বামীর ওপর। সেই স্বামীই যদি স্ত্রীর প্রতি অমানবিক আচরণ করে, তাহলে সংসারের গতিবিধি তো ঠিক থাকতে পারে না। মণিময়ের ভাবধারণা কোনোদিনই উপেনের সঙ্গে মেলেনি। আজও মেলে না। শোভা, অঞ্জলির মতো স্ত্রীরা তো শুধুই স্বামীর উপর নির্ভরশীল হয়ে সংসারের ঘানি টেনে চলেছে। বাইরের জগতের সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্কই নেই। তাই অঞ্জলিও অনেক কিছু মুখ বুজেই সহ্য করে যাচ্ছে। তবে মণিময় যদিও বা এইরকম রূঢ় ব্যবহার করে শোভার সঙ্গে, তাহলে শোভা নির্দ্বিধায় এসব মেনে নেবে না। কিছুটা হলেও প্রতিবাদ করবে। কিন্তু অঞ্জলি ? নীরবে সয়ে যেতে যেতে আজ মানসিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়েছে। ভেতরে লুকিয়ে থাকা অভিমানকে সযত্নে হৃদয়ের এক কোণে ফেলে রেখেছে। মণিময় উপেনকে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করল না। মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল, রেখার বিয়ের ব্যাপারে উপেনকে কিছু বলবে বলে। তা আজ আর হল না। অঞ্জলি চলে যাওয়ার পর উপেন শান্ত হয়ে বসে মণিময়কে বলল, আচ্ছা ভাই, তুমি কী কিছু বলতে এসেছিলে? না কি এমনিই .... । মণিময় স্মিত হেসে জবাব দিল, না, না দাদা, এমনিই এসেছিলাম। একটু আড্ডা মারার জন্য। যাকগে — এখন তো আর গল্পগুজব করার মতো পরিবেশ নেই। আমি পরে একদিন আসব, বলে মণিময় উঠতে যাচ্ছিল। উপেনের বাধায় আবার বসে পড়ল, আরে, কী যে বল মণিময়, আমি তুমি কথা বলব, এতে পরিবেশ পরিস্থিতির কী করবে, বোসো। এইরকম রাগারাগি, হইচই আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটু বাদেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন বলো তোমাদের কী খবরাখবর! অনেকদিন বাদে এলে কিনা। ইস্কুলে তো আর রোজ কথাবার্তা হয় না ভাই। মণিময় কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উপেনের দিকে তাকিয়ে বলল, না দাদা, তেমন কিছু নয়। তবে রেখার ব্যাপারে আপনাকে তো বলার কোনো সুযোগ পাইনি! তাই ভাবলাম, যাই — বলে আসি। বলার পরই মণিময় লক্ষ করল শোয়ার ঘরে অঞ্জলি এসে ঢুকেছে। মণিময়ের ভালো লাগল। রেখার বিয়ের কথা বললে বৌঠানও শুনতে পাবে। তবুও মণিময় অঞ্জলিকে ডেকে বলল, বৌঠান এই ঘরে আসুন। রেখার ব্যাপারে কথা বলব। অঞ্জলি ধীর স্বরে উত্তর দিল, ঠিক আছে দাদা, আমি এখানেই আছি। আপনি বলুন না! এখান থেকেই শুনব। মণিময়ের খুব কষ্ট হল। যাই হোক নিজেকে সামলে নিয়ে মণিময় উপেনকে বলল, দাদা, আপনি তো সুনির্মলবাবুকে চেনেন!

তাই না? তারই ছেলে রাজুর সঙ্গে রেখার বিয়ের কথাবার্তা চলছে। উপেন উৎসাহিত হয়ে বলল, তাই নাকি? সেই সুনির্মল তো? যে আমাদের স্কুলে কয়েক বছর ক্যাশিয়ার ছিল! রাজুকেও তো দেখেছি। খুবই ছোটো ছিল। মাঝে -মধ্যে নয়নপুরে আসত। ঠিক বলছি তো? মণিময় সঙ্গে সঙ্গে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ দাদা, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমরা গত সপ্তাহে কলকাতা গেছিলাম। ওদের বাড়িঘর দেখে এলাম। তাছাড়া সুনির্মলবাবুও রাজুকে নিয়ে এসে রেখাকে দেখে গেছে। উপেন অনুযোগের সুরে বলল, এত কাণ্ড হয়ে গেল, আর আমি কিছুই জানলাম না! আমার কী অপরাধ ভাই! মণিময় হতচকিত হয়ে উত্তর দিল ছিঃ দাদা, এত ধৃষ্টতা আমার নেই। সবই খুব অল্প সময়ের মধ্যে হয়েছে বলে আর কাউকেই কিছু জানাতে পারিনি। আরেকটা আশ্চর্যের খবর হল, হরিমোহন এই আলাপটার মধ্যস্থতা করছে। শুনে উপেন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, বলছ কী ভায়া! এরমধ্যে আবার হরিমোহন এল কোত্থেকে? ভালই হয়েছে, খুব ভাল কথা। এবার বিয়েটা পাকাপাকি করে নাও। মণিময় আর কিছু বলল না। পাত্রের ব্যাপারে জানতে চাইল না বলে মণিময়ও চুপ করেই রইল। অঞ্জলি আস্তে আস্তে এসে দাঁড়াল দরজার সামনে। হেসে বলল দাদা, রেখার কথা শুনে খুব খুশী হয়েছি। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি যেন মঙ্গল মতো বিয়েটা হয়ে যায়। মণিময় অবাক হয়ে ভাবল, এরই মধ্যে অঞ্জলি সব ভুলে অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এটা যে কোনো মানুষের জন্য বিশাল বড় গুণ। মণিময় অঞ্জলিকে বলল, বৌঠান, আপনাদের সকলের শুভেচ্ছাই আমাদের কাম্য। এখনও ডেট ঠিক হয়নি, হলে এসে আবার জানিয়ে যাব। অঞ্জলি বলল, আরেক কাপ চা করে নিয়ে আসি। মণিময় তীব্র আপত্তির সুরে বলল, না, না, একদমই না। আপনি বিশ্রাম করুন। আমি এখন বাড়ি যাব। আটটা বেজে গেছে। বলে মণিময় উঠল। উপেনও উঠে দাঁড়িয়ে মণিময়ের পিঠ চাপড়ে বলল, এগিয়ে যাও ভাই। আমাকে কোনোরকম কাজে দরকার হলে কিন্তু অবশ্যই বলবে। কোনো দ্বিধা-সঙ্কোচ করবে না। আগে বিয়ের তারিখটা ঠিক করে নাও। মণিময় উপেনের কথা খুব বেশি গ্রাহ্য করল না। কেননা উপেন টাকার ব্যাপারটা যে এমনিভাবে চেপে যাবে মণিময় বিন্দুমাত্রও আশা করেনি। যাই হোক টাকার কথা আজ মণিময়ও কিছু বলল না। বলতে তো হবেই। মণিময় বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল। অঘ্রানমাস এসে পড়ছে। শীতের গন্ধ এখন থেকেই ছড়িয়ে পড়ছে। মণিময় ভাবছে, রেখার বিয়ে স্থির হলে এই গ্রামের বাসিন্দাদের অধিকাংশকেই নিমন্ত্রণ করতে হবে। বলতে গেলে গোটা গ্রামবাসীই নিমন্ত্রিত হবে। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে যে জমিটুকু পড়ে আছে, তাও বিক্রি করে দেবে মণিময়। নিজের মান বাঁচানোর ব্যবস্থা তো নিজেকেই করতে হবে! এই গাঁয়ের নিচুস্তরের লোক থেকে আরম্ভ করে গরিব মেহনতি মানুষ, মধ্যবিত্ত স্তরের মানুষ প্রত্যেকে যাতে রেখার বিয়েতে অংশ নিতে পারে সেই ব্যবস্থাই করবে মণিময়। কিন্তু সুনির্মল কেন জানাচ্ছে না বিয়ের তারিখটা। এটাও মণিময়ের মনে সন্দেহের দানা বাঁধতে শুরু করেছে। শোভার সামনে তো

এব্যাপারে কোনো কথাই বলা যায় না। যাকগে আর দু-চার দিন অপেক্ষা করে মণিময় ভাবছে নিজেই ফোন করে জেনে নেবে। এখনও ছোটো বোন কল্যাণীকেও কিছুই জানায়নি। রাস্তা সংস্কারের নামে রাস্তার যা হাল হয়েছে তাই মণিময় অতি সাবধানে এগোতে লাগল। বেশ কটা দিন কেটে গেছে। রেখার বিয়ের দিন ধার্য হওয়াতে নয়নপুরে যেন আনন্দের বন্যা বইতে শুরু করেছে। এই বিয়ের ব্যাপারে হরিমোহনের ভূমিকা যে অগ্রগণ্য তা নয়নপুরবাসীদের জানতে আর বাকি নেই। মণিময়ের বাড়িতে এখন হরিমোহনের অবাধ যাতায়াত চলছে। লাবণ্যও এসে গেছে দুদিন। দুই পরিবারে এখন সুসম্পর্ক তৈরি হয়েছে। মণিময়ের খবর পাওয়ার পর দীনুও এসেছিল। দীনুর দোকান থেকেই বিয়ের কাপড়চোপড় সব আসবে। তা ছাড়া দীনু সব ব্যাপারেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। স্যার-এর প্রতি তার অগাধ সম্মান প্রদর্শনের ফলস্বরূপই দীনু মণিময়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে আবার অসীমের একটা ইন্টারভিউ এসেছে কোলকাতা থেকে। খুব সম্ভবত একটা বেসরকারি সংস্থার করণিক পদের জন্য। আজ বুধবার, সামনের সোমবার ইন্টারভিউ। রোববার বিকেলেই চলে যেতে হবে অসীমকে। মণিময় স্কুল থেকে ফিরেই অসীমকে ডেকে নিয়ে বসল আলাপ আলোচনা করতে। শোভার ভাল লাগছিল না এইসব আলোচনা। কতই তো ইন্টারভিউ দিল ছেলেটা, কিছুই তো হচ্ছে না। আবার তাই নিয়েই আলোচনা! বিরক্তিকর। আসলেও অসীমের বেকারত্ব আদৌ ঘুচবে কি না কে জানে। শোভার আজকাল এসব নিয়ে ভাবতে আর ভাল লাগে না। সামনে এত বড় একটা অনুষ্ঠান! কীভাবে কী হবে ভাবতে গেলেই টেনশন বেড়ে যায়। এর মধ্যে আবার অসীমের চিন্তা। শোভা মণিময়ের জন্য চা করতে চলে গেল। মণিময় আগ্রহী হয়ে অসীমকে বলল, কী রে অসীম, রোববারেই যাবি তো! ঠিকঠাকভাবে ইন্টারভিউটা দিয়ে আয়। হলে হয়েও যেতে পারে। অসীম প্রায় নেতিবাচক সুরেই বলল, কী যে বল বাবা, কত ইন্টারভিউই তো দিলাম। এটা তো নতুন কিছু নয়। দিয়ে তো আসি। কিন্তু পাবার আশা আমার মোটেও নেই। মণিময় হেসে ফেলল। এ তো হাসিরই কথা। আজকাল তো একটা চাকরি জোটানো ভাগ্যের ব্যাপার। সেখানে শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রতিভা, অভিজ্ঞতা কোনোটাই বিচারের মধ্যে পড়ে না। এ যুগে সরকারও চাকুরী দেওয়ার নামে প্রহসন চালাচ্ছে, আর এ তো প্রাইভেট কোম্পানি। এদের কোনো স্থিরতাই নেই। তাছাড়া কে বলবে অসীমের জন্য! কেউ নেই। হঠাৎ মণিময়ের খুব কষ্ট হল অসীমের জন্য। তাই অসীমের পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনার সুরে বলল, দেখ্ বাবা, অত মন খারাপ করিস না রে, অন্তত পক্ষে আমার সামনে তো নয়ই। আমার খুব কষ্ট হয়। তোদের দুজনের কোনোরকম কষ্ট আমি সহ্য করতে পারি না। শোভাকে দেখে অসীম মণিময়কে বলল রসিকতা সুরে, ঐ দেখো বাবা, তোমার দারোগা বউ আসছে তোমার জন্য চা-মুড়ি নিয়ে। মণিময় বুঝল, পরিবেশটাকে হাল্কা করার জন্যই অসীম

এইভাবে কথাগুলি বলল। মণিময় হেসে ফেলল। শোভা অসীমের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দুজনের চায়ের কাপ মুড়ির বাটি রেখে চলে গেল। দুজনে বসে কথা বলতে বলতে সন্ধ্যা হয়ে এল। অসীম খাওয়া শেষ করে মণিময়কে বলল, বাবা, আর নয়, অনেক হয়েছে! এবার ঘরে চলো তো! পোশাকটা পর্যন্ত ছাড়নি এখনও। চলো, ওঠো — বলে একরকম জোর করেই অসীম মণিময়কে ঘরে নিয়ে গেল। অসীম বেরিয়ে গেল টিউশনি করতে। অসীম ভাবল, কলকাতা যখন যাচ্ছেই, তখন একবার রেখার শ্বশুরবাড়ি ঘুরে এলে মন্দ হয় না। অবশ্য যদি মণিময় যেতে বলে তবেই অসীম যাবে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হয় টিউশনির বাড়িতে। দীনুদার বাড়ি পার হয়ে যেতে হয়। চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত এগুলি তো চালিয়েই যেতে হবে।

সময়মতোই শেষ হয়েছে ইন্টারভিউ। তাই অসীম মণিময়ের কথামতো রওনা হল সোনারপুরের দিকে। ঠিকানাও মণিময় দিয়ে দিয়েছে। সেই অনুযায়ী সুনির্মলবাবুর বাড়ি পৌঁছাতে অসীমের বেগ পেতে হল না। বিকেল হয়ে গেছে। সূর্য অস্ত যেতে বসেছে প্রায়। ট্রেন থেকে নেমে একটা রিকশা নিয়ে নিল। যেতে যেতে যতটুকু অসীমের চোখে পড়ল, ততটুকুতে অসীমের সোনারপুর সম্পর্কে মন ভরল। রাস্তার ধারে সারিসারি গাছ আছে ঠিকই, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নেই বললেই চলে। রাস্তাগুলোও অত মসৃণ নয়। সুনির্মলের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অসীম ভাল করে লক্ষ করল, বাড়িটা ছোটো হলেও খুবই রুচিপূর্ণ। আশেপাশের পরিবেশ ততটা ভাল নয়। বাড়ির অনতিদূরে একটা মন্দির লক্ষ করা যাচ্ছে। কালীমায়ের মন্দিরই হয়তো হবে। এছাড়া একপাশে রিকসাস্ট্যান্ড, অপর পাশে অটোস্ট্যান্ড। আশেপাশে ঘনবসতি চোখে পড়ল না অসীমের। যেসব বাড়িঘর আছে, তা খুবই সাধারণ মানের, এর মধ্যে সুনির্মলবাবুর বাড়িটাই চোখে পড়ার মতো। অসীমের খুব ভাল লাগল এই ভেবে যে রেখা এই বাড়িটাতে থাকবে। অসীম শিয়ালদার একটা অতি সাধারণ হোটেলে উঠেছে। কাল ভোরেই নয়নপুর চলে যাবে। সোনারপুরের থেকে দূরত্ব অনেকটাই, তাই তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। কলিংবেল টিপল অসীম। দেখল সামনে ছোটো একটা ফুলের বাগানও রয়েছে। সুনির্মল এসে দরজা খুলে অসীমকে দেখে ঠিক চিনতে পারল না। অসীম ঘরে ঢুকে প্রণাম করে নিজের পরিচয়টা সেরে নিল। সুনির্মল পরিচয় পাবার পর অসীমকে জাপটে ধরল। উচ্ছ্বসিত হয়ে সুনির্মল বলল, তোমাকে তো কত ছোটো দেখেছি। তাছাড়া আমরা যেদিন গেছিলাম সেদিন তো তুমি আমাদের সামনে আসনি। যদিও বেশিক্ষণ ছিলাম না, যাই হোক — তুমি কিছু মনে কোরো না বাবা, আমি তোমাকে একবারেই চিনতে পারিনি। বোসো, বোসো। অসীম সোফায় বসল। বলল, না, না, জেঠু — ঠিকই আছে। চিনতে না পারারই তো কথা। আপনার শরীর ভাল আছে তো? অসীম দেখল, সুনির্মলের চেহারাটায় একটু বিধ্বস্তভাব রয়েছে। বয়স তো হয়েছে মোটামুটি কম নয়। এর জন্য হতে পারে। সুনির্মল বলল, না, শরীর খারাপ নয়। তবে বিয়ের

একটা টেনশন তো রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন না হচ্ছে ততক্ষণ তো ভীষণ চিন্তা। তাই না বাবা? তোমার নাম তো অসীম! অসীম ঘাড় নেড়ে উত্তর দিল। আর কাউকে দেখতে না পেয়ে অসীম বলে উঠল, জেঠিমা বাড়ি নেই বুঝি! দেখতে পাচ্ছি না। সুনির্মল হেসে বলল, না, তোমার জেঠিমা ওর ছোটোবোনের বাড়ি গেছে। কাছাকাছিই, গড়িয়াতে বাড়ি। ছেলের বিয়ের কথা জানাতে। তুমি বোসো, চলে আসবে। অসীমের মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। এতদূরে এসে শুধু সুনির্মলের সঙ্গে দেখা হবে এটা যে ভাবতে পারছে না। তাই সুনির্মলকে জিজ্ঞেস করল, রাজুদা কখন আসবে জেঠু? আমায় তো তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে। এতটা পথ যেতে হবে তাই। সুনির্মল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক রাজু আসতে! আমাদের এখান থেকে হাইকোর্ট তো অনেকটা দূর, তাই অনেক সময় রাত আটটা, সাড়ে আটটাও বেজে যায়। সময়ের ঠিক থাকে না। সুনির্মলের কথা শুনে অসীম এ ব্যাপারেও আশাহত হল। মনে মনে ভাবল, ফোন করে এলেই সবচেয়ে ভাল হত। অন্ততপক্ষে সুনির্মলের স্ত্রী তো বাড়ি থাকত। অসীম ধীর কণ্ঠে বলল, আমি তো আর বেশিক্ষণ বসতে পারব না। আমি এখানকার রাস্তাঘাট ভাল চিনি না, তাই রাত হওয়ার আগেই আমি বেরিয়ে পড়ব। অসীমের ইচ্ছে ছিল বিয়ের প্রস্তুতি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করার। কিন্তু মন থেকে সায় দিল না বলে কিছুই বলতে পারল না। সুনির্মল অসীমের যাওয়ার কথা শুনতেই তীব্র আপত্তি জানাল। বলল, একী বলছ তুমি, যাবে কি হে, তোমার তো কিছু খাওয়াই হল না! আর তুমি বলছ চলে যাবে। হবু কুটুম বাড়ির মানুষ বলে কথা! আর শোনো অসীম, তোমার আজ যাওয়া হবে না বাবা। তোমাকে আজ রাতটা এখানে থাকতেই হবে। কোনো অজুহাত আমি শুনব না। অসীম বুঝল, সে মহা বেকায়দায় পড়েছে। যেভাবে হোক এখান থেকে ছাড়া পেতে হবে। তাই নম্র হয়ে বলল না জেঠু, আমি আজ থাকতে পারব না। কাল দুপুরের আগে আমার নয়নপুর পৌঁছাতে হবে। তাছাড়া কাল ভোরে কালীঘাটে গিয়ে পুজো দিয়ে যেতে হবে। এটা মায়ের আদেশ। তাই এখানে থাকতে পারব না। পরে এসে থাকব। আমাকে ভুল বুঝবেন না জেঠু। আর খাওয়া ? সে আমি কদিন পরে আবার আমায় কলকাতায় আসতে হবে। তখন এসে জেঠিমার হাতের রান্না পেটপুরে খেয়ে যাব। এনিয়ে আপনি একটুও ভাববেন না। সুনির্মল হঠাৎ কী ভেবে নিয়ে অসীমকে বলল—, তা বাবা — তোমাকে তো জিজ্ঞেস করাই হয়নি, তুমি কী দরকারে কলকাতায় এসেছ? তাও আবার মাত্র দুদিনের জন্য? অসীম আসার আগেই ভেবেছিল ইন্টারভিউর ব্যাপারে কিছু বলবে না। কিন্তু গুরুজনের কাছে মিথ্যে বলার শিক্ষা যে মণিময় দেয় নি। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলতে হল অসীমকে, জেঠু — আমি একটা প্রাইভেট সংস্থায় ইন্টারভিউ দিতে এসেছি। সুনির্মল হেসে বলল, বাঃ বেশ, বেশ, সে তো খুব ভাল কথা — তা অফিসটা কোথায়? অসীম চিন্তা করে বলল, এসপ্লানেড-এ ওদের

মেইন অফিস। এছাড়া ছোটোখাট আরও ব্রাঞ্চ আছে। সেগুলোর খবর অবশ্য আমি জানি না, বলে অসীম ভাবতে লাগল, এখানে এসে লাভ হল কী! এককাপ চাও কপালে জুটল না। সেই কখন ভাত খেয়ে বেরিয়েছে, খিদেয় পেট চোঁ, চোঁ করছে। সুনির্মলও তো কিছু এনে দিতে পারত ভেতরের ঘর থেকে! ওদের ঘরে কি বিস্কুটও থাকে না। দুটো বিস্কুট খেয়ে জল খেলেও খিদের ভাবটা অনেকটাই কমত। এখন অসীমকে বাইরে গিয়ে কিছু একটা খেয়ে নিতে হবে। শহরের মানুষের এই দোষ। মুখের ভদ্রতা যথেষ্টই, কিন্তু গ্রামের মানুষের মতো আন্তরিকতা ততটা নেই। ফ্রিজ থাকলে তো কিছু মিষ্টিটিষ্টি থাকার কথা। তাও হয়তো নেই। যাকগে - অসীম বুঝল, বৃথাই এখানে একজন বয়ঃবৃদ্ধের সামনে বসে থাকা। এবার ওঠা দরকার। অসীম নিজে যথেষ্ট বিচক্ষণ। তাই রেখা যে বাড়িতে আসবে, থাকবে, সেই পুরো বাড়িটা না দেখে যাওয়াটা নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে। তাই অসীম বুদ্ধি করে সুনির্মলকে বলল, জেঠু, আমি একটু বাথরুমে যাব। সুনির্মল উঠে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ, হ্যাঁ এসো আমার সঙ্গে বলে ভিতরে নিয়ে গেল। অসীম মনের সাধে পুরো বাড়ির প্রত্যেকটা ঘর, বারান্দা সব ঘুরে ঘুরে দেখে নিজের ইচ্ছা পূরণ করে নিল। তারপরেই সুনির্মলকে বলে ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। বাড়িটা ভালই লেগেছে অসীমের। সবরকম সুব্যবস্থাই আছে। ভালই লাগল অসীমের যে, রেখা এই বাড়ির বউ হয়ে আসবে। আরামেই থাকবে। রেখার বিবাহিত জীবন যেন সুখশান্তিতে ভরা থাকে। ঈশ্বরের কাছে অসীমের এটাই প্রার্থনা। মঙ্গলবার দুপুরের আগেই অসীম বাড়ি পৌঁছে গেল। অসীম কলকাতা যাওয়ার পর রোববারই বিকেলের দিকে মণিময় হরিমোহনের বাড়ি গিয়ে বিয়ের তারিখ জানিয়ে আলাপ আলোচনা করে এসেছে।

দুপুরের কড়া রোদে নয়নপুর যেন ঝলসে যাচ্ছে। এরই মধ্যে রাস্তার কাজ চলছে পুরোদমেই। হরিমোহনের তদারকিতে দ্রুত কাজ এগোচ্ছে। তাও দুপুরের পরে আর হরিমোহন বেরোয় না আজকাল। খাওয়াদাওয়ার পর বিশ্রাম করতেই মন চায়। তাই লাবণ্যও একটু সুখের মুখ দেখতে পাচ্ছে। হরিমোহনের চেষ্টায় রঞ্জনকেও ঢোকানো হয়েছে সাব-কন্ট্রাকটর পদে। কিছু টাকা ব্যয় করতে হযেছে হরিমোহনের। এখন দেখা যাক রঞ্জন কতদিন কাজ করে। এই সামান্য বিদ্যায় আর কী ভাল কাজই করতে পারবে রঞ্জন! যে কোনো কাজকেই পরিশ্রম দিয়ে সার্থক করে তুলতে হয়। রঞ্জনের পক্ষে এসব কিছুই বোধগম্য নয়। হরিমোহনের কথায় বাধ্য হয়েই কাজে যোগ দিয়েছে রঞ্জন। প্রত্যেক মা-বাবাই সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে। তেমনি হরিমোহন লাবণ্যও শেষ পর্যন্ত ভেবেচিন্তে রঞ্জনকে একটা পথ ধরিয়ে দিয়েছে। আজ দুদিন যাবৎ কাজে যাচ্ছে রঞ্জন। বাড়িতে দুপুরে এসে খেয়ে যায়। পাশের গ্রামে একটা স্কুলের দালানবাড়ির কাজ শুরু হয়েছে এক কন্ট্রাকটারের আন্ডারে। সেখানেই রঞ্জন যায়। লাবণ্য বা হরিমোহন কেউই কাজের ব্যাপারে রঞ্জনকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেনি এখনও। আগে দেখাই যাকনা, রঞ্জন এই কাজে টিকে থাকতে পারে কিনা। রোববার বিকেলে মণিময়

এসেছিল। সেও খুব উৎসাহ দেখিয়ে গেছে রঞ্জনের ব্যাপারে। লাবণ্য পান চিবোতে চিবোতে এসে হরিমোহনকেও একটা পান দিল। খাওয়াদাওয়ার পাট শেষ করে লাবণ্য এইমাত্র অবসর হয়ে এল। ফ্যানটা চালিয়ে জানালা বরাবর চেয়ারটায় বসল। হরিমোহন লাবণ্যকে বলল, দেখ্‌লে তো মণিময় স্যার এসে কত আলাপ আলোচনা করে গেল! আমার মনটা একদম জুড়িয়ে গেছে। এবার রেখার বিয়েটা ভালয় ভালয় হলেই হয়। লাবণ্য বলল, কেন? ভালভাবে না হওয়ার তো কোনো কারণ নেই। স্যার তো আর যেমন তেমন মানুষ নন। তাঁর অর্থকড়ি কম থাকতে পারে, কিন্তু জনপ্রিয়তা? সেটা একবার ভেবে দেখো। এই নয়নপুরে স্যারের মতো মানুষ আর আছে কিনা। হরিমোহনের মুখে উজ্জ্বলতার ছাপ। লাবণ্যর কথা শুনে হরিমোহন বলল, ঠিকই বলেছ। একশো শতাংশ ঠিক। আমার মনে হয় এইজন্যই রেখারও ভাল ঘরে, ভাল বরে বিয়ে হচ্ছে। তাই নয় কী? লাবণ্য হরিমোহনের কথায় সায় দিয়ে বলল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, ভাল কাজের ভাল ফল তো একটা পাওয়াই যায়। জীবনে তো মণিময় স্যার কারুর উপকার ছাড়া অপকার করেন নি, তা হলে ঈশ্বরই বা এমন মানুষের ক্ষতির কথা ভাববেন কেন! হরিমোহন গম্ভীর হয়ে রইল। মনে মনে ভাবল — লাবণ্য তাকে উদ্দেশ্য করেই কথাগুলো বলেছে। এ ব্যাপারে হরিমোহন নিশ্চিত। লাবণ্য এখনও সুযোগ পেলেই হরিমোহনকে খোঁচা দেয়। অতীতের সব ঘটনা নিয়ে লাবণ্য প্রায়ই হরিমোহনকে কথা শোনায়। হরিমোহন এজন্য একটুও দুঃখ পায় না বা কিছু মনেও করে না। স্ত্রী হিসেবে লাবণ্যর কথা বলাব অধিকার রয়েছে পুরোপুরি। এ যে হরিমোহনের ন্যায্য প্রাপ্তি। হরিমোহনের কুকর্মের কথা কে না জানে। তা হলে লাবণ্য বললে দোষ কী! লাবণ্য দেখল হরিমোহন চুপ করে বসে আছে। মুখে কোনো শব্দ নেই। লাবণ্য বলল, কী হল, চুপ করে গেলে যে! আমি কি কিছু ভুল বলেছি? যাক গে এবার শুয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে নাও, বলে জানালার পর্দা টেনে দিল। দরজাটা ভেজিয়ে চলে এল সামনের ঘরে টি. ভি.- র সিরিয়াল দেখবে বলে। বিকেলে আবার যেতে হবে নিত্যানন্দ কর্মকারের দোকানে। মানে সোনার দোকানে। দীনুর কাপড়ের দোকানের পাশেই এই 'গহনালয়'। লাবণ্য রেখাকে একজোড়া কানের দুল দেবে বলে ভাবছে। এখনও হরিমোহনকে বলা হয়নি। আজকালের মধ্যে না গেলে বানিয়ে দিতে পারবে না। মফঃস্বলের দোকান বলে রেডিমেড কিছুই পাওয়া যায় না। লাবণ্যর সব গহনা এই দোকানেরই তৈরি করা। লাবণ্য ভাবছে হরিমোহনকে সঙ্গে নিয়েই যেতে হবে। একা এতটা পথ যাওয়াটা ঠিক হবে না। তার উপর স্বর্ণকারের সঙ্গে কথা বলা, ওজনের কারচুপি ধরা লাবণ্যর পক্ষে অসম্ভব। ভাবতে ভাবতে তক্তপোষে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল লাবণ্য।

রেখার বিয়ের দিন ধার্য হওয়ার পর থেকেই শোভার মুখে খুশীর ছাপ লেগেই আছে। এতদিনে মায়ের সাধ পূর্ণ হতে চলেছে। এতদিনে ঠাকুর মুখ তুলে চেয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই তাই শোভার প্রাণে আনন্দের জোয়ার বইছে। বাড়িঘরে কাজ শুরু হয়ে গেছে। প্রস্তুতিপর্ব চূড়ান্ত

করার জন্য মণিময় উঠে পড়ে লেগেছে। ইস্কুলে তো যেতেই হবে। তারই ফাঁকে জরুরি কাজগুলো এগিয়ে রাখছে মণিময়। শোভার তো নির্ভরতার জায়গা একটাই আছে, সে হচ্ছে মণিময়। কিন্তু মণিময়ের নির্ভরতার জায়গা কোথায়! অর্থের প্রাচুর্য থাকলে যে কোনো মানুষকেই নির্ভর করা যায়। কিন্তু মণিময়ের তো হিসেবের টাকা। এক ফালি জায়গা ছিল শেষ সম্বল। তাও মণিময় বিক্রি করে দিয়েছে। কোনো উপায় ছিল না আর মণিময়ের। হাত পেতে কোনো সাহায্য চাওয়ার অভ্যাস তো মণিময়ের কোনো কালেই ছিল না। যতটুকু আছে মণিময়ের, তা দিয়েই রেখার বিয়ে হবে। এটুকু মনোবল নিয়েই অগ্রসর হচ্ছে মণিময়। শোভা বারান্দায় বসে রেখার সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। রেখার মনটা আজকাল প্রায়ই খারাপ থাকে। মা-বাবা, দাদাকে ছেড়ে একটা নতুন পরিবেশে নিজেকে কীভাবে খাপ খাওয়াবে, পারবে কী পারবে না, এসবই ওর মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। বিশেষ করে বাবাকে ছেড়ে কী করে থাকবে — এসব ভাবনা রেখার মনে প্রায়ই ঝড় তুলছে। অসীমও এসে বসল রেখার পাশে। রেখাই জিজ্ঞেস করল, কীরে দাদা, এবার তোর চাকরিটা হবে তো! নাকি এবারও ....। অসীম নিরাশ ভঙ্গীতে উত্তর দিল, কী করে বলি বল্ তো! ইন্টারভিউ তো ভালই হয়েছে। কিন্তু শুধু ভাল ইন্টারভিউতে আজকাল চাকরি হয় না রে। অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। কেউ তো নেই আমার কাঠখড় পোড়ানোর জন্য! আমি নিজে নিজে কী করব বল! আমার কথা কে শুনবে! দাদার কথা শুনে রেখার মনে খুব লাগল। কিন্তু শোভা! অসীমের কথাকে পাত্তাই দিচ্ছে না। অসীম কিছুই গ্রাহ্য করল না। রেখাকে বলল, তোর শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে এক কাপ চাও পেলাম না। যাওয়ার আগে ভেবেছিলাম প্লেটভর্তি মিষ্টি খেয়েই ফিরব। আমার কী কপাল ভাব্, তোর হবু শ্বশুর ছাড়া কেউ বাড়িতেই ছিল না। রেখা উত্তর না দিয়ে অসীমের দিকে তাকিয়ে রইল। শোভা বিরক্তি সুরে বলল অসীমকে, ওর সামনে ওর শ্বশুরবাড়ির নিন্দে করার জন্য বসেছিস নাকি রে? অসীম উত্তরে কিছু বলল না। অসীম জানে শোভা এইরকমই। কথা বোঝার আগেই উত্তর দেওয়া চাই। এইজন্য অনেক পরিস্থিতিতে শোভা বেকায়দায় পড়ে যায়। তখন মণিময়কে পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়। রেখা শোভার কথায় মনে মনে একটু বিরক্ত হল। তাই বলল, হঠাৎ করে কী যে বল না তার ঠিক নেই। দাদা নিন্দে করল কোথায়! আর করলেই বা কী! এখনও তো ওরা আমাদের কিছু হয়নি ! শোভা চুপ করেই রইল। ঠিকই তো বলেছে রেখা! আর কেই বা এসব কথা শুনতে আসছে! অসীম রেখাকে রাগাবার জন্য বলল, আমার মনে হয়, তোর শ্বশুরবাড়ির লোকজন খুউব কঞ্জুষ প্রকৃতির। নয়ত ফ্রিজ আছে, অথচ ওটাতে কোনো মিষ্টি রাখা নেই! এটা হতে পারে! বল। রেখা বলল, ওরা যা খুশী হোক। আমার তাতে কী রে! তুই বেরিয়ে মিষ্টি খেয়ে নিলেই তো পারতিস! পয়সা তো ছিলই, তাই না? অসীম কৌতুকের ভঙ্গীতে বলে উঠল, এসব তুই কী বলছিস! তার মানে - তোর বিয়ের পর যদি আমি তোর সঙ্গে দেখা করতে যাই তাহলে তুইও মিষ্টি খাওয়াবি না। তাই তো! রাস্তায়

বেরিয়ে খেতে হবে। তাহলে অন্তত পয়সা দিয়ে দিস বোন। বলে অসীম অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হাসতে লাগল। রেখা রেগে গিয়ে বলল, দেখ্ দাদা — উল্টোপাল্টা কথা একদম বলবি না, আমি কি তোকে তাই বলেছি নাকি? অসীম রেখার গাল টিপে আদর করে বলল, না রে, আমার সুইট সিস্টার, আমি তো জাস্ট ইয়ার্কি করছিলাম তোর সঙ্গে! রাজুদাদের পরিবার খুবই সজ্জন, মার্জিত। তাছাড়া বাড়িটা তো খুবই ছিমছাম, সুন্দর, রুচিশীল। রেখা মুচকি হেসে বলল, থাক্ থাক - আর বলতে হবে না রে দাদা। তোদের পছন্দ হয়েছে, এটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট রে। শোভা ভাইবোনের কথাবার্তায় না থেকে উঠে চলে গেল ঘরে। মণিময় আজ বাজার করে ফিরবে তাই দেরি হচ্ছে। অসীমও উঠতে যাচ্ছিল রেখা হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিল। অসীম বলল, কী রে, চা খাওয়াবি না? আমাকে তো বেরোতে হবে। টিউশনিতে যেতে হবে। রেখা বলল, দাদা, আজকাল আমার অনেক কথাই মনে পড়ে। তোর আমার ছোটোবেলার কথা। বিশেষ করে ঘুমুবার সময়ে বাবা যে আমাদের দুজনকে কত রূপকথার গল্প শোনাত, সেইসব অতীতের কথা। বিয়ে হয়ে চলে গেলে তোরা আমাকে ভুলে যাবি না তো রে দাদা? বলে রেখার চোখ ছল্ ছল্ করে উঠল। অসীম রেখার মাথায় হাত বুলাতে লাগল। মানুষের জীবনে যেই দিনগুলি চলে যায়, সেই দিনগুলি আর কখনো ফিরে আসে না। অসীম গভীর আবেগে বলল। আমরা তোকে ভুলে যাব? দেখবি শ্বশুর বাড়িকে যখন বেশি ভালবেসে ফেল্‌বি, তখন আমাদের কথা ভুলে যাবি। এবং এটাই উচিত রে রেখা। বাবা আমাদের সে শিক্ষাই দিয়েছেন। শ্বশুর বাড়ি গিয়ে সবসময় বাবার মান রাখার চেষ্টা করবি। রেখা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তুইও জ্ঞান দিতে আরম্ভ করে দিলি? অসীমও দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, না, রে রেখা — জ্ঞান নয়। বড় ভাই হিসেবে বলছি কথাগুলি। তাছাড়া তোকে ভোলার কথা তো কোনোদিনই মনে আসবে না। তোর চাইতে আদরের কেউ আমার আছে নাকি! এমন কথা মুখেও আনবি না বোন, রেখা চোখের জল মুছে হেসে ফেল্‌ল। বলল, খুব হয়েছে আমার বড়ভাই। চল্ ঘরে, চা খাবি তো নাকি ! তুই রেডি হয়ে নে। আমি চা করছি। চল্ চল্। বলে দুজনেই চলে গেল ভিতরে। অসীম চা খেয়ে বেরিয়ে গেল। সংসারের টানাপোড়েনে মণিময় জর্জরিত। তবুও ঈশ্বর আজ কৃপা করেছেন, মণিময় রেখাকে পাত্রস্থ করতে চলেছেন। কন্যা দায়গ্রস্ত পিতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে মণিময়। এই সমাজ আজ অর্থের জোরকেই প্রাধান্য দেয়। তাই মণিময় আর্থিক দিক দিয়ে সমাজের কাছে পরাস্ত। আজও বাংলার গ্রামেগঞ্জে মানুষের একের প্রতি অপরের আন্তরিকতা অফুরন্ত রয়েছে। যেটা শহরে ইট-বালি রুক্ষতার মধ্যে চাপা পড়ে গিয়েছে। সেখানে কৃত্রিম আদবকায়দা মানুষের মনকে হৃদয়হীন করে তুলেছে। কারোর সাহায্যে কেউ এগিয়ে আসে না, কারুর দুঃখের ভাগীদার হতে মন চায় না। কৃত্রিমতার ছাপে মানুষ হয়ে উঠেছে অহংকারী, অর্থের লোভে ওয়ে উঠেছে চূড়ান্ত দুর্নীতিবাজ। গ্রামেগঞ্জে — এই ধরনের অমানবিকতা বা অশালীনতা নেই

বললেই চলে। তাই মণিময়ের মনে একটা বিরাট শান্তি বিরাজ করছে যে, নয়নপুরের বাসিন্দারা তাকে এতই সমীহ করে চলে যে অর্থের প্রাচুর্য সেখানে হার মানে। অর্থবল না থাকতে পারে। কিন্তু লোকবল ? সে তো পরিপূর্ণতার নজির সৃষ্টি করে রেখেছে মণিময়ের কাছে। বাহ্যিক আড়ম্বর সে করবে না, রেখার জন্য সে নিঃস্ব হয়ে ও যা করার করবে। কুটুম্বিতারও কোনো ত্রুটি সে রাখবে না। শোভার তো অনেকই চাহিদা। সেই চাহিদা পূর্ণভাবে মেটানো মণিময়ের পক্ষে অসম্ভব। শোভা সবসময়েই এইরকম। মণিময়ের আর্থিক সঙ্গতি কতটুকু সে বুঝতে চায় না। আর এখন তো মেয়ের ব্যাপারে আরও অবুঝ হয়ে উঠেছে। তাই বলে তো মণিময় কারুর কাছে অর্থ সাহায্য চাইতে পারবে না। ধার হিসেবেও নয়। এটা তার নীতিতে বাধে। কিন্তু শোভা তা মানতে নারাজ! ধার করলে তো শোধ করে দিলেই হয়! তাই মণিময় অনেকক্ষেত্রে বুদ্ধি পরামর্শ শোভার কাছ থেকে নেয় না। যেটা নিজের পরিধির মধ্যে সম্ভব, সেটাই মণিময় করে। সেখানে কারুর মতামতই গ্রাহ্য করে না। মণিময় গভীর চিন্তা নিয়ে বসে আছে বিছানার উপর। ইস্কুল থেকে এসে এখনও জামাকাপড়ও ছাড়েনি। শোভা চা করে নিয়ে এসে পাশে বসল। স্বামীর ভাবগতিক তার ভাল ঠেকল না। কিসের এত চিন্তা কে জানে! তবুও সাহস করে শোভা বলল, কী গো এরকমভাবে বসে আছ? পোশাকও পাল্টালে না! কী হয়েছে বলবে তো! মণিময় শোভার হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে খেতে শুরু করল। তবুও মণিময় চুপ করেই রইল। শোভার সহ্য হচ্ছিল না মণিময়ের এই ভাবগম্ভীর চেহারা। তাই জোরেই আবার বলল, কী হল উত্তর দিচ্ছ না যে! মেয়েটা কি তোমার একার? আমারও তো। তাই কী নিয়ে তোমার এত ভাবনা আমাকে খুলে বল। মণিময়ের চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। উঠে দাঁড়িয়ে শোভার দিকে তাকিয়ে বলল, দেখো, তোমার মর্জিমাফিক জিনিস কেনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমার এটা চাই, ওটা চাই। আমার কথাটা ভাববে না? আমার কতটুকু ক্ষমতা আছে সে নিয়ে তোমার কোনো চিন্তা নেই? সুতরাং যা করবে সেটা নিজের ক্ষমতা বুঝে করবে। শোভা মুখটা কালো করে বসে রইল। কিছু বলার হয়তো সাহসই পাচ্ছে না। মনেমনে অভিমান জমতে লাগল। আজ যদি শোভার নিজস্ব সঞ্চিত অর্থ থাকত, তাহলে মণিময়কে অনেকাংশেই সাহায্য করতে পারত। কোনোদিনই শোভা টাকাপয়সা নিয়ে ভাবেনি। কিন্তু স্বামীর জন্য তার ভালবাসার কোনো ঘাটতি কোনোকালেই ছিল না, এখনও নেই। সংসারের হিসাব পত্তর সবই মণিময়ই বহন করেছে। শোভাকে এইসব দায়িত্ব দেয়নি। সংসারে কোন্ খাতে কী খরচ কিছুই জানে না শোভা, বা জানতে চায়ওনি কোনোদিন। হেঁসেল ঠেলা, ছেলেমেয়েদের বড় করা — স্বামীর সেবা করা— এই ছিল শোভার কাজ। নিজের ইচ্ছেমতো টাকা খরচ করার স্বাধীনতাও শোভার ছিল না। এতই সীমিত টাকা যে মণিময়ও কোনোদিন সাহস দেখায়নি শোভাকে দিয়ে সংসার চালানোর দায়িত্ব অর্পণ করতে। এইভাবেই হয়তো স্ত্রীর মর্যাদা কিছুটা হলেও ক্ষুণ্ণ করা হয়। শোভা কি আজ মেয়ের বিয়েতেও

একটু স্বাধীনতা দেখাতে পারবে না? হয়তো পারবে না। টাকাপয়সাই এ ব্যাপারেই বাদ সেধেছে। মণিময়ই বা কী করবে! কাকেই বা বলবে। একমাত্র শোভাকেই তো বলা যায়। হয়তো বা মণিময়ের খারাপ লাগল নিজের এই রূঢ়তার জন্য। শোভাকে এতসব বলা ঠিক হয়নি ভেবে। আবার এসে শোভার পাশে বসল। নম্রভাবে বলল, শোন, এসব কথা বলার আমার কোনো দরকার ছিল না। কিন্তু তুমিই যদি আমার অবস্থাটা না বোঝ কে বুঝবে বল তো? শোভা এবার ফোঁস করে উঠল। নিজেকে সামলাতে না পেরে বলল, আমি বুঝি না? কে বোঝে শুনি! তা ছাড়া আমার কি কোনো স্বাধীনতাই থাকতে নেই! মণিময় বুঝল শোভা অভিমানী হয়ে উঠেছে। তবুও জিজ্ঞেস করল, স্বাধীনতা? কোন্ স্বাধীনতার কথা বলছ তুমি! তোমার কোনো কথাই আমি বুঝতে পারছি না। শোভা মণিময়ের দিকে চোখ বড় করে তাকিয়ে বলল, মানে? তুমি কি কচি খোকা নাকি, যে কিছুই বুঝতে পারছ না! বিয়ের পর থেকে আজ অবধি কোনো টাকা পয়সা আমাকে দিয়েছ? তুমি যা এনেছ তাই খেয়েছি, তুমি যা দিয়েছ তাই পরেছি। কোনোদিন কোনো কথা শুনিয়েছি তোমাকে? আর আজ আমার মেয়ের বিয়েতে আমি নিজের মতো কিছুই করতে পারব না? তাতেও বাধা! কেন, আমার কী অপরাধ! আমার মেয়ের জন্য আমার নিজের কোনো সাধ-আহ্লাদ থাকতে পারে না! রেখা পাশের ঘর থেকে সবই শুনছিল। মণিময় দেখল পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করছে। তাই এ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে রইল পত্রিকা নিয়ে। শোভা বলেই চলেছে, হ্যাঁ— এখন তো পালাবেই! এসব কথার কোনো উত্তর তোমার কাছে আছে কি? কোনো উত্তর নেই। অর্থের প্রাচুর্য আমাদের কোনোকালেই নেই, তাই বলে আমরা তো ভিখারি নই যে, মেয়েটাকে একটু সাজিয়েগুছিয়ে দিতে পারব না! তা হলে দরকার কী ছিল এত বড়লোকের বাড়িতে মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার! লোভ সামলাতে পারনি, তাই না? মণিময়ের মনে দুঃখ হল লোভ কথাটা শুনে। উঠে গিয়ে শোভাকে বলল ধীর স্বরে, লোভ? কীসের লোভ! মেয়ে শ্বশুর বাড়িতে সচ্ছলতায় থাকবে সেটা কোন্ বাবা না চায়। আমি তো ওকে প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ করতে পারিনি। সেটা তুমিও জানো। তাছাড়া সবই নিয়তির বন্ধন। আমরা শুধু চেষ্টা করেছি। বাকিটা ঈশ্বরের কৃপা। সেটা তো তুমিও মান!— বলে মণিময় শোভার দিকে তাকিয়ে রইল। দেখল শোভা চোখের জল মুছছে। মণিময়ের খুব কষ্ট হোলো। শোভাকে সে দুঃখী করতে চায়নি। সত্যিই তো মণিময় শোভাকে সংসারের পুরো দায়িত্ব দেয় নি। সবসময়েই ভেবেছে, হয়তো বা সবমিলিয়ে শোভা গলদ্‌ঘর্ম হয়ে যাবে। পারবে না সামলাতে। তাই নিজের কাছেই টাকাপয়সা রেখেছে। এতে কি স্ত্রীর স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হতে পারে? এ প্রশ্ন আজ মণিময়ের মনেও জাগছে। তাই মণিময় শোভাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ঠিক আছে — আমারই ভুল হয়েছে। তোমাকে আমি কালকেই কিছু টাকা দিয়ে দেব। তুমি সেই টাকাগুলো নিজের

মর্জিমাফিক খরচ কোরো, কেমন! এবার ওঠোতো। আমাকে তো কোনো খাবারও দিলে না! আমার তো খিদে পেয়েছে! বলে মণিময় শোভাকে হাত ধরে টেনে উঠিয়ে দিল। পরিবেশ অনেকটাই শান্ত করে দিয়েছে মণিময়। রেখা এল মায়ের সামনে। বাবার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। বাবার জন্য ছোটোবেলার থেকেই রেখার আলাদা একটা টান রয়েছে। রেখা বলল শোভাকে, বাব্বা, অনেক হয়েছে মা। তুমিই শেষপর্যন্ত জিত্‌লে। বাবার কিন্তু তুলনা হয় না। তবুও তুমি বাবাকেই দোষ দাও! যাকগে তোমরা দুজনে এখানে বসে ভাল ভাল কথা বল। ঝগড়া কিন্তু একদম নয়। আমি দেখি কী খাবার বানানো যায়। বলে রেখা রান্নাঘরে গেল। শোভার চোখ আরও ছলছল করে উঠল। রেখা আছে বলেই না আজ শোভাকে উঠতে হল না। এরপর কে ভাববে শোভার জন্য। সংসারের কাজের ব্যাপারে ভাববার আর কেউ থাকবে না। মণিময় কৌতুক ভঙ্গীতে বলল, দেখলে তো আমার মেয়ের কত গুণ! আরাম করে নাও কিছুদিন। তারপর কী হবে! বুঝতে পারছ তো? শোভার কথা বলার কোনো ইচ্ছে ছিল না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল, মেয়েটা শুধু তোমার নয়, রেখা চলে গেলে আমি এ ঘরটাতে কী করে থাকব! ভাবতে পারছিনা। মণিময় সহজ ভঙ্গীতে বলল, দূর এসব কথা ছাড় তো! তাছাড়া মেয়ে তো পরের জন্যই। প্রথম প্রথম কষ্ট হবে ঠিকই, তারপর আস্তেআস্তে সব ধাতস্থ হয়ে যাবে। আর কারুর যেন মেয়ের বিয়ে হয় না। শোভা মণিময়ের কাছ থেকে সান্ত্বনা পেয়ে মনেমনে খুশীই হল। তবুও হৃদয়ের এক কোণে মাতৃত্ববোধের নিদর্শন থেকেই যায়। যা কেউই মুছে দিতে পারে না। দুজনের এই আলাপ আলোচনার মাঝে এল রেখা। ট্রেতে করে দু কাপ চা, বাটিতে করে চিড়ে ভাজা ওপরে নারকেল কোরা দিয়ে নিয়ে এল। এই খাবার মণিময়ের খুব পছন্দের, জানে রেখা। রেখা মণিময়কে খাবারটা দিয়ে বলল হেসে, নাও, বাবা খাও। আর তো বেশিদিন পারব না তোমাদের সেবা করতে, সে অধিকারটুকু তোমরাই কেড়ে নিচ্ছ। আমি তো তোমাদের ঘাড়ের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছি — তাই না বাবা? শোভা উঠে রেখাকে জড়িয়ে ধরে বলল, এ তুই কী বলছিস মা? তুই আমাদের লক্ষ্মী। ঘাড়ের বোঝা হয় কোন্ মেয়ে মা-বাবার কাছে? বিয়ে তো দিতেই হয়। এটা চিরাচরিত রীতি যে মা। তুই শিক্ষিত মেয়ে, তুই তো আরও ভাল জানিস রে। বলে শোভা রেখাকে আদর করতে লাগল। মনের মধ্যে যে তোলপাড় হচ্ছে সেটা আর বুঝতে দিল না শোভা। পুরোটা দুঃখ নিজেকেই সইতে হল। মা-র জ্বালা অতি বিষম বস্তু, যার কোনো বিকল্প হয় না। সবাই জানে, ভগবানকে চোখে দেখা যায় না। কিন্তু বাস্তবে মা-ই হচ্ছে ভগবানের সমসাময়িক। সুসন্তান যারা, তারা মাকে সেই রূপেই সেবা-যত্ন করে। মণিময়ের দুই সন্তানই এ ব্যাপারে অতুলনীয়। রেখা, নিজের চোখের জল লুকোবার জন্য দৌড়ে এ ঘর থেকে চলে গেল। শোভা ভাবতে লাগল, রেখা-অসীমকে কত দুঃখ, কষ্টর মধ্যে বড় করে তুলেছে। কত না অভাব ওদেরও সইতে হয়েছে। সেদিনকার দিনগুলির কথা মনে পড়লে শোভার বিভীষিকাময় লাগে। অনেক সাধ-

আহ্লাদ মেটাতে পারেনি ওদের। কিন্তু মণিময়ের শিক্ষা, সংস্কার দুই ছেলে মেয়েকেই এইসব চাহিদার ঊর্ধ্বে রেখেছে। বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে ভাবতে শিখিয়েছে মণিময়। সন্তানদের প্রতি মণিময়ের দায়িত্ব-কর্তব্য নিয়ে কোনো দ্বিমত পোষণ করা যায় না। শোভা আজ অবধি সে সাহস পায়নি। সমস্যা বিজড়িত সংসারে মণিময়ই তো সব সামলে রেখেছে। শোভাকে এ ব্যাপারে কোনো চিন্তাই করতে হয়নি। এজন্য শোভা সর্বদাই কৃতজ্ঞ মণিময়ের কাছে। এক এক করে দিন এগিয়ে আসছে। সঙ্গে কাজও এগিয়ে যাচ্ছে। বাড়িঘর সংস্কারের কাজ শেষ হয়ে গেছে। অসীম কয়েকটা ফুলের টব এনে রেখেছে বারান্দায় সারি সারি করে। ভালই লাগে দেখতে। মণিময় এতক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাই দেখছিল। ছেলেটার সৌন্দর্যবোধ আছে বলতে হবে। টিউশনির পয়সা দিয়ে এনে বাড়ির সৌন্দর্যকে বাড়িয়েছে। এমনিতে বাড়িটা তো খুবই আটপৌরে। রেখার শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেই হয়তো ওর মাথায় এসেছে ফুলের টবের। গেট্‌টাকে বেড়া পাল্টে টিনের করে দেওয়া হয়েছে। আর কিছু বাকি রয়েছে কিনা তাই দেখছিল মণিময়। সুনির্মলের ফোন প্রায়ই আসে রাতের দিকে যখন অসীম বাড়ি থাকে। উনি রেখার সঙ্গেও কথা বলেন, শুধু কথা নয় হাসি-ঠাট্টাও করেন। মাঝেমধ্যে সুনির্মলের স্ত্রীও শোভার সঙ্গে বিয়ের আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করে। রাজু একদিনই কথা বলেছিল, তাও অসীমের সঙ্গে, রেখার সঙ্গে নয়। তাই রেখার একটু মনটা খারাপ লাগে। হয়তো বা লজ্জা পায়, তাও হতে পারে। অসীমের সঙ্গে দেখা হয়নি বলে পরদিনই রাজু ফোন করে অসীমের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছিল। আর করেনি। দুই পরিবারের মধ্যে এখন থেকেই একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এটা ভাবতেও ভাল লাগছে মণিময়ের। অনেকক্ষণ বসে পত্রিকাটা শুধু নাড়াচাড়াই করছে, পড়তে মন বসছে না। নানা চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। সন্ধ্যা কখন হয়ে গেছে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। মশার উৎপাতে বসা যাচ্ছে না। উঠতে গিয়ে দেখল গেট দিয়ে উপেন ঢুকছে। খবরাখবর নিতেই এসেছে হয়তো। উপেনদার তো পরের ব্যাপারে সর্বদাই কৌতূহল বেশী।

মণিময় দেখে একগাল হাসি দিয়ে বলল, আরে উপেনদা যে, আসুন, আসুন, বলে বসার ঘরে নিয়ে বসাল। বসার ঘরটা নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। সোফাগুলোকে নতুন করা হয়েছে। কভারগুলো লাগানো হয়নি। তবুও মনে হচ্ছে সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম। উপেন এসে দেখে একটু অবাকই হল। বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, বাঃ, খুব সুন্দর লাগছে তো ঘরখানা। এ তো তোমার কম্ম নয়। তা কে করল এসব? মণিময়ের খুউব ভাল লাগল শুনতে। আগে কেউ কোনোদিন এসব বলেনি তাই। মণিময় একটু হেসে বলল, কে আর, এসব অসীমের কাণ্ড। সেই ঘরের ওলটপালট করছে। রেখার বিয়ের জন্য তার করার আর শেষ নেই। রোজই কিছু না কিছু করেই যাচ্ছে। সামান্য পয়সায় যা করা যায় আর কী, বলে মণিময় শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে

উপেনকে বলল, বসুন দাদা বসুন। শুনেছি ঢাকনাও নাকি বানাতে দিয়েছে। সাথে পর্দাও আছে। মণিময়ের কথা শুনে উপেনের মন খুব তৃপ্ত হল। বলল, ভাই, তুমি তো ভাগ্যবান হে। অসীমের মতো ছেলে তোমার পাশে রয়েছে। হোক না সামান্য পয়সা, তাই বা কে করে বল? তবে ছেলেটার রুচিজ্ঞান আছে বলতে হবে। উপেনের কথায় মণিময় গর্ববোধ করল। সন্তানের প্রশংসা শুনতে কার না ভাল লাগে। মণিময় রেখাকে ডেকে বলল চায়ের কথা। উপেন মণিময়কে বলল কতটুকু এগোলে ভায়া। এই প্রথম তোমার বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান। অনেক কাজের চাপ, তাই না? তা তুমি ছুটি নিচ্ছ কবে থেকে? মণিময় একটু ভেবে চিন্তে বলল ছুটি তো বেশি আগে নিয়ে লাভ নেই। তাই ঠিক করেছি বিয়ের দুদিন আগে থেকে পনের দিনের ছুটি নেব। উপেন মণিময়ের কথায় সায় দিয়ে বলল হ্যাঁ তা ঠিক আছে, বিয়ের দিন তো ধার্য হয়েছে ডিসেম্বরের আট তারিখ, তাই তো? তুমি তো ভায়া এক মাসের ছুটিও নিতে পার, তোমার তো অনেক ছুটি পাওনাও হয়েছে। মণিময় বলল, না দাদা, এতদিন ছুটি নিয়ে কী করব! পনের দিনই যথেষ্ট। রেখা চা নিয়ে এল। উপেন রেখাকে দেখে হেসে বলল, কী রেখা আমাদের ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যাচ্ছিস? রেখা একটু লজ্জার ভাব দেখাল। বলল কী আর করব জেঠু — মা-বাবা তো উঠে পড়ে লেগেছেন আমাকে তাড়াবার জন্য। আমার কী করার আছে বলো! বলে মাথা নিচু করে চলে গেল। উপেন রেখার কথা শুনে হা - হা করে সজোরে হেসে উঠল। মণিময় হাঁ করে তাকিয়ে রইল। উপেনদার এইরকম প্রাণখোলা হাসি মণিময় কোনোদিনই দেখে নি। আজ তাহলে কী হল! শুধু রেখার মন্তব্যেই কী উনি এতটা আত্মতুষ্টি পেলেন? উপেন চা খেতে গিয়ে মণিময়কে বলল, ভাই, অনেকদিন বাদে রেখা মায়ের কথায় প্রাণখোলা হাসি হাসলাম। সত্যি মণিময়, তোমার দুটি সন্তানই অতুলনীয়। এই গাঁয়ের গর্বও বলতে পার। মণিময়ের এইসব আলাপ - আলোচনার মাঝে রতীশের কথা মনে পড়ল। উপেনের কাছেই ঠিকানা বা ফোন নম্বর পাওয়া যাবে ভেবে মণিময় বলল, দাদা, একটা কথা মনে পড়ে গেল। সেটা হচ্ছে রতীশের নাম্বার বা ঠিকানা তো আমার লাগবে। বিয়ের কার্ড তো পাঠাতে হবে। আর মোবাইল নম্বর পেলে তো কথাই নেই, আমি নিজে বলে দেব ওদের বিয়েতে উপস্থিত থাকার জন্য। উপেন ভাবল — মণিময় এতটাই বিচক্ষণ যে কোনো দায়িত্ব কর্তব্যই সে এড়াতে পারে না। উপেন খুব খুশী হল মণিময়ের কর্তব্যপরায়ণতায়। নয়ত রতীশ উপেনের ভাই বটে, কিন্তু মণিময়ের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ খুবই কম হয়েছে। সেক্ষেত্রেও মণিময়ের এতটা স্বজনশীলতায় উপেন বিস্মিত। তাই উপেন উৎসাহিত হয়ে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় দেব তোমাকে। দুটোই আছে আমার কাছে। আসবে কিনা জানি না, তবে আমার স্থির বিশ্বাস কেউ না এলেও রতীশ অবশ্যই আসবে। তা ছাড়া সবাই যদি আসেও, তোমাকে এও বলে দিচ্ছি — ওদের থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা আমার বাড়িতেই হবে। তোমাকে এ নিয়ে

চিন্তা করতে হবে না। মণিময় এটা খুব ভালই জানে — রতীশ যেহেতু উপেনদার ভাই, তাই সে উপেনদার বাড়িতেই থাকবে। এ নিয়ে চিন্তা মণিময়ের মোটেও নেই। মণিময় তাই কিছুই বলল না এ ব্যাপারে। শুধু বলল, তা হলে কাল আপনি স্কুলে নিয়ে আসবেন তো ঠিকানা এবং ফোন নম্বর ? উপেন হেসে বলল, নিশ্চয়ই ভাই, এনে তোমাকে দিয়ে দেব। পরে আমি কথা বলব ওর সঙ্গে, বলে উপেন ঘড়ির দিকে তাকাল। উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। মণিময় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বলল, আরে, উঠছেন যে! এত তাড়া কিসের ? কোথাও যাবেন নাকি ? উপেন বলল হ্যাঁ — বাজারের দিকে যাব। তোমার বৌঠানের ওষুধ আনতে হবে। মণিময় আর বাধা দিল না। বলল, দাদা — একদিন বৌঠানকে নিয়ে আসুন না, নয়ত হীরককে দিয়েও তো পাঠাতে পারেন। একটু গল্পটল্প করে যাবে। মনটাও ভাল লাগবে। পাঠিয়ে দিলে আমিও তো পৌঁছে দিতে পারব! উপেন মণিময়ের কথায় সায় দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। শোভা সামনে এল না এক মিনিটের জন্যও, উপেন এতক্ষণ থেকে গেল। সবই মণিময় লক্ষ করল। কিছু বলতে গেলেই তো হাজার কথার সম্মুখীন হতে হবে। শোভা উপেনকে পছন্দ করে না এটা ঠিক-কিন্তু বাড়িবয়ে খবরাখবর নিতে এসেছে উপেন তাও শোভার দায়িত্ব ছিল না কি একটিবার এসে কুশল মঙ্গল জানবার ? মণিময় এসব একদম পছন্দ করে না, তাই মনেমনে খুব ক্ষুব্ধ হল। শোভার এই ধরনের কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণ স্থান, কাল, পাত্র বিশেষে অভাবনীয় রূপে প্রায়ই লক্ষ করা যায়। এই স্বভাব আর পরিবর্তন হওয়ার নয়। উপেনদা কী ভাবলেন কে জানে! তিনি তো শোভার খোঁজও করলেন না। সবাইই খুব অদ্ভুত। যাকগে, এসব কথা ভেবে কী লাভ! যা হবার তা তো হয়েই গেছে। মণিময় টিভি দেখতে বসল। রাত অনেক হয়েছে। কুয়াশা পড়ছে বাইরে। মণিময় জানালা দিয়ে লক্ষ করল, ঠান্ডা হাওয়াও আসছে। খুবই সুন্দর আবহাওয়া। এর পরেই শীত জাঁকিয়ে আসবে। মণিময়ের ভাল লাগছে, রেখার বিয়েটা এত সুন্দর আবহাওয়ায় হচ্ছে ভেবে। বিয়ের আরও বেশ কিছুদিন বাকি আছে। তখন শীতের পরশ লেগে যাবে। এইটুকুই রক্ষা যে, রেখাকে গরমে সেজেগুজে কষ্ট পেতে হবে না। অসীমও এসে গেছে। আজ উপেনের মুখে অসীমের প্রশংসা শুনতেই মণিময়ের প্রাণটা জুড়িয়ে গেছিল। মণিময় তো এটাই চেয়েছিল সারাজীবন। ছেলেটা যাতে মানুষের মতো মানুষ হয়। এখন ওর একটা যেমনতেমন চাকরির ব্যবস্থা হলেই, মণিময়ের আর কোনো চিন্তাই থাকবে না। নিশ্চিন্ত মনে জীবনের বাকি দিনগুলি কাটিয়ে দিতে পারবে।

নানারকম ভাবনা চিন্তায় জর্জরিত মণিময় আজকাল হামেশাই চিন্তায় ডুবে থাকে। বিছানায় গিয়েও সহজে নিদ্রাকে কাছে আনতে পারে না মণিময়। পাশে শোভা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। ইদানীং মণিময়কে অনেক রাত পর্যন্ত জেগেই কাটাতে হয়। রেখার বিয়ে সম্পন্ন না হওয়া অবধি হয়তো এমনিই চলবে। পাশের বাড়ির নীরদের গলা শোনা যাচ্ছে। চিৎকার চেঁচামেচি করছে। মণিময়ের মনে হল, নীরদ হয়তো বা নেশা করে এসে হইচই করছে। এটা

যদিও নতুন কিছু নয়। নীরদটা প্রায়ই নেশা করে বেশি রাতে বাড়ি ফেরে। এমনিতে নীরদ মোটামুটি বিনয়ী, নম্র স্বভাবের ছেলে। মণিময়কে খুবই সমীহ করে। তবুও মণিময় এদের একটু এড়িয়েই চলে। এই সমস্ত ভাবতে ভাবতে মণিময়ের চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল।

'শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন' কবিগুরুর এই গানের কলি যে নয়নপুরের পরিবেশের জন্য যথোপযুক্ত। ভোরের হাওয়ার ঠান্ডা শিরশিরে ভাব যেন সারা দেহমনে পুলক জাগায়, রোমাঞ্চিত হয় প্রাণ। ধানের শিষে সোনার ফসল ফলনে নয়নপুর যেন মোহময়ী হয়ে উঠেছে। সেজে উঠেছে এক অনন্যা রূপে। পল্লীবালারা সব কলসি কাঁখে জল আনতে যাচ্ছে। চাষীরা কাঁধে কাস্তে নিয়ে মাঠে যাচ্ছে নতুন করে চাষ করতে। নতুন ফসল ঘরের তোলা হয়ে গেছে। নতুন ধানে নবান্ন উৎসব মহা সমারোহে চাষীদের প্রতি ঘরে সম্পন্ন হয়ে গেছে। নয়নপুর যদিও এখন আর পল্লীগ্রাম নয়, অনেকটাই উন্নত হয়েছে এবং মফঃস্বল শহরে পরিণত হতে যাচ্ছে শিগ্‌গিরই। কিন্তু এখানকার বাসিন্দারা গ্রামের প্রকৃত আদবকায়দায় অভ্যস্ত বলে নয়নপুরের ঐতিহ্যকে এখনও ধরে রেখেছে। ভোর হতে না হতেই মাঠে যাওয়া, গাঁয়ের বধূদের কলসী কাঁখে নিয়ে জল আনতে যাওয়া, বারো মাসের তের পার্বণ, সবই বজায় রেখেছে ওরা। শহর থেকে অনেকেই এখানে বেড়াতে এসে পরিবর্তনের আনন্দ পায়। ফিরে যায় একরাশ প্রকৃতির আলোবাতাস নিয়ে। যা শহরের ঘিঞ্জি পরিবেশে পাওয়া দুর্লভ। গাঁয়ের মেঠো পথের ভিজে গন্ধ আজও সবার মন কেড়ে নেয়।

সকালবেলায় দীনু এসে হাজির হল মণিময়ের বাড়িতে। ছেলেকে টিচার-এর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসেছে। দীনু ঢুকতেই, অসীম বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁত ব্রাশ করছিল, বলল কী ব্যাপার দীনুদা সাতসকালে তুমি! স্যার—এর খবর পেয়ে বুঝি! এমনিতে তো আর তোমার টিকির নাগাল পাওয়া যায় না! দীনু বারান্দায় উঠতে উঠতে উত্তর দিল, খুব পেকেছিস, তাই না রে! বলে দীনু মোড়ায় বসে মণিময়কে ডাকতে থাকল স্যার, ও স্যার — আমি এসছি। মণিময় ঘরেই বসে স্কুলের পরীক্ষার খাতা দেখছিল। মণিময় উঠে এল। দীনু দাঁড়িয়ে পড়ল। মণিময় তাই দেখে বলল, আরে বোসো, বোসো। বলে মণিময় ইজিচেয়ারে বসে পড়ল। দীনুও বসল। বলল, স্যার, আপনার কথামতো আমি প্যান্ডেলের লোকেদের সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা আপনার সঙ্গে কথা বলতে আসবে। আমিও থাকব স্যার। মণিময় স্নেহের সুরে বলল, বাবা, তোমাকে অসুবিধায় ফেলছি না তো? দীনু লজ্জার ভঙ্গীতে উত্তর দিল, না, না স্যার। কোনো অসুবিধা নেই আমার। এসব কথা বলবেন না স্যার, আমার খুব কষ্ট হয়। আপনি আমার বাবার মতো। আপনার জন্য কিছু করতে পারলে আমি ধন্য হব। অসীম মুখ ধুয়ে এসে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছিল। হঠাৎ বলে উঠল, বাব্বা — দীনুদা তুমি তো বেশ সুন্দর কথা বলতে পার! মণিময় ধমকের সুরে অসীমকে বলল, এই, দীনু কি তোর ইয়ার্কির পাত্র? বড্ড বেশি কথা বলতে শিখেছিস। অসীম মণিময়কে হেসে বলল, আচ্ছা, বাবা — আমি

তোমাকে তো কিছু বলিনি। তা হলে তুমি কেন কথা বলছ! তুমি তো দীনুদার সঙ্গে কথা বলবে। মণিময় হাসতে লাগল ছেলের কথা শুনে। দীনু অসীমকে ইশারা করল চুপ করার জন্য। অসীম চলে গেল। শোভা রান্নাঘর থেকে দীনুর আওয়াজ পেল। তাই এল বারান্দায়। দীনুকে শোভাও পুত্রবৎ স্নেহ করে। তাই না এসে পারল না। দীনু শোভাকে দেখে হেসে বলল, কী গো কাকিমা, বিয়ে তো এসেই গেল। প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছেন তো। শোভা বলল, হ্যাঁ বাবা আমার যতটুকু করার তাই করছি। তবে তোমার দোকান থেকে কাপড়চোপড়গুলো আনা বাকি আছে। দীনুর দিকে মণিময় তাকিয়ে রইল। কী অপূর্ব ছেলে এই দীনু। দীনু হঠাৎ মনে পড়াতে বলে উঠল মণিময়কে, আচ্ছা স্যার —— কার্ডগুলো ছাপতে দেবেন কবে? আপনি বয়ানটা লিখে দিলে আমি প্রেসে দিয়ে দেব। আমার দোকানের পাশেই প্রেস আছে স্যার! শোভা চুপ করে দাঁড়িয়েই রইল। এসব ব্যাপারে সে কিছুই জানে না। মণিময় খুশী হয়ে বলল, ঠিকআছে দীনু, আগামী দুদিনের মধ্যে আমি লিখে কার্ডগুলো তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব, কেমন! দীনু সম্মতিসূচক সুরে বলল, ঠিক আছে স্যার, আমি তাহলে এখন যাই। আপনার যখন যা দরকার হবে আমাকে বলবেন, আমি করে দেব। একটুও দ্বিধা করবেন না স্যার। দীনু দাঁড়িয়ে পড়ল যাওয়ার জন্য। শোভা একটু এগিয়ে এসে বলল, দীনু বাবা, একটু চা খেয়ে যাও। রেডি করাই আছে দেরি হবে না। দীনু তীব্র আপত্তিতে বলল, না, না কাকিমা - এখন আমি চা খাব না। আর বিয়ে বাড়িতে শুধু চা খাবই বা কেন ! এখন তো প্রায়ই আসব। তখন একদিন চা-মিষ্টি খেয়ে যাব। এসব নিয়ে আপনি একদম ভাববেন না। আমি চেয়েই খেয়ে যাব। তবে এখন নয়, আর কাকিমা একটা কথা, আপনি যেদিন দোকানে আসবেন, আমাকে আগে একটু খবর দিয়ে তবেই যাবেন, নয়ত আমি তো দোকানে নাও থাকতে পারি। ঠিক আছে? তাহলে এবার আমি আসি। অসীমকে বলবেন জানিয়ে দিতে। ওর কাছে আমার মোবাইল নম্বর আছে। বলে দীনু চলে গেল। মণিময়ও ভিতরে চলে গেল। শোভা পথের দিকে তাকিয়েই রইল। সত্যি কী সোনার টুকরো ছেলে এই দীনু। রেখাকে তো নিজের বোনের চাইতেও বেশি ভালবাসে। তার মনটাই দয়ামায়ায় ভরা। গুরুজনদের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা প্রদর্শন চোখে পড়ার মতো। আজকালকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই ধরনের মানসিকতা দেখাই যায় না। শোভা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ রেখার ডাকে চমকে উঠল। কী হল মা — দীনুদা তো কখন চলে গেছে। তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ! আমি সবজি কেটে রেখে এসেছি। অনেক কাজ করেছি। বাকি কাজ মাসি এসে করবে। শোভা মেয়ের কথায় হেসে বলল, ঠিক আছে। তোকে আর কোনো কাজ করতে হবে না। তুই গিয়ে একটু বিশ্রাম কর্ মা। আমি যাচ্ছি, বলে শোভা চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। মাঝে রেখা চা করে মণিময় ও অসীমকে দিল। বেলা বাড়ার সাথে সাথে রোদের তাপও বাড়তে লাগল। এইরকম কড়া রোদের চমক শীতের শুরুতে থাকেই। চারদিক যেন ঝলসে যাচ্ছে। মণিময় তাই ছাতা মাথায় দিয়ে স্কুলের উদ্দেশে

রওনা হল। রেখা এসে শোভার ঘরে বিছানায় বসে মার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে থাকল। মণিময় রেখার সব টিউশনি বন্ধ করে দিয়েছে। তাই আজকাল আর রেখাকে বেশি বাইরে বেরোতে হয় না। রেখা শোভাকে বলল বিয়েটা অত তাড়াতাড়ি ঠিক করে ফেললে যে আমাকে একটু ভাবতেসময় দিলে না! মেয়ের কথা শুনে শোভার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। কী বলে মেয়েটা! ওকেও ভাবতেহবে! শোভা রাগভাব প্রকাশ না করে শান্ত গলায় বলল, কেন? তুই আবার কী ভাববি। তোর বিয়ে নিয়ে আমরা যে ভাবনা চিন্তা করে স্থির করেছি এতে তোর বুঝি বিশ্বাস নেই! বলে শোভা রেখার দিকে তাকিয়ে রইল উত্তরের আশায়। রেখা সঙ্গে সঙ্গে বলল, কী যে বল না, তার কোনো ঠিক নেই। আমি কী তাই বলেছি না কি! শোভা এবার একটু রাগ হয়েই বলল, তুমি কী বলেছ। তার অর্থ খুঁজে বেড়ানোর আমার দরকার নেই। তোমার বাবা অনেক খবরাখবর নিয়েই এখানে বিয়ে পাকা করেছেন। সুতরাং এর উপরে আর কোনো কথা চলে না, বুঝলি? রেখা সহজ ভঙ্গীতে মাকে বলল সে তো ঠিকই আছে, কিন্তু আমি যে শুনেছি তোমার হবু জামাই নাকি উন্নাসিক প্রকৃতির। তাছাড়া দাম্ভিক, বদমেজাজী! এগুলো যদি সত্যি হয় মা? শোভা লক্ষ করল রেখার গলায় ভয়ের সুর। শোভা বলতে লাগল, কে বলেছে ওকে এসব বাজে কথা। শোভা সান্ত্বনার সুরে বলল দেখ্ রেখা এগুলো তোর ভাগ্য। সব তো আর দেখাশোনা যায় না। তাছাড়া এইসব কথা তোকে বললই বা কে? রেখা থতমত খেয়ে গেল। বিছানা ছেড়ে উঠে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে লাগল। শোভা তো নাছোড়বান্দা। আবার জিজ্ঞেস করল কী হল, বললি না! আমার কথার জবাবটা অন্তত দে। রেখা ইতস্তত করে বলল বাদ দাও তো মা, আর ভাল্ লাগছে না এসব কথা। যা হবার হবে, পরে দেখা যাবে। শোভা বুঝতে পারল, রেখা কারুর নামই বলবে না। শোভা জানে, অনেক পুরুষ মানুষেরই এসব দোষগুলি থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই স্ত্রীর উপর এ সবের প্রভাব পড়ে না। তারাও স্ত্রীকে ভালবাসতে জানে। কোত্থেকে কী শুনে এসেছে, তাই নিয়ে অবান্তর আলোচনা। পুরুষ মানুষের একটুআধটু মেজাজ থাকা তো ভালই। শোভা দেখল রেখা স্নানে চলে গেছে। এই ফাঁকে শোভা বিছানায় গড়িয়ে নিল। রেখা এলেই শোভা যাবে চানে। শোভার কাছে এখন বাড়িটা খুব ভাল লাগে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘরগুলো সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। সবই অসীমের কার্যকলাপের জের। আজ আসার সময় সোফার ঢাকনাগুলো নিয়ে আসবে। এত বছর পরে বাড়িটা নতুন সাজে সেজেছে। রেখার শ্বশুরবাড়ির মানুষের কাছে যাতে মণিময়ের মানসম্মান থাকে, সেই জন্যই অসীম নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী বাড়িঘরটাকে মনের মতন করে সংস্কার করেছে। অসীমের দায়িত্বজ্ঞান দেখে শোভা খুবই সন্তুষ্ট। রেখার ঘরে পুরনো ফ্যানটা খুলে নতুন খুব সুন্দর একটা ফ্যান লাগানো হয়েছে। সবই অসীম করেছে। মণিময়কে এসব নিয়ে ভাবতে দেয়নি অসীম। নিজের উপার্জনের টাকা দিয়েই এসব করেছে। বাড়িটা শুধু ঘুরেঘুরে দেখে শোভা। মনটা শান্তিতে ভরে যায়। মেয়ের

বিয়ের কল্যাণে যতটুকু হয়েছে তাতেই শোভা সন্তুষ্ট। শোভার চান সারা হলে খাওয়াদাওয়ার পাটও চুকে গেল। একটা পান চিবোতে চিবোতে শোভা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। ভাবল বিকেলে বেরিয়ে কিছু কাজ সারতে হবে। তাই একটু বিশ্রাম নেওয়া দরকার। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল।

উপেনের বাড়ির উঠানে মোড়াতে বসে গল্প করছে অঞ্জলি জলধরের বউ লতার সঙ্গে। লতা প্রকৃতই গ্রাম্য মেয়ে। মূর্খ বললেও চলে। কিন্তু খুব চালাকচতুর। পটলার মার অনুপস্থিতিতে লতা এসে অনেকসময় অঞ্জলিকে সাহায্য করে দিয়ে যায়। অঞ্জলিও লতাকে এটাওটা দিয়ে সাহায্য করে। গরিব চাষীর সংসার। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। এরমধ্যেও লতা খুবই হাসিখুশী থাকে। অনেক স্বপ্ন নিয়ে এত দারিদ্র্যের মধ্যেও লতা দুটো ছেলে মেয়েকে স্কুলে ভর্তিকরেছে। এ নিয়ে জলধর খুব অশান্তি করে লতার সঙ্গে। সমাজের নিচু স্তরের মানুষ এরা। এদের মধ্যে অধিকাংশই জানে না পাঁকেও পদ্মফুল ফোটে। এই মূর্খ মানুষগুলোর চিন্তাধারা এতই সীমিত যে শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে এদের ধ্যানধারণা অতটা সুস্পষ্ট নয়। কিন্তু এখনকার যুগে চাষীর ঘর থেকেও শিক্ষিত, বিদ্বানের প্রাদুর্ভাব লক্ষ করা যায়। লতার সেই স্বপ্ন আছে যে ওর সন্তানরাও শিক্ষিত হবে। লতা তাই নিয়েই আলোচনা করছিল অঞ্জলির সঙ্গে। লতাই চা করেছে অঞ্জলির জন্য। অঞ্জলি লতাকে আপাদমস্তক লক্ষ করে বলল, তোর শরীরটা এত খারাপ হয়েছে কেন রে? খুউব পরিশ্রম করিস তাই না রে? লতা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, কী আর করব বল মা ঠাকরুন, আমাকেই তো সব করতে হয়েছে। অঞ্জলি বুঝতে পারল না লতা কী বলতে চাইছে। তাই জিজ্ঞেস করল, মানে? সবটা কী ? লতা বলল মানে এ মাসে নতুন ধান উঠেছে না? সারা উঠোন ভর্তি ধান। সেগুলো সিদ্ধ করা, ঝাড়া, গুছিয়ে রাখা, তারপর তো আবার সংসারের কাজ আছেই। এইবার তো দুটো দিনের জন্য বাপের বাড়িও যেতে পারলাম না। অঞ্জলি বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, তোদের এই সাতকাহন আর শেষ হবে না। কাজ করবি বলে শরীরটার দিকে একটু লক্ষ করবি না? শরীরটা খারাপ হয়ে গেলে পরিশ্রম করবি কী করে। বলে অঞ্জলি করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল লতার দিকে। লতার শীর্ণকায় চেহারার মধ্যে দীনতার ছাপ স্পষ্ট। পরনে একটা আধময়লা পুরনো শাড়ি। উপেনের পুরনো পাঞ্জাবি, পুরনো শার্ট দিয়ে দেয় অঞ্জলি, ভাবে পুরনো জামাকাপড় ঘরে জমিয়ে রেখে কী লাভ! কাউকে দিয়ে দেওয়াই ভাল। লতা বিনয়াবনত হয়ে বলল আমার আবার শরীরের চিন্তা। স্বামী সন্তানকে নিয়েই চিন্তা করেই আমার সময় কাটে গো মা। অঞ্জলি বিরক্ত হয়ে বলল, কেন, জলধর তো পারে তোর একটু সেবাযত্ন করতে! অভাবের সংসারে যা জুটাতে পারবি তাই তো ভাগ করে খাবি। কিন্তু সময়মতো খাওয়াদাওয়াটা তো করবি। লতা জলধরের কথা শুনে একটু উত্তেজিত হয়ে বলল,কী যে বল না মা — ওইটা তো একটা হাড় বজ্জাত লোক। নিজের ছাড়া সে কিছুই বোঝে না। ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার জন্যও তার কোনো চিন্তা

নাই। আর সে করবে কিনা আমার চিন্তা। অঞ্জলি খুব ভালই জানে — সমাজের এই শ্রেণীর পুরুষগুলো কীরকম হয়। তবে সবাই তো আর খারাপ হয় না। কিন্তু জলধর ? সে তো এমনিতে খুব বিনয়ী বলেই মনে হয়। কিন্তু নিজের সংসারে তার কীরকম চেহারা, সে তো একমাত্র লতাই জানে। অঞ্জলি এটাও জানে বেশি রাত করে যেদিন বাড়ি ফেরে জলধর, সেদিনই লতাকে মারধোর করে, ঘর থেকে বের করে দেয়। লতাও কম যায় না। সমাজের বিভিন্ন স্তরে নারী চরিত্রও বিভিন্নভাবে লক্ষ করা যায়। লতা খুব কঠোর প্রকৃতির স্ত্রী। সে জলধরকে নিয়ে থানা পুলিশও করেছে। তাই মনে হতেই অঞ্জলি জিজ্ঞেস করল, কী রে, জলধর এখন আর তোকে মারধর করে ? না কি কমেছে। এখন তো অনেকদিন কোনো হইচই শুনতে পাই না। লতা একটু হেসে বলল না গো মা, এখন আর আগের মতো এত করে না, তবে আমিও বলে দিয়েছি — আমার গায়ে হাত তুললে এবার আমি মহিলা কমিশনে যাব। পুরুষরা কী ভাবে মহিলাদের ? এতই দুর্বল ? অঞ্জলি খুব সন্তুষ্ট হল লতার কথায়। শিক্ষার আলো এদের না থাকুক, আত্মসম্মান বজায় রাখার দায়িত্ব থাকলেও যথেষ্ট। কিন্তু কোথায় ? কটা মেয়ে অত্যাচারী স্বামীর সঙ্গে যুঝতে পারে ? অসহনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে নিজে আত্মঘাতী হয়। কোনো দিক বিবেচনা না করে এই পথকেই বেছে নেয়। এতে করে সমাজের এই অন্ধকার অধ্যায়ের কি কোনো উন্নতি দেখা যাচ্ছে ? মোটেও নয়। দিনদিন এইসব অন্যায়, ঘৃণ্য অপরাধ বেড়েই চলেছে। তাই অঞ্জলির লতার কথা শুনে খুবই ভাল লেগেছে। প্রতিবাদী মন তো একটা আছে ওর। লতার মতো এই নয়নপুরে আরও আছে। এদের বসবাস বস্তিতে। দিনের বেলায় ভাল মানুষের মুখোশ পরে ঘুরে বেড়ায়, আর সন্ধ্যে হতে না হতেই নেশাগ্রস্ত হয়ে ঘরে ফিরে স্ত্রীর উপর অত্যাচার চালায়। এগুলোতে আজ পর্যন্ত তো কেউই প্রতিবাদের ভূমিকা নিয়ে অগ্রসর হয়নি। সরকারি তরফে অনেক কিছুই করার আছে। কিন্তু যারা লিখতে পড়তে পারে না, তাদের কী সাধ্য আছে সরকারের দোরগোড়ায় যায় বিচারপ্রার্থী হয়ে। যার যার মানসিকতা না পাল্টালে কারুরই সাধ্য নেই পুরুষদের এই সমস্ত অমানবিক আচরণ বন্ধ করার। লতার সঙ্গে এইসব আলাপ - আলোচনা শেষ করে অঞ্জলি ঘরে চলে গেল। লতা রান্নাঘরে গিয়ে অঞ্জলির টুকিটাকি কাজগুলো শেষ করে নিল। হঠাৎ লতা দেখল শোভা ঢুকছে। সুন্দর হাল্কা রঙের তাঁতের শাড়ীতে শোভাকে খুব সুন্দর লাগছে। লতা এগিয়ে গেল। কিন্তু শোভা খুব একটা পাত্তা দিল না। শুধু বলল, তুই এখানে ? লতা জানে শোভা, ওদের মতো মানুষদের বেশি পছন্দ করে না। তাই সামনের থেকে সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, আমি তো প্রায়ই আসি এখানে ! বলে অঞ্জলিকে ডেকে বলল, মা ঠাকরুন, দেখো এসে, কে এসেছে তোমার বাড়িতে ! অঞ্জলি চুল আঁচড়াচ্ছিল, ঘরের থেকে তড়িঘড়ি করে বেরিয়ে এসে শোভাকে দেখে অবাক ! এ কাকে দেখছে অঞ্জলি ! একই পাড়ায় থাকে শোভা। অথচ গত দুয়েক বছরে এ বাড়িতে আসেনি। এমনিতে রাস্তাঘাটে দেখা হয়েছে আগে। তাই বিস্ময় প্রকাশ করে

বলল, একী—দিদি আপনি ? আসুন, আসুন। আমার কী সৌভাগ্য! শোভা অঞ্জলির কথায় হেসে ফেলল। ঘরে গিয়ে টি.ভি.- র ঘরে বসল। অঞ্জলি দেখছে শোভাকে। প্রায় একই রকম আছে শোভা। তেমন কোনো পরিবর্তন নেই। মণিময় স্যার খুব যত্নে রেখেছেন স্ত্রীকে, বোঝা যায়! শোভা অঞ্জলিকে দেখে একটু অবাকই হল। শুনেছে শরীর খারাপ অঞ্জলির। তাই বলে এত জীর্ণদশা, ভাবতে পারেনি শোভা। লতা দরজায় দাঁড়িয়ে সব লক্ষ করছে। শোভা অঞ্জলিকে বলল, তোমার শরীরটা এখন কেমন আছে ভাই? অনেক রোগা হয়ে গেছ দেখছি। অঞ্জলি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আর, আমার থাকা না থাকা। আছি আর কী, মরে তো যাই নি। শোভা বুঝল অঞ্জলির একটা চাপা দুঃখ কোথায় যে লুকিয়ে আছে। শোভা বলল, এ আবার কেমন কথা! মরবে কেন! মানুষের কি শরীর খারাপ হয় না? আবার সেরেও তো যায়। তাই না অঞ্জু ? অঞ্জলি না শোনার ভান করে লতাকে বলল, যা তো, এক কাপ চা করে নিয়ে আয়। আমি আসছি। লতা চলে গেল রান্না ঘরে। শোভা অঞ্জলিকে বলল, তুমি বোসো তো। তোমাকে যেতে হবে না। আমি শুধু এক কাপ চাই খাব। আর কিচ্ছু খাব না। ভাত খেয়েছি দেরি করে, তাই। অঞ্জলি কোনো প্রতিবাদ করল না। কীই বা দেবে। ঘরে কিছু থাকলে তো! অঞ্জলি বসে শোভার দিকে হেসে বলল, আমি জানি দিদি, আপনি আসবেন। তা বিয়ের কেনাকাটা সব শেষ? শোভা আন্তরিকভাবে উত্তর দিল, না ভাই, পুরো হয়নি, কিছু কেনাকাটা বাকি আছে। রেখার বিয়ের শাড়ীটা, আর ওর প্রয়োজনীয় কিছু কাপড়চোপড়। সব তো হিসেবের টাকা, বেশি কিনবই বা কোত্থেকে! অঞ্জলি সায় দিয়ে বলল, সে তো ঠিকই। আমাদের মতো সাধারণ শিক্ষক পরিবারে টাকাপয়সার স্বাচ্ছন্দ্য কোথায়! টেনে আনতে ছিঁড়ে যায়, এইতো অবস্থা। শোভা অঞ্জলিকে সমর্থন করল। অঞ্জলির কথা বলার ধরন আগের মতোই আছে। অঞ্জলি লতাকে ডেকে বলল চা নিয়ে আসতে। লতা এক কাপ চা ট্রেতে করে নিয়ে এল। অঞ্জলি নিয়ে সেটা টেবিলে রাখল। লতা ঘর থেকে চলে যাওয়ার পর শোভা বলল, এই মেয়েটা এখানে কী করছে! এদের বেশি আশকারা দিও না। অঞ্জলি একটু চমকে গেল শোভার কথায়। বলল, কেন দিদি, লতা তো খুব ভাল মেয়ে। আমাকে অনেক সময় অনেক কাজে সাহায্য করে দেয়। আমি ডাকলেই আসে। নয়ত এমনিতে খুব একটা আসে না। শোভা মানতে পারল না কথাগুলো। তাই বলল, কেন, পটলার মা-ই তো আছে। ওর আবার কিসের দরকার? অঞ্জলি বুঝতে পারল, শোভার আগের মতই একটু উন্নাসিকতা আছে। তাই বলে অঞ্জলি তো আর ওদের এড়িয়ে চলবে না।

বয়সের সাথে সাথে মানুষের স্বভাবে অনেক পরিবর্তনই হয়। কিন্তু অঞ্জলি বুঝল যে, শোভার কোনো পরিবর্তনই হয়নি। একইরকম আছে। সে সবার সাথে মেশেও না, কথাও বলে না। কারুর বাড়িতে যাওয়া বেশি পছন্দ করে না, অথচ মণিময় একেবারেই বিপরীত স্বভাবের। অঞ্জলি হঠাৎ দেখল লতা দাঁড়িয়েই আছে। তাই ডেকে বলল, লতা, তুই এখন চলে যা, পরে

আমি আবার খবর দেব। শোভা একটু আশ্চর্য হয়ে ভাবল, অঞ্জলি কি শোভার কথায় লতাকে চলে যেতে বলল! তাই জিজ্ঞেস করল কী হল অঞ্জু, তুমি আমার কথায় নাকি লতাকে চলে যেতে বললে? অঞ্জলি হেসে ফেলল। শোভার হাত ধরে বলল, আরে না, না, ওর তো আর কোনো কাজ নেই। থেকে কী করবে, তাই বললাম আর কী ...... বাদ দিন তো এসব কথা। বলুন বিয়ের বাড়ির কথা। শুনলাম খুব সুন্দর করে সাজানো গুছানো হয়েছে ঘরদুয়ার! শোভা মনেমনে খুব গর্ববোধ করল অসীমের জন্য। অঞ্জলির দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ, সবই অসীমের কাণ্ড। ওই তোড়জোড়করে এসব করছে। একদিন তো যেতে পার। গল্পগুজবও করে এলে। ঘরে বসে থাকতে কত ভাল লাগে! অঞ্জলি মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ— তা তো পারিই দিদি, কিন্তু শরীরটাই ভাল থাকে না। তাই কোথাও যেতেও ইচ্ছে করে না। শোভা দেখল সত্যিই অঞ্জলি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। শোভার ইচ্ছে ছিল অলকের কথা জিজ্ঞেস করার। কিন্তু অঞ্জলির কথা ভেবে অলকের প্রসঙ্গ উত্থাপনই করল না। কথা ঘুরিয়ে শোভা জিজ্ঞেস করল, উপেনদা আসার তো সময় পেরিয়ে গেল। তাই না? অঞ্জলি উপেনের কথা উঠতেই মুখটা গম্ভীর করে বলল তার ফেরার কোনো সময় নির্দিষ্ট নেই। বাড়ি এসে তো আবার আমার অসুস্থ চেহারাই দেখতে হবে। তাই হয়তো বাড়ির প্রতি আকর্ষণটা কমে গেছে, বলে অঞ্জলি দুঃখী চেহারায় বসে রইল। শোভাও উপেনকে বেশি পছন্দ করে না। তাঁর লম্বাচওড়া ভাষণ কোনোদিনই শোভা সহ্য করতে পারে না। মণিময়ের কাছে শুনেছে, অঞ্জলির প্রতি তার অবজ্ঞার কথা। আজ তো অঞ্জলির কথায় তা ধরাও পড়ল। শোভা অঞ্জলিকে বলল, দেখো অঞ্জু—সংসারে ভালোমন্দ সবই হয়। এতদিন তো সবই মানিয়ে এসছ। এখনই বা মানাতে পারবে না কেন! এসব নিয়ে দুশ্চিন্তা একদম কোরো না। ভাল মন্দ মিশিয়েই তো মানুষ হয়। শুধুশুধু চিন্তা করে শরীরটাকে আর খারাপ কোরো না। শোভার কথায় অঞ্জলি কিছুই বুঝতে চায় না। যে যাকে নিয়ে সংসার, সেই একমাত্র বোঝে স্বামীর তুচ্ছতাচ্ছিল্য স্ত্রীর জন্য কতটা অপমানজনক! অঞ্জলি খুব ভালই জানে শোভার পক্ষে এই সমস্ত পরিস্থিতি বোঝা একেবারেই অসম্ভব। কেন না মণিময় তো শোভাকে হৃদয়ের সিংহাসনে বসিয়ে রেখেছে। কোনো কষ্টই বুঝতে দেয় না। অঞ্জলি বুঝতে পারল, শোভা আর বসবে না। শোভা উঠে দাঁড়িয়ে অঞ্জলির হাত ধরে বলল, শোনো, এর মধ্যে একদিন গিয়ে সোনার জিনিস, শাড়ি কাপড়গুলো দেখে এসো। তাছাড়া বিয়ের দিন সকাল থেকে তুমি আমার পাশে থাকবে। বুঝলে? এর যেন আর অন্যথা না হয়। কোনো অজুহাতও শুনব না। এবার তাহলে আসি। যেও কিন্তু অঞ্জু। অঞ্জলি উঠে শোভার পেছন পেছন গিয়ে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিল। শোভা চলে গেল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এখনও উপেন ফেরেনি। অঞ্জলি সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাতে ঠাকুরঘরে গেল। শরীরের নানা

জটিলতায় অঞ্জলির মনটাও বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। এখন আর সংসারের কোনো কাজকর্মই করতে মন চায় না। সন্তানের সুখও পাচ্ছে না অঞ্জলি। ভবিষ্যতে পাবে কিনা কে জানে! উপেনের এ জন্য কোনো হেলদোল নেই। দিব্যি আছে মানুষটা। অঞ্জলির দুঃখ কমাবার জন্য কোনোদিন উপেন অঞ্জলিকে সান্ত্বনার বাণীও শোনাবার চেষ্টা করে নি। সে আছে নিজের চাকরি, বাজার, এখানে ওখানে যাওয়া এসব নিয়ে। অঞ্জলির বেরোবার প্রয়োজন আছে কিনা, তা সে জানার চেষ্টাও করে না কখনও। স্বামী সন্তান দিয়ে যার কোনো শান্তি নেই তার আর কিসে শান্তি হবে! অঞ্জলির কাছে এখন সংসার অসাড় হয়ে গেছে। শুধু বেঁচে থাকা, যার কোনো উদ্দেশ্য নেই। স্বামীর ভালবাসা পেতেই অঞ্জলি এ সংসারে এসেছিল। অভাব অনটনের মধ্যে সংসারকে সুন্দর করে সাজিয়েছিল অঞ্জলি। দুই সন্তানের জননী হওয়ার পরও ভালই ছিল অঞ্জলি। সুন্দরী না হলেও যথেষ্ট সুশ্রী ছিল এই অঞ্জলি। পরিপাটি করে ছিমছাম পোশাকে ঘুরে বেড়াত, আবার সংসারের ঘানি টানতেও দ্বিধা করত না। আজ অঞ্জলিকে দেখলে চেনাই যায় না, তুলনাই চলে না আগের অঞ্জলির সঙ্গে। জীবনের বাহুপাশে আবদ্ধ হয়ে কখন যে হৃদয়ের তার ছিঁড়ে গেছে, তা অঞ্জলি নিজেও বলতে পারে না। গ্রামের প্রতি ঘরেই সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালানো হচ্ছে। কাঁসি, ঘণ্টা, উলুধ্বনির আওয়াজ ভেসে আসছে। আকাশে শুক্লতিথির চাঁদ যেন জ্বলজ্বল করছে। চাঁদের আকারে বোঝা যাচ্ছে পূর্ণিমা এগিয়ে এসেছে। সামনের শুক পক্ষতে রেখার বিয়ে। জরাজীর্ণ চেহারায় কী করে বিয়ে বাড়ি যাবে। কতজনে কত প্রশ্ন করবে। এসবের সম্মুখীন হতে হবে। তবুও তো যেতে হবে। রেখার বিয়ে বলে কথা। পুরো নয়নপুর গ্রামেই সাজসাজ রব চলছে। কত কিছুই ভাবে আজকাল অঞ্জলি। অঞ্জলি ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। হঠাৎ হীরক এসে মা-র পাশে বসে বলল, মা, বাবাকে দেখে এলাম চায়ের দোকানে বসে কার সঙ্গে যেন গল্প করছে। তুমি চা খেয়েছ? নাকি আমি করে দেব? অঞ্জলি হেসে ছেলের পিঠে হাত রেখে বলল না বাবা, আমি চা খেয়েছি। লতা এসছিল ও করে দিয়ে গেছে। তুই যা পড়তে বসগে যা, আমি পরে তোকে খাবার দেব, কেমন? হীরক ঘাড় নেড়ে চলে গেল পড়তে। হীরক এইমাত্র এসেছে টিচারের বাড়ি থেকে। স্কুল ছুটির পরই চলে যায় পড়তে। এক্ষুনি ওকে কিছু খেতে দিতে হবে। অঞ্জলির হঠাৎ মনে পড়ল, লতাই তো কয়েকখানা রুটি বানিয়ে দুধ গরম করে রেখে গেছে। মনে একটু শান্তি পেল। কিছু করতে হবে না। উপেনও হয়তো এসে আর চা খাবে না। অঞ্জলি এ ঘর থেকে ডেকে হীরককে বলল বাটিতে দুধ আর রুটি নিয়ে খেয়ে নিতে। হীরক তাই করল। তাই অঞ্জলি শুয়ে একটু বিশ্রাম নিতে লাগল।

রাত প্রায় সাতটা সাড়ে সাতটা বাজে। উপেন বাড়ি ফিরছে, হাতে বাজারের ব্যাগ। বাজার থেকে বেরোতেই দেখা হল মণিময়ের সাথে। ওর হাতে একটা খালি ব্যাগ। হয়তো বাজার করতেই এসেছে মণিময়। উপেনের সাথে দেখা হতেই মণিময় বলল, আরে দাদা, আপনি

স্কুল থেকে বাড়িযাননি এখনও ! বাজার করলেন বুঝি! উপেন ভাবল মণিময় কী করে জানল উপেন বাড়ি যায়নি এখনও ? তাই কৌতুক সুরে বলল মণিময়কে, কী ভায়া, আজকাল কি গোয়েন্দাগিরি করছ নাকি। মণিময় উপেনের কথায় হতবাক হয়ে বলল, কেন, কেন — আমি কী বললাম দাদা ? উপেন বলল না মানে, তুমি কী করে জানলে আমি এখনও বাড়ি যাইনি ! মণিময় হেসে বলল, ও, এই কথা। আমি জেনেছি শোভার কাছ থেকে। ও গেছিল আপনাদের বাড়িতে বৌঠানের সঙ্গে গল্প করতে। উপেন উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, ও মা, তাই নাকি ? বৌমা তো বহুদিন পরে গেল আমাদের বাড়ি। তাই না মণিময় ? খুউব ভাল লাগল শুনে। তারপর তোমার অন্যান্য খবর আর কী, বলো। মণিময় ফ্যাসাদে পড়ে গেল উপেনের সঙ্গে দেখা হয়ে। দেখা না হলে ভাল ছিল। অনেক দেরি হয়ে যাবে বাজার নিয়ে যেতে। মণিময়ের হঠাৎ মনে পড়ল রতীশের কথা। তাই উপেনকে বলল, দাদা, কাল রাতে রতীশের সঙ্গে কথা বলেছি। রেখার বিয়ের কথা শুনে সে খুবই খুশী। যাক — আমি যা বলার, যেভাবে বলার বলে দিয়েছি সবকিছু রতীশকে। এখন নিমন্ত্রণ রক্ষা করার দায়িত্ব ওর। উপেন সঙ্গে সঙ্গে বলল, একদম ঠিক কথা। তোমার কর্তব্য তুমি করেছ, বাকিটা তো ওরই দায়িত্ব। যাকগে অনেক দেরি করিয়ে দিলাম তোমাকে। আমি এবার যাই। তুমি বাজার করে এসো। বলে এক মুহূর্তও দাঁড়াল না উপেন। মণিময় হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। উপেনের স্বভাবই এইরকম। কথা বলতে আরম্ভ করলে থামতে চায় না। মণিময় বাজারে ঢুকে গেল। মেয়েটার জন্য একটু ভাল মাছ কিনতে হবে, যদি পাওয়া যায়। আর তো মোটে কটা দিন। তারপরেই তো পরের ঘরে বৌ হয়ে চলে যাবে। আজকাল মণিময়ের বাড়িতে পিঠে পায়েসও হচ্ছে শুধুমাত্র রেখার জন্য। যদিও এসব জিনিস রেখার খুব বেশি একটা পছন্দের নয়। তবুও মায়ের মন তো! কত কিছুই করে খাওয়াতে ইচ্ছে করে মেয়েটাকে, কিন্তু শরীর নিয়ে পেরে ওঠে না। বেশিক্ষণ কোনো কাজ করতে গেলেই হাঁপিয়ে ওঠে। তাই সাহস পায় না শোভা। গত সপ্তাহে নীরদের বউ রমা এসে বাটি ভরে পিঠে পুলি দিয়ে গেছে রেখার জন্য। রেখার আদর নয়নপুরের প্রতি ঘরে ঘরেই আছে। সবাই ওকে ভালবাসে। কেউ মেয়ের মতন, কেউ বা আবার বোনের মতন। দুদিন বাদে এই মেয়েই চলে যাবে নয়নপুর ছেড়ে শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশে। সাথে নিয়ে যাবে এই গাঁয়ের মানুষের অফুরন্ত ভালবাসা ও শুভেচ্ছা।

এদিকে কলকাতায় সুনির্মলের বাড়ির বেহাল দশা। বিয়ে বাড়ির কত কাজ! তার মধ্যে বিশৃঙ্খলার শেষ নেই। কে যে করবে এত সব কাজ, সুনির্মল ভেবে পায় না। রাজুর তো সময় নেই বললেই চলে। সপ্তাহে দুটো দিন ছুটি পায়। তার মধ্যে যতটুকু করতে পারে! বিয়ের কার্ড ছাপানো হয়ে গেছে। কিন্তু বিলি তো করতে হবে। সুনির্মল এখন আর আগের মতো ছুটোছুটি করতে পারে না। স্ত্রী গীতা আত্মীয় স্বজনদের নেমন্তন্নগুলো ধীরে ধীরে সেরে ফেলছে। তাও তো দূরেরগুলো তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বিয়ের কেনাকাটা রাজু তার মাকে নিয়ে

বেশির ভাগ সেরে ফেলেছে। আর বাকিগুলো সোনারপুর থেকে কিনলেও চলবে। জনবল নেই বলে কাজকর্ম খুব ধীর গতিতে এগোচ্ছে। সুনির্মল একটু প্রাচীনপন্থী বলে রাজুর সঙ্গে মতের অমিল হয়েই চলেছে। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে সুনির্মলের ইচ্ছা অনুযায়ী বৌভাতের রান্নার আয়োজন ঠাকুরকে দিয়ে করাবে। নিজেদের বাজারহাট সব করে দিতে হবে। রাজুর ইচ্ছে ছিল ভাল ক্যাটারার দিয়ে করানোর, তা হলে কোনো ঝামেলাই পোয়াতে হয় না। কিন্তু সুনির্মলের জেদের কাছে রাজু হেরে গেছে। চিরকালই সুনির্মল জেদি স্বভাবের লোক। নিজে যা বলবে সেটাই ঠিক। তাই রাজু বা গীতা কেউই সহজে কোনো মতামত পোষণ করে না। সুনির্মলের ছোটো ভাই আসবে বিয়ের দুদিন আগে। ছোটো ভাই সুবিমল থাকে পুনেতে। সেখানেই একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির ডেপুটি ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। সাতদিনের ছুটিতে আসছে স্ত্রী ছেলে মেয়ে নিয়ে। সুবিমল অত্যন্ত পরিশ্রমী গোছের লোক। তাছাড়া দাদা সুনির্মলকে আজও খুব সমীহ করে চলে। যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে সুনির্মলের পরামর্শ মতোই করে। সুনির্মল তাই নিশ্চিন্ত, সুবিমল এসে পড়লে অতটা চিন্তা আর থাকবে না। ওকে নিয়েই সব বাজারহাট করা যাবে। সে যদিও একাই একশো। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল এইসব চিন্তা করতে করতে। গীতা হয়তো বা এখনও বিছানা ছেড়ে ওঠেনি। ওকেও তো সারাদিন কম কাজ করতে হয় না। আগে তো অনেক কাজেই স্ত্রীকে সাহায্য করত সুনির্মল। এখন আর তা সম্ভব হয় না। রুমাটাও হয়েছে তেমনি। ওর শুধু সাজসজ্জা। মাকে সাহায্য করার ব্যাপারটা এড়িয়েই চলে। এজন্য রাজু খুবই বিরক্ত রুমার ওপর। হঠাৎ গীতা এ ঘরে এল হাই তুলতে তুলতে। সুনির্মলকে জিজ্ঞেস করল, কী গো—বসে আছ যে চুপচাপ! চা করব? এখন চা খাবে তো? সুনির্মল মনে মনে খুশিই হল। বলল হ্যাঁ—খেতে পারি। আমি তো একটুও ঘুমুই নি, সেই থেকে বসেই আছি। গীতা বলল, বাঃ—খুব ভাল করেছ। দেখো, চিন্তা করে করে শরীরটা খারাপ করতে পার কিনা! তাহলে তো একেবারে সোনায় সোহাগা হবে। বলে গীতা একটু বসল। সুনির্মল গীতার দিকে হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, কী করব বলো! আমার চিন্তা করা ছাড়া আর কী কাজ আছে! সামনে এত বড় একটা অনুষ্ঠান। এখনও কত কাজ বাকি রয়ে গেছে। গীতা বুঝতে পারল, সুনির্মলের এখন আর সেইরকম শারীরিক সক্ষমতা নেই বলেই, এত হতাশ হয়ে পড়েছে। গীতা তাই সহজ ভঙ্গীতে বলল, বাদ দাও তো তোমার চিন্তাভাবনা। ঠাকুরপো এলেই সব একে একে হয়ে যাবে। একটুও চিন্তা কোরো না। তা ছাড়া আমি তো আছি। গীতার কথাগুলো শুনে সুনির্মল অনেকটাই চিন্তামুক্ত হল। তাই হেসে বলল তুমি কি আজ নিমন্ত্রণ করতে কোথাও যাবে? বলে গীতার দিকে তাকিয়ে রইল। গীতা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হ্যাঁ-ভাল কথা মনে করেছ, যেতে তো হবেই। এই সোনারপুরেই দু-চারটা নিমন্ত্রণ বাকি রয়েছে। সেগুলো ভাবছি সেরে আসব। আগে তোমাকে চা করে দিই। বলে ভেতরে চলে গেল। সুনির্মল এবার টি.ভি. খুলে বসল। জানালা দিয়ে বেশ ঠান্ডা হাওয়া

আসছে। শীতের ছোঁয়ায় যেন প্রকৃতি খুব শান্ত হয়ে উঠেছে। নানারকম ফুলে বাগান ভরে গেছে। কিন্তু সেগুলোও তো ধীরে ধীরে তাদের ফোটা বন্ধ করে দেবে। শীতের রুক্ষতায় ফুলের অবসান ঘটে। সুনির্মলের সাহিত্যিক মনোভাবে এইগুলো খুব সুন্দরভাবে ধরা পড়ে। গুন গুন করে গলায় সুর ভাঁজতে লাগল সুনির্মল। শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন। আমলকীর ঐ ডালে ডালে। কবিগুরুর অনেক গানই সুনির্মল জানে। অনভ্যাসে বিদ্যানাশ-এর মতো অবস্থায় দাঁড়িয়েছে এখন সুনির্মল। মেয়েটাকে অনেক চেষ্টা করেও গান শেখানো হয়নি। ওর কোনোরকম উৎসাহ উদ্যমই নেই গানের প্রতি! শিখবে কী করে! বরং ছেলেটা কিছু কিছু গান এখনও সুনির্মলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে চেষ্টা করে। সুনির্মলের এইসব উল্টোপাল্টা চিন্তার মাঝখানে গীতা এল চা নিয়ে। গীতার দিকে তাকিয়ে লক্ষ করল, মুখটা খুউব শুকিয়ে গেছে। একে তো বয়সের ছাপ তার উপর বিয়ের টেনশন, গীতাকে অনেকটাই কাবু করে ফেলেছে। সুনির্মলের তো এ ব্যাপারে কিছু করার নেই। তাই কিছু বলতে গিয়েও বলল না। শুধুশুধু কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। চা খেয়ে গীতাকে আবার বেরোতে হবে। তাই সুনির্মল চুপ করেই রইল। বিয়েটা চুকে গেলে গীতাকে ডাক্তার দেখাতে হবে। সুনির্মল ভাবল, স্বামী হিসেবে এটা তার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। মণিময়ের মতো সুনির্মলও সংসারের চারদিকে নজর রেখে চলে। ছোটোখাট সব ব্যাপারেই সে মতামত ব্যক্ত করে। এ নিয়ে মাঝেমধ্যে গীতার সঙ্গে মতভেদের ফলে মনোমালিন্যও সৃষ্টি হয়। তবু সুনির্মল থেমে থাকে না। গীতা বেরোবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসে সুনির্মলকে বলল, শোনো, আমি বেরোচ্ছি। রুমা তো এখনও এল না। টেবিলের উপর খাবার ঢাকা আছে, দয়া করে খেয়ে নিতে বোলো। শুনে সুনির্মল তাকাল গীতার দিকে। দেখল একটা সুন্দর সিল্কের শাড়ি পরেছে গীতা। হাল্কা সবুজ রং। বেশ মানিয়েছে গীতাকে। সুনির্মলের খুব ভাল লাগল নিজের স্ত্রীকে। একসময় মোটামুটি সুন্দরীই ছিল গীতা। নিজেকে সামলাতে না পেরে বলেই ফেলল বাঃ —বেশ দেখাচ্ছে তোমাকে। গীতা সলজ্জ ভঙ্গীতে বলল, থামো তো। আর ঠাট্টা করতে হবে না। এখন আবার সুন্দর ! কী যে বল না তার ঠিক নেই। সুনির্মল হেসে বলল হ্যাঁ — তুমি তো আমার কাছে চিরদিনই সুন্দর। এখন আর তখন কী! গীতা টেবিলের উপর থেকে কয়েকটা কার্ড হাতে নিয়ে নিল। বলল, বুঝেছি, তোমার ভীমরতিতে পেয়েছে। এখন আমি যাই, না হলে রাত হয়ে যাবে। সুনির্মলের রাজুর কথা মনে পড়তেই গীতাকে বলল, রাজু এসে কী খাবে? বললে না তো? গীতা চলেই যাচ্ছিল। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলল, মুড়ি-চিড়া সবই তো আছে ঘরে। রাজুর জন্য চিন্তা নেই আমার। ও নিজে নিয়েই কিছ্ একটা খেয়ে নেবে। তুমি খেলে, তোমাকেও দেবে। বলে গীতা বেরিয়ে গেল। সুনির্মল দরজায় দাঁড়িয়ে ডেকে বলল গীতাকে, রিকশা করে যেও। হেটে যেও না কিন্তু। বেশি দেরি কোরো না। — বলে দরজাটার ছিটকানি লাগিয়ে দিল। মেয়েটি এখনও ফিরল না। বাজে প্রায় বিকেল সাড়ে ৫টা। টিউশন আছে কিনা গীতা তো কিছু

বলল না! কলেজের ক্লাস তো আর এতক্ষণ হয় না। রুমা তো জানে গীতা বিকেলে বেরুবে। তারপরও ওর আসার কোনো নামগন্ধ নেই। এত বেপরোয়া স্বভাব হয়েছে মেয়েটার। সুনির্মলের ভাবতেই মন উত্তেজিত হয়ে যায়। বি.এ. পাশ করলে বিয়েটা দিয়ে দিতে হবে। কিন্তু সুপাত্রের সন্ধানই বা কে দেবে! সুনির্মলের একটা কথা মাথায় আছে যদিও, এবার সুবিমল এলে ওর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে হবে। কাকা হিসেবে ওরও তো একটা দায়িত্ব আছে। সুনির্মল এমনিতেই খুব বাস্তববাদী, সংবেদনশীল মনের মানুষ। আজকাল রুমার চালচলন, আদবকায়দা সুনির্মলের মোটেও ভাল লাগে না। যুবতী বয়স, দেখতে শুনতেও মন্দ নয়। পোশাক পরিচ্ছদেও আধুনিকতার ছাপ। কলেজে যাওয়ার পরই মেয়েটার চলনবলন অনেক পাল্টে গেছে। সুনির্মল তো সবই লক্ষ করে। এটাও লক্ষ করে যে, মা হিসেবে গীতা মেয়েকে কোনো শাসনই করে না। অনেক কিছু দেখেও না দেখার ভান করে থাকে গীতা। তাই তো রাজুও খুব বিরক্ত হয় মায়ের উপর। অনেক ক্ষেত্রে মেয়েকে মা যেটা বলে বোঝাতে পারে, বাবা ভাই সেটা পারে না। কিন্তু গীতার কোনো হুঁশই নেই এ ব্যাপারে। মা মেয়ের সম্পর্ক অনেকটা বন্ধুর মতোই হয়। কিন্তু গীতা? সেইক্ষেত্রে গীতা একটু অন্য ধাতের মনে হয় সুনির্মলের। ছেলের বিয়ের পরই মেয়ের বিয়ের তোড়জোড় করবে। এই স্থির সিদ্ধান্তে সুনির্মল অটল থাকবে। রাজু তো থাকবেই পাশে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। রাজুরও সময় হয়ে আসছে ফেরার। হঠাৎ ক্লান্ত চেহারায় রুমা ঢুকল ঘরে। সুনির্মল খুব বিরক্ত হয়ে মেয়ের দিকে তাকাল। কোনো কথা বলার মতো মানসিকতা সুনির্মলের নেই। রুমা ঘরে গিয়ে ব্যাগ রেখে বাথরুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে এল। দেখল টেবিলের ওপর খাবারটা ঢাকা। তাই বিনা দ্বিধায় খেয়ে নিল। তারপর এসে টি ভি. খুলে বসল। সুনির্মল রাগে ফেটে পড়ল। উঠে দাঁড়িয়ে রুমাকে বলল, কী হল— বাড়িতে ঢুকেই খাওয়া সেরে টি ভি. দেখতে বসে গেলি! আর কোনো কাজ নেই? রুমা টি ভি.-র দিকে তাকানো অবস্থায়ই উত্তর দিল, কী মুস্কিল — এই তো মাত্র এলাম, এইসময় কী কাজ থাকে বলো তো! যাও-বিরক্ত কোরো না আমাকে। আমি খুব টায়ার্ড। সুনির্মল রেগে গিয়ে বলল, কী বললি তুই ? এত কথা বলতে শিখেছিস? কলেজ, টিউশন সব বন্ধ করে দেব। তারপর দেখব তুই কী করিস, অসভ্য মেয়ে কোথাকার। রুমা সুনির্মলের দিকে তাকিয়ে বলল, আচ্ছা জ্বালাতো! কী করতে হবে বলবে তো! শুধু শুধু চিৎকার করে শরীরটা খারাপ করছ। সুনির্মল পেছনে হাত দিয়ে সারা ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। এত কর্কশ সুর রুমার! স্বপ্নেও ভাবেনি সুনির্মল। তার সন্তান এত উদ্ধত, অভব্য আচরণ করবে! রাজুই তার সুসন্তান হিসেবে বিবেচ্য। হাঁটা থামিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েকে হুকুমের সুরে বলল যা, সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বেলে দিয়ে আয়। এটাও কী কোনো মেয়েকে বলে দিতে হয়। মা বাড়ি থাকলে তো তোর করতে হয় না। পারলে তোকে তোর মা সিংহাসনে বসিয়ে রাখে! এসব আর আমি সহ্য করব

না। রুমা টিভি. বন্ধ করে দিয়ে দাঁড়িয়ে বাবাকে প্রশ্ন করল কী সহ্য করবে না? আমি কী এমন কাজ করি যে তোমার সহ্য হচ্ছে না! সুনির্মল রাগে দাঁত কটমট করতে লাগল। শুধু বলল, চলে যা আমার সামনে থেকে। দাঁড়া, তোর ব্যবস্থা আমি করছি। বলে সুনির্মল বারান্দায় চেয়ারে বসল। রুমা সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাতে গেল খুবই অনিচ্ছায়। দিন দিনই ওর স্বাধীনচেতা মনোভাব বেড়েই চলেছে। পড়াশুনোয়ও ততটা মনোযোগ আছে বলে সুনির্মল মনে করে না। কোনোরকমে পাশ করে যাচ্ছে। সামনে রাজুর বিয়ে, এমনিতেই কত চিন্তা মাথায়। তার উপর মেয়ের ধরনধারনে সুনির্মলের মানসিক চাপ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বারান্দা থেকে সুনির্মল রাস্তার দিকেই তাকিয়েছিল। হঠাৎ দেখল রাজু চলে এসেছে। হাতে আবার একটা কাপড়ের প্যাকেট রয়েছে। কী এনেছে কে জানে। জানার আগ্রহও নেই। রাজু আজ তাড়াতাড়ি চলে এসেছে। এবার সুনির্মল রাজুর সাথে বসে চা-মুড়ি খাবে। রাজু এসে ঢুকলে সুনির্মল তাকিয়ে বলল, কী রে রাজু, আজ যেন একটু তাড়াতাড়ি ফিরলি? রাজু ঘরে ঢুকে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সুনির্মলও বারান্দা ছেড়ে ভিতরে গেল। সোফায় বসল। রাজু প্যাকেটটা সুনির্মলের সামনে টেবিলের ওপর রাখল। বলল বাবা, আজ একটু আগেই বেরিয়ে গেছি স্যারকে বলে। তাই আর কী একটা কাজ সেরে তাড়াতাড়ি চলে এলাম। সুনির্মল হেসে অবাক সুরে বলল,কোনো কাজ ছিল বুঝি তোর? কী কাজ রে বাবা? রাজু শার্টের বোতাম খুলতে খুলতেই উত্তর দিল, মানে সে রকম কোনো কাজ নয়। বলছি দাঁড়াও, এদিক ওদিক তাকিয়ে আবারও বলল, মা নেই বুঝি বাড়িতে! দূর অফিস থেকে এসে মাকে ঘরে না দেখলে ভাল লাগে না। কোথায় গেছে মা? সুনির্মলের বেশ ভাল লাগল, ছেলের মাতৃভক্তি দেখে! পরেও এটা থাকবে কিনা কে জানে। কিন্তু এখন তো বেশ প্রখরই রয়েছে। সুনির্মল হেসে বলল, কী কচি খোকা রে আমার, মা কাছে না থাকলে ভাল লাগে না। কেন, আমি তো আছি। তোর মা গেছে দু-চারটা নিমন্ত্রণ করতে। চলে আসার সময় হয়েছে। কাছাকাছিই গেছে। রাজু হাত পা ধুয়ে ট্রাউজার পাঞ্জাবি পরে বাবার সামনে এসে বসল। রুমার কী সুবুদ্ধি হল, এ ঘরে এসে রাজুকে জিজ্ঞেস করল, দাদা, চা করব? রাজু রুমার দিকে না তাকিয়েই বলল, হ্যাঁ খাব, বাবার জন্যও করবি, সঙ্গে মুড়িভাজা নিয়ে আসবি— বলে পত্রিকা খুলে বসল। রুমা চলে গেল। রাজুর হঠাৎ মনে পড়লে প্যাকেটটা সুনির্মলের হাতে দিল। সুনির্মল হাঁ করে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইল। রাজু বলল, কী হল বাবা, খুলেই দেখ না, তোমার জন্য এনেছি। সুনির্মল ভাবল—এই না হলে ছেলে। হৃদয়ে সাড়া জাগিয়ে মনপ্রাণ তৃপ্ত হল। প্যাকেট খুলে ফেলল সুনির্মল। দেখল খুউব মার্জিত রুচির পাঞ্জাবির সেট। হাল্কা ঘিয়ে কালারের মধ্যে মোটা সুতির কাজ। সুনির্মলের খুউব পছন্দ হয়েছে। তাই খুশি হয়ে বলল, বাবা, এত দাম দিয়ে আবার আমার জন্য আনতে গেলি যে! রাজু বুঝল সুনির্মলের খুব আনন্দ হয়েছে, তাই এসব বলছে। রাজু তাই বলে

উঠল, কেন আনব না ? বিয়ের দিন কি তুমি পুরনো ড্রেস পরবে নাকি ! আমি তোমার উপযুক্ত, মোটামুটি সক্ষম ছেলে হয়ে তাই দেখব ! কী যে বলল বাবা, আমি ছেলে। আমি দেব না তো কে দেবে ? সুনির্মলের প্রাণটা জুড়িয়ে গেল ছেলের কথা শুনে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে হল, রাজু তো গীতার জন্য কিছুই আনল না। গীতা তো দুঃখ পেতে পারে। তবুও সুনির্মল রাজুকে কিছুই এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল না। চুপ করেই রইল। রুমা চা-মুড়ি নিয়ে এল। টেবিলের উপর পাঞ্জাবির সেটটা দেখে রুমা রাজুকে জিজ্ঞেস করল, কী রে দাদা, এটা বুঝি বাবার জন্য এনেছিস ! খুউব সুন্দর হয়েছে। তাহলে আমার আর মার জন্য কবে আনবি ? রাজু শান্তভাবেই বলল, সে পরে হবে ক্ষণ। মানে আমি টাকা দিয়ে দেব, তুই আর মা গিয়ে পছন্দমতো কিনে নিয়ে আসবি। সুনির্মল গম্ভীর হয়ে থাকলেও মনেমনে খুশিই হল। চা-আর মুড়ি খেতে থাকল দুজনেই। সাতটা বাজতে চলল এখনও গীতা ফিরে এল না। সুনির্মল জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখল, রাস্তার লাইটগুলোও এখন পর্যন্ত জ্বলেনি। কৃষ্ণপক্ষের রাত বলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন পথঘাট। গীতা কতক্ষণে আসবে কে জানে। সুনির্মলের ভাবগতি দেখে রাজু বুঝতে পারল যে বাবার টেনশন হচ্ছে মায়ের জন্য। তাই চা-মুড়ি খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা বাবা, তুমি কি জান, মা কোন্‌দিকে গেছে ? না কি তাও জান না ! রুমা এসব কথায় না থেকে এ ঘর থেকে চলে গেল। সুনির্মল ভেবেচিন্তে বলল, না, রে রাজু। আমি সত্যিই জানি না। আসলে আমারই দোষ, আমি তো জিজ্ঞেসও করিনি তোর মাকে কার কার বাড়ি যাবে ! রাজু বলল, তাহলে আমি কী একটু এগিয়ে দেখব ? সুনির্মল কথাটা শুনে অনেকটা নিশ্চিন্ত হল। রাজু তো পরিণত বুদ্ধির ছেলে। তাই তার চিন্তা শক্তির সূক্ষ্মতাও বেশি। কিন্তু সুনির্মল ভাবছে— এইমাত্র ছেলেটা এতটা পথ পেরিয়ে এসেছে, আবার এখন বেরোবে মাকে আনার জন্য ? এটা ভাল লাগছে না। তাই রাজুকে বলল, আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর্। তারপর নয়তো যাস। বলে সুনির্মল শোওয়ার ঘরে চলে গেল। রাজু কাপ বাটি সব রেখে এল, পত্রিকাটা নিয়ে বসল। গীতা প্রায় আটটা নাগাদ ফিরে এল। অনেকগুলো নিমন্ত্রণ সেরে এসেছে। সুনির্মল বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। গীতা আসার পর নিশ্চিন্ত হয়ে রাজু বেরিয়েছে হাঁটতে। সোনারপুর জায়গাটা যেমনই হোক, হাঁটার জন্য খুবই ভাল। নিরিবিলি রাস্তায়ই লক্ষ করা যায় মানুষ সুস্বাস্থ্যের জন্য হাঁটছে। ভোরবেলায় সেটা চোখে পড়ে।

বাজার সেরে, গল্প করে উপেন বাড়ি ফিরল প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। অঞ্জলি শুয়ে টি.ভি. দেখছিল। গেটের আওয়াজেই বুঝতে পারল উপেন এসেছে। অঞ্জলি সোফা ছেড়ে উঠে বসল। বাজার নিশ্চয়ই এনেছে। এখন আবার বাজারও গুছাতে হবে। উপেন রান্নাঘরে ঢুকে ব্যাগটা রেখে এই ঘরে এল একেবারে হাত-পা ধুয়ে। অঞ্জলিকে বসে থাকতে দেখেই বলল, কী গো বসে আছ যে ! মাছ তরকারি এনেছি তো। অঞ্জলি অনিচ্ছায় উত্তর দিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ যাচ্ছি।

এই তো মাত্র এলে। চা খাবে নাকি? উপেন হাত মুখ মুছতে মুছতে বলল, না চা খাব না। তবে একটু তেল মুড়ি খেতে পারি। বলে উপেন ধুতি পাঞ্জাবি পাল্টে নিল। হীরকের খোঁজখবর নিল। অঞ্জলি আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে বাটিতে করে তেলমুড়ি নিয়ে এল। উপেন অঞ্জলিকে বসতে বলে নিজেও বসল। অঞ্জলি চুপ করে বসেই রইল। উপেন তাই দেখে বলল আজ নাকি মণিময়ের বউ এসেছিল? অঞ্জলি মাথা নেড়ে সায় দিল। উপেন বলল, বিয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা বলল বুঝি? সুনির্মলবাবুর বাড়ির কথা বলল কিছু? অঞ্জলি উপেনের এই সমস্ত কৌতূহলী প্রশ্ন শুনতে ভাল লাগছিল না। তাও বাধ্য হয়ে বলল, না তো, ওদের বাড়ি সম্বন্ধে কোনো কথাই হয়নি। এমনিতে আমরা গল্পগুজব করলাম কিছুক্ষণ। উপেন খুব মনোযোগ সহকারে অঞ্জলির কথাগুলি শুনছিল। হঠাৎ বলে উঠল, কতদিন পর আমাদের বাড়িএসেছে বৌমা। ঠিক না? বিয়ে বাড়িতে যাওয়ার জন্য তোমাকে বলল না! অঞ্জলি বলল, হ্যাঁ বলল তো। শুধু বিয়েতে কেন, তার আগেও একদিন গিয়ে শাড়ি গয়না দেখে আসতে বলল। উপেন হেসে অঞ্জলির দিকে তাকালো। উপেন দেখল অঞ্জলি গম্ভীর মুখ করে বসে আছে। তাই বলল, তা বেশ তো, তুমি এর মধ্যেই একদিন চলে যেও। হীরক স্কুল থেকে এসে তোমাকে দিয়ে আসবে। অঞ্জলির ভালই লাগল কথাটা। তাই উপেনকে বলল, মনে আছে তোমার, তুমিই একদিন আমাকে সুনির্মলবাবুর ছেলের কথা বলেছিলে রেখার জন্য? বলেছিলে মণিময়দাকে জিজ্ঞেস করে সুনির্মলবাবুর কাছে প্রস্তাব পাঠাবে! উপেন হঠাৎ সব মনে পড়ে গেল। ঠিকই তো, উপেনই এই পাত্রের সন্ধান প্রথম পায়। কিন্তু মণিময়কে আর জিজ্ঞেস করা হয়নি উপেনের। অলকের ব্যাপারে এতই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিল যে ঐ মুহূর্তে এসব ব্যাপার মাথায়ই ছিল না। তাই মণিময়কে কিছুই বলা হয়ে ওঠেনি। উপেন অঞ্জলিকে বলল, হ্যাঁ মনে পড়েছে। কিন্তু মণিময়কে তো আমার বলাই হয়নি। তার কিছুদিন পরেই তো হরিমোহন এই প্রস্তাব নিয়ে মণিময়ের কাছে যায়। নিয়তির বন্ধন এটাকেই বলে গো। উপেন মুড়ি খেতে খেতে টিভি দেখতে লাগল। অঞ্জলি উঠে চলে গেল রান্নাঘরে। হীরক ডাক দিয়ে মাকে বলল, মা, আমার জন্য একটা মাছভাজা করো। ঘি দিয়ে খাব! অঞ্জলি কোনো উত্তর দিল না। ছেলে চেয়েছে তো করতেই হবে। কিন্তু এ সংসারে অঞ্জলির অসুস্থতার কথা কেউই বোঝে না। না ছেলে, না স্বামী। এটাই শুধু দুঃখ অঞ্জলির । এটাও আবার বোঝে, সবার কপালে সব সুখ থাকে না। এই মেনেই সংসার চালিয়ে যাচ্ছে বোবা হয়ে। স্বামীই যদি স্ত্রীর সুবিধা-অসুবিধা না বোঝে, তাহলে কার দায় পড়েছে বোঝার। ছেলে দুটোও তেমনি হয়েছে। স্বার্থপরতার মনোভাব। অঞ্জলির চাহিদা খুব সামান্যই ছিল ঈশ্বরের কাছে। কিন্তু ঈশ্বর তাও পূর্ণ করেন নি। অঞ্জলি নিজের দুর্ভাগ্য বলেই মানে। কাউকেই দোষ দেয় না। এই সমাজের অনেক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারেই সাংসারিক গঠন ব্যবস্থা খুবই দুর্বল লক্ষ করা যায়। সেখানে একের

প্রতি অপরের টান প্রায় থাকে না বললেই চলে। অঞ্জলির সংসারও সেই পর্যায়ের মধ্যেই পড়ে। স্নেহ, মায়া, ভালবাসার বন্ধন এই সংসার থেকে কবেই উধাও হয়ে গেছে। এখন শুধু যান্ত্রিক মনোভাবে দৈনন্দিন কাজকর্ম সমাধান করা হচ্ছে। বাধ্য হয়ে করা, সেখানে প্রাণের লেশমাত্রও নেই। অনেক মানসিক, শারীরিক সংগ্রামের পর অঞ্জলি আজ সংসারের উপর তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছে। মানসিক চাপে শারীরিক শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে অঞ্জলি। সংসারের কোনো কাজেই আজকাল আর মন বসাতে পারে না। জীবনটা জেলখানার কয়েদি হয়ে উঠেছে। এত তাড়াতাড়ি দেহমন মুষড়ে যাবে ভাবতে পারেনি অঞ্জলি। নিজেকে জড়িয়ে কতই না স্বপ্ন ছিল এই সংসারকে নিয়ে। ঘরে ছেলের বৌ আসবে। তার হাতে সংসারের দায়িত্ব সঁপে দিয়ে নিজে মুক্ত বিহঙ্গের মতো ঘুরে বেড়াবে। অঞ্জলির সব স্বপ্ন বিফলে গেল। এখন অতীত তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা আর সইতে পারছে না অঞ্জলি। অথচ এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার কোনো উপায়ান্তরও খুঁজে পাচ্ছে না। জীবনের বেশির ভাগটা রান্নাঘরেই কেটে গেল। বাইরের জগতের সঙ্গে তেমনভাবে আজও পরিচিত হতে পারল না অঞ্জলি। অনেক ক্ষোভ, দুঃখ, অভিমান নিয়ে নিজেকে টেনে নিয়ে চলেছে অঞ্জলি। এটাকে কী বাঁচা বলে? অঞ্জলি তার হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রায়ই এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়ায়। কঠিন নাছোড়বান্দা এই প্রাণ, কিছুতেই অঞ্জলিকে ছাড়তে চাইছে না। অন্তর থেকে সে এই দুর্বিষহ জীবনকে কিছুতেই মানতে পারছে না। এতসব কথা শুধু ভাবাই যায়, অঞ্জলিও শুধুই ভাবে। কিন্তু কাকে বলবে! কে আছে তার এই ভাবনাগুলোকে আপন করে নেবে! না স্বামী, না ছেলে। কেউই নেই। সংসার এখন তার কাছে মরুভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব আশাভরসা স্বপ্নের মতই মলিন হয়ে গেছে। তবে অঞ্জলি জানে—আজকের আধুনিক যুগে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, মানুষের মানসিকতাও অনেক নিম্নমুখী হয়ে গেছে। সংসারেই সে জিনিসটার প্রভাব বেশি লক্ষ করা যায়। ছেলেরা শিক্ষিত হওয়ার পর উচ্চধাপে পৌঁছে গেলেই মা-বাবাকে অবজ্ঞা করতে আরম্ভ করে। অতীতকে ভুলে ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হতে থাকে। মা-বাবা তখন হয়ে যায় সংসারের বোঝা। ভুলে যায় পিতার স্নেহ, মায়ের মমতা। বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে নিজের ছোট্ট গণ্ডি তৈরি করতে ভালবাসে। মা-বাবাকে অশ্রদ্ধা করাটাই অনেক সন্তানের কাছে আজকালকার ফ্যাশন হয়ে দাঁড়ায়। অঞ্জলির মনে তাই প্রশ্ন জাগে-মায়ের ঋণ কি কোনোভাবে শোধ করা যায়। নাকি মায়ের কোন বিকল্প হয়! উপেন অঞ্জলির জমে থাকা অভিমানকে গ্রাহ্যই করে না। মায়ের যে আলাদা মমত্ববোধ থাকতে পারে, সে মানতে নারাজ। তাই উপেনের সামনে ছেলে অলকের কথা মুখেও আনে না। তাই নিজের মনের কথা ভিতরে রেখেই গুমরে মরছে। অলকও হীরকের মতো এইরকম আব্দার করত খাওয়া নিয়ে। অঞ্জলি সেই আব্দার সবসময়েই পূর্ণ করেছে, নিজে না খেয়ে অনেক সময় ছেলেকে খাইয়েছে। হয়তো বা যে-কোনো মা-ই সন্তানের প্রতি অন্ধ ভালবাসায় এইরকমটাই

করবে। তাই বলে যে কোনো ছেলে অলকের মতো স্বার্থবুদ্ধি সম্পন্ন হবে না। অনেক ছেলেই আছে মা-বাবার প্রতি সমস্ত কর্তব্য দায়িত্ব পালন করে থাকে। ওদের কি কেউ শিখিয়ে দিয়েছে? না, এগুলি কাউকে শেখাতে হয় না। এই চেতনাটুকু মনের থেকেই আসে। তবে কেন অঞ্জলি পেল না কিছুই ছেলের কাছ থেকে! অঞ্জলি জানে, যাদের সন্তান অমানুষ হয়, সেই বাবা মায়ের ভাগ্যই মন্দ থাকে। ভাবতে ভাবতে রান্না ঘরে বসেই কিছুক্ষণ কেঁদে নিল অঞ্জলি। কেন ভাগ্য তার সঙ্গে এত বড় ছল করল। কী তার অপরাধ! অঞ্জলির এখন হীরকের উপরও বিশ্বাস নেই। হীরককে নিয়ে সে কিছুই ভাবে না। যা হবার তাই হবে। ভেবে কী লাভ! রান্নাবান্না শেষ হয়ে গেছে। বসে বসেই ঘরটা একটু পরিষ্কার করে নিল। খাওয়াদাওয়া সারার পর অঞ্জলি সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেই চলে গেল শোবার ঘরে। শরীরটা ভাল লাগছে না। তাই ভাবল, সকালে পটলার মা এসেই সব করবে। বেশি রাত যদিও হয়নি। যেহেতু খাওয়াদাওয়ার পর্ব শেষ, তাই অঞ্জলি ওষুধপত্র খেয়ে উপেনকে একটা পান বানিয়ে দিল। নিজেও একটু পান মুখে দিল। তারপর দাঁত ব্রাশ করে শুয়ে পড়ল। বিছানাতেই শান্তি অঞ্জলির। একটা রাত ফুরালেই তো বেঁচে থাকার একটা দিন কমল মনে হয়। জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণায় মনটা সবসময় ভরে থাকে।

মণিময়ের বাড়িতে কাজকর্ম চলছে। মণিময় তাই তদারকি করছে, আর হাতে কাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে। সঙ্গে অসীমও আছে তদারকিতে। দীনু আসার কথা মলয়কে নিয়ে। মলয় এই নয়নপুরেরই ছেলে, কিছুদিন হয় ক্যাটারার-এর ব্যবসা আরম্ভ করেছে, খুব সুনামও হয়েছে। বর্ধমান পর্যন্ত ওকে যেতে হয়। তাই দীনুর পছন্দমতো মলয়কেই নিয়ে আসবে। বেলা প্রায় আটটা বাজে। এখনও আসছে না। এরপর তো স্কুলের সময় হয়ে যাবে। মণিময় খুব অস্থিরতা করছে। বারেবারেই গেটের দিকে তাকাচ্ছে। অসীম তাই দেখে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, কী হয়েছে বাবা! তোমাকে এত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন ? মণিময় তো আজকাল সব ব্যাপারেই টেনশন করে। তাই ছেলেকে বুঝতে না দিয়ে বলল, না রে বাবা। কিছুই হয়নি। ঐ দীনু আসবে বলেছিল তো, এখনও আসছে না তাই আর কী ...। অসীম মণিময়ের হাবভাবে মনেমনে হাসল। দীনুদা তো আসবেই, সে কথায় এক্কেবারে পাক্কা। বাবা ইদানীং একটুতেই অস্থির হয়ে পড়ে। তাই অসীম বলল ও এই কথা। দীনুদা যদি এ বেলাই আসবে বলে থাকে তাহলে অবশ্যই আসবে তুমি টেনশন কোরো না তো! বলে অসীম মণিময়ের জন্য একটা চেয়ার এগিয়ে দিল। মণিময় চেয়ারে বসল। শোভা এল এক বাটি মুড়ি নিয়ে। মণিময়ের এটাই হল প্রাতরাশ। শোভা দেখল দুইজন লেবার বাড়ির সীমানার ড্রেইনগুলো সাফ করছে। মণিময় তাই এখানে বসে পর্যবেক্ষণ করছে। সারা বাড়িতে বিশ্রি গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। শোভা নাকে কাপড় দিয়ে মণিময়কে জিজ্ঞেস করল, কী গো, ওদের চা দিতে হবে না? দিলেও কিন্তু এখন দেব না। যাওয়ার আগে দেব। মণিময় ভাবল শোভাকে আবার চা-টিফিন করতে হবে

ওদের জন্য! একটু সহানুভূতি অনুভব করল শোভার জন্য। তাই বলল,না, না দরকার নেই। তোমাকে আর এসব ঝামেলা করতে হবে না। আমি ওদের তো টাকা দেবই, সঙ্গে টিফিন খাওয়ার পয়সাও দিয়ে দেব। ঠিক আছে ? শোভা একগাল হেসে গদগদ হয়ে বলল, সত্যি গো — তুমি আমার জন্য কত ভাব! আর আমি কিনা তোমার সঙ্গে শুধুশুধু মেজাজ দেখাই! অসীম একটু দূরে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। মণিময়ের দিকে মুচ্‌কি হেসে মাকে বলল, সবই যদি বোঝ, তবে মেজাজ দেখাও কেন? বুঝে চললেই পার বাবার সঙ্গে! মণিময় ছেলেকে ইশারা করল চুপ করার জন্য। অসীম অন্যদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। কখন হঠাৎ করে শোভা খিচিয়ে উঠবে? তাই ভেবে মণিময় শোভার দিকে তাকিয়ে রইল। সত্যিই শোভা অসীমের সামনাসামনি হয়ে বলল, এই ছেলে, খুব সেয়ানা হয়ে গেছিস তাই না? আমাদের কথার মাঝেও ফোড়ন কাটছিস যে বড়! অসীমও কম যায় না। সে মা-বাবার সঙ্গে মজা করতে ভালবাসে। মায়ের মেজাজ বিগড়াতে এক মিনিটও লাগে না, এটাও অসীম ভাল করেই জানে। তাই শোভার সঙ্গে অসীমের খটাখটিও লাগে বেশি। অসীম শোভাকে রাগার জন্য ইচ্ছে করেই বলল, বাঃ, তুমি আমার সামনে আমার বাবাকে বকবে, আর আমি বুঝি তাই সহ্য করব! মোটেও সহ্য করব না। এবার থেকে আমি বাবার হয়ে তোমার উল্টোপাল্টা কথার প্রতিবাদ করব। বুঝলে? শোভা আরও উগ্র হয়ে উঠল। মণিময় দেখল পরিস্থিতি জটিল হয়ে যাচ্ছে। অসীমটাও তেমনি হয়েছে। শুধু মায়ের সঙ্গে ঝগড়া ! তাই মণিময় অসীমকে বলল, অসীম যা তো ভিতরে, এখানে তোর কোনো কাজ নেই। তাছাড়া তুই বেরোবি না? অসীম উত্তর দেওয়ার আগেই শোভা বিদ্রুপের সুরে বলল মণিময়কে, ওমা, এ তুমি কী অদ্ভুত কথা জিজ্ঞেস করছ তোমার ছেলেকে! ও আবার কবে না বেরোয়! চাকরি না করলে কী হল, তোমার ছেলের তিরিশদিনই বাইরের কাজ থাকে। তাই বলছি — এইসব অবান্তর প্রশ্ন তোমার মনে আসে কী করে! অসীম দেখল মায়ের কথায় আবার সেই চাকরির কথা চলে এসেছে। এখানে থাকা ঠিক নয়, ভেবে অসীম ভিতরে চলে গেল। মণিময় অসীমের কথা ভেবে শোভার উপর খুব বিরক্ত হল। শোভার স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে অসীমকে চাকরির খোঁচা দিয়ে কথা বলার। মণিময় শোভার আচরণে খুব কষ্ট পায়। শোভাকে এসব বলে কী লাভ, যে বুঝতে চায় না, তাকে বোঝানোর দায় কি শুধুই মণিময়ের। মণিময় সেটা মনে করে না। তাই শোভাকে গম্ভীরভাবে বলল, তোমার রান্নাবান্না নেই? আমার তো স্কুল আছে। খেয়ে তো যেতে হবে। যাও না, আগে রান্নাটা শেষ কর গে। শোভা আর দাঁড়াল না। বুঝল মণিময়ের খুবই রাগ হয়েছে। ছেলেমেয়ের ব্যাপারে কোনো খারাপ মন্তব্য সে সইতে পারে না। রেখা এবং অসীম মণিময়ের প্রাণ। কেননা মণিময়ের এই ব্যাপারে দৃঢ়তা আছে যে ছেলেমেয়েকে আজকের যুগের সঙ্গে মিলিয়ে চলতে শেখায়নি। শিখিয়েছে সহনশীলতা, ভদ্রতা, শালীনতা।

এইগুলি সবই মণিময়ের কাছ থেকে পাওয়া, এরজন্য শোভা কোনোভাবেই কৃতিত্বের অধিকারী নয়। অনেক কষ্টের পয়সায় ওদের মানুষের মতো মানুষ তৈরি করতে সফল হয়েছে মণিময়। তাই শোভার কটূক্তিগুলো মণিময়ের মনে তীরের মতো বিঁধে থাকে। শোভা জানে স্বামী হিসেবে যেমন মণিময় সার্থক পুরুষ, তেমনি পিতার ভূমিকায়ও সে সফল। তাই শোভা নিজেকে কিছুটা অপরাধী ভেবেই রান্নার কাজে হাত লাগাল। রেখাও এল মাকে সাহায্য করতে। দেখল, শোভা চুপচাপ বসে রান্না চাপিয়েছে। রেখা নিজেই সেধে বলল, জানো মা, দাদা কিছু না খেয়েই বেরিয়ে গেল। আমি কত সাধলাম কিছু খেয়ে বেরোবার জন্যে। আমার কোনো কথাই শুনল না, শুধু বলল এসে খাবে। শোভা ফিরে তাকিয়ে বলল, ঠিক আছে, এসেই খাবে, খিদে পেলে এমনিতেই খাবে। এত সাধবার কী আছে! তুই খেয়ে নে রেখা। টেবিলে রাখা আছে রুটি আলুভাজা, খেয়ে নে মা। রেখার কানে শোভার কথাগুলো ঢুকল বলে মনে হল না শোভার। তাই নিজেই খাবারটা দিল মেয়েকে। রেখা অন্যমনস্কভাবে বসেই রইল। তারপর অনেক ভেবেচিন্তে শোভাকে বলল, মা, তোমাকে একটা কথা বলব ? রাগ করবে না তো। শোভা রেখার গাল টিপে দিয়ে বলল, আচ্ছা, রেখা, তোর উপর কেন রাগ্‌ব ! তুই আমার লক্ষ্মী মেয়ে। বল্ বল্। রেখা শোভার কথায় সাহস পেল কিছু বলার জন্য। দুদিন বাদে এ বাড়ি ছেড়ে, মা, বাবা, দাদাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। দাদা অসীম যে রেখার বন্ধুর মতো। ভাই-বোনের এই গভীর ভালবাসার সম্পর্ক সত্যিই চোখে পড়ার মতো। রেখা খেতে খেতেই বলল শোভাকে,আমি তো চলেই যাচ্ছি। দাদাই তোমাদের একমাত্র সম্বল হবে তখন। তাই তোমাকে অনুরোধ করে বলছি, তুমি দাদার সঙ্গে এরকম ব্যবহার কোরো না। আজ কমাস যাবৎই লক্ষ্য করছি তুমি দাদার সঙ্গে কীরকম যেন একটা ব্যবহার কর! কিন্তু কেন মা ? চাকরি হচ্ছে না, সেটা কী দাদার দোষ। চেষ্টার তো কোনো ত্রুটি করছে না। তা হলে ? কী দোষ দাদার ? দাদার মতো একটা ভাল ছেলে সারা নয়নপুরেও খুঁজে পাবে না। তা ছাড়া ....। শোভা ভ্রূ কুঁচকে বলল কী হল থামলি কেন ? বলতে থাক। শোনার জন্যই তো আমি আছি। একবার বাবা, একবার মেয়ে। যাক্ গে — কী বলছিলি আরও বল্ না। রেখা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। খাওয়াও শেষ হয়ে গেছে। দেখল শোভাও খাবার নিয়েছে খাবে বলে। আশ্চর্যই লাগল রেখার কাছে। ছেলে খায়নি বলে শোভার কোনো হাপিত্যেশ নেই। থাক, রেখা এ ব্যাপারে কিছুই বলল না। ভাবল এ তো যার যার অভিরুচি। তাই রেখা আবার নিজের কথায় ফিরে এল। বলল, যা বলছিলাম। মানে তোমাদের তো বয়সও হচ্ছে। বার্ধক্যের একমাত্র লাঠি হচ্ছে ছেলে। যদি সে সত্যিকারের মানুষ হয়। দাদা তো তাইই। তবে কেন দাদার মনটাকে নষ্ট করে দিচ্ছ উল্টোপাল্টা কথাগুলি বলে। আর চাকরি ? সে তো একদিন না একদিন হবেই। শোভা খেতে খেতে রেখার দিকে তাকিয়ে বলল, ছেলে বার্ধক্যের লাঠি বলে, আমাকে কী

করতে হবে? ওকে তোয়াজ করে কথা বলতে হবে? সে আমি পারব না। ওর অন্যায় দেখলে আমি মা হয়ে তো কিছুই বলতে পারি। এজন্য অসীমের যদি রাগ হয় আমার উপর, হোক গে। এতে কিছু আসে যায় না আমার। রেখা জল খাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। মায়ের এই উন্নাসিক কথাগুলো রেখার মোটেও ভাল লাগছে না। আর তাছাড়া মেয়েলোকের উন্নাসিকতা ভাল নয়। শোভার কথাবার্তার ধরনে মনে হয় ছেলেকে তার কোনোদিনই দরকার লাগবে না। কিন্তু এ যে কত বড় ভুল ধারণা সেটা শোভার বোধগম্যের মধ্যে পড়ে না। রেখা বুঝতে পারল, শোভাকে কিছু বোঝানো নিরর্থক। তাই কথা না বাড়িয়ে মণিময়ের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল। মণিময় খেয়ে বেরিয়ে পড়বে। আজ বরং একটু দেরিই হয়ে গেছে।

মণিময় চুপচাপ খেয়ে নিল। শোভার সঙ্গে কোনো কথাই বলল না। রেখাই মণিময়কে বলল অসীমের না খেয়ে বেরিয়ে যাওয়ার কথা। শোভাই এজন্য দায়ী। তবুও মণিময় কিছুই না বলে স্কুলে চলে গেল। রেখা চলে গেল নিজের ঘরে। বসে বসে অসীমের জন্য মনটা অস্থির হয়ে উঠল রেখার। ভাবছে বিয়ের পর রাজুকে বলবে, দাদার জন্য একটা অন্তত সাধারণ চাকুরীর ব্যবস্থা করে দিতে। কে জানে রাজু গায়ে মাখবে কি না কথাটা। কতটা গুরুত্ব পাবে অসীম রাজুর কাছে ? কিছুই তো রেখা বুঝতে পারছে না এখনই। তবে অসীমের জন্য রেখার মনটা হুহু করে কেঁদে ওঠে। ওর স্নেহের ঋণ কোনোদিনই শোধ করতে পারবে না রেখা। রেখার চোখে জল এসে যায় এসব ভাবতে গিয়ে। হঠাৎ শোভা এসে বলল, দেখলি রেখা, দীনুটা এল না কথা দিয়েও। দিন তো চলে যাচ্ছে। আজই তো খাওয়ার মেনু তৈরি হয়ে যেত দীনু এলে। হতভাগাটা এল না কেন কে জানে। রেখা চোখের জলটা তাড়াতাড়ি মুছে নিল। শোভার কথার কোনো উত্তর দিল না। চুপ করে বসে বই-এর পাতা উল্টাতে লাগল। কে বলবে, ঈশ্বর কবে অসীমকে কৃপা করবে। শোভা রেখাকে চুপ করে থাকতে দেখে চলে গেল নিজের ঘরে। প্রায় সাড়ে এগারটা বাজে। এখনও রেখা বা শোভা কারুরই স্নান সারা হয়নি। হঠাৎ গেট খোলার শব্দে শোভা চমকে উঠল। রেখাও তাকাল জানালা দিয়ে, ভাবল অসীম এসেছে। কিন্তু তা নয়, এসেছে নীরদের বউ রমা। স্নান সেরে ভাল শাড়ী পরে সেজেগুজে এসেছে। রেখা নিশ্চিত, এবার শোভা খুব বিরক্ত বোধ করবে। অসময়ে কেউ এলে শোভার মেজাজ বিগড়ে যায়। কিন্তু কেউ না কেউ তো অসময়ে আসতেই পারে। সবার কি আর সময়ের জ্ঞান থাকে? তাছাড়া এই বাড়িটা এখন বিয়ে বাড়ি। যখন-তখন লোকজন আসাটাই স্বাভাবিক। রেখা বসেই রইল। শোভা বারান্দায় এসে দেখল রমা এসেছে। শোভা হাসি মুখেই তাকে অভ্যর্থনা করল। রমা বারান্দায় মোড়ায় বসল। রমা নীরদ ওরা মণিময়ের পরিবারকে খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখে এবং ভালওবাসে রেখাকে খুবই। কিন্তু শোভা খুব বেশি একটা পছন্দ করে না। প্রতিবেশী বলে তাও তো মিশতে হয়। শোভাও আরেকটা মোড়ায় বসে রমার দিকে তাকিয়ে বলল চানটান সারা হয়ে গেছে বুঝি? এ জন্যই এত ফ্রেশ লাগছে। তা এত তাড়াতাড়ি কাজও সেরে

ফেললে? রমা বলল, হ্যাঁ, আজ রান্নার আয়োজনটা কম, তাই তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে। তা ছাড়া আমার শাশুড়ি মা-ও বাড়ি নেই। তাঁকে তাঁর ছোটো ভাই এসে নিয়ে গেছে। দু-চারদিন ওখানে থেকে আসবে। শোভা আশ্বস্তের সুরে বলল, ভালই তো হয়েছে রমা। দুটো দিনই একটু শান্তিতে থাকতে পারবে। তুমি বোসো, আমি আসছি, বলে শোভা ভিতরে গেল। একটু বাদেই ফিরে এল একটা প্লেটে দুটো মিষ্টি নিয়ে। রমার হাতে দিয়ে বলল, এই দুখানা মিষ্টি খেয়ে নাও। রমা একটু অবাকই হল মিষ্টি দেখে। আরও এই সময়ে। তাই রমা বলল, কেন দিদি —— এই সময়ে মিষ্টি। আমি স্নান পুজো সেরে রুটি খেয়ে এসছি এইমাত্র। খেতে পারব না, অসম্ভব। শোভা ধমকের সুরে বলল, এ আবার কী কথা। রুটি খেয়ে এসছ বলে দুটো মিষ্টি খেতে পারবে না। খুউব পারবে। খাও শিগগির। বিয়ে বাড়ি এলে মিষ্টি খেতে হয়। রমা শোভার সঙ্গে তর্ক যুক্তিতে যাওয়ার আর সাহস পেল না। তাই খেয়েই নিল। রমা উৎসাহের সুরে জিজ্ঞেস করল, দিদি, বিয়ের সব কেনাকাটা হয়ে গেছে? শোভা কিছুক্ষণ নিরুত্তর থেকে বলল, হ্যাঁ, মোটামুটি শেষ হয়েছে। অল্প কিছু বাকিও আছে। জানে রমা, শোভা কোনো জিনিসই রমাকে দেখাবে না। তাই রমা দেখার কোনো আগ্রহও দেখাল না। রেখা এল রমার সঙ্গে কথা বলতে। বিয়ের কনেকে সবারই দেখতে ভাল লাগে। রমারও তাই লাগল। রেখার অমায়িক ব্যবহারে রমা খুব তুষ্ট। রমাদের মতো মেয়েরা শিক্ষিত মানুষদের কাছে একটু ভাল ব্যবহার, আন্তরিকতা, এটুকুই আশা করে। এর বেশি কিছু নয়। রমা রেখার কাছ থেকে ভাল ব্যবহার পায় বলেই না, এ বাড়িতে রমা মাঝেমধ্যে আসে। নয়ত কখনোই আসত না। রমাকে রেখা বলল , কী, কাকিমা কেমন আছ? দেখে তো মনে হয় ভালই আছ! সত্যিই — আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, তোমাদের ছেড়ে যাব বলে। রমা ভাবল, কী বলছে রেখা। রেখার সঙ্গে রমার কোনদিকেই তুলনা চলে না। তবুও রেখার যথেষ্ট টান রয়েছে নয়নপুরের অতি সাধারণ মানুষদের জন্যও। রমা বিগলিত হয়ে বলল, কী বলছ রেখা। আমাদের মতো মানুষের জন্যও তোমার মন খারাপ লাগে? রেখা অবাক হয়ে রমার কথার উত্তর দিল, কেন, মন খারাপ হতে পারে না তোমাদের জন্য। এত পাশাপাশি থেকেছি, মেলামেশা করেছি, তা মন খারাপ হওয়াটাই তো স্বাভাবিক, তাই না কাকিমা? রমা আপন মনে বলতে লাগল, তুমি কত শিক্ষিত,আর আমি তো একটা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। কোথায় তুমি আর কোথায় আমি। সত্যি রেখা, তুমি যে বাড়ির বউ হয়ে যাচ্ছ তারা সত্যিই ভাগ্যবান। তোমার মতো বউমা পাচ্ছে। তোমার মনে কোনো ভেদাভেদ নেই। তোমার জন্যই তো তোমাদের বাড়ি আসি গো। রেখা বুঝল রমা খুব আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছে। রেখা তাই বলল, আচ্ছা কাকিমা, এবার বলো তুমি আমার বিয়ের শাড়িটা দেখতে চাও? শোভা তো পাশেই বসা। রেখার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে। রেখা মাকে লক্ষ করল, কিন্তু বেশি গ্রাহ্য করল না। রমা আড়ষ্ট সুরে বলল, যদি আমাকে দেখাও তো অবশ্যই দেখব। এই জন্যই তো এসেছি। কিন্তু দিদিকে বলার সাহস পাইনি। রেখা

ঘরে গিয়ে আলমারি খুলে শাড়িটা নিয়ে এসে রমাকে দেখাল। রমা তো খুব খুশী শাড়ি দেখতে পেয়ে। শোভার ভাল লাগল না বলে উঠে চলে গেল। রমাকে বলেও গেল না। তাই দেখে রমা বলল, দিদি মনে হয় রাগ করেছেন। চলে গেলেন যে। আমাকে শাড়িটা দেখিয়েছ, তাই হয়তো ....। রেখা তাড়াতাড়ি করে বলল, না , না রাগ করবে কেন! আর রাগ যদি করেও থাকে, এতে আমার কী, আমার শাড়ি আমি যাকে খুশি দেখাতে পারি, এতে কার বলার কী থাকতে পারে ? রেখা লক্ষ করল, রমার মনটা খুব বিষণ্ণ হয়ে গেছে। রেখা বলল,আরেকটা কথা তুমি মনে রাখবে। বিয়ের দিন সকাল থেকেই তুমি এখানে থাকবে, এখানেই খাওয়াদাওয়া করবে। কেমন ? রমা ইতস্তত করে বলল চেষ্টা করব। এখন আমি যাই গো। বলে উঠল রমা। রেখা গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিল। ঘরে এসে দেখল মা স্নানে ঢুকেছে। সত্যি রেখা বুঝতে পারে না শোভার হাবভাব। যে বাড়িতে আসে, তার সঙ্গে তো অবশ্যই ভাল আতিথেয়তা করতেই হয়, সে যেই হোক। শোভার মতিগতি রেখা অনেক সময়ই বুঝতে পারে না। মানুষে-মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে কী লাভ! সেটাই বুঝতে পারে না। রেখা বুঝতে পারে না — মা শোভা কেন কিছু কিছু মানুষকে ভিন্ন চোখে দেখে, সব মানুষই তো সকলের কাছে সমান হওয়া উচিত। রেখার মতে কাউকেই অবজ্ঞার চোখে দেখা উচিত নয়। তাই নয়নপুর গ্রামের মানুষ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই রেখাকে সুনজরে দেখে। স্নেহও করে। মণিময়ের শিক্ষায় বড় হয়েছে বলেই দুটো সন্তানই মানুষের মতো মানুষ হয়েছে। এই অভিমত সকলেরই। জীবনের চলার পথে প্রত্যেকেরই নীতিবাদী, আদর্শবাদী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। নয়ত চলতে চলতে পা পিছলে যাওয়ার সম্ভাবনাকে কেউ আটকাতে পারে না। সেখানে আর্থিক সচ্ছলতার প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় শিক্ষার অগ্রগতি। শিক্ষার মান উন্নয়নে আজ সারা ভারতবর্ষ সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। নানা দিকে শিক্ষার মান তুলে ধরা হয়েছে। অবৈতনিক, মিড্ ডে মিল ইত্যাদি রাখা হয়েছে শিক্ষার উন্নতির লক্ষ্যে। তবে পাশাপাশি দুর্নীতি, অরাজকতা, হিংসাশ্রয়ী কার্যকলাপও অব্যাহতই চলছে। শুধু বড় বড় শহরে নয়, গ্রামেগঞ্জেও এর প্রভাব পড়েছে। স্বরাষ্ট্র দপ্তর শাসন কায়েম রেখেছে ঠিকই, তাও এইসব প্রতিরোধ করতে ততটা সক্ষম হতে পারছে না। প্রশাসনিক জটিলতায়, রাজনীতির প্রভাবে এগুলোকে বন্ধ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই নয়নপুরেও আজকাল এই প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। আগের সেই গ্রামের মাহাত্ম্য, বৈশিষ্ট্য, আজ আর তুলে ধরা যায় না। নানাভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে এই গ্রামের কিছু স্তরের মানুষ। এরা দরিদ্র, নিঃসহায়, সম্বলহীন, নিরীহ প্রকৃতির লোক। এদের পাশে দাঁড়াবার লোকও আজকাল খুঁজে পাওয়া যায় না। অর্থলোভী, শয়তান, স্বার্থপর লোকদের ভিড়ে এরা নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। মণিময়, উপেন, দীনুর মতো লোকেরা এদের কোনো সাহায্যই করতে পারে না। সহানুভূতি দেখাতে পারে, ভাল পরামর্শ দিতে পারে। এছাড়া সৎ মানুষের মূল্য আজ ক-জনাই বা দেয়। মণিময় তার ছেলেমেয়েদের আজকালকার শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেনি,

তুলেছে নিজের আদর্শের আওতায় রেখে। কিন্তু পারেনি শোভাকে পাল্টাতে। নিজের সংসারের গণ্ডিটুকু ছাড়া সে আর কিছুই বুঝতে শেখেনি। তাই তো মানুষের সঙ্গে আচার-ব্যবহারটুকুও ঠিকভাবে করতে পারে না। মণিময় এজন্য অনেকসময় ধৈর্যহারা হয়ে যায়। তখনই মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। মেয়ে হয়ে রেখাও মায়ের এইসমস্ত অসংলগ্ন আচরণ মানতে পারে না। এখন তো মণিময়ের একটাই চিন্তা শোভাকে নিয়ে। মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের সামনে না কোনো বেফাঁস কথা বলে বসে। সুনির্মল নূতন কুটুম্ব হতে চলেছে। মেয়ের শ্বশুরবাড়ি মানেই মেপে কথা বলা। কোনো ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবহার না করা। মণিময়ের এইসব ভাবনা রেখার মনে ঠিক ঠাঁই পায়, কিন্তু শোভার ? শোভা তো এসব বোঝেই না। অসীমও মায়ের এই ধরনের আচরণে ক্ষুব্ধ এবং আতঙ্কিত। রেখা দেখল, অসীম ফিরেছে, কিন্তু শোভার এর জন্য কোনো হুঁশই নেই। ছেলেটা কিছু খেয়েছে কিনা সেটা অসীমকে জিজ্ঞেস করা প্রয়োজনও মনে করছে না শোভা। দিব্যি একটা গল্পের বই নিয়ে শুয়ে আছে। কিন্তু অসীমের না খাওয়ার জন্য তো শোভাই দায়ী। রেখা আশ্চর্যই হলো শোভার আচরণে। এরকম তো ছিল না শোভা, তবে এখন কী হল তার ? অসীমের খুব দুঃখ হল। রেখাকে বলল, দেখলি তো রেখা মার ব্যবহার ! আমার চাকরি হচ্ছে না, তো আমি কী করব ? কই বাবা তো এইরকম করে না ! রেখা অসীমের দিকে তাকিয়ে অন্যরকমভাবে বলল দাদা, তুইও কী নূতন করে চিনতে আরম্ভ করেছিস মাকে ? সবসময়ই তো এই রকম। এত সেন্টিমেন্টাল হলে চলে রে দাদা ! চল্ — চান করে নে, আমি ভাত দিচ্ছি। অসীম আবেগবশে রেখার হাত ধরে বলল, বোন, তুই চলে গেলে আমাকে কে দেখবে, বল ! আমি যে একদম একা হয়ে যাব রে। কী উপায় হবে আমার, দিনের পর দিন মায়ের কথার খোঁচা শুনে থাকতে হবে ? রেখা একটু হেসে বলল দূর — এসব নিয়ে এত ভাবিসনা তো। যখন ভাল লাগবে না তখন আমার কাছে চলে যাবি। ক-দিন থেকে আসবি। তাছাড়া বাবা তো আছেনই। মা-ও তো এমনিতে খুবই ভাল তাই না ? অসীম চুপ করে থেকে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ — মা তো ভালই। মা কি কারুর খারাপ হয় ? ছেলে খারাপ হতে পারে, মা কোনোদিনই খারাপ হয় না। জানিস তো —— আমার এই মুহূর্তে যে কোনো একটা চাকরির দরকার। কোথায় যাব, কাকে যে বলব, কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। রেখা অসীমকে টেনে তুলে দিল চেয়ার থেকে। অসীম চান সেরে খাওয়াদাওয়া সেরে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। শোভা আর রেখাও খাওয়ার পাট শেষ করে নিল। রেখার মনে হল আজও শোভা বিকেলে কোথাও যাবে। বিছানার উপর ভাল শাড়ি ব্লাউজ দেখা যাচ্ছে। কখন বের করে রেখেছে কে জানে ! কোথায় যাবে তাও জানে না রেখা। তাই জানার কোনো উৎসাহও দেখাল না।

এদিকে কৃষ্ণনগরে কল্যাণীর কাছে পৌঁছে গেছে মণিময়ের চিঠি এবং বিয়ের কার্ড। কল্যাণী আনন্দে আত্মহারা। এতদিন পরে একটা শুভ খবর পাওয়া গেল। দাদা মণিময়েরও চিন্তার

অবসান ঘটতে চলেছে। মেয়ে মানেই তো পরের জন্য। ভাবলে কল্যাণীরও খুবই কষ্ট হয়। সেই ছোট্ট রেখাকে এতদিন স্নেহ মমতা দিয়ে লালন পালন করার পর দাদা নিজের হাতে অন্যের হাতে দান করে দেবে মেয়েকে। সামাজিক রীতিনীতি মেনে চললে তো এইসব নিয়মগুলো করতেই হবে। এটা একদিকে যেমন দুঃখের, অন্যদিকে তেমনি সুখকর। কল্যাণী বসে অনেকক্ষণ স্মৃতি মন্থন করল। খানিকটা চোখের জলও ফেলল। আর তো কটা দিন। যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হবে কল্যাণীদের। অসীমের মোবাইলে কল্যাণী বলে দিয়েছে বিয়ের আগের আগের দিন গিয়ে পৌঁছোবে। সপরিবারেই যাবে। অরুণকে বলা হয়ে গেছে সাতদিনের ছুটি নিতে! দাদাকে তো কাজকর্মে সাহায্য করতে হবে অরুণকে। কল্যাণী এটাও জানে কল্যাণী গিয়ে পৌঁছুলেই বৌদি শোভা হাতে স্বর্গ পাবে। সব ভেবে চিন্তেই বিয়ের দুদিন আগে যাওয়া স্থির করেছে। অরুণ আজ বাড়ি ফিরলে কল্যাণী অরুণকে নিয়ে বেরিয়ে রেখার জন্য এক জোড়া সোনা বাঁধানো শাখা কিনে আনবে ভাবছে। এমনিতে তো কিছুই দিতে পারে না, তাই একমাত্র পিসি হিসেবে সোনার জিনিস দেওয়া উচিত। কিছু টাকা কল্যাণী জমিয়েছে। আর বাকি যা লাগবে তা অরুণই ব্যবস্থা করবে। আর্থিক ক্ষমতা ভাল থাকলে কল্যাণী হয়তো বা আরো ভাল জিনিসই দিত। মণিময়ের ঋণ কি কোনোদিন শোধ করতে পারবে কল্যাণী? কোনোদিনই পারবে না। দেবতুল্য দাদা মণিময়কে এই সময় কটা টাকা দিয়ে সাহায্য করার মতো ক্ষমতাও নেই কল্যাণীর। মা-বাবার মৃত্যুর পর দাদা আর বৌদির স্নেহযত্নেই বড় হয়েছে কল্যাণী। মা-বাবার অভাব কোনোদিনই বুঝতে দেয়নি ওরা। টানাটানির সংসারে থেকেই কল্যাণীর বিয়ে হয়েছে। সুপাত্র দেখে দাদা অনেক কষ্ট করে টাকার জোগাড় করে কল্যাণীকে পাত্রস্থ করেছে। এসব কিছুই ভোলেনি কল্যাণী। ভুললে যে ভগবান অসন্তুষ্ট হবেন। এটুকু কৃতজ্ঞতাবোধ সারা জীবনই থাকবে কল্যাণীর। মণিময়ের জন্যই তো আজ সংসার পেয়েছে, ভাল স্বামী সন্তান পেয়েছে। মণিময় যদি কল্যাণীর দায়িত্ব না নিত তা হলে তো কল্যাণী ভেসে যেত খড়কুটোকে আশ্রয় করে। তারই মেয়ের বিয়ে হতে চলেছে। সেখানে তো উপস্থিত থাকতেই হবে। ছেলে দুটোর সে কী আনন্দ, দিদির বিয়েতে যাবে, থাকবে মামার বাড়িতে। কল্যাণীর আলমারিতে নূতন একটা শার্টও রয়েছে। কিনেছিল অরুণের জন্যে। সেটাই রেখার জামাইকে আশীর্বাদে দেবে। আগামী পরশুদিনই রওনা হতে হবে। অরুণকে বলেছে শান্তিপুর লোকাল-এ টিকিট কেটে আনতে। এখান থেকে ভোরবেলা রওনা হতে হবে। শিয়ালদা থেকে হাওড়া গিয়ে আবার ট্রেনে উঠতে হবে। নয়নপুর পৌঁছতে বিকেল হয়ে যাবে। শিয়ালদহ পৌঁছে হোটেলে ভাত খেয়ে নিতে হবে। নয়ত ছেলে দুটোর কষ্ট হবে। অরুণ এতই ভাল যে কল্যাণীর কোনো কথাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। তার স্বভাবই এইরকম। মণিময় কল্যাণীকে

ফোন করে বলে দিয়েছে কীভাবে আসতে হবে। যাওয়ার আগে কল্যাণীর কিছু কেনাকাটাও আছে নিজেদের জন্যে। তারপর বাড়ির ব্যবস্থা করে রেখে যেতে হবে। তাই পাশের বাড়ির ছেলেটাকে বলেছে রাতে এসে ঘুমাতে। বিকেলে যখন গয়নার দোকানে যাবে, তখনই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোও নিয়ে আসবে। কল্যাণী নিজের জন্য কিছু কিনবে না। বিয়ের দিন পরার জন্য দুই ছেলের ড্রেস আর অরুণের জন্য ট্রাউজার পাঞ্জাবি কিনে আনবে। যাওয়ার সময় কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া নিয়ে যাবে কল্যাণী। ভাবছে :— কয়েকটা নারকেলের নাড়ুও বানিয়ে নিয়ে যাবে রেখার জন্য। আবার কবে পাবে রেখাকে কে জানে। মণিময়ের বাড়ির মতো কল্যাণীর বাড়িতে বিয়ের আনন্দের জোয়ার বইছে। কল্যাণীদের রওনা হওয়ার দিন এসে গেল। কালই ভোরে রওনা হতে হবে। গোছগাছ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। শুধু নাড়ুগুলো ঢোকানো বাকি আছে। যদি ভুলে যায়, তাই নাড়ুর কৌটোটা ব্যাগের সামনে রেখে দিল কল্যাণী। একটা ভিআইপি সুটকেস, আর একটা বড় ব্যাগ রেডি করে নিয়েছে। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গেসঙ্গে বেরিয়ে পড়ল কল্যাণীরা।

সকালবেলায় হরিমোহন আজকাল মর্নিং ওয়াক করে। শরীরটা নিয়ে চিন্তা করতে আরম্ভ করেছে হরিমোহন। লাবণ্য খুব খুশী এজন্য। জীবনের সায়াহ্নে এসে কিছুটা শরীর চর্চা তো করতেই হয়। আজকালকার দিনে শুধু ওষুধে ভাল থাকা যায় না। গোপাল চা করে রেখেছে। হরিমোহন এলে লাবণ্যও চা খাবে। গোপাল তাই চা টি-পটেই রেখে দিল। হরিমোহনের শোওয়ার ঘরের টেবিলের ওপর চা শুদ্ধ ট্রেটা রেখে গেল। লাবণ্যর মনে পড়ল —— আজ তো হরিমোহনের রেখাদের বাড়িতে সকালের দিকেই যাওয়ার কথা। প্যান্ডেলের লোকজন আসবে। তাই মণিময় স্যার খবর পাঠিয়েছেন হরিমোনকে সেই সময় থাকার জন্য। কী জানি মনে আছে কিনা! তক্ষুনি হরিমোহন ঢুকল। ঘরে ঢুকেই ফ্যান চালিয়ে বসল। লাবণ্য এসে কাপে চা ঢেলে দিল। ড্রেসটা পাল্টে চা খেতে বসল। লাবণ্য নিজের জন্যও চা ঢালল কাপে। চা খেতে খেতেই লাবণ্য হরিমোহনকে বলল, কী গো, আজ যে রেখাদের বাড়িযেতে হবে, সেটা মনে আছে তো ? হরিমোহন বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে আছে। আমি কি এমন মাথা নিয়েই চলি নাকি যে সামান্য কথাটাও ভুলে যাব! লাবণ্য চা খাওয়া শেষ হতেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আর কথা বাড়াল না। চান করে পুজো দিয়ে রান্না করবে। এদিকে মণিময় বারান্দায় বসে অপেক্ষা করছে দীনুর জন্য। হরিমোহনেরও আসার কথা। দীনু তো কালও এল না। আজ না এলে তো মহাবিপদ। আর মাত্র চারদিন বাকি। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাটা পাকাপাকি হওয়া দরকার। মণিময় রেখাকে ডেকে বলল, রেখা মা, আমাকে এক কাপ চা দিয়ে যা তো। একটু মুড়িও দিস। আর দীনু ওরা এলেও ওদের চা-বিস্কুট দিস। মণিময় ভাবল রেখা শুনেছে কিনা কে

জানে। তাই রান্নাঘরে গিয়ে শোভাকে বলে এল। রেখাও হাত মুখ ধুয়ে এল রান্নাঘরে। বলল, বাবা, আমি শুনতে পেয়েছি তো, দিচ্ছি তোমাকে চা করে। তুমি গিয়ে বসো, আমি নিয়ে আসি। মণিময়ের মুখে হাসি ফুটে উঠল। এসে আবার বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসল। অসীম আরও দুটো চেয়ার এনে রাখল। তারপর অপেক্ষার অবসান ঘটল। দীনু এল মলয় ক্যাটারকে নিয়ে। মণিময় অসীমকে বলল হরিমোহনকে ফোন করতে আসার জন্য। অসীম মণিময়ের কথামতো তাই করল। অসীমের ফোন পাওয়ার আগেই হরিমোহন বেরিয়ে গিয়েছিল। তাই কিছুক্ষণের মধ্যে হরিমোহনও চলে এল। সবাই বসে আলাপ আলোচনা করতে লাগল। রেখা চা করে দিলে অসীম ট্রেতে করে নিয়ে এসে যার যার হাতে কাপগুলো ধরিয়ে দিল। বিস্কুটের প্লেটটা টেবিলের উপর রাখল। মণিময় মলয়কে আড়াইশো লোকের খাওয়ার বরাদ্দ দিয়ে দিল। দীনু আর অসীম মিলে খাওয়ার মেনু তৈরি করল। মণিময়ের সাধ্যের মধ্যে সেই সব ব্যবস্থা করা হল। হঠাৎ দীনু আবদার করে বসল মণিময়ের কাছে, স্যার, আমি সবাইকে আইসক্রিমটা খাওয়াব, আপনি কিন্তু না করবেন না। এটা আমার আর প্রণতির একান্ত ইচ্ছে। আপনি বাধা দিলে খুব কষ্ট পাব। রেখা তো আমারও বোন, নাকি! তাই দাদা হিসেবে এটুকু করার অনুমতি দিন স্যার। মণিময় এক আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়ে গেল। না-ও করতে পারছে না, হ্যাঁ ও করতে পারছে না। তারপর অসীম মীমাংসা করে দিল। কী হল বাবা, কিছু বলো। তুমি না কোরো না, এটা ঠিক হবে না। দীনুদা এত করে বলছে। তুমি না কোরো না। অগত্যা মণিময় দীনুর কথায় রাজি হয়ে গেল। দীনু খুব খুশী হল। অসীম জানে, মণিময়কে অসীম কিছু বললে, সেই কথা এড়িয়ে যেতে পারে না। হরিমোহনও হাসতে লাগল দীনুর দিকে তাকিয়ে। মলয়কে বলা হল কাল এসেই আগে বিয়ের গেটটা বানানোর জন্য। সেই মতো সে লোক নিয়ে আসবে। মণিময় উপেনের সঙ্গে কথা বলে ওদের ড্রয়িং রুমটাতেই বর এবং বরযাত্রীদের বসানোর ব্যবস্থা করে ফেলেছে। তাই দীনু কালই মলয়কে নিয়ে উপেন স্যার-এর বাড়িতে গিয়ে দেখিয়ে দিয়ে আসবে কীভাবে কী করতে হবে। হরিমোহন মণিময়কে বলল, স্যার — আপনার বাড়ি তেঅতিথিদের শোওয়ার জায়গার অসুবিধা হলে, আমার তো একটা বড় ঘর খালিই পড়ে থাকে, সেটা ব্যবহার করতে পারেন। কোনো অসুবিধা হবে না। বিছানাপাটি সবই আছে। মণিময় ইতস্তত করছিল বলে অসীম বলল, ঠিক আছে কাকু, যদি সেইরকম অসুবিধা হয়, তা হলে আপনার বাড়িতেই নিয়ে যাব। বলে মণিময়কে আশ্বস্ত করল। হরিমোহন অসীমকে বলল, দেখো বাবা, খাবার পরিবেশনের সময় তোমাকে থাকতেই হবে, অন্যেরা তো থাকবেই, কিন্তু তোমার থাকাটা একান্ত দরকার। তাছাড়া সাতটা-সাড়ে সাতটার মধ্যে খাওয়া আরম্ভ করতেই হবে। নয়ত অনেক রাত হয়ে যাবে। ঠিক বললাম তো স্যার? মণিময়

সায় দিয়ে বলল হ্যাঁ, হ্যাঁ — একদম ঠিক কথাই বলেছেন। তা ছাড়া আমি তো বিয়ের কার্ডে লিখেই দিয়েছি প্রীতিভোজ সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা থেকে। সেইমতেই আরম্ভ করতে হবে। তারপর হরিমোহন মলয়কে বলল, দেখ বাবা, খেয়াল রেখো, কার বাড়ির কাজ করছ! রান্নাবান্না যেন সুস্বাদু হয়। তাহলেই তো তোমার ব্যবসা প্রসারিত হবে। মাছ-মাংস যেন টাটকা হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখো। দীনু কটাক্ষ চোখে তাকাল হরিমোহনের দিকে। মুখে কিছুই বলল না। একটু বিরক্ত বোধও করল। সব কিছুতেই হরিমোহনের বাড়াবাড়ি। মলয়কে এইসব কথা বলার উনি কে! দীনু অসীমকে বলল কাল সকালেই তিনজন লেবার আসবে গেট এবং প্যান্ডেলের জন্য। তুই বাড়িতে থাকিস কিন্তু। দেখিয়ে দিবি, যদিও ওরা এইসব কাজে অভ্যস্ত। তবুও তুই থাকিস। অসীম বলল হ্যাঁ, ঠিক আছে আমি থাকব। কাল থেকে তো বাবাও ছুটি নিয়েছে। তাই না বাবা? মণিময় অসীমকে বলল, হ্যাঁ কাল থেকে আমার ছুটি। কিন্তু আমি তো এসময় বাড়িথাকতে পারব না। তুইই থাকবি। আমি কার্ড নিয়ে বেরোব। আশেপাশের বেশ কয়েকটা নিমন্ত্রণ করা বাকি আছে। কাল যেতেই হবে। অসীম বলল, কোই বাত নেহি, তুমি চলে যাও। অসীম দীনুর দিকে তাকিয়ে আনন্দে বলল, জান দীনুদা, আজ কৃষ্ণনগর থেকে আমার পিসি আসছে সপরিবারে, কী মজা না? দীনু বলল তাই নাকি? খুউব ভাল কথা। বিয়ের অতিথি আসতে শুরু করল তাহলে। শোন্ — শোয়ার অসুবিধা হলে আমাকে একটা ফোন করে চলে যাস আমার বাড়ি কেমন? মণিময় বাধা দিয়ে বলল, না দীনু- আজ কোনো অসুবিধা হবে না। বাড়িতেই হয়ে যাবে। হরিমোহন উঠল চেয়ার ছেড়ে। অসীম বলল, কাকু চলে যাচ্ছেন? আর বসবেন না! হরিমোহন হেসে বলল, আর বসব কেন বাবা! কথাবার্তা তো শেষই। কাল বিকেলের দিকে এসে দেখে যাব কাজ কতটুকু এগোল। স্যার আমি এবার চলি তাহলে। দীনুকে কিছু বলল না। মণিময় হরিমোহনকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিল। অসীম আর দীনু কথা বলছে। অসীমের হঠাৎ মনে পড়াতে দীনুকে জিজ্ঞেস করল, দীনুদা, তুমি কাল এলে না কেন? দীনু বলল,আর বলিস না, কাল দোকানের ম্যানেজার না আসাতে আমাকে দোকান খুলতে হয়েছে। না হলে আমার একটু দেরি করে গেলেও তো অসুবিধা নেই কোনো। তাই আসতে পারিনি রে। ফোনে তোকে এসব বলার সময়ও ছিল না আমার। মণিময় সামনে এসে বলল, ব্যবসার কাজে সময় না পাওয়া মানে ব্যস্ত থাকা তো খুব ভাল কথা দীনু। বসে থাকলে তো আর ব্যবসার উন্নতি হবে না! বলে মণিময় ভিতরে চলে গেল। দীনু সুযোগ পেয়ে, রেখা, ও রেখা বলে ডাকতে লাগল। রেখা এল হাত মুছতে মুছতে। মাথা নিচু করে বলল কী ব্যাপার দীনুদা, ডাকছ কেন? দীনু রেখার মাথায় হাত রেখে বলল, আরে পাগলী, দুদিন বাদে তো তোর বিয়ে, তার আগে একবার দেখব বলে তোকে ডেকেছি। কেমন লাগছে রে বোন! মা

বাবা, দাদা আর এই গ্রামের মানুষ, সবাইকে ছেড়ে শহরে গিয়ে উঠবি, খারাপ লাগছে না? রেখা চুপ করে আছে দেখে অসীম বলল, তা আবার লাগছে না, সারাক্ষণই কান্নাকাটি করছে। ভাল লাগছে না দীনুদা ভাবতে। রেখা শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে। দীনু জোরে বলে উঠল, এসব কী বলছিস অসীম! খারাপ লাগাটাই তো স্বাভাবিক, তাই বলে বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবে না! বাপের বাড়িতে থাকবে নাকি চিরদিন? রেখা আস্তে আস্তে বলল, সেটাই ভাল ছিল দীনুদা, বিয়ে না করলে কী হয় মেয়েদের? ছেলেরা থাকতে পারে, আর মেয়েরা কী দোষ করেছে সে বাপ-মার কাছে চিরটা কাল থাকতে পারবে না! আমার ভীষণ ভয়ভয় করছে। কেমন না কেমন হবে মানুষগুলো, কে জানে! দীনু ধমকের সুরে বলল, একদম চুপ। আর কোনো কথা নয়। দুঃখের কথা তো নয়ই। ওরা মানুষ হিসেবে খুব ভাল। আমি শুনেছি বিশ্বস্তসূত্রে। এসব নিয়ে একটুও ভাবিস না। ঈশ্বর মঙ্গলময়। রেখা দীনুর সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে চলে গেল ঘরে মায়ের কাছে।

শোভার আজ অনেক কাজ। রাতের রান্নাও একবারে করে রাখবে। কাল থেকে একটা রান্নার মাসি আসবে। জলধরের বউ লতারই নিজের দিদি। দক্ষিণ পাড়ায় থাকে। দীনুই ঠিক করে দিয়েছে। আজ কল্যাণী আসছে। বিকেলের মধ্যে চলে আসবে। এলে তো গল্পগুজব চলবে। তাই রান্নাটা একবারে করে রাখাই ভাল। পট্‌লার মা এসে অনেক কিছুই করে দিয়ে গেছে। এখন রেখা সাহায্য করছে মাকে, দীনু চলে গেছে। অসীম রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে রেখাকে কাজ করতে দেখে খুব রাগারাগি করল কিছুক্ষণ। মণিময় অসীমকে সমর্থন করে শোভাকে বলল, কী হয়েছে তোমার। মেয়েটার দুদিন বাদে বিয়ে, ওকে দিয়ে কাজ করাচ্ছ কেন? এতদিন তো করেই এসেছে। এখনও তুমি ওকে সাহায্য করতে বলছ! কী এমন রান্না যে একা করতে পার না। পট্‌লার মা তো সবই করে দিয়ে গেছে। সত্যি কী অদ্ভুত স্বভাবের মা তুমি! বাবা হয়ে আমি যেটা বুঝি, সেটা মা হয়ে তুমি বোঝ না? শোভা মণিময়ের দিকে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল। কে বলবে এই সে লোক, যে কোনোদিনই শোভাকে চোখ রাঙিয়ে কথা বলেনি, তার আজ কী হল। শোভা শুধু বলল, আমি তো ওকে ডাকিনা কাজ করার জন্য। ওই তো আসে। মণিময় বাঁকা হাসি দিয়ে বলল বাঃ—চমৎকার অজুহাত। তুমি তো ওকে না করতে পার। তাও তো কর না। রেখা মণিময়ের কথায় বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে। শোভা খিঁচিয়ে উঠে বলল, যাও তো এখান থেকে, আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। মাথাটা গরম কোরো না তো! মণিময় আর কিছু বলল না অনেক কিছু ভেবে। চলে এল নিজের ঘরে। স্কুলের সময় হয়ে আসছে।

মণিময় হরিমোহনকে বলেছিল ফোন করে সুনির্মলের বাড়ি গিয়ে খোঁজ- খবর নিয়ে আসতে।

মণিময়ের কথামতো সকাল সকাল বেরিয়ে গেল হরিমোহন কলকাতার উদ্দেশ্যে। কালই মণিময় বলেছে হরিমোহনকে। সকালবেলায় ক্যাটারারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে গিয়ে মণিময়ের মনে ছিল না। পরে ফোন করে হরিমোহনকে বলেছিল। সেই অনুযায়ী হরিমোহন সকালবেলা রওনা হয়ে সুনির্মলের বাড়ি এসে পৌঁছল প্রায় দুটো আড়াইটা হবে। সুনির্মল জানত মণিময় হরিমোহনকে পাঠাচ্ছে কিছু আলোচনার জন্য। এখন ভরসা করা যায় হরিমোহনকে, তাই মণিময় নিজে না এসে হরিমোহনকেই পাঠিয়েছে। বাড়ি একদম সুসজ্জিত। চারদিকে রঙিন কাপড়ের মোড়কে ঢাকা হয়েছে প্যান্ডেল। ঝাড়বাতিও লাগানো হয়েছে। হরিমোহন ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সুনির্মল আপ্যায়ন করে নিয়ে বসাল। সুনির্মলের স্ত্রী গীতাও এসে বসল। সুনির্মল বলল, তারপর বলুন হরিমোহনবাবু, বিয়েবাড়ির কী খবর! সব রেডি? হরিমোহন শান্ত গলায় বলল, হ্যাঁ — সবই প্রায় প্রস্তুত। আজ থেকে বিয়েবাড়ির গেট-প্যান্ডেলের কাজ শুরু হয়েছে। মণিময় স্যার তো একা, তাই আমরাও একটু একটু সাহায্য করার চেষ্টা করছি। আপনার তো দেখছি সবই রেডি। গীতা হরিমোহনের কথার উত্তরে বলল, উনিও তো একাই। ছেলে তো এখনও ছুটি পায়নি। তাই আগে আগেই সব রেডি করা হচ্ছে। আজ রাতের ফ্লাইটে আমার দেওর আসছে, সে এলে একদম নিশ্চিন্ত। হরিমোহন এমন ভাব দেখাল যেন সুবিমলকে চেনে। সেইভাবেই বলল, তাই নাকি? উনি এসে পড়লে তো কথাই নেই। সুনির্মল অবাক ভঙ্গীতে বলল, আপনি কী আমার ভাইকে চেনেন? হরিমোহন থতমত খেয়ে বলল, না, না, আমি কী করে চিনব বলুন! আপনারা বললে তাই আমিও বুঝলাম। সুনির্মল মজা করতে ভালবাসে সবসময়েই। সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। গীতা ভিতরে গিয়ে এক গ্লাস সরবত নিয়ে এল হরিমোহনের জন্য। হরিমোহন সরবত খাওয়া শেষ করে নিল মুহূর্তের মধ্যে। তারপর পকেট থেকে বের করে একটা পান মুখে দিল। সুনির্মল বলল, এবার কাজের কথায় আসা যাক। তাই না? বলছিলাম — আমাদের একটাই তো দাবি, সেটা হচ্ছে বরযাত্রীদের সুষ্ঠুভাবে আপ্যায়ন করা। সে ব্যবস্থা হয়েছে কি? বুঝতেই তো পারছেন, রাজুর কলিগরা, এছাড়া আমার নিকট আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশীদের মধ্যে কয়েকজন — এই আর কী। হরিমোহন মনোযোগ দিয়ে সুনির্মলের কথাগুলো শুনল। তারপরে বলল, আচ্ছা দাদা, বরযাত্রী কতজন হবে! সেই অনুযায়ী তো সব ব্যবস্থা করতে হবে। তাই জিজ্ঞেস করছিলাম আর কী! হরিমোহন খুব বিনয়ী ভাবে সুনির্মলের দিকে তাকিয়ে রইল উত্তরের অপেক্ষায়। সুনির্মল বিনা দ্বিধায় বলল, তা প্রায় সত্তরজন তো হবেই। এর বেশি হবে না, দু-চারজন কম হতে পারে। মণিময়বাবুকে বলবেন, ওঁর সাধ্যের মধ্যেই সব আয়োজন করতে। হরিমোহন খুশী হল মনে মনে। মণিময় স্যারের কথা বলেছে তাই। সুনির্মলের বিবেচনাবোধ আছে

তাহলে! হরিমোহন ভেবে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ সে তো অবশ্যই। উনি তো এমনই একজন মানুষ, যিনি কারুর কাছ থেকে কোনো রকম আর্থিক সাহায্য নিতে নারাজ। এমন কী ধার হিসেবেও কোনো টাকাপয়সা নিতে চাননা। ওঁর যতটুকু ক্ষমতা, তার মধ্যেই উনি যথেষ্ট পারদর্শিতার সাথে এই শুভকাজটা সম্পন্ন করবেন বলে আমাদের আশা। সুনির্মলও যথেষ্ট বিচক্ষণতার সঙ্গে হরিমোহনের সঙ্গে আরও আলাপ আলোচনা করল। গীতা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে চলে গেছে। তারপর হরিমোহনকে ডেকে সুনির্মল সহ ডাইনিং টেবিলে খেতে দিল। বিশাল আয়োজন। হরিমোহন এখন আর খেতে পারে না। খাওয়াদাওয়ার পর বিদায়ের পালা। তাই হরিমোহন, বিনয়াবনত হয়ে সুনির্মল ও গীতার কাছে হাত জোড় করে অনুমতি চাইল এবং বলল, অনেক খেলাম দাদা। এখন তাহলে আমি রওনা হই। আর যদি কিছু বলার থাকে তাহলে স্যার-এর সঙ্গে ফোনে বলে নেবেন। আর আপনি যা-যা বলেছেন, তাই গিয়ে আমি স্যারকে বলব। কোনো চিন্তা করবেন না, আমরা নয়নপুর বাসিন্দারা সবাই মিলে আপনাদের আপ্যায়ন করব। আতিথেয়তার কোনো ত্রুটি স্যার রাখবেন না, এটুকু আমি জোর দিয়েই বলতে পারি। সুনির্মল পাল্টা জবাবে বলল এ আপনি কী বলছেন, মণিময়বাবুকে তো আমরাও খুব ভালভাবে চিনি। ওঁর মতো সজ্জন ব্যক্তির সঙ্গে কুটুম্বিতা হচ্ছে — এ আমাদের পরম ভাগ্য হরিমোহনবাবু! হরিমোহন সুনির্মলের কথায় একগাল হাসি দিয়ে বলল, তা হলে এবার আমি যাই। বলে দুজনের দিকে তাকিয়েই বিদায় নিল হরিমোহন। হরিমোহনের খুবই ভাল লাগল সুনির্মলের আচার ব্যবহার। রেখা সুখেই থাকবে আশা করা যায়।

উপেনের বাড়িতে দীনু এসেছে মলয়কে নিয়ে। ড্রইং রুমটাকে সাজাতে হবে বর এবং বরযাত্রীদের জন্য ।.অঞ্জলি এ সবের মধ্যে নেই। রান্না আরম্ভ করেছে মাত্র। বেলা তো বেশি হয়নি, মাত্র আটটা বাজে। পটলার মা কাজ করছে। অঞ্জলিকেও সাহায্য করে দিচ্ছে সব্জি কেটে, মাছ ধুয়ে, বাটনা বেটে। এখানে শেষ করে তারপর রেখাদের বাড়ি যাবে। উপেন দীনুকে দেখে বাইরে এসেছে। দীনুকে উপেন বলল, হ্যাঁ বাবা দীনু, আরও একজন লোক তো লাগবে, সোফা সেট, টিভি, ছোটো খাটটা এগুলো বের করতে! দীনু ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখে নিল। তারপর বলল, হ্যাঁ স্যার — সে তো লাগবেই। আমি তা হলে কাল আবার আসব দুটো লোক নিয়ে। আজ দেখে গেলাম। দীনুর কথায় সম্মতি জানায়, হ্যাঁ — এটাই ভাল হবে। এই জিনিষগুলো, সবগুলো নয়, টিভিটা ছাড়া বাকিগুলো অলকের ঘরে নিয়ে রেখে দিলেই হবে। টি.ভি.টা আমাদের শোবার ঘরে অস্থায়ীভাবে লাগিয়ে নিলেই হবে! দীনু মলয়কে বলল, তুই পারবি তো টি.ভি.টা ঐ ঘরে সেট করে দিতে? মলয় রাজি হয়ে বলল হ্যাঁ, হ্যাঁ, পারব। কালই আমি ওদের সঙ্গে এসে লাগিয়ে দিয়ে যাব। দীনু আশ্বস্ত হয়ে

বলল, স্যার, তবে আমরা যাই আজ, আজ তো কাজ হল না। কালকের মধ্যে অবশ্যই সব কমপ্লিট করতে হবে। ফুল লাগাতে হবে বিয়ের দিন সকালে। তাও আবার ফুল আসবে বর্ধমান থেকে। যাক গে বাকি সব কাজ করে ফেলতে হবে। আমরা আজ যাই স্যার। কাল আমরা এই সময়েই আসব। বলে দীনু ও মলয় চলে গেল। উপেন রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে অঞ্জলিকে বলল, আচ্ছা তোমার কি কোনো ভদ্রতা জ্ঞানও নেই! অঞ্জলি হঠাৎ উপেনের কথায় থমকে গিয়ে বলল, কেন, আমি আবার কী করলাম! উপেন চেঁচিয়ে বলল কী করলে মানে? দীনুদের একটু চা করে দিতে পারলে না। এটাও কি আমাকে বলে দিতেহবে? অঞ্জলি ধীরস্বরে বলল, বলে দিতে তো হবেই। তুমি বললে না কেন ? পট্লার মাকে বললেও তো হত। এখন হইচই করে লাভ কী! উপেনের ঔদ্ধত্য দেখে পট্লার মা চোখ বড় বড় করে তাকাল উপেনের দিকে। উপেন যদিও দেখতে পেল না। উপেন আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেল নিজের ঘরে। অঞ্জলি উপেনের ব্যবহারে মোটেও দুঃখ পেল না। কারণ এটা এই লোকটার রোজনামচা। অনেকটাই গা সওয়া হয়ে গেছে।

হরিমোহন কলকাতা থেকে ফিরে মণিময়ের বাড়ি এসেছে। কাল রাত হয়ে গিয়েছিল ফিরতে। তাই আর আসেনি। ঘুম থেকে উঠে হাঁটতে বেরিয়ে বাড়ি ফেরার পথে মণিময়ের বাড়ি ঢুকেছে। হরিমোহন ঢুকেই দেখল মণিময় উঠানে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে। হরিমোহনকে দেখেই উৎসাহিত হয়ে পড়ল। তিন চারটে চেয়ার উঠানে পাতাই ছিল। তাই দুজনেই দুটো চেয়ারে বসে কথা আরম্ভ করল। হরিমোহন প্রথমেই বলল, সত্যি স্যার, সুনির্মল বাবু অপূর্ব লোক। কী সুন্দর তার অমায়িক ব্যবহার! আমার এত ভাল লেগেছে যে আপনাকে বোঝাতে পারছি না। মণিময় অধৈর্য হয়ে বলল সে তো বুঝলাম, এবার আসল কথা বলুন। সুনির্মলবাবু কী বলল! হরিমোহন বুঝল মণিময় স্যার সুনির্মলের কথা শোনার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে রয়েছে। মেয়ের শ্বশুর বলে কথা। তাই হরিমোহন দেরি না করে মণিময়কে বলল, স্যার, সুনির্মলবাবু বললেন, বরযাত্রী প্রায় সত্তর জনের মতো হবে। এর বেশি হবে না। ওদের জন্য স্পেশাল ব্যবস্থা করতে বলেছে। সুষ্ঠু তদারকিতে ওদের যেন মান সম্মান বজায় রাখা হয়। এটাই নাকি ওদের একমাত্র দাবি স্যার। মণিময় হরিমোহনের কথায় মৃদু হাসল। তারপরে বলল, সে তো আমি দেখবই। বরযাত্রীদের দেখাশুনার জন্য অন্ততপক্ষে পাঁচজনকে মোতায়েন রাখতে হবে, যাতে কোনো ত্রুটি ওরা ধরতে না পারে। কথার মাঝে রেখা চা নিয়ে এল। হরিমোহন রেখাকে দেখে হাসল। মনে মনে তৃপ্তি পেল রেখাকে দেখে। রেখা চলে গেল। হরিমোহন চা খেতে গিয়ে বলল, স্যার, সুনির্মলবাবু এও বলল, বরযাত্রীদের ফেরার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা সুনির্মলবাবুই করে আসবে। এর জন্য আপনাকে চিন্তা করতে না করেছে। সত্যি স্যার — রেখা মা-এর

শ্বশুরবাড়ির লোকজন খুবই ভাল, তুলনাহীন। মণিময়েরও ভাল লাগল সুনির্মলের কথাগুলি শুনে। মণিময় কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বরযাত্রীদের আসার গাড়ি তো আমাকেই ঠিক করতে হবে! তাছাড়া এই কাজটা আমারই করা উচিত। বরের গাড়ি ছাড়াও আরও চারটা গাড়ি লাগবে সেটা দীনুর সঙ্গে কথা বলতে হবে। হরিমোহন সজোরে বলে উঠল, হ্যাঁ, স্যার মনে পড়েছে - এ ব্যাপারেও উনি বলে দিয়েছেন। বরের গাড়ি আপনি তো আলাদা সুন্দর গাড়ি দেবেনই, বাকিদের জন্য বাসের ব্যবস্থা করলেই যথেষ্ট। মণিময় শুনে চমকে উঠল, এসব কী বলছে হরিমোহন। সত্যিই কী সুনির্মল তাই বলেছে! নাকি হরিমোহন নিজে বানিয়ে বলছে কে জানে। তাই মণিময় বলল, ঠিক আছে হরিমোহনবাবু। আমি বরং রাতে একবার সুনির্মলবাবুর সঙ্গে কথা বলে নেব এ ব্যাপারে। আসলে বাসটা আমার ঠিক পছন্দ নয় বরযাত্রীদের জন্য। তবুও আমি কথা বলে নেব। দেখাই যাক না, উনি কী বলেন। হরিমোহন বুঝল মণিময়ের রুচিতে বাধছে। হঠাৎ কল্যাণী একটা প্লেটে মিষ্টি নিয়ে এল হরিমোহনের জন্য। দেখে মণিময়ও খুশী হল। কল্যাণীকে দেখে হরিমোহন চিনতে পারল। কল্যাণী তো ভাল করেই চেনে। তখন তো হরিমোহন অন্য প্রকৃতির লোক ছিল। কল্যাণী এখানে এসেই হরিমোহনের আদ্যোপান্ত শুনেছে। তাই কল্যাণী বলল, দাদা, ভাল আছেন? বৌদি কেমন আছে! হরিমোহন বিগলিত হয়ে বলল, আমরা আছি একরকম, তোমাদের খবর কী ভাই, কতদিন পরে তোমাকে দেখলাম বলো তো? কল্যাণীকে মণিময় ইশারা করছিল চলে যাওয়ার জন্য। তাই কল্যাণী হরিমোহনকে বলল, মিষ্টিটা খেয়ে নিন। আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। আমি যাই — বলে একরকম পালিয়েই গেল কল্যাণী। মণিময় বলল,খান, হরিমোহনবাবু। কল্যাণী এনেছে কৃষ্ণনগর থেকে। কৃষ্ণনগরের স্পেশাল মিষ্টি। হরিমোহন খুব খুশী তাকে এত আপ্যায়নের বহর দেখে! হরিমোহন বিনয়ী ভঙ্গীতে বলল, আপনি বলছেন স্যার, অবশ্যই খাব, কিন্তু এমনিতে আমি এখন সকালে এক কাপ চা খেয়ে স্নান করে পুজো সেরে, তারপর যা খাওয়ার খাই। এ সবই আমার স্ত্রী লাবণ্যর কথামতোই করছি। মণিময় হেসে বলল, বাঃ — সে তো খুব ভাল কথা। কারোরই সারা জীবন তো একই নিয়মে চলতে পারে না। একটা সময় প্রয়োজনের তাগিদে অনেক কিছুই পরিবর্তন করতে হয়। আপনার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে হরিমোহনবাবু। এটা খেয়ে নিন, একদিন খেলে কিছু হবে না। হরিমোহন মণিময়ের কথা মতো মিষ্টিটা খেয়ে নিল। হরিমোহনের এখন ওঠা দরকার। কেননা মণিময় স্যার স্কুলে যাবে, নাকি আজ থেকেই ছুটি নিয়েছে তা তো হরিমোহন জানে না। তাই হরিমোহন জিজ্ঞেস করল, স্যার — আপনার ছুটি আরম্ভ হয়ে গেছে? মণিময় অন্যদিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছিল, হঠাৎ হরিমোহনের কথার উত্তরে বলল আমার ছুটির

কথা বলছেন ? সে তো কাল থেকেই শুরু হয়ে গেছে, কাল তাই কিছু নিমন্ত্রণ করে এসছি। আজ আবার বেরোব বিকেলের দিকে। বাকিগুলো শেষ করে আসব। মণিময় দেখল জলধর এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে একটা প্যাকেট, আরেক হাতে দুটো পায়রা। মণিময় উঠে এগিয়ে গেল, অবাক কণ্ঠে বলল, কীরে জলধর, তুই এ সময় এখানে? বাজার থেকে ফিরলি বুঝি? জলধর হরিমোহনের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, না স্যার, আপনার বাড়িতেই এস্‌ছি। একটু দরকার ছিল, রেখা দিদির সঙ্গে। মণিময় হেসে বলল, ও হো - তাই বল্। দাঁড়া রেখাকে ডেকে দিচ্ছি। হরিমোহন ঠিকই বুঝল জলধর কেন এসেছে। তাও মণিময়কে কিছুই বলল না। উঠে দাঁড়িয়ে মণিময়কে বলে চলে গেল। মণিময় বলে দিল কাল সকালে আসার জন্যে। কী দরকার আছে! তাই হরিমোহন চলে গেল। মণিময় রেখাকে ডাকলে রেখা এল। রেখা জলধরকে দেখে হেসে বলল, আরে জলধর দা তুমি, মোড়াটা দিয়ে বলল বোসো, বোসো, কী খবর বল! এতদিন পর আমাকে মনে পড়ল! জলধর রেখার কথায় লজ্জাবোধ করল। জলধর ভাবে, সমাজে ওদের ছোটোলোক বলেই পরিচিত। তাহলে রেখার এই উক্তিতে তো জলধর অস্বস্তি বোধ করারই কথা। রেখার কাছে এরাও মানুষ, তাইই হয়তো সবাইকে মান দিয়েই কথা বলে। সে-ই চলে যাচ্ছে শ্বশুর বাড়ি। এই গ্রাম যে কেঁদে ভাসাবে, সেটা জলধরও জানে। জলধর অস্বস্তিতেই বলল, না দিদি, এখন আর বসব না। তুমি তো আমাদের গাঁয়ের গর্ব গো, তুমি চলে যাচ্ছ শ্বশুরবাড়ি, এ যে আমাদের মতো মানুষের কাছে কত আনন্দের। তা তুমি বুঝবে না দিদি। তুমি আমাদের খবরাখবর সবসময়েই রেখেছ! তোমার কাছে গরিব বড়লোকের কোনো ফারাক নাই। তাই তোমার কাছ থেকে আমরা সবসময়েই ভালবাসা পেয়েছি। রেখা হতবাক হয়ে রইল জলধরের কথার ধরনে। জলধরকে বলল বাব্বা - এত প্রশংসা করছ আমার ! কেন, আমি কী করেছি তোমাদের জন্য ! কিছুই তো করিনি। জলধর আবারও বলল, তুমি আমাদের সঙ্গে এত মেলামেশা করেছ নিজের মতন করেছ, কোনোদিনই ঘেন্নার চোখে দেখনি। এটাই আমাদের মতো মূর্খ মানুষদের কাছে অনেক পাওয়া গো দিদি। দিদি একটা জিনিষ তোমাকে দেব, না করবে না তো? রেখা বলল কী দেবে জলধরদা? তোমাদের শুভেচ্ছাই শুধু চাই আমি। আর কিছু নয়। জলধর নাছোড়বান্দা হয়ে বলল, তা বললে কি চলবে? তোমার জন্য এনেছি এগুলো, বলে জলধর প্যাকেটটা আর পায়রা দুটো বারান্দায় রাখল। রেখা অবাক হয়ে রইল জলধরের মতো মানুষের আন্তরিকতা দেখে। এরা সমাজের নিচুস্তরের মানুষ। এরাও জানে কর্তব্য করতে! রেখা নিচু গলায় বলল এগুলো আবার কেন এনেছ তুমি ? কতগুলো পয়সা খরচ করলে বলতো। আমার খুব খারাপ লাগছে জলধরদা। তুমি একটু বোসো, আমি আসছি, বলে রেখা ভিতরে গিয়ে একটা প্লেটে একটা

মিষ্টি আর একগ্লাস জল এনে দিল জলধরকে। শোভা এসে চুপি দিয়ে দেখে চলে গেল। জলধর বলল তুমি আবার মিষ্টি দিলে দিদি! বলে জলধর মিষ্টিটা খেয়ে নিল। তুমি আমাদের সকলের দিদি। এই গ্রামে আমাদের আর কোনো দিদি রইল না — দীর্ঘশ্বাস ফেলে জলধর বলল। রেখার চোখ ছলছল করে উঠল। জলধর বলল, দিদি — তুমি পায়রার মাংস আর গোবিন্দভোগ চালের ভাত করে খাবে। আজ রাতেই করে খেয়ে নিও। তাহলে আমি আর লতা খুব শান্তি পাব গো দিদি। কাল এসে খবর নিয়ে যাব খেয়েছ কি না। এখন আমি যাই দিদি! খাবে কিন্তু। বলে উঠে চলে গেল। রেখা বসে ভাবতে লাগল, এরা নিচু স্তরের মানুষ হলেও, মন তো এদের উঁচু স্তরের। এদের সাথে গভীরভাবে মিশলেই শুধু বোঝা যায় এদের অন্তরের পরিধি কতটুকু বিস্তৃত। শ্রদ্ধা, সম্মান এদের কাছ থেকেই পাওয়া যায়। অথচ প্রতিপত্তিশালী লোকেরা এদের মানুষ বলেও গণ্য করে না। এই হচ্ছে সমাজের চালচিত্র। সত্যিই রেখা রাতের বেলায় পায়রার মাংস রান্না করে সবাইকে খাওয়াল, নিজেও তৃপ্তি করে খেল। রেখার খুব প্রিয়, এই পায়রার মাংস। শোভার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই এই ব্যাপারে। মণিময়, তার মেয়েকে সবাই এত স্নেহ করে ভেবে মনেমনে গর্বিত। অসীমও জানে রেখা খুবই প্রিয় পাড়াপ্রতিবেশীদের কাছে শুধুমাত্র তার আচার ব্যবহারের জন্য।

সমস্ত কাজকর্ম পরিপূর্ণভাবে সমাপ্ত। মণিময়ের বাড়ি সেজেছে বিয়ের সাজে। সানাই বাজছে মিহি সুরে। কলকাতার থেকে এসেছে গিরিজা একা। উপেনের ভাই রতীশ এসেছে সপরিবারে। উপেনের বাড়িতেই এসে উঠেছে কাল। মণিময়ের মনটা খুবই বিষণ্ণ। মেয়েটা বাড়ি খালি করে চলে যাবে। সেই আয়োজনই তো চলছে এতদিন যাবৎ। একদিনেই সব শেষ হয়ে যাবে। আজ বিয়ে, কালই চলে যাবে রেখা। ঈশ্বরের কাছে মণিময়ের একটাই আবেদন, মেয়েটা যেন শান্তিতে থাকে। সব দেখেশুনেই তো বিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তবুও তো মনের একটা কোণে সন্দেহ থেকেই যায়! প্রত্যেক বাবা-মার ক্ষেত্রেই হয়তো তাই হয়। চিন্তার আর শেষ থাকে না। কিন্তু শোভা ? সে তো দিব্যি আছে। হয়তো বা মনের কষ্ট মনেই জমিয়ে রেখেছে। বুঝতে দিচ্ছে না। পরে বোঝা যাবে। সব কাজ মিটে গেলে তখন বোঝা যাবে।

শেষরাতের অনুষ্ঠান দধিমঙ্গলের পর আর শোভা বা মণিময় কেউই ঘুমায়নি। রেখাকে একটা ঘর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। শুধুই কাঁদছে বসে। মা-বাবাকে ছেড়ে যেতে কি কোনো মেয়ের মন চায়। কিন্তু যেতে তো হবেই, এ যে সামাজিক প্রথা। মণিময় একটু বাদেবাদেই মেয়ের কাছে গিয়ে বসছে। মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক কিছু বলছে। অসীম, কল্যাণী ওরা এখনও শুয়ে। দুপুরের খাওয়াদাওয়া ক্যাটারারই ব্যবস্থা করবে। সকালের ব্রেকফাস্টও ওরাই করে ঘরে দিয়ে দেবে। রান্নার মাসি শুধু চা করছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, দীনু, হরিমোহন, উপেন, গিরিজা,

রতীশ সবাই এল। হাসি, গল্পের সাথে ব্রেকফাস্ট করল সবাই এখানে। চা-ও খাওয়া হল। হরিমোহনের স্ত্রী লাবণ্য ভোরবেলা এসে কতক্ষণ রেখার সঙ্গে বসে কাটিয়ে গেছে। লাবণ্যই বলে গেছে শোভাকে ঠাকুরবাড়ির অন্নভোগ এনে রেখাকে খাওয়াতে। তা হলে বাড়িতে আর ঝামেলা করতে হয় না। শোভার মন মতোই হয়েছে পরামর্শটা। দুপুরে সবাই প্যান্ডেলে বসেই খাওয়াদাওয়া করল। মণিময় এক ফাঁকে উপেনের বাড়ি গিয়ে বর এবং বরযাত্রীদের বসার ব্যবস্থাটা দেখে এল। খুবই সুন্দর হয়েছে। ঘরটা চেনাই যায় না, এত সুন্দর হয়েছে। মণিময় এই সুযোগে অঞ্জলি বৌঠানকেও বলে এল সন্ধ্যাবেলা যেন অবশ্যই আসে বিয়ে বাড়ি তে। রতীশ বৌকে বলে এল অঞ্জলিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সব পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এখন আরম্ভ হবে রাতের রান্না। মণিময় দানে বসবে বলে সেই সময়টা উপেন, অরুণ, দীনু, অসীম থাকবে খাওয়ার প্যান্ডেলে সুব্যবস্থাপনার জন্য। শোভা মণিময়ের জন্য নূতন ধুতি আর চাদর বের করে রেখেছে। শোভা, কল্যাণী সব নূতন শাড়ি পরে প্রস্তুত জল ভরতে যাওয়ার জন্য। রমা, লতা, লাবণ্য, রতীশের বউও এল জল ভরতে যাওয়ার জন্য। সন্ধে ঘনিয়ে আসছে। যেন পুরো নয়নপুর গ্রাম আলোয় ভাসছে। আজ যে স্যারের মেয়ের বিয়ে, উঁচু-নিচু সব ঘরে ঘরে বিয়েতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। সানাই-এর সুরে বাজছে বেদনার সুর। শীতের পরশে ধরিত্রীর রূপ যতই রুক্ষ হোক —— কিন্তু বিয়ের আমেজে, উল্লাসে মুখরিত নয়নপুর যেন সেজেছে নববধূ সাজে। সকলস্তরের সব মানুষ উচ্ছ্বাসে আনন্দে হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত। মেঠো রাস্তা পাকা ঝকঝকে হয়ে বেরিয়ে গেছে মণিময়ের বাড়ির সামনে দিয়ে। স্কুল মাঠের রাস্তা পর্যন্ত লাগানো হয়েছে ঝাড়বাতি। অনেক নানা রঙের লাইট। পুরো রাস্তা জুড়ে হয়েছে প্যান্ডেল । যেন আলোয় আলোময়। রেখা সাজতে বসেছে। পড়েছে লাল বেনারসী, লাল ওড়না, খোপায় ফুলের মালা, কপালে চন্দনের টিপ, পায়ে আলতা, আলতা দিয়ে হাতও রাঙানো হয়েছে, ঠোঁটে হালকা রংয়ের লিপস্টিক। গয়নাগাটি পরে যেন স্বাগতা-লক্ষ্মীর মতো লাগছে। প্রণতি সাজিয়েছে, সঙ্গে রয়েছে রমা। রেখার বান্ধবী চম্পা আসেনি। চম্পার মা শান্তিবালা সকালবেলা এসেই আশীর্বাদ করে গেছে। রাতে আসবে না তাই।

কনের সাজে রেখাকে কি অপূর্বই না দেখাচ্ছে। মণিময় গিয়ে চুপি দিয়ে দেখে চলে এল। সব মেয়েদের ভিড়। শোভার মনটা বেশি ভাল নেই। মা তো! ভাল না থাকারই কথা। তবুও তো সবই করতে হচ্ছে। ভাল একটা সিল্কের শাড়ি পরেছে। খোঁপা বেধে দিয়েছে প্রণতি। নিজের ঘরে চুপ করে বসে রয়েছে শোভা। এখনও লোকজন আসা শুরু হয়নি। কল্যাণীর চোখে পড়ল, এসে শোভাকে বলল কি গো বৌদি —— তুমি এখানে বসে আছ যে! কল্যাণী এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে ফেলল শোভা। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, বল্‌না কনু, আমি কী করে

থাকব। কার সঙ্গে মনের কথা বলব। আমি যে সহ্য করতে পারছি না রে। কল্যাণীও চোখের জল মুছতে মুছতে বলল, এসব বোলো না বৌদি, সব মেয়েদেরই বিয়ে হয়! তাই তোমার মেয়ের কী নূতন কিছু হচ্ছে নাকি! এ তো আনন্দের কথা, ভাল বরে, ভাল ঘরে রেখার বিয়ে হচ্ছে! এত মন খারাপ করা তোমার উচিত নয়। একটু শুয়ে থাকো। নয়তো শরীরটা খারাপ করবে। লোকজন এলে আমি এসে ডাকব। বলে কল্যাণী চলে গেল রেখার ঘরে।

বিয়ে সময়মতোই সুসম্পন্ন হল। সুনির্মলও যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে বরযাত্রীদের আপ্যায়নে। সুনির্মলের ভাই সুবিমল যথেষ্ট ভদ্র এবং বিনয়ী। হরিমোহন যেহেতু এই বিয়ের ঘটকালি করেছে, তাই তাকে একটা ধুতি গিফ্‌ট হিসেবে দেওয়া হয়েছে। হরিমোহন সকাল থেকেই এই বিয়ে বাড়িতে। দীনুর সঙ্গে সঙ্গে হরিমোহনও সবকিছু তদারকি করেছে। অল্প বয়সের যুবক-যুবতীরা বাসর জেগে গানবাজনা, হইচই করেছে। বিয়ের পরদিন মণিময়ের বাড়ি টা খুবই ম্লান দেখাচ্ছে। আজ চারটে নাগাদ রওনা হবে মেয়ে জামাই। রাজুর বোন রুমা রয়ে গেছে। একসাথে যাবে। রাজুকেও খুব মিষ্টি লাগছিল দেখতে। বারান্দায় বসে রাজু ও অসীম কথা বলছে। রেখা কী যেন রাজুকে বলতে এসে চলে গেল। হয়তো বা লজ্জায়। রাজু অসীমকে বলল, এবার তোমার পালা, তোমার বোনকে তো আমি নিয়ে যাচ্ছি, তুমি এবার বিয়ে করে বউ নিয়ে এসো ঘরে। তা হলে মা-বাবার আর দুঃখ থাকবে না। গ্রাম বাংলার মেয়ে যাচ্ছে বৌ হয়ে শহরে। ঠিকই মানিয়ে নেবে। কিন্তু একটা শহরের মেয়ে কী পারবে গ্রাম্য পরিবেশে নিজেকে মানাতে! এই একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। যার উত্তর পাওয়া খুবই কষ্টকর।

চার বছর পাঁচ বছর পেরিয়ে গেছে রেখার বিয়ের। এমনিতে ভালই আছে। দুজন দুজনকে খুব ভালবাসে। রাজু খুব খেয়াল রাখে রেখার। কিন্তু ঈশ্বর তো সবদিকে শান্তি দেন না কাউকেই। একটা খুঁত রেখেই দেন। রেখার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। রেখা আজও সন্তানের মুখ দেখতে পারল না। রাজু অনেক বড় বড় ডাক্তার দেখিয়েছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। রাজুর বোন রুমারও বিয়ে হয়েছে বছর তিনেক হবে। বারুইপুরে শ্বশুরবাড়ি। জামাই সুদীপ ব্যাঙ্কে আছে করণিক পদে। রুমা তো বি.এ. পাশও করতে পারেনি। ওদের তিন মাসের একটা পুত্রসন্তান রয়েছে। যাই হোক — সুনির্মল দাদু হতে পেরেছে। রেখার মন ভেঙে গেছে। তবে আগের চাইতে রেখার স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে। দেখতেও এইজন্য খুব ভাল লাগে। নয়নপুরে দু-তিন মাসে একবার যায়। রাজুই নিয়ে যায়। মণিময় রিটায়ারমেন্টে চলে গেছে। কেমন যেন একটু হয়েও গেছে। চোখে ভাল দেখতেও পায় না। অসীম শেওড়াফুলিতে একটা প্রাইভেট কোম্পানীতে সুপারভাইজারের চাকরি জুটিয়েছে। মাইনেপত্র ভালই। ওখানেই থাকে ভাড়া

বাড়িতে। তাই মণিময় ছেলেকে বিয়ে করিয়ে দিয়েছে। দীনুই এই সম্বন্ধটা দিয়েছিল। দীনুরই খুবই দূর সম্পর্কের আত্মীয় হয় ভদ্রলোক। তারই মেয়ে প্রতিমা। নাম যেমন প্রতিমা, দেখতেও তেমনি। প্রতিমার বাবাও স্কুল শিক্ষক ছিলেন। এখন আর নেই। কিছুদিন হয় মারা গেছেন। আমতায় ওদের বাড়ি। প্রতিমা বি.এ. পাশ তো বটেই, গান, শেলাই সবই জানে। রেখার মতোই স্বভাব অনেকটা। শোভা তো খুব স্নেহ করে অসীমের বৌকে। এসব ব্যাপারে মণিময় ভাগ্যবান তো বটেই। ছেলের জন্য এখন আর কোনো টেনশন নেই। উপেনের ছেলে হীরক কলেজে পড়ছে। অঞ্জলি একদম বিছানায়। শুধু প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায়। উপেনও রিটায়ারমেন্টের পর একদম কাবু হয়ে পড়েছে। রান্নার জন্য একটা লোক রাখতে হয়েছে। ঘরে বসেই দুটো টিউশনি করছে উপেন। আগের ঔদ্ধত্য উবে গেছে। হরিমোহন মাঝে মধ্যে দুই বাড়িতেই আসাযাওয়া করে, খোঁজখবর নেয়। হরিমোহন ছেলেকে এখনও বিয়ে করায়নি। তবে রঞ্জনও হরিমোহনের মতো অনেক শুধরে গেছে। লাবণ্য তাই শান্তিতেই আছে মোটামুটি। মধ্যেমধ্যে শোভার কাছে যায় গল্প করতে।

সংসারের টানাপোড়েনে সব মানুষই জীবনের একটা ধাপে এসে ঝিমিয়ে যায় অতীতকে কাছে পেতে চায়। অতীতের স্মৃতিগুলো যেন নেশার মতো হৃদয়কে আঁকড়ে ধরে রাখে। কিন্তু সময়? সে তো কারোর অপেক্ষায় বসে থাকতে পারে না। বয়েই যায়। ব্যথা, বেদনা, আনন্দ সবই সময়ের হাতে, অতীতের গ্রাম্য সমাজ ব্যবস্থা আজও আছে কোনো না কোনো ভাবে, একেবারে ফুরিয়ে যায়নি। যায়নি হারিয়ে। আজও সেখানে পূজাপার্বণ লেগেই থাকে। তেমনি বিবাদ, কলহ, বিভেদও থাকে। থাকে না কোনোকিছুতেই কৃত্রিমতা। ওখানকার আলো, বাতাস যেমন মাটি, তেমনি মাটি মানুষের আন্তরিকতা। জীবনের পথে চলতে গেলে এগুলি একান্তই দরকার। কোথায় হারিয়ে গেছে মানুষের মধ্যে সহজসরলতার ছাপ, অন্তরের ভালবাসাও নেই। আজ আর কোথাও নেই মানুষের মহত্ত্ব, ছেয়ে গেছে নৈরাজ্য, দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে স্তরেস্তরে। সমাজ চলেছে কলঙ্কের পথে। সততার ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছে মানুষ। দ্রুত ধাবমান বেগে এগিয়ে চলেছে শহরগুলো। শুধু পিছিয়ে রয়েছে গ্রামবাংলার সুনিপুণ চিত্র, অতীত বহনকারী কতগুলো স্মৃতি। মেনে নেওয়া যায় না শহরের রুক্ষ চেহারার কাছে প্রাণমুগ্ধ করা শান্ত, হৃদয় জুড়ানো গ্রামের পরাজয়! কখনও বা বানের জলের করাল গ্রাসে তলিয়ে যাচ্ছে, কখনও দুর্বৃত্তদের কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বাংলার অনেক গ্রাম। ভেজালেভেজালে জয়জয়কার দেশ। তাই তো অকৃত্রিমতার স্থান কোথাও হয় না। মণিময়, উপেনের নয়নপুর আজও সুরক্ষিত। বিবাদ, কলহের মাঝেও শান্তি খুঁজে পায় ওরা। অশান্তির আগুনে জ্বলে। একটু শান্তির জন্য বাড়ি থেকে বিতারিত হতে হয় না। সবুজ বনানীতে ঘেরা, মাটির গন্ধ

আজও শুধু গ্রামেই মেলে। শহরের মানুষই মানুষ, আর যারা গ্রামে বাস করে তারা মানুষ নয়? শহর তো গ্রামেরই উৎস। বেকারত্বের জ্বালা মেটাতে কেন শহরে আসতে হয়। একটা মেয়েকে সুপাত্রে দান করতে হলে কেন শহরের ছেলে খোঁজা হয়! তার কারণই হচ্ছে বাংলার গ্রামগুলোর কোনো রক্ষণাবেক্ষণ নেই, নেই কোনো উন্নয়ন প্রকল্প। সেখানে সহায়সম্বলহীন মানুষদের বাস, শিক্ষার চরম অবনতি আজও লক্ষ করা যায়। তার উন্নয়নের চেষ্টা হচ্ছে না যে তা নয়, কিন্তু লুটেরাদের হাতে টাকা পড়লে তো উন্নতির মুখ থুবড়ে পড়বে। কোনো কাজেরই অগ্রগতি হবে না। গ্রামের নিরীহ মানুষরা তো চায়ই গ্রামে কারখানা হোক। ভাল হাসপাতাল হোক — শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা হোক্ —কিন্তু এখন মণিময় উপেনের মতো লোক তো হারিয়ে গেছে। কে করবে ওদের স্বপ্ন পূরণের চেষ্টা!

